সন্তানবৎসলা

শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী

স্বামী নারায়ণানন্দ তীর্থ

প্রকাশক

শ্রীকল্যাণ কুমার চট্টোপাধ্যায়
শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী আশ্রম
ভাদৈনী, বারাণসী—২২১০০১

প্রথম প্রকাশ—১লা ভাদ্র ১৩৫৮

প্রাপ্তিস্থান

১. শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী আশ্রম
ভাদৈনী, বারাণসী—২২১০০১

২. শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী আশ্রম
আগরপাড়া
কলিকাতা-৭০০০৫৮

৩. শ্রীকমলেন্দু ঘোষ
ইউনিক গোল্ড কোটার্স,
৪১ ইডেন হাসপাতাল রোড্
(কলেজ ষ্ট্রীটের উপর)
কলিকাতা-৭০০০১২

প্রিন্টার্স

রাজধানী প্রিন্টিং
১১৭।১, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০১২

সূচীপত্র

চিত্রসূচী

—উৎসর্গ—

দরিদ্র পিতা-মাতার ঘরে জন্মগ্রহণ করিলেও যাঁহাদের অপরিসীম স্নেহ ও যত্নে কখনও দুঃখের আঁচড় শরীরে লাগে নাই এবং দারিদ্র্যের কশাঘাত জীবনে সহ্য করিতে হয় নাই, সেই পরমারাধ্য পরমপূজ্য সন্তানবৎসল জনক-জননীর পুণ্য স্মৃতিকল্পে বিশ্বজননী পরমস্নেহময়ী শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ীর স্নেহ, ক্ষমা ও করুণার বিবৃতি 'সন্তানবৎসলা শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী' অতিশয় শ্রদ্ধা, ভক্তি ও কৃতজ্ঞতার সহিত সাদরে উৎসর্গিত হইল ॥ ইতি ॥

অতি অধম দীন সন্তান
নারায়ণানন্দ

সন্তানবৎসলা শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী

ভূমিকা

মার কথা অমৃত সমান—যিনি বলেন এবং যিনি শ্রবণ করেন, উভয়েই ধন্য। তবে যাঁর মুখে বা লেখনীদ্বারা মাতৃ-মাহাত্ম্য প্রচারিত হয়, তিনি নমস্য। কারণ মায়ের অশেষ কৃপা ব্যতীত, কে মায়ের নিবিড় স্পর্শ-মহিমা উন্মোচনে সমর্থ হয়। তাই 'ভাইজী' তাঁর 'মাতৃদর্শন' পুস্তকে লিখিয়াছেন "আমার শুষ্ক হৃদয় কিরূপে তিনি (মাতাজী) প্রাণময় করিয়াছেন, সে সম্বন্ধে অল্প কয়েকটি কথা এই বইতে অবতারণ করিয়াছি মাত্র।" ইহা হইতে বুঝা যায় যে ভাইজীর হৃদয় মায়ের কৃপায় প্রাণময় হইয়াছিল বলিয়াই 'মাতৃ-দর্শন' লিখিত হয়। ডঃ গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয় শ্রীগুরুপ্রিয়া দেবী রচিত 'শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী' (১ম), ভূমিকায় বলিয়াছেন "আদ্যাশক্তিকে কে বুঝিতে পারে ? তিনি নিজেকে নিজে প্রকাশিত করিলে তবে তাঁহার কিঞ্চিৎ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়, কিন্তু তাহাও সকলে পায় না যাহার নিকট তিনি যতটুকু আত্মপরিচয় প্রকাশ করেন, সে ততটুকুই পায়। অন্যে কিছুই পায় না।"

লেখক স্বামী নারায়ণানন্দ তীর্থ তাঁহার এই পুস্তকের প্রস্তাবনায় প্রশ্ন করিয়াছেন—"আমার মধ্যে ইহা লিখিবার প্রেরণা আসিল কি করিয়া ?" ইহাই উত্তরে বলিতেই হইবে যে গঙ্গাজলে গঙ্গা পূজার মত, মায়ের কাজ মা-ই করাইয়া লইতেছেন। এই সত্যই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে 'আনন্দময়ী মা' গ্রন্থের লেখক গঙ্গা সমীরণের বাক্যে—"মা ছাড়েন না।···আমার দিক থেকে প্রস্তুতি ছিল না। প্রয়াসও ছিল না। তথাপি মা জুড়ে বসলেন হৃৎমাঝে।"

ভাইজী এবং নারায়ণানন্দ স্বামী উভয়ের জীবনেই একটি সাদৃশ্য দেখা যায়। উভয়েই মাতৃহারা হইয়া 'মা' 'মা' করিয়া ব্যাকুল হৃদয়ে আশ্রয় খুঁজিতেন তাই দর্শনমাত্রই মা আনন্দময়ী তাঁহাদের বুকে টানিয়া লইয়াছিলেন। কিন্তু ভাইজীর জীবনে মায়ের সঙ্গলাভ স্বামীজীর তুলনায় স্বল্পকাল স্থায়ী হইয়াছিল। তাই আজ স্বামীজীর সুদীর্ঘ পঞ্চাশ বৎসরকালের মাতৃ-রসাস্বাদন অনন্যসাধারণ এবং তারই ফলশ্রুতি এই গ্রন্থরত্ন। আশাকরি সহৃদয় পাঠক ইহা পাঠে তৃপ্ত হইবেন।

বারাণসী

শ্রীসুধাংশু চরণ ভট্টাচার্য
অধ্যাপক (অবসরপ্রাপ্ত), উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

প্রস্তাবনা

পরমারাধ্যা বিশ্বজননী পরম স্নেহময়ী শ্রীশ্রীমায়ের একান্ত অনুগত সন্তান শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র রায় যিনি পরবর্তী জীবনে মাতৃ-গোষ্ঠীর নিকট "ভাইজী" নামে পরিচিত হইয়াছিলেন, তিনি বহুপূর্বে মায়ের সন্তানদের কাছে শ্রীশ্রীমাকে যিনি যেভাবে পাইয়াছেন এবং তাঁহার সহিত যে সকল ঘটনা সংঘটিত হইয়াছে সেই সমুদয় যথাযথরূপে লিপিবদ্ধ করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন। তাঁহার জীবিতাবস্থায় এই প্রার্থনার কোন সাড়া কাহারও নিকট হইতে পাইয়াছিলেন বলিযা মনে হয না। শ্রীশ্রীমায়েব প্রত্যেকটি সন্তানের সাথে তাঁহার যে কোন না কোন বিশেষ ঘটনা আছে অনেকেই ইহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়া থাকেন। তাঁহাবা মায়ের স্নেহ, আদব ও ভালবাসা প্রাপ্ত হইয়া যে আপন আপন জীবন মধুময় ও ধন্য করিয়া তুলিতেছেন তাহা সহজেই অনুমান কবা যাইতে পারে। যাঁহারা অতিশয গম্ভীর প্রকৃতির এবং বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি তাঁহারা সেই সমস্ত মাতৃলীলা-প্রসঙ্গ সাধারণের নিকট প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করেন না, সেইহেতু ঐ সব বৃত্তান্ত গুপ্তই থাকিয়া যাইতেছে। ভাব গোপন রাখিলে যে উহা পুষ্ট হয় ও দানা বাঁধে ইহা অতি সত্য কথা এবং ইহা সকলেই জ্ঞাত আছেন। গভীর জলের বড় বড় রুই, কাতলা, মৃগেল ইত্যাদি মৎস্যসকল কদাচিৎ জলেব উপর দৃষ্ট হয়। উহারা সলিলের অতলতলে বাস করিতেই ভালবাসে এবং সেই প্রকারেই থাকিতে অভ্যস্ত। চুনো, পুঁটি, খলিশা প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মাছই অগভীর জলের উপর সদা ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিয়া থাকে। একটি প্রচলিত কথা আছে, "গণ্ডূষজলমাত্রেণ শফরী ফর্-ফরায়তে।" আমার দশাও দাঁড়াইবে তদ্রূপ। এখানে কেহ প্রশ্ন করিতে পারেন, আপনার যখন লিখিবার মত বিদ্যা, বুদ্ধি ও শক্তি নাই এবং লিখিতেও পারেন না তবে এইসব লিখিবার এত প্রয়াস

কেন? এই প্রশ্নের উত্তরে আমার বক্তব্য ও বিনীত নিবেদন, "প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্মাণি সর্বশঃ। অহংকারবিমূঢ়াত্মা কর্তাহমিতি মন্যতে॥" প্রকৃতির সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয়ের দ্বারাই কর্মসকল কৃত হইয়া থাকে। অহংকারবিমূঢ়চিত্ত পুরুষ সেই সকল কর্মের আমিই কর্তা, এই প্রকার অভিমান করে। প্রকৃতিই সর্বপ্রকার কার্য জীবের দ্বারা করাইতেছেন। প্রকৃতিকে অতিক্রম কবা সহজ নহে। আমি তো কিছুই লিখিতে চাহি না কিন্তু মহাবলশালিনী প্রকৃতি আমাকে দিয়া বলাৎ করাইয়া লইতেছেন।

ইহার আর একটি দিকও বিচার করিবার আছে। যাঁহারা শ্রীশ্রীমায়েব নিকট হইতে স্নেহ, আদর ও ভালবাসা জীবনে পর্যাপ্ত পরিমাণে পাইয়াছেন বা পাইতেছেন তাঁহারা যদি সে সকল জগতের সম্মুখে তুলিয়া না ধরেন তাহা হইলে সাধারণ মানব মায়ের মহিমা জানিবে কি কবিযা? শ্রীশ্রীমায়ের যে অসীম স্নেহ, আদর, ক্ষমা ও করুণা। ইহা যদি বিশ্বের প্রাণিবর্গ জানিতে না পারিল তাহা হইলে তাহাদের জীবনের সার্থকতা কি? পরমস্নেহময়ী মাকে এত নিকটে পাইয়াও যাহারা তাঁহার কৃপাবিন্দু হইতে বঞ্চিত তাহারা বাস্তবিকই বড় অকিঞ্চন ও দয়ার পাত্র। অতএব যাঁহারা শ্রীশ্রী মায়ের অপাব স্নেহ, আদর ও করুণা যেমনভাবে তাঁহার কাছ হইতে পাইয়াছেন বা পাইতেছেন তাহা বিশ্ব সংসার তাঁহাদের নিকট হইতে জানিবার দাবি রাখে। ইহা তাহাদের অন্যায্য আবদার নহে। স্নেহ, ক্ষমা ও করুণার সচল বিগ্রহ শ্রীশ্রীমাকে আমি আমার এই অতি ক্ষুদ্র জীবনে যেরূপে পাইয়াছি তাহা অনেকদিন পূর্বে প্রীতিভাজন শ্রীকমলা প্রসন্ন ভট্টাচার্যের (বর্তমানে শ্রীমৎ বিরজানন্দ ব্রহ্মচারীর) বিশেষ আগ্রহে ও শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী সংঘের উদ্যোগে প্রকাশিত "আনন্দবার্তা" ত্রৈমাসিক পত্রিকায় 'পুরাতন স্মৃতি' নাম দিয়া ধারাবাহিকরূপে উপর্যুপরি কয়েক বৎসর প্রকাশিত হইয়াছিল। বিশেষ কোন কারণবশতঃ বহুদিন উহা আর লেখা হয় নাই। লিখিবার জন্য ভিতর হইতেও কোন প্রকার প্রেরণা আসে নাই। সার কথা হইল, শ্রীশ্রীমা না

লিখাইলে তাঁহার কথা নিজের ইচ্ছায় কেহ লিখিতে পারে না। ইহা কেবল আমারই কথা নহে। এই সত্যটি বহুজন পরীক্ষিত এবং বহুজন স্বীকৃত।

শ্রীশ্রীমায়ের সন্তানদের মধ্যে কেহ কেহ আমাকে মায়ের সম্বন্ধে পুনরায় কিছু লিখিবার জন্য অনেকদিন যাবৎই অনুরোধ করিতেছেন। তাঁহাদের পুনপুনঃ বলা সত্ত্বেও যে আমি এ পর্যন্ত মায়ের বিষয় আর কিছু লিখি নাই তাহার কারণ, মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতপ্রবর শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ মহাশয়ের মত মহামনীষী ও অনুভব সম্পন্ন ব্যক্তিও শ্রীশ্রীমাকে ঈশ্বর শ্রেণী, অবতার শ্রেণী, সিদ্ধ শ্রেণী কিংবা সাধকশ্রেণী কোন শ্রেণীরই অন্তর্ভুক্ত করিতে না পারিয়া অবশেষে বলিতে বাধ্য হইয়াছিলেন— 'মা, মা-ই। তাঁহাকে কোন শ্রেণীরই অন্তর্গত করিয়া সীমাবদ্ধ করা যায় না' – এমন মায়ের বিষয় কিছু লিখিবার যোগ্যতা ও সামর্থ্য আমার মধ্যে কোথায়? আমার নিকট শ্রীশ্রীমায়ের জীবনালেখ্য অতিশয় দুর্বোধ্য। যিনি আমার ধরা ছোঁয়ার ঊর্ধ্বে তাঁহার সম্বন্ধে কিছু লিখিতে যাওয়া কেবল বাতুলতাই নহে বরং হাস্যকর ব্যাপার বলিয়াই পরিগণিত হইবার যোগ্য। তা ছাড়া সন্তান হইয়া মায়ের পরিচয় দিতে যাওয়া আমার দৃষ্টিতে ধৃষ্টতাই।

শ্রীযুক্ত গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয় শ্রীশ্রীমাকে তাঁহার ইষ্টদেবী জ্ঞানেই পূজা করিতেন এবং ব্যবহারও তাঁহার সহিত সেভাবেই করিতেন। ইহার সমর্থনে মার নিকট হইতে আমি যে ইঙ্গিত পাইয়াছি তাহা পরে যথাস্থানে লিখিবার ইচ্ছা রহিল। মায়ের অসংখ্য ভক্তবৃন্দের মধ্যে অনেকেই যে তাঁহাকে গুরুরূপে, কি ইষ্টরূপে দেখেন তাহার প্রমাণ তাঁহাদের মায়ের সহিত আচরণেই পরিস্ফুট হইতেছে।

আমি শ্রীশ্রীমায়ের জীবনচরিত লিখিতে বসি নাই। আমি জানি মায়ের জীবনী লেখা সহজ কার্য নহে, বরং ইহা আমার পক্ষে অসাধ্যই। ১৩৮৩ সালের শ্রীশ্রীদুর্গাপূজার পর দেওঘরের মহাতপস্বী মহাত্মা শ্রীমৎ বালানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজের এক শিষ্য এবং শ্রীশ্রীমায়ের বিশেষ কৃপার পাত্র জনৈক ভক্ত আমাকে ৺বিজয়ার

যথাযোগ্য সম্ভাষণ জানাইয়া আমি আমার এই অকিঞ্চিৎকর জীবনে মাকে কিভাবে পাইয়াছি তাহা লিখিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। লোকটি অতিশয় সাধু প্রকৃতির এবং ভগবদ্ভক্ত। একবার শ্রীশ্রীমা যখন তাঁহার রাঁচী আশ্রমে অবস্থান করিতেছিলেন সেই সময় এই ভদ্রলোকটি সস্ত্রীক মায়ের দর্শনে গিয়া তাঁহাকে প্রণাম করেন। মা তাঁহার স্বভাব সুলভ রীতিতে তাঁহার মাথায় স্বীয় করকমল রাখিয়া আশীর্বাদ করিয়াছিলেন। মা বর্তমান সময়ে অনেককেই এইভাবে মাথায় হাত দিয়া আশীর্বাদ করিয়া থাকেন। শ্রীশ্রীমায়ের বরদ হস্তের স্পর্শের সঙ্গে সঙ্গে এক অনির্বচনীয় আনন্দে তাঁহার মনপ্রাণ ভরিয়া যায়। এই অভিলষিত সুন্দর অবস্থাটি তাঁহার একদিন তুইদিন নহে, বেশ কয়েকদিন চলিয়াছিল। এই স্থিতির মধ্যে তিনি সংসারের কোন কাজই করিতে পারিতেন না। সর্বদাই ভগবদ্ভাবে বিহ্বল হইয়া থাকিতেন। তাঁহার স্ত্রী আমাকে লিখিলেন শ্রীশ্রীমা একই সময় আমার স্বামীর ও আমার মাথায় হাত রাখিয়া আশীর্বাদ করিয়াছিলেন কিন্তু আমার পতির এমন সুন্দর ভাব হইল, আমার হইল না কেন ? আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধি অনুসারে তাঁহাকে আমি ইহার উত্তর দিয়াছিলাম। শ্রীশ্রীমায়ের এইরূপ কৃপাপ্রাপ্ত ব্যক্তির অনুরোধের মধ্যে যথার্থ আন্তরিকতা ছিল বলিয়াই কি আমার হৃদয়ে মায়ের বিষয় পুনরায় লিখিবার উদ্দীপনা জাগিল ? নচেৎ আমার মধ্যে ইহা লিখিবার প্রেরণা আসিল কি করিয়া ? আমি কখনও স্বপ্নেও কল্পনা করি নাই যে আমি শ্রীশ্রীমাকে আমার এই তুচ্ছ জীবনে যেভাবে পাইয়াছি তাহা এইরূপে সকলের নিকট লিখিয়া প্রকাশ করিতে হইবে। এইসব কথা গোপন রাখিবারই বিষয়। ঢাক ঢোল বাজাইয়া বাজারে সকলের সমক্ষে প্রচার বা প্রদর্শনের বস্তু নহে। তথাপি যে ইহা লিপিবদ্ধ করিতেছি তাহার উদ্দেশ্য মায়ের মহিমা বর্ণনদ্বারা নিজেকে পরিশুদ্ধ করিবার প্রয়াস। আমার এই নগণ্য জীবনে যেভাবে বিশ্বজননীর স্নেহ, ক্ষমা ও করুণার পরশ পাইয়াছি তাহাই অকপটে ব্যক্ত করিয়া তাঁহার শ্রীচরণে কৃতজ্ঞতা নিবেদন করিবার চেষ্টা।

বার্ধক্যজনিত বিচারশক্তির অভাবে, মস্তিষ্কের তুর্বলতাহেতু ও

বুদ্ধির অল্পতার কারণ মায়ের মহত্ত্ব ঠিক ঠিক ভাবে যে প্রকাশ করিতে পারিব না সেইজন্য ক্ষমার দাবি করা আমার পক্ষে কিছু অসঙ্গত বলিয়া মনে করি না। অনেকেই অবগত আছেন বৃদ্ধ বয়সে কাহারও কাহারও মাথার গোলমাল হয়। তাহাকে আভিধানিক ভাষায় ভীমরতি বা ভীমরথী বলে। সাতাত্তর বৎসর সাত মাস বয়সের সপ্তম রাত্রি পার হইলে মানুষের ভাল-মন্দ, পাপ-পুণ্য, শুভাশুভ কোন কর্মের বিচার করা হয় না। তাঁহাকে সকলেই কৃপার চক্ষে দেখিয়া থাকেন এবং তাঁহার সমস্ত অপরাধ ক্ষমার্হ। বলা হয় ভীমরতি অবস্থাপ্রাপ্ত ব্যক্তি যাহা ভোজন করেন তাহা সবই শ্রীভগবানের প্রসাদ, যত পদ তিনি গমন করেন তাহাদ্বারা তিনি শ্রীভগবানের দিকেই অগ্রসর হইতেছেন বুঝিতে হইবে এবং যাহা কিছু তিনি বলেন সকলই শ্রীভগবানের স্তুতি বলিয়া গ্রাহ্য করা হয়। এই গ্রন্থ লেখকের বহুদিন হয় সেই ভীমরতি অবস্থা পার হইয়া গিয়াছে। বর্তমানে তিনি একজন পলিতকেশ ও দন্তবিহীন অশীতি বৎসরের বৃদ্ধ। তিনি সকলের নিকট হইতে "আসি আসি" বলিয়া বিদায় গ্রহণ করতঃ মহা-প্রয়াণের জন্য সর্বতোভাবে প্রস্তুত। সংলগ্ন অসংলগ্ন, সঙ্গত অসঙ্গত, ভাল মন্দ, বিহিত অবিহিত যাহা তিনি বাক্যদ্বারা বলিবেন বা লেখনীদ্বারা লিপিবদ্ধ করিবেন সবই শ্রীশ্রীমায়ের মহিমা বা স্তুতি বলিয়া সহৃদয় পাঠক ও পাঠিকারা যে দয়া করিয়া মানিয়া লইবেন সেই বিশ্বাস লেখক মনে মনে পোষণ করেন এবং তাহার সকল অপরাধ যে ক্ষমার যোগ্য সেই প্রত্যয়ও তিনি রাখেন।

যাহা আমি এই পুস্তকে লিখিতে যাইতেছি তাহার মধ্যে অধিকাংশ স্থলেই বৎসর, মাস, তারিখ ও বার সন্ধান করিয়া পাওয়া যাইবে না, ঘটনার ক্রম বা পারম্পর্যও প্রাপ্ত হওয়া কঠিন। আমার স্মৃতিশক্তির উপর নির্ভর করিয়াই পূর্বেও লিখিয়াছি এবং এখনও আমাকে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে, কারণ দিনপত্রী বা ডায়েরি (Diary) লেখার অভ্যাস আমার কোন দিনই ছিল না এবং এখনও নাই। এই সকল অনিবার্য ত্রুটির জন্য প্রথমেই আমি আমার সদাশয় পাঠক ও পাঠিকাদের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি।

আশাকরি তাঁহারা আমাকে ক্ষমার দৃষ্টিতেই দেখিবেন ও বিচার করিবেন—সমালোচকের দৃষ্টিভঙ্গীতে নহে।

বহুবৎসর পূর্বে 'আনন্দবার্ত্তা" পত্রিকায় 'পুরাতন স্মৃতি' শিরনামা দিয়া আমার যে সকল লেখা প্রকাশিত হইয়াছিল সেই সকল প্রবন্ধ এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত করা হইবে অধিকন্তু নূতন আরও কিছু যাহা এই পর্যন্ত লিখিত ও প্রকাশিত হয় নাই তাহাও এই পুস্তকে সন্নিবিষ্ট করিবার ইচ্ছা রহিল। জানি না আমার এই অভিলাষ পূর্ণ হইবে কিনা। করুণাময়ী শ্রীশ্রীমায়ের যদি খেয়াল হয় তাহা হইলেই ইহা কার্যে পরিণত হইবে নচেৎ দরিদ্রের মনোরথ যেমন মনে উদয় হয় এবং মনেই বিলীন হইয়া থাকে এই ক্ষেত্রেও তাহাই হইবে।

পরমারাধ্যা বিশ্বজননী শ্রীশ্রীমায়ের কয়েকজন ধর্মপিপাসু নবীন ভক্তসন্তান উপর্যুপরি দুই তিন দিন সৎসঙ্গ করিতে আসিয়া আমাকে নানা প্রকার প্রশ্ন করেন। আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধি অনুসারে তাহাদের জিজ্ঞাসার সমাধান করিতে চেষ্টা করি এবং কথা প্রসঙ্গে একদিন তাহাদের সম্মুখে বলিয়া ফেলি—আমি আমার এই অকিঞ্চিৎকর জীবনে যে ভাবে স্নেহময়ী শ্রীশ্রীমাকে গত পঞ্চাশ বৎসর পাইয়াছি তাহা লিপিবদ্ধ করিতে প্রয়াস করিয়াছি। এই পুস্তকখানিতে মায়ের স্নেহ, ক্ষমা ও করুণার দিক্‌গুলিই আমি বিশেষ করিয়া প্রদর্শন করিতে চেষ্টা করিয়াছি। জানি না এই গুরুত্বপূর্ণ কার্যটি সুসম্পন্ন করিতে কতদূর কৃতকার্য হইয়াছি। পুস্তকখানির সম্বন্ধে তাহাদের আগ্রহ ও ঐৎসুক্য অবলোকন করিয়া একদিন তাহাদের নিকট ইহার প্রস্তাবনাটি পাঠ করিয়াছিলাম। অনুমান করি ইহা শ্রবণ করিয়া তাহারা সন্তুষ্টও হইয়াছিলেন এবং সেই জন্যই মনে হয়, তাহারা আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন পুস্তকখানা কতদিনের মধ্যে তাহারা মুদ্রিত অবস্থায় দেখিতে পাইবেন? এই কথার উত্তরে তাহাদের আমি বলিয়াছিলাম এই দুর্দিনে একজন কপর্দকহীন ভিক্ষুক সন্ন্যাসীর পক্ষে ব্যয়-বহুল পুস্তক-মুদ্রণ কেবল অসাধ্যই নহে বরং অসম্ভব কার্য। যদি মায়ের ইচ্ছা হয় তাহা হইলে তাঁহার লীলাকথা প্রকাশিত হইবে নচেৎ ইহা

পাণ্ডুলিপি অবস্থাতেই আমার নিকট থাকিবে। যখন আমার ইচ্ছা হইবে তখন ইহা পাঠ করিয়া মায়ের অসীম স্নেহ, ক্ষমা ও করুণার অনুধ্যান করিয়া তৃপ্তিলাভ করিব। ইহাই আমার পক্ষে যথেষ্ট লাভ।

ইহার পর উহাদের মধ্যে একজন আমার সঙ্গে একান্তে সাক্ষাৎ করিয়া জানাইলেন, অর্থের অভাবে মায়ের লীলাকাহিনী মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইবে না, ইহা হইতে পারে না। তিনি পুস্তকখানির মুদ্রণের সম্পূর্ণ ব্যয় স্বেচ্ছায় বহন করিতে স্বীকার করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে আমাকে ইহাও জানান যে তাহার বন্ধুরা যেন এই অর্থ সাহায্যের কথা ঘুণাক্ষরেও জানিতে না পারেন। এই কারণে তাহার নাম এই স্থানে প্রকাশ করা হইল না। এই ভাবে অযাচিত-রূপে অর্থ-সংকট দূর হওয়ায় পুস্তকখানা এত সত্বর জনসাধারণের করকমলে পৌঁছিবার সম্ভাবনা উপস্থিত হইল নতুবা ইহা আদৌ মুদ্রিত হইত কিনা সন্দেহ। এই জন্য তাহাকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করিতেছি এবং সন্তানবৎসলা শ্রীশ্রীমায়ের চরণে তাহার অভিলষিত মাতৃ-কৃপা ও ইষ্টপ্রসন্নতা প্রার্থনা ব্যতীত একজন সন্ন্যাসী আর কি যাচ্ঞা করিতে পারে? শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতায় শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন, "স্বল্পমপ্যস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ।" ধর্মের অল্পমাত্র অনুষ্ঠানও জন্ম-মরণাদি মহৎ সংসার ভয় হইতে মানবকে সর্বতোভাবে রক্ষা করিয়া থাকে। এই প্রকার গুপ্তদান বাস্তবিকই প্রশংসার যোগ্য এবং বিত্তশালী ব্যক্তিদের অনুকরণীয়।

এই পুস্তকের বিক্রয়লব্ধ অর্থ শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী কন্যাপীঠের কুমারী কন্যাদের সেবায় সাদরে অর্পিত হইবে। নিবেদনমিতি।

শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী আশ্রম,
বারাণসী।

নারায়ণানন্দ তীর্থ
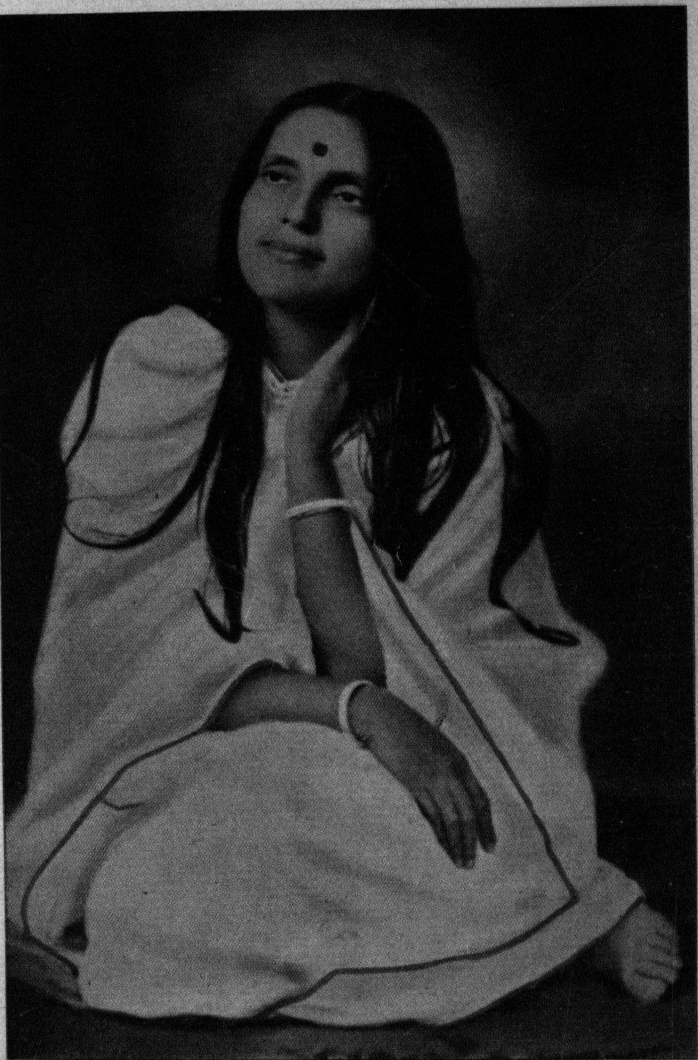
শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী

শ্রীশ্রীমায়ের প্রথম দর্শন

ছাত্রজীবন হইতে সাধু, সন্ন্যাসী, যোগী ও তপস্বীদের প্রতি যে আমার একটা আকর্ষণ ছিল তাহা আমার এক শিক্ষক জানিতেন। শিক্ষক হওয়া সত্ত্বেও পরবর্তী জীবনে তিনি আমার সহিত বন্ধুর ন্যায় ব্যবহার করিতেন। তিনি একদিন বৈকালবেলা আমার নিকট আসিয়া সংবাদ দিলেন কাশীর রামাপুরা পল্লীতে শ্রীকুঞ্জমোহন মুখোপাধ্যায়ের বাড়ীতে এক মাতাজী আসিয়াছেন। আমার যদি ইচ্ছা হয় তাঁহাকে গিয়া দেখিয়া আসিতে পারি। এই সংবাদটুকু ছাড়া বন্ধুবরের নিকট মাতাজীর বিষয় আর কোন সমাচার পাইলাম না। এতদিন পর্যন্ত পুরুষ সাধু, সন্ন্যাসী, যোগী, তপস্বী ও মহাত্মার কথাই শুনিয়াছি। কোন মাতাজীর কথা কানে কখনও আসে নাই। স্বাভাবিক ভাবেই আমার মনে প্রশ্ন জাগিল এই মাতাজী কে? কোথা হইতে তিনি আসিয়াছেন? নাম কি? তিনি অপরিচিত কোন পুরুষের সঙ্গে দেখা করেন কিনা? এবং কথা বলেন কিনা? একসঙ্গে এই জাতীয় অনেকগুলি প্রশ্ন মনে উদিত হইল। এই সকল জিজ্ঞাসা মনে উঠিবার ফলে ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলাম না, মাতাজীর দর্শনে যাইব কিনা? অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া সন্ধ্যার পর মাতাজীর দর্শনে যাওয়াই স্থির করিলাম। অপরিচিত ব্যক্তির সঙ্গে যদি তিনি দেখা নাই করেন বাড়ী ফিরিয়া আসিব, আব যদি দয়া করিয়া তিনি দর্শন দেন উত্তম কথা। আমার তো মা নাই। তিনিও তো আমার গর্ভধারিণীর জাতিরই একজন, মাতৃ-তুল্যা। যাই না তাঁহাকে দেখিতে। ক্ষতি তো কিছু নাই-ই, বরং লাভেরই সম্ভাবনা অধিক। আমার গর্ভধারিণীর স্নেহের বিন্দুমাত্রও যদি এই মাতাজীর কাছ হইতে পাওয়া যায়, তাহা হইলে হয় তো মাতৃহারা সন্তানের প্রাণের দুঃখ কিছু হ্রাস হইতে পারে। এখানে বলা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না,

এই ঘটনার পূর্বে আমার স্নেহময়ী জননীর কাশীলাভ হইয়াছিল। গর্ভধারিণীর অভাব মনটাকে সদাই বিষণ্ণ ও উৎসাহহীন করিয়া রাখিত। কোন কার্যেই ঠিকভাবে মনঃসংযোগ করিতে পারিতাম না। এই রকম মানসিক অবস্থার মধ্যে এবং এইসব এলো-মেলো কথা ভাবিতে ভাবিতে সন্ধ্যার পর যথাস্থানে মাতাজীর দর্শনের জন্য যাইতে প্রস্তুত হইলাম।

বর্তমান সময় হইতে অর্ধশতাব্দী পূর্বের অতি পুরাতন কাহিনী; ১৩৩৩ সনের ফাল্গুন কি চৈত্র মাস (ইংরাজী ১৯২৭ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী কি মার্চ মাস)। সন্ধ্যার পর সায়ংকৃত্যাদি সমাপন করিয়া মাতাজীর দর্শন অভিলাষে বাড়ী হইতে শ্রীদুর্গা-দুর্গা বলিয়া বাহির হইয়া পড়িলাম। ইহার পূর্বে কখনও কোন স্ত্রীলোক সাধু দেখি নাই। শ্রীশ্রীমাতাজীর বিষয় চিন্তা করিতে করিতে অতিশয় সঙ্কোচের সহিত গন্তব্য স্থান রামাপুরায় গিয়া উপস্থিত হইলাম। শ্রীযুক্ত কুঞ্জমোহন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বাড়ী আমার বিশেষ পরিচিত স্থান। এই বাড়ীর অনেকের সঙ্গেই আমার জানাশোনা আছে। বাড়ীর দ্বারে পৌঁছিতেই কীর্তনের অতি সুমধুর সুর আমার কানে প্রবেশ করিল। একজন ভদ্রলোক বাড়ীর বাহিরে দাঁড়াইয়াছিলেন। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম মাতাজী নীচের তলায়ই সিঁড়ির ধারে পশ্চিমের দিকের ঘরে অবস্থান করিতেছেন এবং সেখানে হরিনাম কীর্তন হইতেছে। আমি মাতাজীর দর্শনাভিলাষে গিয়াছি এই সংবাদ জানাইতেই তিনি বিলম্ব না করিয়া এবং কোন প্রকার প্রশ্ন না করিয়াই মায়ের ঘরটি আমাকে দয়া করিয়া দেখাইয়া দিলেন।

সাধু-সন্ন্যাসীদের সম্বন্ধে আমাদের ধারণা, সাধারণতঃ তাঁহারা গৈরিক বস্ত্র পরিধান করেন, মস্তক হয় মুণ্ডিত নতুবা জটাযুক্ত, গলায় রুদ্রাক্ষ অথবা তুলসীমালা, সর্বাঙ্গে ভস্ম মাখা, কপালে হয় বিভূতির ত্রিপুণ্ড্র না হয় চন্দনের তিলক। বর্তমান জগতে তাঁহাদের আমরা এইরূপ বেশেই দেখিতে পাই। আমাদের আলোচ্য মাতাজীকে যেরূপে আমি সেইদিন দর্শন করিয়াছিলাম তাহার কিঞ্চিৎ বিবরণ নিম্নে দিতে চেষ্টা করিতেছি।

সাধারণ একটি তেলের প্রদীপ ঘরের এক কোণে টিম্ টিম্ করিয়া জ্বলিতেছে। কয়েকজন লোক অত্যন্ত তন্ময় হইয়া 'হরিবোল,' 'হরিবোল' বলিয়া অতিশয় মধুর স্বরে কীর্তন করিতেছেন। যাঁহারা কীর্তন করিতেছিলেন তাঁহাদেব সকলেরই মুখ পূর্বদিকে। তাঁহাদের সম্মুখে একখানি ছোট সাদা ধপধপে বিছানার উপব একটি মাতৃমূর্তি শান্তভাবে স্থির হইয়া বসিয়া আছেন। তাঁহার পবিধানে গোলাপী রংয়ের একটি সেমিজের উপব ঐ বংযেবই একখানা সুন্দর শাড়ী। দুইহাত ভরা সোনার চুড়ী, সোনা দিয়া বাঁধান শাঁখা ও লোহা। গলায় সুবর্ণের মুণ্ডমালা অথবা কড়িহার এবং ললাটে একটি বড রকমের সিন্দুরের টিপ্। মাথায় অল্প ঘোমটা। রাজরাজেশ্বরী বেশে যেন স্বয়ং মহামায়া বিশ্বজননী ঘরটি আলো করিয়া বিরাজিতা। চোখ দুইটি খুবই সুন্দর ও ভাবে ঢুলুঢুলু। না জানি কতই দিব্য সুধাপানে একেবারে বিভোর। এক অপূর্ব স্বর্গীয় মহাভাবে দেবী-মূতিটি মগ্ন। সেই দেবদুর্লভ ভাবঘন মূর্তিখানি দর্শন করিয়া মনে হইতেছিল যেন তিনি এই মরজগতের কেহ নহেন। এই জগতের লোকের ত্রিতাপজ্বালা দূর করিবার জন্য যেন কোন এক দিব্যলোক হইতে আগমন করিয়াছেন। তাঁহাব রূপের ছটা সন্দর্শন করিয়া মনে হইতেছিল সংসারের তাপ ক্লিষ্ট মানবের শান্তি বিধানের জন্য করুণা যেন অবিরল ধারায় তাঁহার সর্ব শরীর হইতে ঝরিয়া পড়িতেছে। সেই ঘরে আরও কয়েকজন মহিলা উপস্থিত ছিলেন। মাতাজী কে ইহা জানিবার জন্য আমাকে কাহারও নিকট পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতে হয নাই। তাঁহার মুখশ্রীর মধ্যে এমনই একটা বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান যাহার দরুণ হাজার হাজার লোকের মধ্য হইতেও তাঁহাকে অতীব সহজেই চিনিয়া বাহির করা যায়। স্বর্গীয় সুষমায় তাঁহার অপূর্ব মুখমণ্ডল সর্বক্ষণই প্রস্ফুটিত শতদল পদ্মের ন্যায় বিকসিত হইয়া আছে।

প্রথম দর্শনেই মনে মনে বেশ অনুভব করিলাম প্রকৃতই ইনি মাতাজী, বিশ্বের মা—বিশ্বজননী। কে যেন হৃদয়ের মর্মস্থলে সঙ্কেত জানাইয়া দিল, যে স্নেহময়ী গর্ভধারিণীকে হারাইয়াছ, তাঁহার সকল অভাব এই মায়ের দ্বারা পূর্ণ হইবে এবং ইনিই

চিরশান্তির অভ্রান্ত পথ দেখাইয়া দিবেন। আমার অন্তরের নিভৃত-স্থানে গর্ভধারিণীর যে শূন্য আসনখানি এতদিন পড়িয়াছিল, আমার অজ্ঞাতসারে তাহাতে কখন যেন এই মাতাজী বসিয়া পড়িলেন। ধারণা করিলাম এতদিনের হারান মাতৃস্নেহ এই মাতাজীর কাছ হইতেই পাওয়া যাইবে। শ্রীশ্রীমায়ের অনিন্দ্যসুন্দর দিব্য পবিত্র মূর্তিখানি অনেকক্ষণ পর্যন্ত পলকহীন দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিয়া এক অভূতপূর্ব আনন্দ অনুভব করিলাম। সাথে সাথে মনে হইতেছিল যাঁহার অভাব এতদিন অন্তরের নিগূঢ়তম প্রদেশে অনুভব করিতে-ছিলাম, যাঁহার জন্য কত সাধু, সন্ন্যাসী, যোগী ও মহাপুরুষের চরণপ্রান্তে গিয়া উপস্থিত হইতাম, তিনিই যেন এই পবিত্র মাতৃদেহ ধারণ করিয়া আমার সম্মুখে এইভাবে আজ উপস্থিত হইয়াছেন। মানব জীবনের যাহা ঈপ্সিত—যথা ইহলোকের স্নেহ, আদর ও করুণা এবং পরলোকের সম্বল জ্ঞান, ভক্তি ও ভগবৎ-প্রেম সে সবই এই মাতাজীর রাতুল চরণে বিদ্যমান। আপন করিয়া ধরিতে পারিলেই যাহা কিছু আকাঙ্ক্ষিত সকলই এই মায়ের নিকট হইতে পাওয়া যাইবে। সংক্ষেপে বলিতে গেলে বলিতে হয় প্রথম দর্শনেই মনে হইল এই মাতাজী যেন আমার কতই আপন। যে মাকে হারাইয়াছি সেই মা-তে আর এই মা-তে যেন কোন ভেদ নাই। যেন সেই মা আর এই মা অভিন্ন বা এক। সেই মা-ই আজ এই মূর্তিতে আমার নিকট আবির্ভূতা হইয়াছেন।

গর্ভধারিণী কেবল মা-ই, আর এই মায়ের মধ্যে পিতা, মাতা, ভ্রাতা, বন্ধু ও গুরু একাধারে সবই রহিয়াছেন। মাতার স্নেহ, পিতার সংরক্ষণ, ভাইয়ের ভালবাসা, সখার প্রীতি এবং গুরুর আশ্রয়, সকল ভাবেরই উদ্‌গমস্থান এই 'মা'। সেই শুভ মাহেন্দ্রক্ষণে বিনা বিচারে, অকুণ্ঠিত চিত্তে এই জীবনতরীর একমাত্র কর্ণধাররূপে এই মাতা-জীকেই অলক্ষিতে কখন যেন বরণ করিয়া ফেলিলাম। ছাত্র জীবন হইতে আজ পর্যন্ত এই সুদীর্ঘকাল অবধি কতই তো সাধু, সন্ন্যাসী, যোগী, তপস্বী ও মহাপুরুষ দেখিলাম। কিন্তু কাহাকেও তো এমনভাবে ভালবাসি নাই। এমনতর আপন করিয়া লইতে পারি নাই। এই মাকে পাইবার জন্যই যেন শিশুকাল হইতে

অত্যাবধি এই দীর্ঘদিন এখানে সেখানে কতই না সন্ধান করিয়া বেড়াইয়াছি। আজ স্বয়ংই এইরূপে ধরা দিবার জন্যই অপ্রত্যাশিত-ভাবে সংবাদ পাঠাইয়া তাঁহার শ্রীচরণে চিরদিনের মত টানিয়া লইলেন। এই বহু অভিলষিত মাতৃ-দর্শনের যোগাযোগ কি করিয়া সম্ভব হইল, ইহার কারণ অনেক অনুসন্ধান ও চিন্তা করিয়াও কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি নাই। মাতাজীর আগমনবার্তা আমাকে জানাইবার জন্য আমার শিক্ষকবন্ধুকে কে অনুপ্রাণিত করিয়াছিল? ইহা কি বাস্তবিকই ভাবিবার বিষয় নহে!

অনেকক্ষণ পর্যন্ত স্থিরভাবে ভাবাবস্থায় বসিয়া থাকিবার পর হঠাৎ মা উঠিয়া দাড়াইলেন। ঐ নিঝুম গভীর রাত্রিতে কাহারও কোন প্রকার অপেক্ষা না রাখিয়া সেই বিভোর অবস্থাতেই তিনি ঢুলিতে ঢুলিতে বাড়ী হইতে বাহির হইয়া পড়িলেন। উঠান, বৈঠকখানা ঘর, বারান্দা এবং বাড়ীর সম্মুখের ঢালু রাস্তা পার হইয়া মা একেবারে সদর পথে আসিয়া উত্তরাভিমুখে গির্জাঘরের দিকে চলিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার পশ্চাতে পশ্চাতে তিন চারি জন স্ত্রীলোক এবং দুইজন মাত্র পুরুষ তাঁহার অনুসরণ করিতেছিলেন। ঐ দুইজন পুরুষের মধ্যে এই গ্রন্থ লেখকও ছিলেন একজন। রাজপথে গাড়ী ঘোড়া চলাচল করিতেছে দেখিয়া আমাদের ভয় হইতেছিল পাছে ঐ সকল মায়ের উপর আসিয়া পড়ে। মা ভাবাবস্থায় থাকাকালীন কি উপায়ে তাঁহার শরীর রক্ষা করিতে হয়, আমাদের মধ্যে কেহই তাহা জানিতেন না। আমাদের মধ্যে আমি ব্যতীত যে অপর একজন পুরুষ (শ্রীঅখিলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়) ছিলেন তিনি তাড়াতাড়ি দৌড়াইয়া গিয়া একজন মধ্যবয়স্ক সাধু-পুরুষকে বাড়ী হইতে ডাকিয়া আনিলেন। তিনি আসিয়া উপস্থিত হইতে হইতে মা বাড়ী হইতে অনেকখানি দূরে আসিয়া পড়িয়া-ছিলেন। সাধুবাবা গিয়া মাকে ঐ ভাববিহ্বল অবস্থাতে ধরিয়া বাড়ী ফিরাইয়া আনিলেন। মা ঘরে আসিয়াই আপনার সেই অপ্রশস্ত ছোট্ট বিছানাটিতে চাদর মুড়ি দিয়া শুইয়া পড়িলেন। পরে জানিতে পারিয়াছিলাম ঐ সাধুপুরুষটিই ছিলেন শ্রীশ্রীমাতাজীর

পতিদেবতা শ্রীরমণীমোহন চক্রবর্ত্তী। তিনি পরবর্ত্তী জীবনে 'বাবা ভোলানাথ' নামে সকলের নিকট পরিচিত ছিলেন।

মাকে অল্প সময়ের জন্য দেখিয়া অতৃপ্ত-হৃদয়ে বাসায় ফিরিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। বাড়ী প্রত্যাগমনকালে সংবাদ লইয়া জানিয়াছিলাম, মা পরের দিনই সঙ্গের সকলকে লইয়া হরিদ্বার কুম্ভ-স্নানে গমন করিবেন। মায়ের সঙ্গে তাঁহার গর্ভধারিণী, পতি শ্রীরমণী মোহন চক্রবর্তী, ডাক্তার শশাঙ্কমোহন মুখোপাধ্যায়, তাঁহার কন্যা শ্রীমতী আদরিণী দেবী, আরও কয়েকজন অনুগত ভক্ত আসিয়াছিলেন। সেইদিন মাতৃদর্শনের পর বাসায় ফিরিতে রাত্রি অনুমান বারটা বাজিয়াছিল। অপ্রত্যাশিতভাবে শ্রীশ্রীমায়ের দর্শনের এই হইল আমার প্রথম যোগাযোগ। সেই রাত্রির মায়ের সেই অপূর্ব ছবিটি এই সুদীর্ঘ পঞ্চাশ বৎসরেও কিছুমাত্র ম্লান হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না, বরং মনে হইতেছে মাকে যেন অদ্যই সেই রাজরাজেশ্বরী মূর্তিতে দর্শন করিয়া আসিলাম। ক্ষণিকের দর্শনে যে কাহাকেও এত ভাল লাগিতে পারে ইহা আমি স্বপ্নেও কল্পনা করিতে পারি না। ইহার পশ্চাতে কোন প্রকার যোগসূত্র না থাকিলে কি ইহা কখনও সম্ভব হইতে পারে? সেই যোগসূত্রটি যে কি তাহাই বিচার করিবার বিষয়।

শ্রীকৃষ্ণ-জন্মাষ্টমীতে মায়ের দ্বিতীয় দর্শন

সেই প্রথমদিন অল্প সময়ের জন্য মাকে দেখিয়া সাধ না মিটিতেই অতৃপ্ত বাসনা লইয়া রাত্রি বারটায় বাড়ী ফিরিতে হইয়াছিল। বাড়ী আসিতেই বৃদ্ধা পিসীমা জিজ্ঞাসা করিলেন, "এত রাত্রি পর্যন্ত তুই কোথায় ছিলি? কোনদিনই তো তুই এত রাত পর্যন্ত বাহিরে থাকিস্না। আজ কোথায় গিয়াছিলি?" পিসীমার এই প্রশ্নের উত্তরে তাঁহাকে জানাইলাম যে আমি রামাপুরায় কুঞ্জমোহন বাবুর বাড়ী এক মাতাজীর দর্শনে গিয়াছিলাম।

পিসীমা—কোন্ মাতাজী আবাব আসিলেন এখানে? তোর মুখে তো কখনও ইহার পূর্বে কোন মায়ের কথা শুনি নাই। এ আবার তোর কোন্ মা আসিলেন?

আমি—এ মা যে কে, কি করিয়া বুঝাইব তোমাকে? ইনি এই জগতের মানুষ নহেন। জীবের কল্যাণ করিতে হয় তো তিনি কোন দেবলোক হইতে এখানে আসিয়াছেন। তাঁহার মুখে চোখে এমনই একটা দিব্যভাব, রূপের এমনই মাধুর্য যে, যে কেহ একবার এই মাকে দেখিয়াছে সেই মুগ্ধ হইয়াছে। পিসীমা! তুমিও যদি একবাব এই মাতাজীকে দেখ, তুমিও তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়িবে। এমনই তাঁহাব লোককে আকর্ষণ করিবার অদ্ভুত শক্তি। এমন শক্তি কোথায়ও বড় দেখা যায় না।

আমার পিসীমাও মাকে পরে দর্শন করিয়াছিলেন। সেই সুন্দর ঘটনাটি এবং মায়ের অপূর্ব ব্যবহার যথাস্থানে লিখিবার ইচ্ছা রহিল।

মাকে পুনরায় দর্শন করিবার জন্য মনটা বড়ই উদ্গ্রীব হইয়া থাকিত। কবে আবার মাতাজী কাশী আসিবেন এই সংবাদের জন্য মাঝে মাঝে বন্ধুটির নিকট খোঁজখবর করিতাম। আমার এই

বন্ধুর নাম ছিল শ্রীরাজারাম গোবিন্দ আকুত। তিনি কাশী হিন্দু কলেজিয়েট্ স্কুলে গণিত পড়াইতেন। তিনি কুঞ্জমোহন বাবুর বাড়ীর ছেলেদের বিশেষ করিয়া তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র ও আমার সহপাঠী ধীরেনের গৃহশিক্ষকের কার্য করিতেন। সেইসূত্রে তাঁহার ঐ বাড়ীতে যাতায়াত ছিল। তিনি এলাহাবাদ ও আগ্রা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে যথাক্রমে বি এস্. সি, ও এম এস্ সি, পাস করিয়াছিলেন। তিনি বড়ই সাত্ত্বিক প্রকৃতি ও ধর্মপরায়ণ ব্যক্তি ছিলেন এবং কাশীর বিখ্যাত যোগী শ্রীমৎ বিশুদ্ধানন্দ মহারাজের নিকট হইতে মন্ত্র ও যোগক্রিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি জীবনে দুই শতেরও অধিক শ্রীমদ্ভাগবতের পারায়ণ করিয়াছিলেন। তিনি ছিলেন একজন প্রকৃত আদর্শ গৃহস্থ—সংস্কৃত, পালী ও গণিত শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ও নিষ্ঠাবান্ মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ। বয়সে অন্ততঃ পক্ষে তিনি আমা হইতে পাঁচ-ছয় বৎসরের বড়।

অনুমান ছয়-সাত মাস পর আগষ্ট কি সেপ্টেম্বর মাসে শ্রীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমীতে পুনরায় শ্রীশ্রীমায়ের কাশী শুভাগমন হইল। ইহার মধ্যে তিনি হরিদ্বার, বিন্ধ্যাচল প্রভৃতি তীর্থস্থান পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীমায়ের কাশী আগমন উপলক্ষ্যে শ্রীকুঞ্জমোহন বাবু একখানি ক্ষুদ্র পুস্তিকা প্রকাশ করেন। এই বইখানিতে তিনি তাহার পুত্র শ্রীমান্ মন্নুর সর্পদংশনের কথাই বিশেষভাবে বর্ণনা করিয়াছিলেন এবং মা তাহাকে কিরূপে মৃত্যু হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন তাহাই বিস্তারিতরূপে লিখিয়া ছিলেন। প্রসঙ্গক্রমে ঐ পুস্তিকাতে শ্রীশ্রীমায়ের অতি সংক্ষিপ্ত পরিচয়ও তিনি লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন।

শ্রীশ্রীমায়ের পুনরায় কাশী আগমন হইয়াছে। এই শুভ সংবাদ লোকের মুখে মুখে শহরময় বাতাসের মত ছড়াইয়া পড়িল। তাঁহার দর্শন মানসে দলে দলে লোক রামাপুরায় কুঞ্জমোহনবাবুর বাড়ী যাইতে লাগিল। সেই সময় ঐ বাড়ীখানি একটি দেবমন্দিরে পরিণত হইয়া উঠিয়াছিল। দেবতা দর্শনের একটা নির্ধারিত সময় প্রত্যেক মন্দিরে আছে কিন্তু এই মাতাজীর দর্শনের কোন বাঁধাধরা সময় ছিল না। সকল সময়ই শ্রীশ্রীমাকে দেখিবার জন্য দর্শনার্থীদের ভিড় লাগিয়া থাকিত।

সমাধি ভঙ্গের পরে—শ্রীশ্রীমা
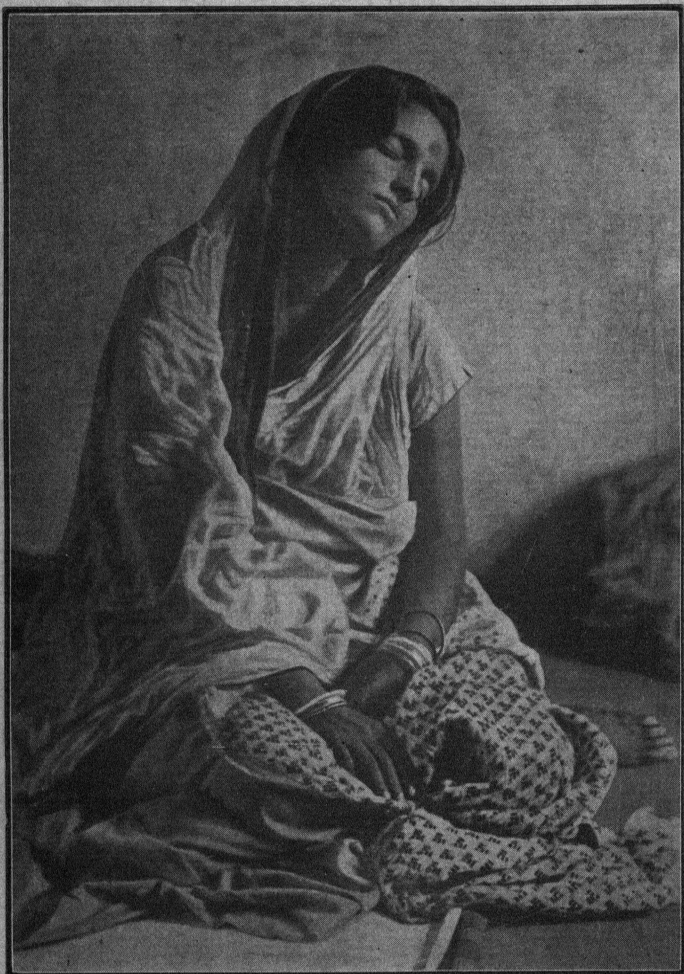
সমাধির আবেশে—শ্রীশ্রীমা

ধর্মপ্রাণ মাতৃভক্তগণ মায়ের দর্শন অভিলাষে তাঁহাদের প্রাণের ভক্তি-অর্ঘ্য ও শ্রদ্ধাঞ্জলি লইয়া মায়ের মন্দিরের দ্বারে আগ্রহের সহিত সর্বক্ষণ উপস্থিত থাকিতেন।

অদ্যকার বারাণসী ও অর্ধশতাব্দীর পূর্বের বারাণসীতে যথেষ্ট প্রভেদ। রাত্রি প্রভাত হইতে না হইতেই লোকে পতিতপাবনী ও কলুষনাশিনী গঙ্গায় অবগাহনকরতঃ পবিত্র হইয়া ফুল, বেলপাতা ও গঙ্গাজলসহ দেবতাদর্শনে গমন করিতেন। মায়ের শুভাগমনের সংবাদ পাইয়া শ্রদ্ধালু কাশীবাসী বাঙ্গালী ভক্তবৃন্দ মায়ের পূজা করিতে কুঞ্জমোহনবাবুর আবাসস্থানে যাইতে লাগিলেন। আমিও আহারাদির পর বেলা দ্বিপ্রহরের সময় মাতৃদর্শন মানসে সেখানে গিয়া উপস্থিত হইলাম। সেখানে গিয়া দেখি বাড়ীর দরজায় এবার কলাগাছ ও মঙ্গল-কলস স্থাপিত হইয়াছে এবং আমপাতার মালার দ্বারা সমস্ত পথটি সুসজ্জিত। মা যে সত্য সত্যই আসিয়াছেন এইসব সাজসজ্জাই তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। দুপুরবেলা বলিয়াই অনুমান করিলাম মানুষের ভিড় এখন কম। বাড়ীর ভিতরে গিয়া দেখিলাম উঠানের উত্তরদিকের ঘরে মা একখানা চৌকির উপর একখানা সাদা ধপ্‌ধপে চাদর মুড়ি দিয়া শয়ন করিয়া আছেন। তাঁহার পা হইতে মাথা পর্যন্ত সর্বশরীর আবৃত এবং তাঁহার দেহের উপর পুষ্প, বিল্বপত্র এবং আচ্ছাদিত উত্তরীয়খানা গঙ্গাজলে সিক্ত হইয়া আছে। ঘরের বাহিরে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া অনিমেষ নয়নে এই অপূর্ব দৃশ্য দর্শন করিতেছি। মানুষের উপর যে এইভাবে পূজা হয় তাহা কখনও ইহার পূর্বে দেখি নাই। বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করিলাম মায়ের উদর ও বক্ষঃস্থল শ্বাস-প্রশ্বাসের গতির দ্বারা স্পন্দিত হইতেছে না। শুনিয়াছিলাম সমাধি অবস্থায় নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস নাকি স্থির বা রুদ্ধ হইয়া যায়, কিন্তু ইহা দেখিবার কখনও সৌভাগ্য হয় নাই। আজ তাহা প্রত্যক্ষ করিলাম। অনেকক্ষণ পর্যন্ত নিশ্চলভাবে দণ্ডায়মান হইয়া এই অভাবনীয় ও অভিনব দৃশ্যটি অতিশয় মনোযোগের সহিত অবলোকন করিতেছি। হঠাৎ কে যেন অতি পরিচিতের ও আপন জনের মত পশ্চাৎদিক হইতে আমার দক্ষিণ হস্তখানি ধরিয়া বলিলেন, "এখানে এতদূরে

দাঁড়াইয়া কেন? আয় না ঘরের ভিতর। মাকে প্রণাম করবি।" চমকিত হইয়া মুখ ফিরাইয়া দেখি, আমার বাল্যবন্ধু ও সহপাঠী ধীরেনের মা অর্থাৎ শ্রীযুক্ত কুঞ্জমোহন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের স্ত্রী আমার পিছনে দাঁড়াইয়া আছেন। ধীরেন ও আমি একসঙ্গে পড়িতাম, সেইসূত্রে আমি কখনও কখনও ঐ বাড়ী যাইতাম। এই নিমিত্ত তিনি আমাকে চিনিতেন। তিনি আমাকে তাঁহার পুত্রের ন্যায় স্নেহ করিতেন। তিনি দয়া করিয়া আমাকে একেবারে শ্রীশ্রীমায়ের পায়ের কাছে লইয়া উপস্থিত করিলেন। তিনি অতিশয় সন্তর্পণে মায়ের চরণের উপরকার চাদরখানা অপসারিত করিবার ফলে তাঁহার পাদপদ্ম দুইখানি দর্শন করিবার সৌভাগ্য হইল। কি সুন্দর রাঙ্গা টুকটুকে মায়ের চরণযুগল! চন্দনলিপ্ত মায়ের শ্রীপাদপদ্ম! সেই দেব-দুর্লভ মাতৃ-চরণে মস্তক রাখিয়া, প্রাণ ভরিয়া প্রণাম করিলাম। তাঁহার পদযুগলের স্পর্শে আমার সর্বশরীর পুলকে শিহরিয়া উঠিল। মায়ের চরণপরশে কি অনির্বচনীয় আনন্দ যে পাইলাম তাহা লিখিয়া প্রকাশ করিবার ভাষাও আমার নাই এবং শক্তিরও অভাব। ইহা অনুভব করিবারই বস্তু—ভাষায় ব্যক্ত করিবার নহে। মূকের রসাস্বাদনের ন্যায়। আজকাল শ্রীশ্রীমায়ের চরণ-স্পর্শ যেমন দুর্লভ, পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে তেমন সুলভ না হইলেও বর্তমানের মত এমনতর অপ্রাপ্য ছিল না। মায়ের পা ছুঁইয়া বা চরণে মস্তক রাখিয়া প্রণাম করিতে পারা যাইত। কেহ বাধা দিত না বা নিষেধ করিত না। কাহারও অনুমতিরও প্রয়োজন হইত না। মায়ের দিক হইতেও কোন প্রকার আপত্তি ছিল না। এই বিষয়ে পুরাতন ভক্তগণ যে অধিক ভাগ্যবান্ ছিলেন তাহা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিবেন।

এই সমাধি হইতে মা কখন যে উত্থিত হইবেন জিজ্ঞাসা করায় ধীরেনের গর্ভধারিণী বলিলেন, "মায়ের উঠিবার, খাইবার, শয়ন করিবার কি বিশ্রাম করিবার কোনই নির্দিষ্ট সময় নাই। মা অধিকাংশ সময়ই এইভাবে সমাধিতে পড়িয়া থাকেন। দুপুরের মায়ের ভোগ হয় তো রাত্রি দশটায় হইতেছে। শয়ন হইতে হয় তো তিনি উঠিলেন বেলা বারটায়। মুখ ধুইলেন হয় তো অপরাহ্ন

চারি ঘটিকার সময়। এই ভাবেই মায়ের সারাটা সময় অনিয়মের মধ্যে কাটিয়া থাকে।"

কখন যে মায়ের দর্শন হইবে তাহার কোনই ধরাবাঁধা সময় না থাকিবার কারণে সকাল, দুপুর, সন্ধ্যা, রাত্রি প্রায় সর্বক্ষণই মাকে দেখিবার একটা তীব্র উৎকণ্ঠা লইয়া ঐ বাড়ীতে উপস্থিত থাকিতে চেষ্টা করিতাম। কোন ফাঁকে যে মায়ের দেখা পাওয়া যাইবে ইহাই ছিল আমার সেই সময়কার একমাত্র লক্ষ্য। মাতৃ-দর্শনের বিন্দুমাত্র সুযোগও যাহাতে না হারাই সেইদিকে আমার সতর্ক দৃষ্টি থাকিত। বেশীর ভাগ সময়ই মায়ের ঐ অলোকসামান্য দিব্য পবিত্র মূর্তিখানি আমার মানসপটে জাগরূক থাকিত। মানসিক চিন্তার প্রাবল্য হেতু সেই সময় আমি মাকে নিদ্রার মধ্যেও অনেক সময় পাইতাম।

শহরে লোকের মুখে মুখে রটিয়া গেল রামাপুরায় কুঞ্জমোহন-বাবুর বাড়ী ঢাকা হইতে এক 'মানুষকালী' আসিয়াছে। তখনও মায়ের এই 'আনন্দময়ী' নাম প্রচার হয় নাই। এই নাম অনেক পরে তাঁহার এক বিশিষ্ট ভক্ত-সন্তান ঢাকাপ্রবাসী শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র রায় রাখিয়াছিলেন। এই জ্যোতিষবাবুই পরবর্তীকালে মায়ের ভক্তদের মধ্যে "ভাইজী" নামে পরিচিত হইয়াছিলেন। তখন সকলে মাকে "ঢাকার মা," "সাহবাগের মা," কিংবা "সিদ্ধেশ্বরীর মা" বলিয়া ডাকিত। মাতৃ-দর্শনের অভিলাষে বহু সাধু, সন্ন্যাসী, যোগী, তপস্বী, পণ্ডিত ও সাধারণ নাগরিকগণ বা জনসমাজ দলে দলে আসিতে লাগিলেন। সেইসময় গৌহাটির কটন কলেজের প্রসিদ্ধ অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতপ্রবর শ্রীপদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ মহাশয় প্রায় প্রত্যহই শ্রীযুক্ত গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয়ের বাড়ী পুস্তক আনিতে যাইতেন। তিনি ছিলেন একজন প্রাচীন আদর্শের চরমপন্থী সনাতনধর্মী শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত। তাঁহার লোকচরিত্র বিচারের মানদণ্ড এত উচ্চ ছিল যে কেহই তাঁহার আন্তরিক প্রশংসার যোগ্য ছিল না। তাঁহার মুখে কাহারও সুখ্যাতি বড় শোনা যাইত না। একদিন তিনি শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ মহাশয়ের বাড়ী গিয়া বলিলেন, "কাশীতে একজন মা আসিয়াছেন। তিনি রামাপুরায় শ্রীকুঞ্জমোহন মুখোপাধ্যায়ের বাড়ী আছেন।

তাঁহার সঙ্গে তাঁহার স্বামীও আসিয়াছেন। তিনি অধিকাংশ সময়ই সমাধিতে থাকেন। তাঁহার খুব উচ্চাবস্থা বলিয়া মনে হয়। আপনি এই মা'টিকে দর্শন করিবেন।"

শ্রীবিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের মুখে মায়ের প্রশংসা শ্রীযুক্ত কবিরাজ মহাশয়ের মনের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিল। কারণ যিনি কখনও কাহারও সুখ্যাতি করেন না, তাঁহার মুখে যখন এই মাতাজীর এত প্রশংসা, তাহা হইলে তাঁহার মধ্যে নিশ্চয়ই এমন কিছু তিনি দেখিয়াছেন যাহা অতিশয় বিরল। শ্রীযুক্ত বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের নিকট মায়ের আগমনবার্তা পাইয়া পরম শ্রদ্ধেয় পণ্ডিতপ্রবর শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ মহাশয় সেইবারই শ্রীশ্রীমাকে প্রথম দর্শন করেন এবং মায়ের প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইয়া পড়েন। শ্রীশ্রীমায়ের উপর কবিরাজ মহাশয়ের এতই প্রগাঢ় ভক্তি-শ্রদ্ধা যে তিনি কখনও মায়ের বিষয় কোন কথা উত্থিত হইলে নিজের মতামত প্রদান করিতেন না। যেমন তিনি তাঁহার গুরু-দেবের সম্বন্ধে কোন কথা উঠিলে উত্তর দেন না, চুপ করিয়া থাকেন, মায়ের সম্বন্ধেও তদ্রূপ কোন উত্তর দিতেন না। তিনি মনে করিতেন মা ও তাঁহার গুরুদেব শ্রীমৎ বিশুদ্ধানন্দ মহারাজ তাঁহার আলোচনার বিষয় নহেন। সেই প্রথম দিন হইতে জীবনের অন্তিম দিবস পর্যন্ত মায়ের প্রতি ভক্তি-বিশ্বাস কবিরাজ মহাশয়ের অটুট ছিল। এই সময়ই ভারত ধর্ম মহামণ্ডলের শ্রীমৎ স্বামী জ্ঞানানন্দ মহারাজের সুযোগ্য শিষ্য ও ধর্মপ্রচারক স্বামী দয়ানন্দজীও মাকে দর্শন করিতে আসেন এবং নানাবিধ দার্শনিকতত্ত্ব ও যোগ সম্বন্ধে বহু প্রশ্ন করিয়াছিলেন। মাও তাঁহার সহজ ও সরল ভাষায় সেই সকল নানা প্রকারের প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিয়া উপস্থিত শ্রোতাদের চমৎকৃত করিয়া দেন। স্বামীজী মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কে, দেবী না মানবী?" মা উত্তর দিলেন, "বাবা! তুমি যা কও তাই।" এখন হয় তো মায়ের মুখ কমল হইতে এই প্রকার উত্তর শ্রবণ করিয়া আমরা তত আশ্চর্য হইব না, কারণ তাঁহার নিকট হইতে বর্তমান সময়ে এই রকম কথা প্রায়ই শুনিতেছি। কিন্তু অর্ধশতাব্দী পূর্বে যখন প্রথম শ্রীশ্রীমায়ের মুখ হইতে এই উত্তর

শুনিলাম তখন প্রাণ মন আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছিল। যিনি পূর্ণ তাঁহাকে যাহা বলা যায় তিনি তাহাই। পূর্ণের মধ্যে এইটি আছে, ঐটি নাই কিংবা ইহা আছে, উহা নাই, এমনতর কোন কথা হইতে পারে না। পূর্ণের অন্তর্গত সবই—ভাল মন্দ, উত্তম অধম, ছোট বড়, মানব দানব, দেব গন্ধর্ব, পশু পাখী সকল লইয়াই তিনি। অথবা এই সকল তিনিই। তিনি ছাড়া আর পৃথক্ অস্তিত্ব কাহারও নাই। নানারূপে, নানানামেও তিনি, আবার অনাম, অরূপেও তিনিই। তিনি ব্যতীত কাহারও কি কোন অস্তিত্ব বা সত্তা আছে? এই জগতের উপাদান কারণও তিনি এবং নিমিত্ত কারণও তিনিই। জগৎ বা সংসার বলিয়া পৃথক্ কিছু নাই। ব্রহ্মই অজ্ঞানীর নিকট জগৎ বা সংসার বলিয়া প্রতিভাসিত হইতেছেন। রজ্জুতে যেমন সর্পের প্রতীতি হয় অজ্ঞানের দরুণ, তেমনই ব্রহ্মে এই জগৎ ভ্রম হইতেছে। অধিষ্ঠানের অতিরিক্ত অধ্যস্ত বস্তুর কি কোন পৃথক্ সত্তা আছে? না থাকিতে পারে? সত্য বস্তু রজ্জু না থাকিলে মিথ্যা বস্তু সর্পের প্রতীতি কি প্রকারে হইবে? এখানে অধিষ্ঠান রজ্জু এবং অধ্যস্ত সর্প। অধ্যস্ত মিথ্যা বস্তু সর্প যখন আলোকের প্রভাবে বিলীন হয় তখন সেই মিথ্যা বা কাল্পনিক বস্তু সর্প যায় কোথায়? উহা তখন সত্য বস্তু যে রজ্জু তাহাতেই লয় প্রাপ্ত হয়। একই সব, আবার একেতেই সব। কত গভীর তত্ত্ব যে সেইদিন মা সাধারণ একটি বাক্যদ্বারা সকলকে বুঝাইয়াছিলেন তাহা চিন্তা করিলে আশ্চর্য হইতে হয়। সাথে সাথে আত্ম-পরিচয় কি ভাবে যে মা সেইদিন দিয়াছিলেন তাহা কি আমরা একটুও ভাবিয়া দেখিয়াছিলাম? শ্রীশ্রীমা যে স্বয়ং পূর্ণ-ব্রহ্ম তাহারই ইঙ্গিত সেইদিন স্বামী দয়ানন্দজীকে কথা প্রসঙ্গে তিনি দিয়াছিলেন। মা তো নানা প্রকারে, কথার ছলে তাঁহার স্বরূপের পরিচয় দিয়াই যাইতেছেন কিন্তু তাঁহাকে প্রকৃতভাবে চিনতে পারে কয় জনে?

সমাধির বিষয় প্রশ্ন করিলে তাহার উত্তরে মা যাহা বলিয়াছিলেন তাহার নিষ্কর্ষ হইল, কোন একটা বিষয় ভাবিতে ভাবিতে যখন সেই বিষয়েই মন একেবারে নিমগ্ন বা লয় হইয়া যায়,

যখন তুমি, আমি, ইহা, উহা, সে এবং জগৎ বলিয়া দুইটা বা অপর কিছু থাকে না, যাহা চিন্তা করিতেছিলে তাহাই হইয়া গিয়াছ— ইহাকেও এক প্রকার সমাধি বলা যাইতে পারে। ইহাও কিন্তু একটা অবস্থা। এই অবস্থারও বকম ভেদ আছে। যখন মন বলিয়া পৃথক্ কিছু আর থাকে না অর্থাৎ চিন্তা করিতে করিতে মন যখন চিন্তার যাহা বিষয় তাহাতে সম্পূর্ণভাবে লয় প্রাপ্ত হয় অথবা তদাকার বা বিষয়াকার হইয়া যায়, উহাও এক প্রকারের সমাধি। এই বিষয়টি সুন্দর একটি উদাহরণ দ্বারা স্পষ্ট করা যাইতে পারে। একজন লতাগৃহে বা লতামণ্ডপে বসিয়া একটি বারশিঙ্গার (প্রতিশৃঙ্গে ছয়টি শাখাযুক্ত হরিণবিশেষ) ধ্যান বা চিন্তা করিতে করিতে নিজেকে মানুষ মনে না করিয়া বারশিঙ্গাই মনে করিতেছে। তাহাকে যখন লতাকুঞ্জ হইতে বাহিরে আসিতে বলা হয়, তখন সে বলে আমি কি করিযা বাহিরে আসিব আমার শিং যে লতায় আটকাইয়া যাইবে। যতক্ষণ মন আছে ততক্ষণই ভাল মন্দ, সুখ দুঃখ, ইহা উহা, নানাবিধ চিন্তা বা কল্পনা। মন যখন নাশ হইয়া যায় তখন কে ধ্যান করে, কাহাকে ধ্যান কবে এবং ধ্যানই বা কি— যাহাকে তোমরা ত্রিপুটি বা তিন পুটলির নাশ বলিয়া থাক—তখন একটা অখণ্ড সত্তামাত্র থাকে। ইহাকেই না তোমরা নির্বিকল্প সমাধি নাম দিয়া থাক? নির্বিকল্প অর্থাৎ কল্পনা বলিয়া কিছুই আর তখন ভাসে না বা উদ্ভাসিত হয় না। ইহাও যে কত রকমের বাক্যদ্বারা তাহা আর কতটুকু লোককে বুঝান যায়।

একজন বিধবা ভদ্রমহিলা প্রশ্ন করিলেন, "মা! যোগ কাহাকে বলে?" স্ত্রীলোকটির প্রশ্নের উত্তরে মা বলিলেন "দুইটা লইয়া যোগ হয়। একটার সহিত আর একটার যখন মিলন হয় তখন তাহাকে যোগ কহে। যেমন তোমরা বলিয়া থাক পরমাত্মার সঙ্গে জীবাত্মার যোগ। যেমন একটি অঙ্কের সহিত আর একটি অঙ্কের যোগ হয়। তোমরা সাধারণতঃ দেখিয়া থাক একের সঙ্গে আর এক যোগ করিলে দুই হয়। পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার যোগ হইলে কিন্তু তৃতীয় কোন আত্মা হয় না। পরমাত্মার মধ্যে জীবাত্মা লয় হইয়া পরমাত্মাই হইয়া যায়। এখানে একের সহিত এক যোগ

করিলে কিন্তু দুই হয় না বরং একই হয়। একের সঙ্গে যতই যোগ কর না কেন—যোগফল এক ব্যতীত এখানে দুই হইবে না। পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার যোগ হইলে জীবাত্মাকে আর অন্বেষণ করিয়া পাওয়া যাইবে না। এক পরমাত্মাই থাকিবেন। যেমন সাগরের সঙ্গে নদী মিলিলে নদীর পৃথক্ সত্তা অর্থাৎ নাম ও রূপ কি আর খুঁজিয়া পাওয়া যায়? সমুদ্রের সহিত নদী মিলিত হইয়া নিজের নাম ও রূপ হারাইয়া সমুদ্রই হইয়া যায়। জীবাত্মাও পরমাত্মার সলিত যুক্ত হইয়া আপন পরিচ্ছিন্নতা বা ক্ষুদ্রতা নাশ করিয়া পরমাত্মাই বা স্ব স্বরূপেই প্রতিষ্ঠিত হয়।

মর্যাদা পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীরামচন্দ্র অনুজ লক্ষ্মণকে শ্রীরাম গীতায় বলিতেছেন—

আত্মন্যভেদেন বিভাবয়ন্নিদং ভবত্যভেদেন ময়াত্মনা তদা।
যথা জলং বারিনিধৌ যথাপয়ঃ ক্ষীরে বিয়দ্ব্যোম্ন্যনিলে যথানিলঃ॥

যেমন সমুদ্রে জল, দুগ্ধে দুগ্ধ, মহাকাশে ঘটাকাশ এবং বায়ুতে বায়ু মিলিয়া এক হইয়া যায়, তদ্রূপ এই সম্পূর্ণ প্রপঞ্চকে আপন আত্মার সহিত অভিন্নরূপে চিন্তা করিলে জীব পরমাত্মার সঙ্গে অভিন্ন হইয়া যায়।

অনন্তের সহিত যত সংখ্যাই যোগ কর না কেন যোগফল অনন্তই হইবে। অনন্ত হইতে অধিক কোন সংখ্যা থাকিলে তো যোগফল বৃদ্ধি পাইবে। এই জন্যই ব্রহ্মকে অনন্ত বলা হয়। ব্রহ্ম শব্দের অর্থ হইল যাহা হইতে বড় আর কিছু নাই। অনন্ত অর্থাৎ যাহার অন্ত বা শেষ নাই। সব হইতে বড়। তাই বলা হয় 'অনন্তং ব্রহ্ম'।[১] চিত্তের স্বভাব হইল নানাবিধ চিন্তা করা। সেই চিত্তকে কৌশলে বহু চিন্তা হইতে এক চিন্তায় আনা যায়। পরে সেই এক চিন্তাও

---

১. যিনি দেশদ্বারা, কালদ্বারা এবং বস্তুদ্বারা পরিচ্ছিন্ন নহেন তাঁহাকেই ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান বলে। জ্ঞানী যাঁহাকে ব্রহ্ম বলেন, যোগী তাঁহাকেই পরমাত্মা বলেন এবং ভক্ত তাঁহাকেই শ্রীভগবান বলিয়া থাকেন। শ্রীমদ্ভাগবতে বলা হইয়াছে—

বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে॥

অভ্যাসের দ্বারা বা ক্রিয়াবিশেষের দ্বারা নিরোধ করা যাইতে পারে। ইহাকেই না তোমরা চিত্তবৃত্তি নিরোধরূপ যোগ বল? ইহাকে এইভাবেও বলা যাইতে পারে—চিত্তকে বহু অগ্র হইতে প্রথম একাগ্র করা, তাহার পর আর চিত্তের একাগ্রও থাকে না, চিত্ত নিরোধ হইয়া যায়। মা! তোমরা তো তোমাদের এই ছোট্ট মেয়েটাকে লেখাপড়া কিছু শিখাও নাই, তাই আবোল-তাবোল বলিল। যেমন তোমরা বাজাইলে তেমনই শুনিলে। মা ও বাবার কাছে ছোট্ট মেয়েটার কথা বলিতে কোন সঙ্কোচ নাই।" এই কথা বলিয়াই হো হো করিয়া মা একগাল হাসিয়া দিলেন।

শ্রীশ্রীমা'কে কেহ কোন প্রকার প্রশ্ন করিলে তাহার উত্তর দিতে তাঁহার মোটেই দেরী লাগে না এবং চিন্তাও করিতে হয় না। সাধারণ সাধারণ উদাহরণ দিয়া তিনি এমন সরলভাবে সব বুঝাইয়া দেন, যাহা কোন বই পুস্তকে কি পুরাণ কোরাণে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। সত্য বলিতে গেলে বলিতে হয়, মা হইতেছেন একজন গৃহস্থঘরের গ্রামের সামান্য কুলবধূ। শাস্ত্রীয় পুস্তকাদি পড়া তো অতিশয় দূরের কথা সেই সময় পর্যন্ত যোগ বা তত্ত্বকথা শ্রবণ করিবার অবসর বা সুযোগও তাঁহার হয় নাই। সুন্দর সুন্দর দৃষ্টান্তের দ্বারা মা কিভাবে যে ঐ সকল জটিল প্রশ্নের উত্তর দিতেন তাহা ভাবিলে বাস্তবিকই আশ্চর্য হইতে হয়। যে কোন প্রকার জিজ্ঞাসার উত্তর দিতে মায়ের ক্ষণকালমাত্রও বিলম্ব বা চিন্তা করিতে হইত না। যেমন গ্রামোফোনের রেকর্ডের সঙ্গে সূচ বা পিন জুড়িয়া কল চালাইলেই শব্দ নির্গত হইয়া থাকে তেমনই মা অনর্গল নানা রকমের প্রশ্নের উত্তর বলিয়া যাইতেন। সমস্যাপূর্ণ কি জটিল জিজ্ঞাসার জবাব দিতে তাঁহাকে কিছুমাত্র ভাবিবার বা চিন্তা করিবার প্রয়োজন হইত না। উচ্চাঙ্গের সমাধির কথাগুলি তিনি স্তরে স্তরে এমন সুন্দর ও সরলভাবে বিশ্লেষণ করিয়া বুঝাইয়া দিতেন যাহা চিন্তা করিলে অবাক্ হইতে হয়। এই সকল তত্ত্ব ও যোগের কথা শুনিয়া বৃদ্ধ স্বামী শ্রীশঙ্করানন্দজী মুগ্ধ হইয়াছিলেন। তিনি এই সময়ই শ্রীশ্রীমাকে প্রথম দর্শন করেন এবং মায়ের প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইয়া পড়েন। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তাঁহার

মায়ের প্রতি অসীম শ্রদ্ধা ও ভক্তি ছিল। তিনি মাকে স্বয়ং জগদম্বা বলিয়াই মনে করিতেন। মায়ের দর্শনের সুযোগ পাইলে তিনি তখনও তাহা পরিহার করিতেন না। মায়ের কাশী অবস্থানকালে প্রত্যহ তিনি মায়ের দর্শনের জন্য আশ্রমে আসিতেন। মায়ের সঙ্গে তিনি বহু তত্ত্বালোচনা করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীমায়ের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়

শ্রীশ্রীমায়ের সঙ্গে আমার কিভাবে প্রথম পরিচয় হইল তাহাই লিখিতেছি। একদিন সৎসঙ্গের পর অনেক রাত্রিতে মা কুঞ্জমোহন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বাড়ীর ছাতে বিশ্রাম করিতেছেন। ছাতে আর অপর কেহ নাই। গরমের সময় তাই বাবা ভোলানাথের শয়নের জন্য ছাতেই বিছানা করা হইয়াছে। তিনি শয্যায় শায়িত এবং মা শয্যার এক পার্শ্বে বসিয়া আছেন। সুযোগ পাইয়া একান্তে মায়ের নিকট একটু বসিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না। এমন প্রলোভন কেহই যে ছাড়িতে পারে না সে কথা বলাই বাহুল্য। শ্রীশ্রীমাকে ও বাবা ভোলানাথকে প্রণাম করিয়া তাঁহাদের সম্মুখে বসিতেই মা জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার নাম কি? কোথায় থাক? কে কে আছে তোমার? কি কর তুমি?" এই সকল সাধারণ প্রশ্নের উত্তর দিতে আমার দুই এক মিনিটের অধিক সময় লাগিল না। কোন কথা না পাড়িলে তো আর মায়ের কাছে বেশী থাকা যাইবে না। তাই ভাবিতে লাগিলাম মায়ের সঙ্গে কি কথা বলিব? চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে হঠাৎ কয়েকটি অদ্ভুত স্বপ্নের কথা মনে পড়িয়া গেল। এই সকল স্বপ্নের মধ্যে একটি স্বপ্নের সঙ্গে আমার জীবনের অনেক কিছু সম্বন্ধ জড়িত আছে। তাই সেই স্বপ্ন বৃত্তান্তই শ্রীশ্রীমায়ের চরণে নিবেদন করিলাম। স্বপ্নটি এখানে উল্লেখ করিতেছি না, কারণ সেইটি হইল আমার ব্যক্তিগত জীবনের একটি বিশেষ কথা। আমার স্বপ্নের কথা শুনিয়া 'খুব ভাল স্বপ্ন' বলিয়া মা আমাকে উৎসাহিত করিলেন এবং পবিত্রভাবে জীবন-যাপন করিতে নির্দেশ দিলেন। সাথে সাথে এই জাতীয় স্বপ্ন বিবরণ কাহারও নিকট যে প্রকাশ করিতে নাই, তাহাও বলিলেন। উহা এই স্থানে না লিখিবার দরুণ মায়ের আদেশটিও এইভাবে রক্ষা হইয়া গেল। সকল সময়ই যে আমি মায়ের আজ্ঞা পালন করি,

তাহা শপথ করিয়া বলিতে পারি না। যদি মায়ের আদেশ পালন করিতে পারিতাম তাহা হইলে জীবনের গতি অন্য প্রকারই হইত। পারতপক্ষে তাঁহার আদেশ লঙ্ঘন করিতে ভিতর হইতে কোন প্রকার সাড়া যে পাই না, ইহা অতি সত্য কথা। বরং মায়ের আজ্ঞা পালন করিতে না পারিলে মনে দুঃখই হয়। কিন্তু প্রাক্তন কর্ম ও প্রারব্ধ এতই বলবান্ যে কখন কখন মায়ের আদেশ ইচ্ছা না থাকিলেও অমান্য করিয়া ফেলি।

এই অল্প সময়ের কথাবার্তায় সন্তানদের প্রতি মায়ের কত যে স্নেহ ও করুণা তাহা বেশ বুঝিতে পারিলাম। সেই সময় মা আমাকে আরও তিনটি প্রশ্ন করিয়াছিলেন। তাহার মধ্যে প্রথম প্রশ্ন হইল আমি মাছ খাই কি না? দ্বিতীয় প্রশ্ন হইল আমি চা পান করি কি না? এবং তৃতীয় প্রশ্ন হইল আমি রাঁধিতে জানি কি না? মায়ের তিনটি জিজ্ঞাসারই উত্তর আমি এক 'না' শব্দের দ্বারা দিয়াছিলাম অর্থাৎ মাছ খাই না, চা পান করি না এবং রন্ধন করিতেও জানি না বা পারি না। ইহা দ্বারা কেহ যেন আমাকে ভুল বুঝিবেন না। আমি জীবনে যে কখনও মৎস্য ভক্ষণ করি নাই, এমন কথা নহে। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দ হইতে আমি মাছ খাই না। ইহার পূর্বে আমি মৎস্য ভক্ষণ করিয়াছি, তবে খুব রুচির সহিত নহে। চা পান যে জীবনে কখনও করি নাই এমন কথা প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতে পারিব না। কখনও সর্দি-কাশি হইলে ঔষধের মত দুই একদিন পাথরের গ্লাসে কিংবা বাটিতে চা পান করিতাম। তাহাও অপর কাহারও বাড়ীতে গিয়া। কারণ আমাদের বাড়ী চা ও তামাকের ব্যবহার কোন দিনই ছিল না। আমরা জানিতাম চীনামাটির বাসনে একবার মুখ স্পর্শ হইলে উহা উচ্ছিষ্ট হয়। পুনরায় উহা আর ব্যবহার করা চলে না। যেমন মৃত্তিকানির্মিত এঁটো বাসন পুনর্বার ব্যবহার নিষিদ্ধ। চীনামাটির পেয়ালাদিতে কখনও চা পান করিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না। তবে রন্ধন করিতে কোনকালেই আমি পারিতাম না এবং চেষ্টাও কখনও করি নাই কারণ উহার প্রয়োজন পূর্বে অনুভব করি নাই। এই রন্ধন সম্বন্ধে একটি ঘটনা এখানে উল্লেখ

করিলে আশা করি খুব অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। যদ্যপি ঘটনাটি সংঘটিত হইয়াছিল অনেক পরে তথাপি এই স্থানে লিখিলে অধিক অশোভন হইবে না। ইহা দ্বারা অনুমান করা যাইতে পারিবে যে রন্ধন কার্যে আমি কতখানি পটু ছিলাম।

একবার শ্রীশ্রীমা কাশী আসিয়া কুঞ্জমোহনবাবুর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ডাক্তার শশাঙ্কমোহন মুখোপাধ্যায়ের বড় জামাতা শ্রীনির্মলবাবুর বাড়ী উঠিয়াছেন। কুঞ্জমোহনবাবুর বড়ই বাসনা তাঁহার বাগান মাকে দেখান। তিনি একখানা টাঙ্গায় মা ও বাবা ভোলানাথকে লইয়া উদ্যান পরিদর্শনের ইচ্ছায় গমন করেন। অপর একখানা টাঙ্গায় শশাঙ্কবাবু, মির্জাপুরের কুলদাবাবু এবং আমি যাইতেছি। গন্তব্য স্থানটি শহর হইতে বহুদূরে অবস্থিত। যখন আমরা বাগানে গিয়া পৌছিলাম তখন বেলা হইবে প্রায় দ্বিপ্রহর। গ্রীষ্মকাল, মার্তণ্ডদেব মাথার উপর বিরাজমান। রৌদ্রের প্রখর তাপ অত্যধিক হওয়ায় সকলেরই কণ্ঠ ও তালু শুষ্ক প্রায়। বাগান দেখিয়া যখন আমরা বাড়ীর দিকে ফিরিব তখন কুঞ্জমোহনবাবু বলিলেন তাঁহার ইটের ভাটি (ইটখোলা) সেখান হইতে অল্প দূরেই অবস্থিত। তাঁহার ইচ্ছা সেইটিও মা ও বাবা ভোলানাথকে দেখান। পরামর্শ করিয়া তাঁহারা স্থির করিলেন অত রৌদ্রে মাকে কষ্ট দিয়া সেখানে মাঠের মধ্যে লইয়া যাওয়ার প্রয়োজন নাই, বাবা ভোলানাথ দেখিলেই হইবে। তাই একখানা টাঙ্গায় বাবা ভোলানাথ, শশাঙ্কবাবু ও কুঞ্জবাবু ইটখোলা দেখিতে চলিলেন।

শ্রীশ্রীমায়ের কাছে বাগানে রহিলাম আমি এবং কুলদাবাবু। বাগিচায় কুঞ্জমোহনবাবুর একটি অতি সুন্দর হৃষ্টপুষ্ট গাভী ছিল। তিনি সেই গরুর কিছুটা দুধ আমার নিকট দিয়া বলিলেন, "তুমি দুধ গরম করিয়া মাকে খাওয়াইও এবং বাগানের গেটের (ফটকের) বাহিরের মুদিখানা হইতে চাল, ডাল কিনিয়া খিচুড়ি রাঁধিয়া মাকে ভোগ দিও। আমি ইটখোলা হইতে ফিরিয়া দোকানদারের জিনিসের মূল্য পরিশোধ করিয়া দিব।" আমাকে এই আদেশ দিয়া তাঁহারা তিনজনে ইটের ভাটি দেখিতে চলিয়া গেলেন। মাকে একান্তে পাইয়া এবং তাঁহাকে খাওয়াইতে

পারিব এই আনন্দে আমি উৎফুল্ল হইয়া উঠিলাম। আমি তাড়াতাড়ি ঘুটে জ্বালাইয়া মায়ের পরিধানের শাড়ীর অঞ্চল দিয়া দুগ্ধ ছাঁকিয়া মাটির হাঁড়িতে দুগ্ধ গরম করিলাম। আমাদের সঙ্গে গ্লাস কি বাটি না থাকায় মাটির পাত্রেই মাকে দুগ্ধ পান করাইতে হইয়াছিল। সঙ্গে মায়ের ছোট্ট বিছানা ছিল, তাহা পাতিয়া দিলাম। মা বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। এদিকে আমি খিচুড়ি রাঁধিবার আয়োজন করিতে লাগিলাম।

কুঞ্জমোহনবাবুর আদেশমত আমি মুদির দোকান হইতে একপোয়া চাল, একপোয়া মুগের ডাল এবং একপোয়া সৈন্ধব লবণ ক্রয় করিয়া আনিলাম। মাটির হাঁড়িতে চাল, ডাল ধুইয়া জলসহ হাঁড়ি ঘুটের আগুনের উপর চড়াইয়া দেওয়া হইল। খিচুড়ি কিছুতেই উথলাইয়া উঠিতেছে না দেখিয়া আমি একেবারে ধৈর্যচ্যুত হইয়া পড়িলাম। মা আপনার শয্যায় শুইয়া শুইয়া আমার রন্ধন ক্রিয়া দেখিতেছেন। আমার ধৈর্য যখন শেষসীমায় তখন খিচুড়ি আমার অবস্থা দেখিয়া কৃপাপূর্বক মৃত্তিকাপাত্রে উথলিয়া উঠিলেন। খিচুড়ি উথলিয়া উঠায় আমি যে একজন সুনিপুণ সূপকার এই আত্মশ্লাঘায় আমার মনটা ভরিয়া গেল। আমি আর বিলম্ব না করিয়া সৈন্ধব লবণের একপোয়া পরিমাণের খণ্ডটা হাঁড়ির মধ্যে দিতে উদ্যত হইতেই মা আর বিছানায় শুইয়া থাকিতে পারিলেন না। অকস্মাৎ শয্যা হইতে উঠিয়া বসিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে আমাকে বাধা দিয়া বলিলেন, "কর কি? কর কি? সব লবণটাই দিয়া দিলে নাকি"? আমি থমকিয়া প্রবীণ পাচকের মত বলিয়া উঠিলাম, 'খিচুড়িতে লবণ দিব না?' মা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কতটা চাউল ডাইলের খিচুড়ি পাক করিতেছ?" আমি অতি গম্ভীর স্বরে উত্তর দিলাম, 'একপোয়া চাল আর একপোয়া ডাল।' আমার উত্তর শুনিয়া মা বলিলেন, "একপোয়া চাউল আর একপোয়া ডাইলের খিচুড়িতে কি এতখানি লবণ লাগে?" তারপর লবণের ডেলা (খণ্ড) হইতে ভাঙ্গিয়া মা-ই দেখাইয়া দিলেন কতটুকু লবণ দিতে হইবে। মায়ের নির্দেশমত তাহাই খিচুড়ির মধ্যে নিক্ষেপ করিলাম। সবটা লবণ খিচুড়িতে দিলে উহা আর মুখে দেওয়া

যাইত না। ইহা হইতেই বিজ্ঞ পাঠক ও পাঠিকারা অনুমান করিতে পারিবেন আমার রন্ধন বিদ্যার দৌড় কত?

এদিকে আমি যখন খিচুড়ি রাঁধিতেছিলাম, ঐদিকে কুলদাবাবুর কি ভাব হইল, তিনি একটা আমগাছের উঁচু ডালে গিয়া চড়িয়া বসিলেন। যখন আমার রন্ধনকার্য প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে তখন তিনি আম্রবৃক্ষ হইতে অবতরণ করিয়া একটা তাজা কুমড়ার ডগা লইয়া আসিলেন। কুমড়ার ডগা দেখিয়া মা অমনি বলিলেন, "কুমড়ার ডগা আনিয়াছে ভালই হইয়াছে। উহা ধুইয়া খিচুড়ির মধ্যে দিয়া দেও।" মায়ের কথামত তাড়াতাড়ি কুমড়ার ডাঁটা, পাতা ও ডগা ধুইয়া খিচুড়ির হাঁড়ির মধ্যে ছাড়িয়া দিলাম। এইসব দেওয়াতে পাত্রটি ভরিয়া গেল। খিচুড়ি নাড়াচাড়া করা অসম্ভব হইয়া উঠিল। ঐ কার্যটি আমগাছের একটি সরু শাখাদ্বারা করা হইতেছিল। অনেক তোড়জোড়ের পর কোন রকমে পাতা দিয়া ধরিয়া খিচুড়ির হাঁড়ি মাটিতে নামাইলাম। কলাপাতায় উহা ঢালা হইল। প্রথম উপর হইতে কুমড়ার ডাঁটাপাতা এবং পরে জলজলে বা পাতলা খানিকটা চাল-ডাল সিদ্ধ পড়িল। না আছে ইহাতে হলুদ, না লঙ্কা, না মসলা, না ঘি আর না তেল। এই বস্তুটির নাম পাকশাস্ত্রে বা পাকপ্রণালীতে অন্বেষণ করিয়া পাওয়া যাইবে না।

আমার এই রান্নার বহর দেখিয়া মা নিশ্চয়ই কিছু আশ্চর্য হন নাই, কারণ আমি তো তাঁহাকে তাঁহার প্রশ্নের উত্তরে বহু পূর্বেই নিবেদন করিয়াছিলাম যে 'আমি রাঁধিতে জানি না'। কোন প্রকারে রন্ধনপর্ব তো শেষ হইল। এখন আরম্ভ হইবে শ্রীশ্রীমায়ের ভোগপর্ব। আসন পাতিয়া মাকে ভোগে বসান হইল। জায়গায় জলের ছিটা দিয়া তাঁহার সম্মুখে খিচুড়ির পাতাখানা টানিয়া লইলাম। মা নিজের হাতে খান না সেইজন্য আমাকে খাওয়াইয়া দিতে হইবে। আমি এই প্রথম মাকে খাওয়াইতে যাইতেছি। এই অধিকারটি প্রাপ্ত হবার ফলে আনন্দে আমি উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিলাম। কিন্তু তখনও ভাবিয়া দেখি নাই যে মাকে খাওয়ান অত সহজ কথা নয়। তাঁহার মুখে খিচুড়ি দিতে গিয়া দেখি

আমার হাতভরা কালি। খিচুড়ির হাঁড়ি পাতা দিয়া ধরিয়া নামাইবার সময় আমার দুই হাতে কালি লাগিয়াছিল। মা আসনে বসিয়া রহিলেন, আমি কুঁয়ারপাড়ে হস্ত প্রক্ষালন করিতে চলিলাম। পাথরে হাত ঘর্ষণ করিতে করিতে হাত লাল হইয়া গেল, তথাপি হাতের সব কালি উঠিল না। হাতের বাহিরের কালিই উঠাইতে পারিলাম না, মনের ভিতরের কালি যে কি করিয়া উঠিবে তাহা মা-ই জানেন। সেই কর্ম আমার সাধ্যের অতীত। এই অবসরে খিচুড়ি একটু ঠাণ্ডা হইল, নচেৎ উহা মায়ের মুখে দেওয়া আমার পক্ষে কঠিন হইত এবং তিনিও ঐ গরম খিচুড়ি মুখে লইতে পারিতেন কিনা সন্দেহ। আমার সেই কালি-মাখা মলিন হস্তেই মায়ের শ্রীমুখে খিচুড়ির গ্রাস তুলিয়া দিতে লাগিলাম। আমাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্যই মনে হয় মা দুই চারি গ্রাস গ্রহণ করিয়াছিলেন, নতুবা ঐ পদার্থটা না রূপে, না রসে, না গন্ধে কোন প্রকারেই মুখে লইবার যোগ্য ছিল না। তবে একটা কথা আছে দেবতারা ভোজ্য পদার্থের দিকে দৃষ্টি প্রদান করেন না, তাহারা দেখিয়া থাকেন দাতার ভাব। তাই না বলা হয় ভাবগ্রাহী জনার্দন। যেন তেন-প্রকারেণ ভোগক্রিয়া সমাধা করিয়া মাকে আমিই কোন রকমে আচমন করাইলাম। মায়ের মুখশুদ্ধি কিছু দিয়াছিলাম কিনা মনে পড়ে না। না দিবারই কথা, কারণ আমাদের সঙ্গে সেখানে লবঙ্গাদি কিছু নিশ্চয়ই ছিল না।

শ্রীশ্রীমায়ের ভোগের পর কুলদাবাবু স্নান করিয়া প্রসাদ পাইতে আসিলেন। আশ্চর্যের বিষয় তিনি মাকে এত কাছে ও একান্তভাবে পাইয়াও কিন্তু মায়ের সান্নিধ্যে বড় আসেন নাই। তিনি মা হইতে দূরে দূরেই ছিলেন। অথচ মায়ের উপর তাঁহার শ্রদ্ধাভক্তি কিছু কম নয়। আমরা দুইজনে প্রসাদ ভাগ করিয়া লইবার পরও হাঁড়িতে খানিকটা অবশিষ্ট রহিয়া গেল। মায়ের প্রসাদ বলিয়াই উহা গ্রহণ করা হইয়াছিল নহিলে উহা মুখে লইবার যোগ্য কোন প্রকারেই ছিল না। হজমের পক্ষেও যে উহা সুপাচ্য ছিল তাহা বলিতে পারা যায় না, যেহেতু উহার কতকটা অংশ গলিয়া

একেবারে কাদা হইয়া গিয়াছিল বাকী অংশটা সিদ্ধই হয় নাই।
অবশ্য পরিপাকের জন্য একমাত্র ভরসা ভগবদ্বাক্য। শ্রীভগবান
শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতার পঞ্চদশ অধ্যায়ে বলিয়াছেন—

অহং বৈশ্বানরো ভূত্বা প্রাণিনাং দেহমাশ্রিতঃ।
প্রাণাপানসমাযুক্তঃ পচাম্যন্নং চতুর্বিধম্॥

অর্থাৎ আমিই বৈশ্বানর হইয়া প্রাণিগণের দেহকে আশ্রয় করি
এবং প্রাণ ও অপান এই দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া চারি রকম অন্নের
পরিপাক সাধন করিয়া থাকি।

এবং শ্রুতিতেও নির্দেশ পাওয়া যায় যে—

"অয়মগ্নির্বৈশ্বানরঃ, যোঽয়মন্তঃ পুরুষে যেনৈতদন্নং পচ্যতে।"

শ্রুতিতেও এই কথার প্রতিধ্বনি প্রাপ্ত হওয়া যায় যে এই
আত্মাই বৈশ্বানর অগ্নি, যে অগ্নি শরীরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া অন্নের
পরিপাক করে।

উপরের বর্ণিত ঘটনাটির দ্বারা প্রমাণিত হইল যে রন্ধন কার্যে
আমার পারদর্শিতা কত! এই কারণেই মনে হয় শ্রীশ্রীমা
আমাকে বহুপূর্বে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—আমি রাঁধিতে জানি
কি না?

শ্রীশ্রীমাতৃ-দর্শনে ঢাকা গমন

এখন যে সময়কার কথা লিখিতে যাইতেছি সেই সময় শ্রীশ্রীমা অধিকাংশ সময়ই আপনভাবে সমাধিতে পড়িয়া থাকিতেন। বহু ডাকাডাকি করিয়াও তাঁহার মুখ হইতে কোন কথার উত্তর পাওয়া যাইত না। না জানি কোন আনন্দ সাগরে বিভোর হইয়া তিনি ডুবিয়া থাকিতেন। ক্রমাগত ডাকিবার ফলে যদি বা ক্ষণিকের জন্য কখনও একটু সাড়া পাওয়া যাইত আবার না জানি কোন নেশার ঘোরে সুধা সমুদ্রের অতলতলে যেন তিনি নিমগ্ন হইয়া পড়িতেন। সাধন, ভজন কিংবা আধ্যাত্মিক বিষয় সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন করিলে হয় তো বা তিনি কোন সময় তুই একটি প্রশ্নের সংক্ষেপে উত্তর দিতেন। আবার কখনও দেখা যাইত প্রশ্ন তাঁহার কর্ণে প্রবেশই করে নাই, সেইজন্য কোন উত্তরও তাঁহার নিকট হইতে পাওয়া যাইত না। মায়ের সেইসময়ের ব্যবহারে আমরা ধারণা করিতে পরিতাম না যে তিনি আমাদের মত জগতের সাধারণ জীবকে চিনেন কি না। কয়েক বৎসর শ্রীশ্রীমায়ের কাছে যাতায়াতের পরও দেখিয়াছি তিনি আমার নাম পর্যন্ত জানেন না। জীবনের প্রথম দিকে জগতের প্রতি এমনই তাঁহার উদাসীনতা দেখা যাইত। এইরূপ অনাসক্তি ও ঔদাসীন্য থাকা সত্ত্বেও তাঁহাকে দেখিবার এবং তাঁহার সান্নিধ্যলাভ করিবার নিমিত্ত মনটা সর্বদাই বড় ব্যাকুল থাকিত। আবার যে মা কবে কাশী আসিবেন এই সংবাদের জন্য প্রায়ই মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ মহাশয় ও শ্রীযুক্ত নির্মল চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বাড়ী যাইতাম। তাঁহারাই মায়ের খবরাখবর পাইতেন। যখন তাঁহাদের নিকট হইতে শুনিলাম যে মায়ের শীঘ্র কাশী আসিবার কোন সম্ভাবনা নাই তখন ঢাকা গমন ব্যতীত মায়ের দর্শন আর কি করিয়া হইবে?

১৯৩০ কি ১৯৩১ খৃষ্টাব্দের শারদীয়া শ্রীশ্রীদুর্গাপূজার পূর্বে মায়ের দর্শনের নিমিত্ত মনটা বড়ই ব্যাকুল হইয়া উঠিল। কর্মস্থল হইতে তিন মাসের বিদায় লইয়া মা'র নিকট যাইবার জন্য

যাত্রা করিলাম। মায়ের জন্য ব্যাকুলতা এতই তীব্র হইয়াছিল যে যদি কর্মস্থান হইতে ছুটি না পাই তাহা হইলে কার্যে ইস্তফা দিয়াও মায়ের কাছে ঢাকা যাইব—স্থির করিয়াছিলাম। বহুকাল পরে অর্থাৎ বিশ কি পঁচিশ বৎসর পর পূর্ববাঙ্গলায় যাইতেছি। কলিকাতায় আমার মাসীমার বাড়ী কয়েক ঘণ্টা অতিবাহিত করিয়া রাত্রি আটটায় ঢাকা মেলে যাত্রা করিলাম। মাসীমা অনেক আগ্রহ করিয়াও একটি দিন আমাকে তাঁহার নিকট কলিকাতায় রাখিতে পারিলেন না। ইহাতে তিনি বিশেষ দুঃখিতই হইয়াছিলেন। মাকে প্রথম প্রথম দেখিয়া মানুষের মন যে তাঁহার জন্য কি রকম ব্যাকুল হয় তাহা আমি ভাষায় ব্যক্ত করিতে পারিব না। সেই কথা আজ মনে করিয়া বাস্তবিকই আশ্চর্য হইতেছি। মায়ের কাছে থাকিবার যে কি আনন্দ তাহা যাহারা মায়ের নিকট বাস করেন নাই—তাহাদের ভাষার মাধ্যমে লিখিয়া বোঝান অসম্ভব। শারীরিক যতই অসুবিধা হউক না কেন তাহার দিকে কোন লক্ষ্যই যায় না। বর্তমানে আমার এই অপটু দেহ মায়ের সান্নিধ্য লাভের বিশেষ অন্তরায় সৃষ্টি করিয়াছে। প্রবল ইচ্ছা থাকিলেও স্নেহময়ী শ্রীশ্রীমায়ের কাছে যাইতে পারি না। ইহা কি আমার পক্ষে কম দুঃখের কথা! এই মর্মান্তিক দুঃখ সহ্য করা ছাড়া আর কোন উপায় নাই। মায়ের সঙ্গে থাকিতে পারিলে কি আনন্দেই না দিনগুলি কাটিয়া যায়। যাঁহারা মায়ের সঙ্গে সদা বাস করিবার সুযোগ পাইয়াছেন তাঁহাদের সৌভাগ্যের সীমা নাই।

শিয়ালদহ ষ্টেশন হইতে ঢাকা মেল রাত্রি আটটায় ছাড়িবে। নির্দিষ্ট সময়ের বহুপূর্বেই আমি গিয়া গাড়িতে বসিয়াছি। আটটা কখন বাজিবে ইহা জানিবার জন্য প্রত্যেক পাঁচ মিনিট অন্তর অন্তরই ঘড়ি দেখিতেছি। আমি যতই অস্থির হইতেছি ততই যেন সময়ের পরিমাণ আমার নিকট দীর্ঘ হইয়া উঠিতেছিল। মিলনের আনন্দ মুহূর্তে শেষ হইয়া যায় কিন্তু প্রিয়জনের সহিত বিচ্ছেদের দুঃখ যেন জগদ্দল হইয়া পড়ে, কিছুতেই সমাপ্ত হইতে চায় না। আমার গরজে তো আর গাড়ী নির্ধারিত সময়ের পূর্বে ছাড়িবে না।

এমন অবস্থায় ধৈর্য ধারণ ব্যতীত আর উপায়ান্তর নাই। যথা সময়ে গাড়ী তো শিয়ালদহ হইতে ছাড়িল কিন্তু পথ যেন আর শেষ হইতে চায় না। ঢাকা মেলের প্রচণ্ড গতিটা যেন আমার নিকট গরুর গাড়ী বা মালগাড়ীর মত বোধ হইতেছিল। ইচ্ছা হইতেছিল গাড়ী হইতে অবতরণ করিয়া ঠেলিয়া উহার বেগ কিছু বৃদ্ধি করিয়া দেই, যাহাতে গন্তব্যস্থান মায়ের কাছে ঢাকা শীঘ্রই পৌছিতে পারি। সারা রাত্রি গাড়ীতে যে কি উদ্বেগে আমাকে কাটাইতে হইয়াছিল তাহা একমাত্র অন্তরাত্মা শ্রীভগবানই জানেন আর ঢাকায় বসিয়া জানিয়াছিলেন আমাদের পরমস্নেহময়ী শ্রীশ্রীমা।

ভোরবেলা সূর্যোদয়ের সাথে সাথেই আমাদের গাড়ী গোয়ালন্দঘাট ষ্টেশনে আসিয়া পৌঁছিল। পদ্মা নদীর তীর হইতে সূর্যের উদয় দৃশ্যটি অতি মনোরম এবং উপভোগ্য। গোয়ালন্দ-ঘাট ষ্টেশন এই পদ্মা নদীর পাড়ে। লোকে কতই না আগ্রহের সহিত এখান হইতে এই চিত্তাকর্ষক সৌন্দর্য অবলোকন করিয়া মুগ্ধ হইয়া যায়। ঐ সর্বজনপ্রশংসিত ও মনোমুগ্ধকর দৃশ্য দেখিবার আজ আমার অবসর কোথায়? মনেরও এরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখিবার মত অবস্থা নাই। আমার মন পড়িয়া আছে মায়ের কাছে ঢাকায়, রমনার মাঠে। কোন দিকেই আর লক্ষ্য নাই— উদ্দেশ্য একমাত্র মাতৃ-দর্শন। এইরূপ মানসিক স্থিতির মধ্যে কি কখনও প্রাকৃতিক শোভা উপভোগ করা যায়? ক্ষিপ্রগতিতে গাড়ী হইতে নামিয়া স্টিমারে গিয়া স্থান গ্রহণ করিলাম। যথা সময়ে জাহাজ ছাড়িতেছে না দেখিয়া আমার ব্যাকুলতার আর অন্ত নাই। আমার প্রারব্ধ-কর্মই এইভাবে মাতৃ-দর্শনে অন্তরায় সৃষ্টি করিতেছে। স্টিমার একটু বিলম্বেই ছাড়িল, সেই কারণে নির্দিষ্ট সময়ের প্রায় অর্ধঘণ্টা পর উহার গন্তব্যস্থান নারায়ণগঞ্জ আসিয়া পৌঁছিল। হুড়াহুড়ি করিয়া স্টিমার হইতে নামিয়া পুনরায় রেলগাড়ীতে আসিয়া বসিলাম। বেলা অনুমান আট ঘটিকার সময় বহু আকাঙ্ক্ষিত ঢাকায় আসিয়া উপস্থিত হইলাম। সেখান হইতে ঘোড়ার গাড়ী রমনা অভিমুখে চলিতে লাগিল। বহু বাধা অতি-ক্রমের পর শেষ পর্যন্ত গাড়োয়ান আমাকে রমনা মাঠের গেটের

ধারে নামাইয়া শ্রীশ্রীকালীমাতার মন্দির দেখাইয়া দিল। আমাকে নবাগত মনে করিয়া শকট চালক যে ন্যায্যাতিরিক্ত ভাড়া আমার কাছ হইতে আদায় করিয়া লইল, তাহা আমি বেশ বুঝিলাম। দর কষাকষি করিবার আমার অবকাশ কোথায়? মাতৃদর্শনের সীমাহীন উৎকণ্ঠা আমাকে পাইয়া বসিয়াছে। কতক্ষণে মাকে দেখিব সেই কারণে অন্য কোন দিকে আর মন দিতে পারিতে-ছিলাম না।

মনের মাঝে একাগ্রতা, ব্যাকুলতা বা উৎকণ্ঠা ভগবদ্দর্শনের প্রধান উপায়। ভগবদ্দর্শনের জন্য মানবের মনে যদি প্রবল উৎকণ্ঠা চিরজাগরিত না থাকে তাহা হইলে সাধকজীবনের সার্থকতা কি? শ্রীভগবানকে পাইবার জন্য ব্যাকুলতাই হইল বড় সাধনা। ভগবৎ-প্রাপ্তির জন্য আকুলতা জীবনে যদি না আসিল তাহা হইলে তাঁহাকে পাওয়ার আশা সুদূরপরাহত জানিতে হইবে।

রমনা মাঠের মধ্যে একটি বড় পুকুর। পুষ্করিণীর পাড়ে আসিয়া দেখিলাম দুইটি মন্দির। একটি অতি পুরাতন বড় মন্দির আর একটু দূরে অপর একটি অপেক্ষাকৃত নূতন ছোট মন্দির। নব নির্মিত ছোট মন্দিরটিই যে মায়ের আশ্রমের শ্রীশ্রীঅন্নপূর্ণার মন্দির তাহা বুঝিতে বিলম্ব হইল না, কারণ তখনও উহার নির্মাণ কার্য সমাপ্ত হয় নাই। এই সংবাদ কাশী থাকিতেই আমি প্রাপ্ত হইয়া-ছিলাম। এই মন্দিরের জন্য শ্রীশ্রীমার পুরাতন ভক্ত শ্রীভূপতি নাথ মিত্র বারাণসীতে অর্থ সংগ্রহের জন্য কিছু দিন পূর্বে গিয়াছিলেন। আশ্রমের দিকে দৃষ্টি ফিরাইতেই দেখি মায়ের সেই সময়কার বর্ষীয়সী সেবিকা মরণীদিদি পুকুরের দিকে আসিতেছেন। এই মহিলাকে আমি পূর্বে কাশীতে মায়ের সঙ্গে দেখিয়াছিলাম। তিনি আমাকে দেখিয়াই হাসিয়া বলিলেন, আপনি যে এখানে? কোথা হইতে আসিতেছেন?

আমি—এইমাত্র গাড়ী হইতে নামিলাম। মায়ের দর্শনের জন্য কাশী হইতে আসিতেছি। মা কোথয়ে?

মরণীদিদি—কাল রাত্রিতে মা বলিতে ছিলেন, একজন খুব ব্যাকুল হইয়া এই শরীরটার (নিজেকে লক্ষ্য করিয়া) কাছে

আসিতেছে। এখন বুঝিলাম আপনার কথাই মা গতকাল রাত্রিতে বলিতেছিলেন। মা এখনও বাহিরেই বসিয়া আছেন। যান, দর্শন করুন গিয়া।

তিনি আশ্রমের পথ আমাকে দেখাইয়া দিয়া স্নান করিতে পুকুরে গিয়া নামিলেন। মা যে আমাদের মনের অবস্থা সব জানিতে পারেন তার প্রমাণ আজ মরণীদিদির কথায় অবগত হইলাম। গত রাত্রির আমার মনের ব্যাকুলতা যে মা এখান হইতে বুঝিয়াছিলেন তাহা জানিয়া কি আনন্দ যে আমার সেই সময় হইয়াছিল তাহা ভাষায় লিখিয়া কি বাক্যে বলিয়া প্রকাশ করার শক্তি আমার নাই। আনন্দ অনুভবের বস্তু উহা বলিয়া কিংবা লিখিয়া কি কাহাকেও বুঝান যায়?

আশ্রমের ফটক পার হইয়াই দেখি সম্মুখে শ্রীশ্রীঅন্নপূর্ণার মন্দির। মন্দিরের ঈশান বা পূর্ব-উত্তর কোণে একখানি ছোট্ট খড়ের ঘর। উহার চারিদিকেই বেষ্টিত বা ঘেরা বারান্দা। সেই বারান্দায় শ্রীশ্রীমা আশ্রমটি আলো করিয়া বসিয়া আছেন। তাঁহার পরিধানে বড় লাল কস্তাপেড়ে শাড়ী, ললাটে সিন্দুরের ফোঁটা, দুই হস্তে সোনার চুড়ি ও শাঁখা এবং মাথায় অল্প ঘোমটা। মা আমার রাজরাজেশ্বরী শ্রীশ্রীঅন্নপূর্ণা মূর্তিতে আশ্রমটি আলো করিয়া বিরাজিতা। মন্দিরে মায়েরই প্রতীক সুবর্ণ নির্মিত শ্রীশ্রীঅন্নপূর্ণা বিগ্রহ। মায়ের রাতুল চরণে মস্তক রাখিয়া প্রণাম করিতেই বিগত সারারাত্রির শারীরিক কষ্ট ও মানসিক গ্লানি মুহূর্তের মধ্যে দূর হইয়া গেল। প্রণামান্তে মাথা তুলিতেই মা হাসিমুখে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কেমন আছ?" আমি উত্তর দিলাম, "মা! তোমার কাছ হইতে দূরে থাকিয়া যেমন থাকা উচিত তেমনিই আছি।" মা আর কোন প্রকার কথা না বাড়াইয়া বলিলেন, "পুকুরে গিয়া স্নান করিয়া আস।" মাকে পুনরায় প্রণাম করতঃ তাঁহার আদেশমত পুকুরে স্নানাদি করিতে গেলাম। স্নান, সন্ধ্যা ও তর্পণাদি সমাপন করিতে আমার কিছু বিলম্ব হইয়াছিল। আশ্রমে আসিয়া দেখি মটরী পিসীমা অর্থাৎ বাবা ভোলানাথের ছোট ভগিনী আমার জন্য ভাত বাড়িয়া বসিয়া

আছেন। মটরী পিসীমা বড়ই শান্ত প্রকৃতির মহিলা ছিলেন। তিনি লোকের সঙ্গে কথাবার্তা কম বলিতেন। তিনি মুখ বুজিয়া সকলের সেবা করিয়া যাইতেন। শেষ জীবন তিনি মায়ের কাশী আশ্রমেই থাকিয়া বাবা বিশ্বনাথের চরণে চিরশান্তি লাভ করিয়াছেন।

ঢাকার প্রসিদ্ধ স্থান রমনার মাঠ। এই মাঠেই ঘোড়-দৌড়ের প্রতিযোগিতা হইয়া থাকে। বর্তমান সময়ে ঢাকা সহর বাঙ্গলা-দেশের রাজধানী এবং রমনার মাঠকে "শহীদ ময়দানে" পরিণত করা হইয়াছে। এই বিরাট ময়দানের মধ্যে একটি বড় সরোবর। উহারই উত্তরপাড়ে রমনার বিখ্যাত কালীমন্দির (বর্তমান সময়ে উহার চিহ্নপর্যন্ত নাই। পাকিস্থান সরকার মন্দির ভাঙ্গিয়া ধূলিসাৎ করিয়া দিয়াছে)। এই মন্দিরের বায়ু কোণে অর্থাৎ উত্তর-পশ্চিম কোণে শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ীর নব নির্মিত আশ্রম। আশ্রমের বিভিন্ন স্থানে কলাগাছ, আমগাছ, কাঁঠালগাছ, নারিকেল গাছ, নানাবিধ ফুলের গাছ, তুলসীর ঝার, পাম ও ইউকেলিপ্টাসের বৃক্ষ—শোভা পাইতেছে। স্থানটি ইটের প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত ও সুরক্ষিত। পাঁচিল দেখিলেই মনে হয় ইহা অতি পুরাতন স্থান। এই জায়গাটি কোন সময় সাধু সন্ন্যাসীদের সমাধিক্ষেত্র ছিল বলিয়া মনে হয় কারণ অন্নপূর্ণামাতার মন্দিরের জন্য যখন ভিত্তি (বনিয়াদ) খনন করা হইয়াছিল তখন কয়েক স্থলে নরকঙ্কাল ও মাটির কমণ্ডলু পাওয়া গিয়াছিল। সন্ন্যাসীদের সমাধি দান কালে কমণ্ডলু দিবার প্রথা সর্বত্র দেখিতে পাওয়া যায়। দশনামী সন্ন্যাসী বনসম্প্রদায়ের অধীনে এই স্থানটি ছিল। তাঁহাদের নিকট হইতে মাসিক পনের টাকা খাজনায় জায়গাটি আশ্রমের জন্য লওয়া হয়। আশ্রমের মধ্যভাগে মাতা অন্নপূর্ণার মন্দির। এই মন্দিরে মা অন্নপূর্ণার সহিত মা কালী, শিব, বিষ্ণু ও গণেশদেবতা প্রতিষ্ঠিত আছেন। [পাকিস্তান হইবার পর দেবতাদের ঢাকা হইতে আনয়ন করিয়া কাশীধামে গঙ্গারতটে অবস্থিত শ্রীশ্রীমায়ের আশ্রমে স্থাপন করা হইয়াছে।] মন্দিরের কোণে কোণে সাধু ব্রহ্মচারীদের সাধনার জন্য ছোট ছোট গুহা নির্মিত আছে। উত্তরদিকে একখানি বড় চৌচালা টিনের ঘর।

ইহার ভিটা ও মেজে মাটির। আশ্রমের ঈশান কোণে মায়ের ঘর। ইহার পূর্ব ও পশ্চিমে দুইটি দ্বার এবং উত্তর ও দক্ষিণে দুইটি জানালা। ঘরের চারিদিকে অনুমান দুই হস্ত প্রস্থ বারান্দা। এই ঘরের ভিটা, মেজে ও বারান্দা পাকা এবং চাল খড়ের। ইহাতেই দক্ষিণ দিকে মা শয়ন করেন এবং উত্তর দিকে বাবা ভোলানাথ। উভয়েরই শয্যা স্বতন্ত্র। বড় টিনের ঘরে মটরী পিসীমা বাস করেন এবং অন্নপূর্ণা মন্দিরের তিনদিক খোলা নাটমন্দিরে শ্রীযোগেশ ব্রহ্মচারী, শ্রীকমলাকান্ত ব্রহ্মচারী ও শ্রীঅতুল ব্রহ্মচারী রাত্রিতে শয়ন করেন। বড় টিনের ঘরের পশ্চিমে আমগাছতলায় একখানা বড় একচালা টিনের ঘর। ঘরখানি বাঁশের বেড়ার দ্বারা দুইভাগে বিভক্ত। দক্ষিণের বড় অংশে নিরামিষ রন্ধন হয় এবং উত্তরের ছোট অংশে আমিষ। ইহার চতুর্দিকের বেড়া বাঁশের দরমার এবং মেজে মাটির। মন্দিরের পশ্চিমে পাকা কুয়া। কোন আগন্তুক বা অতিথি আসিলে তাহার বাসের কোন স্থান নাই। আমার অতি সাধারণ ছোট্ট বিছানা ও টিনের একটি ছোট বাক্স মটরী পিসীমার ঘরে রাখিয়া দিলাম। মা ও বাবা ভোলানাথ দ্বিপ্রহরে এই ঘরে বসিয়া ভোগ গ্রহণ করেন। রাত্রিতে শয়নের কোন সুবিধাজনক স্থান না পাওয়ায় অবশেষে মায়ের ঘরের দক্ষিণ দিকের অলিন্দেই স্থান করিয়া লইলাম—ঘরের মধ্যে যেদিকে মা শয়ন করেন তাহার বাহিরের দিকে। মা এইস্থানে উপবেশন করিয়াই প্রাতঃকালে আমাকে প্রথম দর্শন দিয়াছিলেন। যতদিন আশ্রমে ছিলাম রাত্রিতে এই জায়গাতেই প্রত্যহ শয়ন করিতাম এবং সকাল সন্ধ্যা দুইবেলা আহ্নিক করিতাম।

বাল্যাবস্থা হইতে আমার অতি প্রত্যূষে শয্যাত্যাগ করিবার অভ্যাস। পরদিন অতি ভোরে উঠিয়া শৌচাদি ক্রিয়া সমাপন-করতঃ আশ্রমের সম্মুখের বিরাট খোলা মাঠে পায়চারি করিতে করিতে বুরুশদ্বারা দন্তমঞ্জন করিতেছিলাম। এমন সময় দেখি একজন মধ্যবয়স্ক গৌরবর্ণ ছিপছিপে শ্মশ্রুবিহীন ভদ্রলোক আশ্রমের দিকে দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইতেছেন। তখনও বেশ অন্ধকার। লোকটি যে আধুনিক মার্জিত রুচির উচ্চশিক্ষিত ও

গম্ভীর প্রকৃতির তাহা তাঁহাকে দেখিলেই ধারণা হয়। পাঠ্যাবস্থায় Collins সাহেবের রচিত উপন্যাস Woman in white পড়িয়াছিলাম। প্রবীণ সাহিত্যিক ও উপন্যাস লেখক শ্রীদামোদর মুখোপাধ্যায় মহাশয় এই পুস্তকের অনুকরণে তাঁহার বিখ্যাত উপন্যাস "শুক্লবসনা সুন্দরী" লিখিয়াছিলেন। এই ভদ্রলোকটিকে দেখিতেই এবং বেশভূষা অবলোকন করিতেই Woman in white এর কথা মনে পড়িয়া গেল। ভাবিলাম আমার যদি লিখিবার শক্তি থাকিত তাহা হইলে Man in white নাম দিয়া আমিও একখানি উপন্যাস লিখিতাম। আশ্রমে প্রবেশ করিতে করিতে উহার মধ্যেই তিনি একটু বক্রদৃষ্টিতে এক ফাকে যে আমাক দেখিলেন তাহা আমার চক্ষু এড়াইল না। আমিও যে তাঁহাকে লক্ষ্য না করিলাম তাহাও নহে কারণ তাঁহার পোষাক পরিচ্ছদ ও আকৃতির মধ্যে একটু বিশেষত্ব ছিল। তাঁহার ললাট অতিশয় প্রশস্ত ও উচ্চ এবং দৃষ্টিভঙ্গি তীক্ষ্ণ ও অসাধারণ বলিয়াই মনে হইল। তাঁহার পরিধানে পাড়বিহীন সাদা ধপধপে ধুতি, গায়ে শ্বেত ফুল শার্ট, শুভ্র চাদর এবং পায়ে খড়িমাখান সাদা ক্যাম্বিসের পাতুকা। এক কথায় বলিতে গেলে ভদ্রলোকটির আপাদ-মস্তক সবই শুভ্র। আশ্রমের ভিতরে প্রবেশ করিয়া মায়ের কুটিরের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন মা তখনও শয্যা ত্যাগ করেন নাই। সেইজন্য তিনি একজন ব্রহ্মচারীকে সঙ্গে লইয়া পুনরায় আশ্রমের ফটকের বাহিরে আসিয়া আমাকে লক্ষ্য করিয়া প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপের সহিত তাঁহার মন্তব্য প্রকাশ করিলেন, "সাধু হইতে আসিয়াছেন এখনও টুথ ব্রাশ দিয়া দাঁত মাজা ছাড়িতে পারেন নাই।" আমাকে শুনাইবার জন্যই তাঁহার এই শ্লেষ বাক্য। সকালবেলা অকারণ ভদ্রলোকটি আমার উপর এইরূপ কটাক্ষ করাতে আমি ভিতরে ভিতরে ক্ষুব্ধ হওয়া সত্ত্বেও হাসিতে হাসিতে তাঁহাকে বলিলাম, "আপনি আমাকে সম্পূর্ণ ভুল বুঝিয়াছেন। আমি সাধু হইতে গৃহত্যাগ করিয়া এখানে মোটেই আসি নাই। মাকে ভাল লাগে তাই তাঁহাকে দেখিতে এখানে আসিয়াছি।" আমার মনে হয় সাথের ব্রহ্মচারী এই

ভদ্রলোককে আমার সম্বন্ধে ভুল সংবাদ দিয়াছিলেন। আমার এইরূপ কাটখোট্টা-নীরস-স্পষ্ট উত্তর শুনিয়া তিনি আরও গম্ভীর হইয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কাল আসিয়াছেন বুঝি?" আমি সংক্ষেপে উত্তর দিলাম, "হ্যাঁ।" আমার সঙ্গে কথা বলিতে বলিতেই তিনি চকিতের মধ্যে পুনরায় আশ্রমের ভিতর চলিয়া গেলেন। আমিও মুখ ধুইতে আশ্রমে যাইতেই দেখি মা তাঁহার শয়নকক্ষ হইতে বাহির হইয়া সোজা মাঠের দিকে যাইতেছেন এবং ঐ ভদ্রলোকটি মায়ের পশ্চাতে পশ্চাতে গমন করিতে করিতে তাঁহাকে স্পর্শ না করিয়া একখানা এণ্ডি চাদর তাঁহার দেহের উপর আলগোছে ফেলিয়া দিলেন। মা চাদরখানা গাত্রে জড়াইয়া দিতে দিতে আশ্রমের বাহিরে গমন করিলেন। ভদ্রলোকটি মায়ের অনুসরণ করিতে লাগিলেন। আমি মাকে দূর হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণামান্তে মুখ ধুইতে কুয়ার পাড়ে চলিয়া গেলাম। পরে ঐ লোকটির বিষয় সন্ধান করিয়া জানিয়াছিলাম, ইনিই স্বনাম ধন্য পুরুষ শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র রায়—শ্রীশ্রীমায়ের একনিষ্ঠ পরমভক্ত। পরে যিনি মাতৃগোষ্ঠীর নিকট "ভাইজী" নামে পরিচিত হইয়াছিলেন। মাকে প্রত্যহ সূর্যোদয়ের পূর্বে মাঠে বেড়াইতে লইয়া যাওয়া জ্যোতিষবাবুর নিত্যকর্ম ছিল। কিছুদিনের মধ্যেই জ্যোতিষবাবুর সঙ্গে আমার হৃদ্যতা জমিয়া উঠিল। তিনি আমাকে তাঁহার ছোট ভাইয়ের মত ভালবাসিতেন এবং স্নেহ করিতেন, পক্ষান্তরে আমিও তাঁহাকে সম্মান করিতাম।

একদিন জ্যোতিষবাবু অতি ভোরে আশ্রমে আসিয়া দেখিলেন মা তখনও বিছানায় শায়িত। তিনি পঞ্চবটীর তলায় (বট, অশ্বত্থ, বিল্ব, আমলকী ও অশোক) ব্রহ্মচারীদের একখানা খড়ের ঝুপড়িতে গিয়া বসিলেন। আমি মায়ের ঘরের দক্ষিণ দিকের বারান্দায় বসিয়া নিজের নিত্যকর্ম সন্ধ্যা ও তর্পণাদি করিতেছি। আশ্রমের ব্রহ্মাচারীরা আপন আপন নির্দিষ্ট কাজে ব্যস্ত আছেন। মায়ের কুটিরের সম্মুখে আশ্রম প্রাঙ্গণে কোন জনমানব নাই। সূর্যোদয় হইয়া গিয়াছে দেখিয়া জ্যোতিষবাবুও বাড়ীতে ফিরিয়া গিয়াছিলেন কারণ রৌদ্র উঠিয়া গেলে মা ময়দানে বেড়াইতে যান

না। এমন সময় একটি ব্রাহ্মণ একখানি নামাবলী গায়ে দিয়া মায়ের ঘরের পশ্চিম দিককার দরজার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার বয়স অনুমান করি পঞ্চাশ কি পঞ্চান্ন বৎসর হইবে। তাঁহার পরিধানে স্বল্প বহরের সাদা থান ধুতি তাহাও হাঁটুব উপর পর্যন্ত। তিনি খালি পায়েই আসিয়াছেন বলিয়া মনে হইল, কারণ পা দুখানি ধূলায় ধূসরিত ছিল। তাঁহাকে দেখিযা মনে হইতেছিল তিনি মাতৃদর্শনের জন্য অনেক দূর হইতে আসিয়াছেন। কাহাকেও কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া তিনি নিঃশব্দে এক দৃষ্টিতে মায়ের ঘরের দরজার অভিমুখে চাহিয়া আছেন। আমি নিজে প্রাতঃকৃত্যে নিযুক্ত ছিলাম সেইজন্য ঐ ব্রাহ্মণের সঙ্গে কোন কথা-বার্তা বলিতে পাবিতেছিলাম না। তিনিও আমাকে মায়ের সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন করেন নাই। তিনি ঐ ভাবে কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিবার পর হঠাৎ মায়ের ঘরের দ্বাব খুলিযা গেল। দরজা খোলার শব্দ শুনিয়া আমি মাকে প্রণাম করিতে নিকটে গিয়াছি সাথে সাথে ঐ ব্রাহ্মণটিও মায়েব কাছে বারান্দায উঠিয়া আসিয়া-ছেন। মা আমাদেব দুইজনকে তাঁহার দিকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া অকস্মাৎ দাঁড়াইয়া পডিলেন। তাঁহার দক্ষিণ চরণখানি চৌকাটের উপব এবং বাম পদখানি পশ্চাতে ঘরেব মধ্যে। শ্রীশ্রীমা কালী যেমন দক্ষিণ চবণ আগাইযা দিয়া এবং বামপদ পিছনে করিয়া দাঁড়ান ঠিক তেমনি করিয়া মা দাঁড়াইলেন। তাঁহার ডান পায়ের আঙ্গুলগুলি সবই চৌকাট হইতে বাহিরে অর্থাৎ শূন্যে। মায়ের মাথায় কাপড় নাই কারণ তখনই তিনি বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়াছেন এবং তাঁহাব ঘন কৃষ্ণবর্ণের কেশগুচ্ছ পৃষ্ঠোপরি আলু-লায়িত। মায়ের সুন্দর নয়নযুগল ভাবেব প্রাবল্যে ঢুলুঢুলু ও লালিমাযুক্ত। শ্রীশ্রীমায়ের সেই সময়কাব অনুপম রূপমাধুরী ও দাঁড়াইবার ভঙ্গিমা দেখিযা মাকে আদ্যাশক্তি ব্যতীত অন্য কিছুই মনে উদয় হয় নাই। ভদ্রলোকটি কোন প্রকার কথাবার্তা বা জিজ্ঞাসাদি না করিয়া অকস্মাৎ সর্বপ্রকার লজ্জা সঙ্কোচ পরিত্যাগ করিয়া মায়ের দক্ষিণপাদপদ্মের বৃদ্ধাঙ্গুলিটি নিজের মুখের মধ্যে লইয়া চুষিতে লাগিলেন। জননী আমার স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন এবং

একদৃষ্টিতে তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণটি বারংবার মায়ের ডান অঙ্গুষ্ঠটি চুষিতেছেন এবং ঢোক গিলিতেছেন। যেমন বাছুর গরুর বাঁটে মুখ দিয়া টানে ও মাঝে মাছে ঢুস্‌দিয়া বাঁট হইতে দুগ্ধ বাহির করে ঠিক সেইভাবে তিনিও ঢুস্‌দিয়া দিয়া মায়ের পায়ের বুড়ো আঙ্গুল হইতে সুধা বাহির করিয়া আকণ্ঠ পান করিতেছিলেন। এইরূপে মিনিটখানেক কি দুই মিনিট মাতৃ-চরণামৃত পান ও পরে প্রণাম করিয়া মায়ের মুখকমলের দিকে একবার অতি করুণ দৃষ্টিতে অবলোকনকরতঃ ধীরে ধীরে আপন গন্তব্যস্থানে যাইতে উদ্যত হইলেন। আমি ঐ ভাগ্যবান্ ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম তিনি বিক্রমপুরের কোন গ্রামের অধিবাসী। মালিবাগে তাঁহার কোন যজমানের বাড়ী শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা করিতে তিনি ঢাকা আসিয়াছেন। এই স্মরণীয় ঘটনার পর সুদীর্ঘ প্রায় পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে সেই সৌভাগ্যশালী ব্যক্তিকে আর কখনও আমি দেখি নাই।

একবার প্রসঙ্গক্রমে শ্রীশ্রীমাকে এই ঘটনার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করায় তিনি কথার পৃষ্ঠে বলিয়াছিলেন, তিনি যখন রায়পুরে (দেহরাদুন) ধর্মশালায় থাকিতেন তখন শ্রীযমুনালাল বজাজ দেশনায়ক শ্রীগান্ধীজীর অনুমতি লইয়া মায়ের দর্শনের জন্য সেখানে কিছুদিন ছিলেন। সেই সময় তিনিও ঠিক এই রকমেই মায়ের পায়ের বুড়ো আঙ্গুলটি তাঁহার মুখের মধ্যে লইয়া চুষিয়াছিলেন। শ্রীযমুনালাল বজাজ কংগ্রেসের এবং স্বাধীনতা সংগ্রামের একজন ত্যাগী নেতা। তিনি দেশবরেণ্য শ্রীমোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীজীর পরমভক্ত ও অনুসরণকারী ছিলেন। তিনি কয়েকদিনের জন্য মাতৃ-সঙ্গ করিতে আসিয়া প্রায় তিন সপ্তাহকাল শ্রীশ্রীমায়ের কাছে থাকিয়া যান। তিনি রায়পুরে আশ্রম সংলগ্ন বহু জমি ক্রয় করিয়াছিলেন এবং তাঁহার ইচ্ছা ছিল সেখানে মায়ের সান্নিধ্যে বাস করিয়া সাধন ভজনে শেষ জীবন অতিবাহিত করিবেন। তাঁহার সেই অভিলাষ পূর্ণ হইবার পূর্বেই তিনি পরলোক গমন করেন। লোকপরম্পরা শোনা গিয়াছে গান্ধীজী নাকি বলিয়াছিলেন—'যে শান্তি আমি ত্রিশ বৎসরে যমুনালালকে দিতে

পারি নাই সেই শান্তি সে শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ীর নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়াছে'—

"As soon as Mataji entered Bapuji's room where he was playing his Charkha, (spinning wheel) She called out loudly: "Pitaji, your Pagal bachhi (crazy daughter) has come to see you!" Bapuji remarked laughingly that if She really were a pagal bachhi, She could not possibly have impressed men like Bhayaji (Jamunalal Bajaj) whom Bapuji was unable to give inner peace, inspite of his best efforts during thirty years of close association with him."

'Ma Anandamayee Lila' by Hari Ram Joshi.

তিনি আমাদের শ্রীশ্রীমাকে কমলা নেহরুর গুরু বলিতেন। মা দেহরাদুন থাকাকালীন শ্রীমতী কমলা নেহরু মায়ের কাছে প্রায়ই আসিতেন এবং তাঁহাকে অতিশয় শ্রদ্ধা ভক্তি করিতেন। যমুনা-লালের মত লোক যাঁহাকে গান্ধীজী পর্যন্ত বশীভূত করিতে পারেন নাই, তাঁহাকে মা যে কি করিয়া এমন শিশুর মত করিয়া পরমাশ্রয় দিয়াছিলেন তাহা বাস্তবিকই চিন্তা করিবার বিষয়!

শ্রীশ্রীমাকে প্রথম প্রথম দেখিয়া মানুষের মনে তাঁহার জন্য যে কি রকম ব্যাকুলতা হয় তাহা যাহারা তাঁহাকে দেখেন নাই, তাহাদের বুঝান অসম্ভব। কেবল মায়ের অন্তরঙ্গ ব্যক্তিরাই তাহা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করিতে পারিবেন। অপর কেহ ইহা ধারণাও করিতে পারিবেন না। অনেক দিন পর মাকে পাইয়া দিনগুলি আমার একটানা বেশ আনন্দেই কাটিতেছিল। শারীরিক অসুবিধার কথা কখনও আমার মনে জাগে নাই। মাতা অন্নপূর্ণার মধ্যাহ্নের ভোগের প্রসাদই ব্রহ্মচারীরা দুই বেলা গ্রহণ করিতেন। মা ও বাবা ভোলানাথের জন্য শ্রীআদরিণী দেবী সিদ্ধেশ্বরী হইতে রাত্রির জন্য দুধ ও খইয়ের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। রাত্রির আহারের কোন ব্যবস্থাই আশ্রমে ছিল না। তার জন্য আমার কোন অসুবিধা হয় নাই, কারণ আমার গর্ভধারিণীর কাশী প্রাপ্তির পর হইতে আমার

রাত্রির আহারের পাট এক রকম উঠিয়াই গিয়াছিল। একদিন মা বলিয়াছিলেন, "তুমি এখানে আসিবার পর হইতে গরুটাও দুধ দেওয়া বন্ধ করিয়াছে।" ইহার কোন উত্তর আমি মাকে প্রদান করি নাই। ইহার কি-ই বা উত্তর দেওয়ার ছিল? মায়ের কাছে তো খাবার জন্য কি আরামের জন্য আসি নাই। অত দূরদেশ হইতে ঢাকা গিয়াছিলাম মায়ের কাছে থাকিবার জন্য, মাকে দেখিবার জন্য। তাহা তো ঠিক ভাবেই পাইতেছি। অতএব আমার কোনই অভিযোগ বা দুঃখ ছিল না। আমি মায়ের কথা শুনিয়া মনে মনে ভাবিয়াছিলাম আমি এমনই অভাগা যে আমাকে দেখিয়া সাগর পর্যন্ত শুকাইয়া যায়, গরুর বাঁটের দুগ্ধ শুষ্ক হইবে তাহা আর বেশী কথা কি? সকাল, দুপুর, সন্ধ্যা ও রাত্রি প্রায় সকল সময়ই মায়ের কুটিরের বারান্দায় পড়িয়া থাকিতাম তীর্থের কাকের মত। তাহার ফলে উঠিতে, বসিতে, খাইতে, শুইতে, বার্তালাপে এবং সকল কাজের মাঝে আমি মা'কে দেখিতে পাইতাম। মায়ের সঙ্গে কথা বলিবার প্রগল্ভতা কখনও বিশেষ করিতাম না, কারণ তাঁহার সঙ্গে সাধন, ভজন কি তত্ত্বালোচনা করিবার মত বিদ্যা-বুদ্ধি দিয়া ভগবান্ এই ক্ষুদ্র জীবটাকে এই জগতে পাঠান নাই। সেইজন্য মাকে দর্শন এবং তাঁহার শ্রীমুখের বাণী শ্রবণ ব্যতীত তাঁহার নিকট হইতে আর বড় কিছু আমি আশা করিতাম না। ইহা ছাড়া আমার ন্যায় একজন অতি তুচ্ছ সাধারণ মানুষ শ্রীশ্রীমায়ের চরণে কি আর অধিক প্রার্থনা করিতে পারে? যতদিন মায়ের নিকট ঢাকায় ছিলাম ততদিন মাতৃদর্শন ভিন্ন অন্য কোন কাজ না থাকিবার দরুণ বিশেষতঃ মাকে দেখিবার সুযোগ হারাই এই আশঙ্কায় আশ্রমের বাহিরে বড় যাইতাম না।

একদিন বেলা অনুমান সকাল দশ ঘটিকার সময় মা তাঁহার শয়ন কুটির হইতে বাহির হইয়া মাঠের মধ্য দিয়া হাঁটিতে হাঁটিতে চলিয়াছেন। শরৎকালের প্রখর রৌদ্রে তাঁহার কষ্ট হইতেছে মনে করিয়া মায়ের পরম ভক্ত শ্রীজ্যোতিষবাবু পিছন দিক হইতে তাঁহার ছাতা ধরিয়া সাথে সাথে চলিতেছেন। আমরাও কয়েকজন মায়ের অনুসরণ করিতেছি। মা চলিতে চলিতে স্বর্গীয় ঈশ্বর

ঘোষের বাগানে গিয়া উপনীত হইলেন। এই বাগানেই তখন টিনের একখানি ঘরে শ্রীশ্রীমায়ের পিতা-মাতা অর্থাৎ আমাদের দাদামহাশয় শ্রীযুক্ত বিপিন বিহারী ভট্টাচার্য ও দিদিমা শ্রীযুক্তা মোক্ষদা সুন্দরী দেবী বাস করিতেন। মা তাঁহাদের ঘরে একবার প্রবেশ করিয়াই তাড়াতাড়ি বাহিরে চলিয়া আসিলেন। বাগানের মাঝখানে একটা বড় পুকুর ছিল এবং উহার চারিধারে ছিল আম কাঁঠাল, নারিকেলাদি নানা রকমের ফলের গাছ। মাঝে মাঝে সাধারণ ফুলের গাছও যে ছিল না তাহা নহে।

মা ঐ পুষ্করিণীর পাড়ে পাড়ে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন এবং আমরাও তাঁহার পশ্চাতে পশ্চাতে চলিয়াছি। সরোবরের দক্ষিণ তীরে গিয়া মা হঠাৎ থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িলেন। আমরাও সকলে অতি দ্রুত গিয়া তাঁহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইলাম। জ্যোতিষ-বাবু মায়ের মাথায় ছাতা ধরিয়া আছেন। একবার আমারও ইচ্ছা হইয়াছিল তাঁহার হাত হইতে ছাতাটা লইয়া মায়ের মাথায় ধরিবার, কিন্তু সাহস করিয়া তাঁহার হাত হইতে ছাতাটা চাহিতে পারিলাম না। আমি ছাতা ধরিতে চাহিলে, ভরসা করি, তিনি কখনই কোন প্রকার আপত্তি করিতেন না। আমাকে অবশ্যই তিনি মায়ের মাথায় ছাতা ধরিতে দিতেন।

সেই সময় দেখা গেল একটি লোক অঞ্জলিতে জল লইয়া পুকুরে জলের মধ্যে দাঁড়াইয়া আছেন। অকস্মাৎ মা আমার দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঐ লোকটি জলে দাঁড়াইয়া হাতে জল লইয়া কি করিতেছে?"

আমি—মা, আজকাল পিতৃ-পক্ষ চলিতেছে। আমার মনে হয়, লোকটি জলে দাঁড়াইয়া হাতে জল লইয়া তর্পণ করিতেছে।

মা—তর্পণ কি? তর্পণ কে করে?

আমি—মৃত পূর্বপুরুষদের প্রীতি বা তৃপ্তির জন্য জীবিত বংশধর কর্তৃক জলদানকে শাস্ত্রীয় ভাষায় তর্পণ কহে। দেহের বিনাশ হইলেও আত্মার তো বিনাশ নাই। সুতরাং আমাদের পিতৃপুরুষ-গণের দেহে মৃত্যুর পূর্বে যে যে আত্মা বিদ্যমান ছিল, সেই সেই আত্মা এক্ষণে যে লোকে, যে শরীরেই অবস্থান করুক—শাস্ত্রোক্ত

বিধানে তর্পণ ও শ্রাদ্ধ দ্বারা সেই সেই শরীরেই তৃপ্তি লাভ করিয়া থাকে। যেহেতু তর্পণের জলের ও শ্রাদ্ধীয় দ্রব্যের পরমাণুপুঞ্জ মন্ত্রশক্তি ও বিশ্বাসের বলে তাঁহাদের (জন্মান্তর গৃহীত) বর্তমান দেহের ভক্ষ্য বস্তুর সহিত মিশ্রিত হইয়া তৃপ্তি বিধান করে। যাহার পিতা মৃত সেই কেবল এই কাজের অধিকারী। যাহার পিতা জীবিত আছে তাহাকে ইহা করিতে নাই। তর্পণ অনেক প্রকার—যথা দেবতর্পণ, মনুষ্যতর্পণ. ঋষিতর্পণ, দিব্যপিতৃতর্পণ, যমতর্পণ, ভীষ্মতর্পণ ও পিতৃতর্পণ। ইহা ছাড়া সংক্ষেপে রামতর্পণ ও লক্ষণতর্পণ আছে। কোন্ তর্পণ কোন্ মুখী হইয়া করিতে হয় এবং কোন্ তর্পণে যব ও কোন্ তর্পণে তিল ব্যবহার করিতে হয় তাহার নির্দেশ শাস্ত্রে উল্লেখ আছে। তর্পণ সম্বন্ধে আমার যাহা জানা ছিল তাহা মাকে সংক্ষেপে নিবেদন করিযাছিলাম। মনে হয় মাও সব কথা শুনিয়াছিলেন।

মা—তুমি তর্পণ কর না ?

আমি—হ্যাঁ মা, আমি সন্ধ্যার ন্যায় প্রত্যহ তর্পণ করিয়া থাকি। সেইজন্য পিতৃপক্ষীয় তর্পণ আর পৃথক্ করিয়া করি না।

মা—তর্পণ করিবার কোন নির্ধারিত সময় আছে কি ? না যে কোন সময়ই ইহা করা যায় ?

আমি—যাহারা প্রত্যহ তর্পণ করেন তাহারা মধ্যাহ্ন সন্ধ্যার সময় তর্পণ করেন। আবার কেহ কেহ স্নানের পর স্নানাঙ্গ তর্পণও করিয়া থাকেন। যাহারা পিতৃপক্ষীয় শ্রাদ্ধের অনুকল্পে তর্পণ করেন তাহারা মধ্যাহ্নকালে তর্পণ করিয়া থাকেন।

মা—এখন বেলা কয়টা ?

আমি—আমার কাছে ঘড়ি নাই। অনুমান করি এখন বেলা এগারটা হইবে।

মা—কাল হইতে সকালে যখন আশ্রমে অন্নপূর্ণামায়ের মঙ্গল আরতি হইবে তখন হইতে বেলা এই এগারটা পর্যন্ত তুমি অন্নপূর্ণা-মায়ের মন্দিরের নীচের কোন একটা গুহায় বসিয়া জপ করিও।

তর্পণ সম্বন্ধে এত কথা হইবার পর মা হঠাৎ এইভাবে কেন যে আমাকে প্রায় ছয় ঘণ্টাকাল জপে বসাইতেছেন তাহার মর্ম

কিছুই বুঝিতে পরিলাম না। কোন প্রকার কারণ মাকে জিজ্ঞাসা করিতেও আমার সাহস হইল না। শ্রীশ্রীমায়ের নিকট হইতে ইহাই আমার প্রথম আদেশ প্রাপ্তি। মায়ের নির্দেশানুসারে পরদিন সকাল পাঁচটা হইতে শ্রীশ্রীমাতা অন্নপূর্ণার মন্দিরের ঈশান (পূর্ব-উত্তর) কোণের গুহায় বসিয়া প্রায় বেলা এগারটা পর্যন্ত জপ করিতে আরম্ভ করিলাম। মা সোজাসুজি আমাকে জপে বসিতে আদেশ দিলেই পারিতেন। আমিও আনন্দের সহিত মায়ের নির্দেশ পালন করিতে চেষ্টা করিতাম, কিন্তু তর্পণের ভূমিকা পত্তন করিয়া কেন যে আমাকে জপ করিতে বসাইলেন ইহার তাৎপর্য আমার বোধগম্য হইল না। তথাপি বিনা বিচারে মায়ের আদেশ আনন্দে পালন করিতে লাগিলাম। গুহায় এত মশা যে সুস্থির হইয়া জপ করা আমার পক্ষে কঠিন হইয়া উঠিল। তাহা সত্ত্বেও মায়ের নির্দেশমত কোন রকমে জপ করিয়া যাইতেছি। উপর্যুপরি কয়েকদিন মশকদংশনের ফলে আমার সমস্ত শরীরে, হাতে ও মুখে বসন্তের মত লাল ছোট ছোট দানা উঠিয়া গেল। কেহ কেহ ইহা দেখিয়া বলিতে লাগিলেন 'মায়ের দয়া' হইয়াছে অর্থাৎ বসন্ত উঠিয়াছে। বাস্তবিকপক্ষে ঐ সব কিছু নয়। ইহা হইল মশার কামড়েরই অনিবার্য পরিণাম। বসন্ত হইলে জ্বর হইত, শরীরে বেদনা হইত আরও কত কি উপসর্গ থাকিত। একদিন অকস্মাৎ জননীর শুভদৃষ্টি আমার উপর পড়িল। তিনি আমাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার হাতে, মুখে ও গায়ে এই সব কি উঠিয়াছে?" আমি উত্তর দিলাম, "মা! ঐ গুহায় ভয়ানক মশা। ঐখানে বসিয়া জপ করিবার দরুণ মশায় ভীষণভাবে কামড়াইয়াছে। মশা কামড়ানর জন্যই শরীরে এই সব উঠিয়াছে। অপর কিছু নহে।" দয়া করিয়া মা বলিলেন, "কাল হইতে ঐ গুহায় না বসিয়া অন্নপূর্ণার মন্দিরে উঠিবার যে সিঁড়ি, তাহার নীচে যে বড় গুহা আছে সেইখানে বসিয়া তুমি জপ করিও।"

পরের দিন স্থান পরিবর্তন করিয়া মায়ের নির্দেশমত অন্নপূর্ণা-মাতার মন্দিরে উঠিবার সিঁড়ির নীচে যে অপেক্ষাকৃত বড় গুহা আছে তাহাতে বসিয়া জপ আরম্ভ করিলাম। এই গুহার দরজায়

কপাট ছিল না—বাঁসের চটা বা বাখারী দিয়া নির্মিত ঝাঁপের কপাট। জপে বসিবার পূর্বে ঐ ঝাঁপের কপাটদ্বারা গুহার মুখ বন্ধ করিয়া জপে বসিয়াছি। এই গুহাটা বোধ হয় ইহার পূর্বে কেহ কখনও ব্যবহার করে নাই, সেইজন্য বহু ভেক গিয়া উহাতে আশ্রয় লইয়াছিল। ইহা আমার জানা ছিল না। কিছু সময় যাইতে না যাইতেই যেমন মশা কামড়াইতে লাগিল তেমনি ব্যাঙগুলো লাফাইয়া লাফাইয়া আমার গায়ের উপর উঠিতেছিল। সে কি একটা দুইটা ব্যাঙ, একেবারে গণ্ডায় গণ্ডায়। ইহা ছাড়া গুহার দরজা বন্ধ থাকার দরুণ ভিতরে গরমও ছিল অত্যধিক। প্রথম গুহায় তো কেবল মশারই দৌরাত্ম্য ছিল। এই গুহায় একেবারে ত্র্যহস্পর্শযোগ, যেমন মশক-দংশন তেমন ভেকের আক্রমণ, তদুপরি অসহ্য গরম। মা আমার জন্য সুব্যবস্থা করিলে কি হইবে? আমার ভাগ্য তো আর তেমন নয় যে সেই সুবিধা ভোগ করিব। জপ ছাড়িয়া উঠিয়া যে দরজাটা খুলিয়া দিব তাহাও পারিতেছিনা, কারণ তাহা হইলে মায়েব আদেশ রক্ষা করা হয় না। মা আমাকে বলিয়াছেন, অন্নপূর্ণার মঙ্গল আরতির সময় হইতে বেলা এগারটা পর্যন্ত বসিয়া জপ করিতে। ইহার মধ্যে আমি যদি আসন ত্যাগ করিয়া উঠি তাহা হইলে মায়ের আদেশ লঙ্ঘন করা হয়। এই আশঙ্কায় জপ ছাড়িয়া গুহার দরজার ঝাঁপ সরাইতে পারিতেছিলাম না। জপ পরিত্যাগ করিয়া উঠিতেও পারিতেছি না, এদিকে আবার গরমেও প্রাণ যায়। এই উভয় সঙ্কটে আমি যে কি প্রকার কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছিলাম তাহা পাঠক অনায়াসেই বুঝিতে পারিতেছেন।

ঐদিকে শ্রীশ্রীমা যে তাঁহার কুটিরের দক্ষিণ দিকের বারান্দায় বসিয়া তাঁহার ভক্তবৃন্দের সঙ্গে তত্ত্বালোচনা করিতেছিলেন সে সবই আমার কানে আসিতেছিল। আর এদিকে গুহার মধ্যে যে মশকের উৎপাত, মণ্ডূকের উৎপীড়ন ও অত্যধিক গরম আমার প্রাণ ওষ্ঠাগত করিয়া তুলিয়াছে, তাহার সংবাদ রাখে কে? মায়ের উপর আমার খুবই রাগ হইতেছিল এবং অভিমানও গিয়া উঠিয়াছিল চরম সীমায়। আমার মন যখন মায়ের প্রতি এইরূপভাবে বিদ্রোহী হইয়া

উঠিয়াছিল, তখন কে যেন আসিয়া আমার গুহার ঝাঁপের দরজাটা টানিয়া খুলিয়া দিয়া গেল। ফলে গুহার অভ্যন্তরে শীতল বাতাস প্রবেশ করায় আমি নিঃশ্বাস ছাড়িয়া বাঁচিলাম। মা নিশ্চয়ই কাহাকেও এই গুহার দ্বার খুলিবার জন্য বলিয়া থাকিবেন, কারণ তিনি ব্যতীত অপর কেহই জানিত না যে আমি ঐদিন সেখানে বসিয়া জপ করিতেছি। গুহার মধ্যে যে আমার ভয়ানক কষ্ট হইতেছিল তাহাই বা অন্যলোকে জানিবে কি করিয়া? কিছুক্ষণ পরে পুনরায় একজন কেহ আসিয়া আমাকে বলিয়া গেলেন, "মা! আপনাকে উঠিতে বলিলেন, এগারটা বাজিয়া গিয়াছে।" মা সকল রকম কাজকর্ম, কথাবার্তা ও গভীর তত্ত্বালোচনার মধ্যেও যে আমাদের কথা খেয়াল রাখেন, আমাদের দুঃখ-কষ্টের বিষয় জানেন এবং তাহার প্রতিবিধান করিয়া থাকেন তাহার একটি নিদর্শন এইভাবে মা আজ চোখে আঙ্গুল দিয়া আমাকে দেখাইলেন। মায়ের প্রতি যে আমার ক্ষোভ ও অভিমান হইয়াছিল তাহা মুহূর্তের মধ্যে দূর হইয়া গেল। মায়ের উপর রাগ হইয়াছিল বলিয়া অনুতাপের তীব্র জ্বালায় আমি দগ্ধ হইতে লাগিলাম এবং দুঃখে ভাঙ্গিয়া পড়িলাম। শ্রীশ্রীমায়ের করুণার পরশ আজ এইভাবে প্রাপ্ত হইয়া কৃতজ্ঞতায় আমার প্রাণ-মন ভরিয়া উঠিল।

চট্টগ্রামের একটি প্রসিদ্ধ মহকুমা কক্সবাজার। সেখানকার উকিল শ্রীযুক্ত দীনবন্ধু চক্রবর্তী মহাশয় আমাদের মাকে স্বীয় কন্যার ন্যায় ভালবাসেন এবং স্নেহ করেন। তিনি শ্রীশ্রীদুর্গাপূজার পর শ্রীশ্রীমাকে সেখানে যাইবার জন্য বিশেষ আগ্রহ করিয়া চিঠি দিয়াছেন। মাও বাবা ভোলানাথকে সঙ্গে লইয়া কক্সবাজার যাইত সম্মত হইয়াছেন। কক্সবাজার গমনের দিন জ্যোতিষবাবু আমাকে জানাইলেন আমিও মায়ের সঙ্গে যাইবার অনুমতি পাইয়াছি। আমি কখনও আশাকরি নাই যে আমারও মায়ের সঙ্গে যাইবার সৌভাগ্য হইতে পারে। এই সংবাদে মনে মনে জ্যোতিষবাবুকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইলাম। মায়ের সঙ্গে যাইতে পাইব অবগত হইয়া মনে যে কি প্রকার আনন্দ হইল তাহা বলিবার নহে। আমাকে সঙ্গে লইবার জন্য আমি

মাকে কোন প্রকার প্রার্থনা জানাই নাই এবং সেখানে আমার অন্তরঙ্গ এমন কেহ ছিল না যিনি আমার জন্য মাকে অনুরোধ করিবেন। তথাপিও যে তিনি আমাকে সঙ্গে লইতে স্বীকার হইয়াছেন, ইহা তাঁহার অহৈতুকী কৃপাই বলিতে হইবে। এই অযাচিত করুণার জন্য তাঁহার শ্রীচরণে ভূয়োভূয়ঃ কৃতজ্ঞতা জানাইতে আমি ভুলি নাই। মায়ের এই অনুগ্রহের কথা মনে করিয়া এখনও আনন্দ পাই।

রাত্রি দশটার সময় মা আশ্রম হইতে যাত্রা করিবেন সেইজন্য অনেকেই তাঁহার দর্শন অভিলাষে আশ্রমে আসিয়াছেন। মা তাঁহার কুটিরের বারান্দায় বসিয়া সমাগত ভক্তবৃন্দের সঙ্গে কথাবার্তা বলিতেছেন। আমিও মার সঙ্গে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া তাঁহার কাছে বসিয়া আছি। ভাগ্যে না থাকিলে সব যোগাযোগ হইলেও তাহা কার্যে পরিণত হয় না। একটা প্রবাদ আছে "ভাগ্যং ফলতি সর্বত্র ন বিদ্যা ন চ পৌরুষম্"। ইহা খুবই সত্য কথা!

শ্রীশ্রীমায়ের সম্মুখে বসিয়া থাকিতে আমার শীত ও কম্প দিয়া জ্বর আসিল এবং ভীষণভাবে মাথা ব্যথা করিতে লাগিল। আমার বুঝিতে আর বাকী রহিল না যে এই কয়েকদিনের মশক-দংশনেরই পরিণাম এই ভীষণ জ্বর। মায়ের নিকট বসিয়া থাকিতে খুবই কষ্ট হইতেছিল তথাপি যতক্ষণ পারিলাম তাঁহার সম্মুখে বসিয়া রহিলাম। যখন শারীরিক যন্ত্রণা অসহ্য হইয়া উঠিল তখন মায়ের চরণে মাথা রাখিয়া প্রণাম করিয়া উঠিতেই মা বলিলেন, "তোমার কপাল এমন গরম কেন?" আমি উত্তর দিলাম, "মা! খুব শীত করিয়া জ্বর আসিয়াছে। মাথা ব্যথাও অত্যধিক। আমি আর বসিতে পারিতেছি না। যাই শুই গিয়া।" সংক্ষেপে এই কয়েকটি কথা কোন রকমে বলিয়া দাঁড়াইতেই, জ্যোতিষবাবু বলিলেন, "যান এখন শুইয়া পড়ুন গিয়া। মায়ের যাওয়ার সময় আপনাকে ডাকিয়া নেওয়া যাইবে।" জ্যোতিষবাবুর মুখে এই কথা শুনিয়া মা আবার বলিলেন, "এত জ্বর লইয়া কি ও যাইতে পারিবে?" জ্যোতিষবাবু উত্তর দিলেন, "বেশ, আজ গিয়া আর কাজ নাই। জ্বর ছাড়িলে ওকে পরে কক্সবাজার পাঠাইয়া দেওয়া যাইবে।"

মা বলিলেন, "এত শীঘ্র কি ওর জ্বর ছাড়িবে ?" মায়ের মুখ হইতে এই কথা শুনিয়া তখনই আমি বুঝিলাম, এই জ্বর কিছুদিন আমাকে ভোগাইবে। মায়ের কাছ হইতে উঠিয়া বিছানা খুলিয়া আমি শুইয়া পড়িলাম। আমি জ্বরে এমনই অচৈতন্য ছিলাম যে, মা কখন যে চলিয়া গিয়াছিলেন তাহা আমি জানিতেও পারি নাই। মা যাইবার সময় আমাকে দেখিয়া গিয়াছিলেন কিনা তাহাও আমি জানি না।

মা কক্সবাজার চলিয়া যাইবার পর দিনই আমার জ্বর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল এবং সাথে সাথে পেটটাও খারাপ হইয়া উঠিল। দেবতাও সময় বুঝিয়া একেবারে মুষলধারে বৃষ্টি আরম্ভ করিয়া দিলেন। কয়েকদিন পর বেলা প্রায় দ্বিপ্রহরের সময় হঠাৎ জ্যোতিষবাবু আশ্রমে আসিয়া দেখিলেন যেখানে আমি শুইয়া ছিলাম সেখানটায় ঘরের চাল দিয়া বৃষ্টির জল পড়িয়া আমার বিছানা ভিজিয়া গিয়াছে। ঔষধ পথ্যেরও কোন ব্যবস্থা নাই, সেইজন্য তিনি আমাকে তাঁহার নিজের বাড়ী লইয়া গেলেন এবং ঔষধ পথ্য ও শুশ্রূষার সব ব্যবস্থা করিলেন। তিনি তাঁহার অবসর মত আমার মাথা টিপিয়া দিতেন এবং নানাপ্রকার সুন্দর সুন্দর মায়ের লীলাকথা শুনাইতেন। এই সময় শ্রীযুক্ত শশাঙ্কমোহন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের ছোট জামাতা ডাক্তার হরেন্দ্রচন্দ্র গাঙ্গুলী মহাশয়ের সহিত আমার প্রথম পরিচয় হয়। তিনি ঢাকা মেডিক্যাল স্কুলের প্যাথোলজিষ্ট ছিলেন। তিনি প্রত্যহ আমাকে দেখিতে আসিতেন এবং তাঁহারই চিকিৎসায় বারদিন পর আমার জ্বর ছাড়িয়াছিল। আমার এই অসুখের সময় জ্যোতিষবাবু ও হরেন্দ্রবাবু যে প্রকার সেবা, শুশ্রূষা ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন তাহা আমি জীবনে কখনও ভুলিতে পারিব না। তাঁহাদের নিকট এইজন্য আমি চিরকৃতজ্ঞ আছি। তাঁহারা আমার দেখা শোনা, সেবা শুশ্রূষা ও ঔষধ পথ্যের ব্যবস্থা না করিলে এই অপরিচিত স্থানে আমাকে কতই না দুর্ভোগ ভুগিতে হইত। অন্ন পথ্য করিয়াই আমি ঘরের ছেলে ঘরে কাশী ফিরিয়া আসিলাম। ঢাকা হইতে কাশী আসিবার পথে দুই তিন দিনের জন্য ফরিদপুর জিলার অন্তর্গত জন্মস্থান

নড়িয়া গ্রাম হইয়া আসিয়াছিলাম। মায়ের নিকট কক্সবাজার আর যাওয়া হয় নাই। অদৃষ্টে না থাকিলে মাতৃ-সঙ্গের সুযোগ হইলেও তাহা সংঘটিত হয় না। কোন এক মরমিয়া বাউল দরদের সহিত গাহিয়াছিলেন—"শ্রীগুরু দয়াল হ'লে হবে কি আমি যে ভাগ্যহীন ভাগ্যহীন।"

কাশী প্রত্যাবর্তনের পরও প্রায় তিনটি বৎসর আমি এই জ্বরে ভুগিয়াছিলাম। নানাপ্রকার চিকিৎসাদি করা সত্ত্বেও কিছুতেই এই জ্বর একেবারে সারিল না। দুই চারি দিন একটু ভাল থাকিতাম, পুনরায় জ্বরে আক্রান্ত হইয়া পড়িতাম। জ্বরের সাথে সাথেই তো মায়ের মুখ হইতে বাহির হইয়াছিল, 'এই জ্বর কি ওর এত শীঘ্র ছাড়িবে'। ফলে হইলও কিন্তু তাহাই। এই ভীষণ ম্যালেরিয়া জ্বর মার কৃপায় কিরূপে উপশম হইয়াছিল তাহা যথাস্থানে বলিবার ইচ্ছা রহিল।

বিনা অনুমতিতে শ্রীশ্রীমায়ের কাছে যাইবার ফল

তিন বৎসর পর অনুমান করি ১৯৩৩ কিংবা ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে শ্রীশ্রীমায়ের শুভ জন্মোৎসবের অব্যবহিত পরেই হঠাৎ বাবা ভোলানাথ ও জ্যোতিষবাবুকে সাথে লইয়া মা ঢাকার আশ্রম ছাড়িয়া সুদূর পশ্চিমে চলিয়া আসেন। কাশীর শ্রীনির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের নিকট জ্যোতিষবাবুর লিখিত একখানা পোষ্টকার্ড আসিল। তাহাতে তিনি লিখিয়াছিলেন আমাদের মঙ্গলের জন্যই মা ঢাকা ত্যাগ করিয়া উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের কোন এক নির্জন স্থানে অজ্ঞাতভাবে বাস করিতেছেন। চিঠিতে কাহাকেও মায়ের নিকট যাইতে নিষেধ করা হইয়াছিল। মায়ের নিভৃত বাসস্থানের কোন ঠিকানা ঐ পত্রখানিতে উল্লেখ ছিল না। পোষ্টকার্ডের উপর যে পোষ্ট অফিসের সীলমোহর ছিল তাহাও আমাদের ভাগ্যদোষে অস্পষ্ট ছিল। অতি কষ্টে কোন রকমে 'ম্যাগ্নিফাইং গ্লাস' দ্বারা পড়িয়া দেখিলাম, লিখা রহিয়াছে রায়পুর গ্রাণ্ট, দেহরাদুন। সংক্ষেপে বুঝিলাম দেহরাদুনের রায়পুর গ্রাণ্ট পোষ্ট অফিসের নিকটবর্তী কোন এক জনবিরলস্থানে মা একান্তে অজ্ঞাত-বাস করিতেছেন।

পুনরায় তিন বৎসর পর শ্রীশ্রীদুর্গাপূজার ছুটিতে মায়ের নিষেধ সত্ত্বেও তাঁহার এই অবাধ্য ও দুর্দমনীয় সন্তানটা তাঁহার সন্ধানে বাহির হইবার মনস্থ করিল। আমার মনে করা উচিত ছিল মা যখন কাহাকেও তাঁহার নিকট যাইতে বারণ করিয়াছেন তখন এই প্রকার ঔদ্ধত্য প্রকাশ না করাই শ্রেয়ঃ। জন্ম হইতেই কতগুলো মানুষ এমন কঠিন সংস্কার লইয়া এ জগতে আসে যাহাদের সহসা কেহই বশে আনিতে পারে না। তাহারা নিজের হঠকারিতা অবলম্বন করিয়াই জীবনে চলিয়া থাকে। সেইজন্য জীবনে দুঃখও পাইয়া থাকে অনেক। এই শ্রেণীর লোকদের

মধ্যে আমারও গণনা হইতে পারে সর্বপ্রথম। লোটা, কম্বল ও একখানা গামছা সঙ্গে লইয়া 'জয় মা' বলিয়া মায়ের উদ্দেশ্যে কোন এক অজানা দেশে আমি বাড়ী হইতে বাহির হইয়া পড়িলাম। শ্রীশ্রীদুর্গাষষ্ঠীর দিন বেলা দশটার সময় যাত্রা করিবার পূর্বে যখন আমি আমার বৃদ্ধা পিসীমাকে প্রণাম করিলাম, তখন তিনি সজল নেত্রে আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই দুর্গাপূজার মধ্যে লোকে বিদেশ হইতে বাড়ী আসে আব তুই বাড়ী ছাড়িয়া এ সময় কোথায় চল্লি?" তাঁহাকে উত্তর দিলাম, "কোনও চিন্তা করিও না পিসীমা। আমি কয়েকদিনের জন্য পশ্চিম হইতে একটু ঘুরিয়া আসি।" পরদিন বেলা আটটায় গিয়া হিমালয়ের পাদদেশে অপরিচিত দেহরাদুন ষ্টেশনে আসিয়া পৌঁছিলাম। পথে গাড়ীতে বসিয়া কত যে আকাশ-পাতাল, কত কি চিন্তা করিয়াছিলাম তাহার আর সীমা নাই। মা কোথায় আছেন? তাঁহার সঙ্গে আমার দেখা হইবে কি না? তাঁহার সহিত আমার সাক্ষাৎকার হইলেও তিনি কিভাবে আমাকে গ্রহণ করিবেন? তিনি কাহাকেও তাঁহার কাছে যাইতে মানা করিয়াছেন, তাহা সত্ত্বেও যে আমি তাঁহার নিকট যাইতেছি, তাহাতে তিনি অসন্তুষ্ট হইবেন না তো? আমার অবাধ্যতার জন্য তিনি যদি আমার উপর রাগ করিয়া কথা না বলেন তাহা হইলে তো আমার দুঃখ রাখিবার স্থান থাকিবে না। তখন আমি কি কবিব? গাড়ীতে বসিয়া সারা দিন রাত্রি শ্রীশ্রীমায়েব চিন্তা ব্যতীত অন্য কোন কথাই আমার মনে উদিত হয় নাই। গাড়ীতে বসিয়া কাহারও সঙ্গে কোন প্রকার কথাবার্তা না বলায় আমার সহযাত্রীরা সকলেই আমার মুখের দিকে মাঝে মাঝে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে দেখিতেছিল এবং হয় তো তাহারা আমাকে একজন অসামাজিক ব্যক্তি কিংবা পাগল বলিয়া মনে করিয়া থাকিবে। তাহাদের সঙ্গে আমি কি কথা বলিতাম? তাহারা কি আমাকে আমার মায়ের সংবাদ, কি সন্ধান কিছু দিতে পারিত? তবে তাহাদের সঙ্গে কথা বলিয়া আমার লাভ কি হইত?

এই অঞ্চলে আমার এই প্রথম আগমন। সুতরাং এখানকার

কাহারও সহিত আমার পরিচয় নাই। দুই চারিজনের নিকট খোঁজখবর লইয়া জানিলাম এখানে কেহই শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ীর নামও শুনে নাই, সন্ধান দেওয়া তো দূরের কথা। কাশীতে অবস্থান কালে নির্মলবাবুর মুখে শুনিয়াছিলাম দেহরাদুনে বাঙ্গালীদের কালীবাড়ী কি দুর্গাবাড়ী নামে কোন স্থান আছে। সেখানে গিয়াও মায়ের কোন সংবাদ পাইলাম না। অন্য কোন উপায় চিন্তা করিয়া না পাইয়া অগত্যা একটা টাঙ্গাওয়ালাকে বলিলাম—'আমাকে রায়পুর লইয়া চল'। সে যাইতে স্বীকার করিল কিন্তু ভাড়া চাহিল তিন টাকা। রায়পুর শহর হইতে কত দূরে জানা না থাকায় তাহাকে তিন টাকা দিতেই সম্মত হইলাম। কতদূর গিয়া দেখি মাইল-স্টোনে লেখা রহিয়াছে রাজপুর ছয় মাইল। গাড়োয়ানকে আমি বলিলাম, 'ভাই! তুমি তো আমাকে রাজপুর লইয়া যাইতেছ। আমি তো রায়পুর যাইব'। মনে হয় সে আমার কথা শুনিতে ভুল করিয়াছিল। সে আপন ভুল বুঝিতে পারিয়া একবার আমার মুখের দিকে বিস্ময়ে চাহিয়া সঠিক আমার গন্তব্য স্থান জানিবার জন্য জিজ্ঞাসা করিল, 'আপনি কোথায় যাইবেন? রাজপুর না রায়পুর?' আমি তাহাকে সুস্পষ্ট করিয়া বলিলাম—'রাজপুর নহে, আমি রা-য়-পু-র যাইব'। সে রাজপুরের দিকে অনেকটা অগ্রসর হইয়াছিল। নিজের ভুল বুঝিতে পারিয়া কোন প্রকার কথা না বাড়াইয়া সে গাড়ী ঘুরাইয়া অন্য পথে রায়পুর চলিল। রাজপুর হইল শহর হইতে উত্তরে মৌসুরির দিকে এবং রায়পুর হইল দেহরাদুন শহরের পূর্বদিকে একটি গ্রাম। টাঙ্গাওয়ালা আমাকে রায়পুর গ্রামে নামাইয়া তাহার প্রাপ্য ভাড়া তিন টাকা লইয়া চলিয়া গেল। অধিক ভাড়ার জন্য কোন প্রকার গোলমাল করিল না।

গাড়োয়ান যেখানে আমাকে গাড়ী হইতে নামাইয়া দিয়াছিল সেখানে দুইটি রাস্তা আসিয়া মিলিয়াছে। একটি পথ গিয়াছে পাহাড়ের দিকে অপরটি গ্রামের দিকে। আমি এখন কোন দিকে যাইব ভাবিয়া স্থির করিতে পারিতেছিলাম না। রাস্তায় আসিতে আসিতে এবং এখানে দাঁড়াইয়াও কয়েকজনকেই জিজ্ঞাসা করিলাম

তাহারা কেহ শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ীকে জানে কিনা এবং তিনি কোথায় থাকেন বলিতে পারে কিনা? তাহারা কেহই মায়ের কোন হদিস দিতে পারিল না। মায়ের কোন সন্ধান না পাইয়া আমার ধৈর্য প্রায় শেষ হইতে চলিয়াছে। অকস্মাৎ একটি উপায় আমার মাথায় আসিল। রায়পুর গ্রাণ্ট পোষ্ট অফিসে গিয়া খোঁজ করিলে হয় তো মায়ের কোন সন্ধান পাওয়া যাইতে পারে কারণ মায়ের নামে অথবা জ্যোতিষবাবুর নামে নিশ্চয়ই চিঠিপত্র আসে এবং পিয়ন চিঠি বিতরণ কবিতে তাঁহাদের নিকট যায়। যদি ইহাতেও কৃতকার্য হইতে না পারি তাহা হইলে বিফল মনোরথ হইয়া কাশী ফিরিয়া যাইব। বেলা তখন প্রায় এগারটা হইবে। গতকাল বেলা দশটায় কাশীতে ভোজন করিয়া রওয়ানা হইয়াছি। এই চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে মুখে এক ফোঁটা জলও পড়ে নাই। ক্ষুধায়, তৃষ্ণায় অধিকন্তু মাকে না পাওয়ার দুঃখে অত্যন্ত অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছি। বিপদে একমাত্র সহায় শ্রীমধুসূদন। পোষ্ট অফিসে যাইবার পূর্বে ঐ স্থানে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়াই মাতৃ-চরণে নিবেদন করিলাম, মা! তোমার আদেশ অমান্য করিয়া নিজের হঠকারিতায় তোমাকে দর্শন করিতে আসিয়া চূড়ান্ত শাস্তি পাইলাম। মা! তুমি তোমার এই অবোধ সন্তানটাকে এখন ক্ষমা কর। যে মুহূর্তে নিরুপায় হইয়া কাতর প্রাণে মাকে স্মরণ করিয়াছি এবং আপন অপরাধ বুঝিতে পারিয়াছি সাথে সাথে দেখিলাম অতি দূরে একজন সাধুর মত গেরুয়াবস্ত্রপরা লোক পাহাড় হইতে নীচে নামিয়া আসিতেছেন। মনে হইলে উনি তো একজন সাধু, হয় তো উনি মায়েব কোন সংবাদ দিতে পারিবেন। এই কথা ভাবিতে ভাবিতে দেখি লোকটি অনেকটা আমার নিকট আসিয়া পড়িয়াছেন। তাঁহাকে দেখিয়াই আমি চিনিতে পারিলাম। ইনি আমাদেরই শ্রীশ্রীমায়ের পুরাতন ভক্ত শ্রীকমলাকান্ত ব্রহ্মচারী। ঢাকা থাকাকালীন আমি এই ব্রহ্মচারীকে আশ্রমে দেখিয়াছিলাম এবং তাঁহার সহিত আমার পরিচয়ও হইয়াছিল।

কমলাকান্তজী—আপনি যে এখানে দাঁড়াইয়া? কোথা হইতে আপনি আসিতেছেন?

আমি—মায়ের দর্শনের জন্য কাশী হইতে আসিতেছি। মা কোথায় ? তাঁহার কি দর্শন পাওয়া যাইবে ?

ব্রহ্মচারীজী আমাকে রাস্তা দেখাইয়া বলিলেন, "এই পথ ধরিয়া পাহাড়ের উপর ঐ মন্দিরে উঠিয়া যান। সেখানে গিয়া দেখিতে পাইবেন মা ঐ শিবের মন্দিরের কাছে সিঁড়ির উপর বসিয়া আছেন। বাবা ভোলানাথের জ্বর হইয়াছে। তাঁহার জন্য ঔষধ আনিতে আমি শহরে যাইতেছি।" এই কথা বলিয়াই তিনি ঔষধ আনিবার জন্য অতি দ্রুতবেগে দেহরাদুনের দিকে চলিয়া-গেলেন। তাঁহার নির্দেশমত গিয়া সত্যই দেখিতে পাইলাম, মা শিবের মন্দিরের নিকট একা আপনভাবে দূর নীল আকাশের দিকে চাহিয়া, পা দুইখানি ঝুলাইয়া সিঁড়ির উপর বসিয়া আছেন। মায়ের বর্তমান চেহারা দেখিয়া আমি অতিশয় স্তম্ভিত ও বিষণ্ণ হইয়া পড়িলাম। মায়ের মাথায় সেই ঘোর কৃষ্ণবর্ণ কেশগুচ্ছ নাই, পরিধানে লাল কস্তাপেড়ে শাড়ী নাই, হস্তে স্বর্ণ নির্মিত চুড়ি নাই এবং ললাটে সিন্দুরের লাল বড় টিপও নাই। মায়ের মস্তকের কেশ পুরুষের চুলের মত ছোট করিয়া ছাঁটা, পরনে নরুনপেড়ে ধুতি, দেহ অত্যন্ত শীর্ণ যেন একটি দশবার বৎসরের ছোট বালক আপন খেয়ালে উদাসীর মতন বসিয়া আছে। যেন এই জগতের সঙ্গে তাহার কোন সম্বন্ধই নাই, এমনই অনাসক্ত ও নির্বিকার ছিল মায়ের ভাবটি সেই সময়। শ্রীশ্রীমাকে এই মূর্তিতে ও বেশে অবলোকন করিয়া আমার কেবলই মনে হইতেছিল—এই কি আমাদের সেই রাজরাজেশ্বরী চির হাস্যময়ী মা আনন্দময়ী ? ঢাকায় মাকে যে অনুপম সৌন্দর্যে পাইয়াছিলাম তাহার কোন চিহ্নই এখন মায়ের মধ্যে দেখিতেছি না। মায়ের নাই সেই রূপ, নাই সেই পরিধানে লাল চওড়াপেড়ে শাড়ি, নাই গলায় সেই সোনার মুণ্ডমালা, নাই দুই হাতভরা সেই স্বর্ণের চুড়ি ও শাঁখা, নাই কপালে সেই সিন্দুরের লাল বড় ফোটা আর না আছে মায়ের সেই মুখভরা চিত্তাকর্ষক মধুর হাসি। মাকে এইরূপে ও বেশে দেখিয়া আমি এতই দুঃখে বিহ্বল হইয়া পড়িলাম যে তাঁহাকে প্রণাম করিতে পর্যন্ত ভুল হইয়া গেল। আমিই প্রথম নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া

বলিলাম, "মা! আমি তোমার আদেশ লঙ্ঘন করিয়া, তোমার কাছে আসা নিষেধ সত্ত্বেও, অবাধ্য সন্তানের মত আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। আমার অপরাধ ক্ষমা কর।"

মা - তোমার আসা দরকার ছিল তাই তুমি আসিয়াছ। তোমার শরীর এত রোগা কেন? কি হইয়াছে?

আমি—মা! সেই যে প্রায় তিন বৎসর পূর্বে ঢাকায় মশক-দংশনে জ্বর হইয়াছিল, সেই জ্বরে এখনও ভুগিতেছি। পেটের প্লীহাটাও খুব বড় হইয়া গিয়াছে। তুমি তো মা, সেই সময়ই জ্যোতিষবাবুকে বলিয়াছিলে, "এত শীঘ্র কি ওর এই জ্বর ছাড়িবে।"

মা—কোন চিকিৎসা করাইতেছ না?

আমি - মা! অনেক চিকিৎসা করাইয়াছি কিন্তু কিছুতেই জ্বর সম্পূর্ণরূপে যাইতেছে না। দুই চারিদিন একটু ভাল থাকি আবার জ্বর হয়। এই ভাবেই গত তিন বৎসর যাবৎ চলিতেছে। কত যে কুইনাইন খাইয়াছি ও ইনজেক্‌শন লইয়াছি তার হিসাব নাই।

মা—একটা কাজ করিতে পারিবে?

আমি—কি কাজ মা? বল।

মা—ভাত না খাইয়া পার না?

আমি—ভাত খাইব না তো খাইব কি?

মা—কেন, রুটি খাইয়া থাকিবে।

সেই যে মায়ের কথামত রুটি খাইতে আরম্ভ করিয়াছিলাম তাহা প্রায় একাদিক্রমে ছয়মাসকাল চলিয়াছিল। এই ছয়মাসের মধ্যে অন্ন স্পর্শও করি নাই। সেই যে জ্বর বিরাম হইল তারপর অনেকদিন পর্যন্ত জ্বর আর হয় নাই। শ্রীশ্রীমায়ের আদেশানুসারে সেই যে ঢাকায় গুহায় জপে বসিয়া ছিলাম এবং জপের সময় মশক দংশনের ফলে জ্বর হইয়াছিল, সেই জ্বর দেহরাত্নের রায়পুর গ্রামে কথার পৃষ্ঠে ভাত খাইতে নিষেধ করায় (সেই দীর্ঘকালের জ্বর) নিরাময় হইয়া গেল। মা তো একটু পূর্বেই বলিলেন, "তোমার এখানে আসা দরকার ছিল তাই তুমি আসিয়াছ।" এই প্রয়োজনের জন্যই কি আমার এইভাবে এখানে আসিবার আবশ্যকতা ছিল? মা কেন যে কি করেন তাহা আমাদের বুদ্ধির অগম্য। জ্বর সারিয়া

যাওয়ার পরও বহুদিন আমি রুটিই খাইতাম। বর্তমান সময়ও আমি রুটিই অধিকাংশ দিন খাইয়া থাকি। রুটি-ভক্ষণই এখন আমার অভ্যাসে পরিণত হইয়া গিয়াছে। মায়ের কৃপাতেই এই সুদীর্ঘ তিন বৎসরের ভীষণ ম্যালেরিয়া জ্বর আরোগ্য হইল। শ্রীশ্রীমায়ের নির্দেশের মধ্যে কি যে অমোঘ শক্তি গুহ্যরূপে নিহিত থাকে তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। মায়ের আদেশমত যদি আমরা আমাদের জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারি তাহা হইলে জীবনে বহু দুঃখ ও অশান্তি হইতে অব্যাহতি পাইতে পারি।

আমার জ্বরের প্রসঙ্গ সমাপ্ত করিয়া স্নেহময়ী মা বলিলেন, "এই পাহাড়ের নীচে একটু দূরে, উত্তরদিকে ঝরণা আছে। সেই ঝরণায় গিয়া স্নান করিয়া আস। পাহাড়ের নীচেই নহর দেখিবে, সেই নহরে কিন্তু স্নান করিও না।" মা এই কথা কতই না স্নেহ ও মমতার সহিত যে বলিলেন শুনিয়া আমার হৃদয় আনন্দে প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। মায়ের নির্দেশমত ঝরণা হইতে স্নানান্তে নিজের নিত্যকর্ম সন্ধ্যা ও তর্পণাদি সমাপন করিয়া উঠিতেই জ্যোতিষবাবু জল খাইতে এক টুকরা গুড় দিলেন। তাহা দিয়াই জলযোগ সমাপন করিলাম। রায়পুরে শ্রীশ্রীমায়ের অজ্ঞাত বাসের সময় তাঁহার সঙ্গে ছিলেন বাবা ভোলানাথ এবং ভাইজী শ্রীজ্যোতিষবাবু। এখানে আসিবার পর হইতেই সকলে জ্যেতিষবাবুকে "ভাইজী" বলিয়া ডাকিতে আরম্ভ করিয়াছে। বাবা ভোলানাথের অসুখের জন্য কমলাকান্ত ব্রহ্মচারীকে সংবাদ দিয়া ঢাকা হইতে রায়পুরে আনা হইয়াছিল। কমলাকান্তজী দেহরাদুন হইতে বাবা ভোলানাথের জন্য ঔষধ লইয়া ফিরিবার পর খিচুড়ি রন্ধন করিলেন, তাহাই ভাইজী, কমলাকান্তজী ও আমি ভোজন করিলাম। মায়ের জন্য গ্রাম হইতে এক ভদ্রমহিলা রুটি ও তরকারি লইয়া আসিলেন। মা তাহাই গ্রহণ করিলেন। বাবা ভোলানাথজীর জ্বর সেইজন্য তিনি সাবু পথ্য করিলেন। সেই সাবুও ব্রহ্মচারীই প্রস্তুত করিলেন। বাবা ভোলানাথের সেবা ও পরিচর্যার জন্যই ব্রহ্মচারী কমলাকান্তজী ঢাকা হইতে এখানে আসিয়াছেন।

সূর্যাস্তের সাথে সাথেই আমরা আপন আপন কম্বল পাতিয়া

জপ-ধ্যান করিতে লাগিলাম। মা আপন ছোট্ট শয্যাটিতে শয়ন করিলেন। কাহারও শয্যায় মাথায় দিবার বালিশ নাই। যে ঘরে আমরা শয়ন করিয়াছিলাম সেই ঘরের দরজায় কপাট ছিল না। একখানা কম্বল দরজায় লম্বা করিয়া ঝুলাইয়া দেওয়া হইয়াছিল বাতাস নিবারণের জন্য। সন্ধ্যার পরই অত্যন্ত শীত পড়ায় আমরা সকলেই কম্বল মুড়ি দিলাম। সমস্ত দিন কেহ কাহারও সঙ্গে কথাবার্তা বড় বলি নাই। যে যাহার আপন ভাবেই ছিলাম। মাকে যে আমি দেখিতে পাইতেছিলাম তাহাতেই আমি সন্তুষ্ট ছিলাম। আমি মায়ের কাছে যাইতেই যে প্রথম তিনি কথা বলিয়াছিলেন তারপর কাহারও সঙ্গে মা আর বিশেষ কোন কথা বলেন নাই। রাত্রিতে মা শুইয়া শুইয়াই অকস্মাৎ আমার নাম ধরিয়া ডাকিয়া প্রথমেই জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার কাশী ফিরিবার গাড়ী কখন?" মায়ের মুখে এই প্রশ্ন শুনিয়া আমি বিস্ময়ে একেবারে আকাশ হইতে পড়িলাম এবং কি যে প্রশ্নের উত্তর দিব বুঝিতে না পারিয়া নির্বাক রহিলাম। আজই আমি কাশী হইতে এত পরিশ্রম ও টাকা পয়সা ব্যয় করিয়া শ্রীশ্রীদুর্গা-পূজার মধ্যে মায়ের কাছে কয়েকদিন থাকিব এই আশায় আসিয়াছি। মা সেইসব কিছুই বিচার না করিয়া আমাকে কিনা জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার কাশী ফিরিবার গাড়ী কখন?" আমি আশা করিয়াছিলাম মা হয় তো আমাকে জিজ্ঞাসা করিবেন, কত দিন তোমার ছুটি? কতদিন তুমি এখানে থাকিতে পারিবে? কিন্তু সেই সব প্রশ্ন না করিয়া মা কিনা জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার কাশী ফিরিবার গাড়ী কখন? মায়ের মুখে এই প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া যেমন হইলাম আশ্চর্য, তেমনই হইলাম মর্মাহত ও দুঃখিত। অসহনীয় মর্মবেদনায় একবার মনে হইয়াছিল মাকে উত্তর দেই, মা! এখন তো এই রাত্রিতে কাশী ফিরিবার কোন গাড়ী নাই, থাকিলে এখনই কাশী ফিরিয়া যাইতাম। কিন্তু বিচার করিয়া দেখিলাম মাকে এইরূপ উত্তর দেওয়া অনুচিত এবং শিষ্টাচার বিরুদ্ধ, সেইজন্য অতিশয় দুঃখের সহিত বলিলাম, "মা! কাশী ফিরিবার গাড়ী কাল সন্ধ্যায়।" মা আমার উত্তর শুনিয়া বলিলেন, "কাল ভোরেই

হরিদ্বার চলিয়া যাও। সেখানে ব্রহ্মকুণ্ডে গঙ্গাস্নান করিয়া রাত্রির গাড়ীতে কাশী ফিরিয়া যাইও। দেখা তো হইল, আর কি? তোমাদের মঙ্গলের জন্যই এই শরীরটা এইভাবে এখানে আছে।"

মা যে এত কঠোর ও নির্মম হইতে পারেন তাহা আমি স্বপ্নেও কখন কল্পনা করিতে পারি নাই। রাত্রিতে আমার আর নিদ্রা হইল না। ক্ষোভে, দুঃখে ও মর্মবেদনায় আমার দুই চক্ষু দিয়া অঝোরে অশ্রু ঝরিতে লাগিল। ঘর অন্ধকার ছিল বলিয়া আমার চোখের জল কেহ দেখিতে পাইল না। মায়ের কথার অবাধ্য হইবার যে এই শাস্তি তাহা বেশ হৃদয়ঙ্গম করিলাম। মায়ের সঙ্গে কোন প্রকার আর কথাবার্তা না বলিয়া ভোর হইতেই হরিদ্বারের সাতটার গাড়ী ধরিতে বাহির হইয়া পড়িলাম। আমি যখন রায়পুর হইতে চলিয়া আসি তখনও মা কম্বলমুড়ি দিয়া শয়ন করিয়াছিলেন। কেবল জ্যোতিষবাবু ও কমলাকান্তজী নিদ্রা হইতে উঠিয়াছিলেন।

শ্রীশ্রীমায়ের নির্দেশমত হরিদ্বারেব ব্রহ্মকুণ্ডে স্নানাদি সমাপনান্তে রাত্রির গাড়ীতে সেখান হইতে রওয়ানা হইয়া নবমী পূজার দিন বৈকালবেলা কাশী প্রত্যাবর্তন করিলাম। একটা প্রচলিত কথা আছে "বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদূনি কুসুমাদপি" ইহা আমরা শ্রীশ্রী মায়ের মধ্যে কদাচিৎ দেখিতে পাই। স্বভাবতঃ মায়ের স্বভাব অতিশয় কোমল ও দয়ালু কিন্তু প্রয়োজন হইলে তিনি বজ্র হইতেও কঠোর এবং নির্মম হইতে পারেন। এই প্রকার বিরুদ্ধভাব কেবল ভগবানেই সম্ভব অন্যত্র এইরূপ বড় দৃষ্টিগোচর হয় না। সময়ানুসারে এই প্রকার বিরুদ্ধাচরণ আমরা শ্রীভগবানের মধ্যেই পাইয়া থাকি। প্রকৃতির সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের দ্বারাই মনুষ্যের স্বভাব নির্মিত হয়, সেইজন্য মানব সাধারণতঃ স্বীয় স্বভাব পরিবর্তন করিতে পারে না। ভগবান্ তো প্রকৃতির গুণের দ্বারা পরিচালিত হন না, অতএব তাঁহার মধ্যে প্রয়োজনানুসারে বিরুদ্ধ ভাবের স্ফুরণ হইতে দেখা যায়। ভগবান্‌কে চিনিবার ইহা একটি সঙ্কেত।

শ্রীশ্রীমা বজ্র হইতেও কঠোর আবার পুষ্প হইতেও কোমল

শ্রীশ্রীমা কিভাবে আমাকে রাযপুর (দেহরাদুন) হইতে পত্রপাঠ মাত্র বিদায় করিয়া দিয়াছিলেন তাহা বর্ণন করা হইল। ইহার দ্বারা দেখান হইয়াছে মা বড়ই হৃদয়হীন, কঠোর ও নির্মম। পক্ষান্তরে সেই মাকেই আমরা দেখিব তিনি কতই না কোমল-হৃদয়া, পরদুঃখেকাতরা এবং ভক্ত-বৎসলা। মা কখন যে কি করেন এবং কেন করেন তাহা আমাদের এই সীমাবদ্ধ ক্ষুদ্র জ্ঞানের দ্বারা হৃদয়ঙ্গম করা কেবল অসাধ্যই নহে বরং অসম্ভব।

১৯৪২ খৃষ্টাব্দেব গরমের সময় কর্মস্থল হইতে অসময়ে চিরবিদায় লইয়া শ্রীশ্রীমায়ের পদপ্রান্তে দেহরাদুনে গিযা উপস্থিত হইয়াছি। বৃদ্ধা পিসীমার জন্য কর্তব্যানুরোধে সংসারে আবদ্ধ ছিলাম। তাঁহার সেবা-শুশ্রূষা ও দেখা-শোনার উপযুক্ত কোন লোক না থাকায় এই সকল কার্যের ভার আমাকেই গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। তিনি পরিণত বয়সে কাশীলাভ করিয়া আমাকে সর্বপ্রকার বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া দিয়াছেন। মনুষ্যের আকর্ষণের সামগ্রী হইল, ব্যক্তি, বস্তু, স্থান ও অবস্থা। ইহাদের দ্বারাই মানব সংসারে বদ্ধ হইয়া আছে। শ্রীভগবানের অসীম কৃপায় বহুদিন পূর্বেই ইহাদের মূলচ্ছেদ হইয়া গিয়াছে। এখন আমি মুক্ত-নীল-আকাশের একটি নীড়হীন উড়ো পাখী। ভগবান তো তাঁহাকে স্মরণ-মনন করিবার অনেক সময় ও সুযোগ করিয়া দেন কিন্তু আমরা এমনই হতভাগ্য সংসারী জীব যে তাঁহার দেওয়া সুবিধার যথোচিত সদ্‌ব্যবহার করি না।

মা তখন দেহরাদুন শহর হইতে অনুমান পাঁচ মাইল দূরে রায়পুরের শিবের মন্দির-সংলগ্ন আশ্রমে অবস্থান করিতেছিলেন। প্রথম যখন ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে তাঁহার অজ্ঞাতবাসের সময় বিনানুমতিতে আমি সেখানে গিয়াছিলাম তখন সেখানে মায়ের

কোন আশ্রম ছিল না। তিনি একটা ভাঙ্গা ঘরে তখন বাস করিতেন। ঘরের দরজায় কপাট পর্যন্ত ছিল না এবং দেয়াল বাহিয়া ও ছাত হইতে জল চুয়াইয়া ঘর ভাসিয়া যাইত। অত্যন্ত পুরাতন ও জীর্ণ হইবার কারণে কোন মানুষ ঐ ঘরে বাস করিতে পারিত না। সেখানে আশ্রয় লইয়াছিল কতগুলি বিষধর সর্প ও বিচ্ছু। এখন সেইস্থানে মায়ের একটি সুন্দর আশ্রম গড়িয়া উঠিয়াছে। সেই আশ্রমে মায়ের সঙ্গে আমরা অনেকেই তাঁকে কেন্দ্র করিয়া পরমানন্দে বাস করিতেছি। মায়ের অজ্ঞাতবাসের সময় এ অতি বিপৎসঙ্কুল স্থানে বাবা ভোলানাথ ও ভাইজী জ্যোতিষবাবু কতই না কষ্ট করিয়া বাস করিতেন। এখন সর্বপ্রকার বসবাসের সুবিধার সময় তাঁহাদের দুইজনের মধ্যে কেহই আমাদের মধ্যে নাই। মায়ের উপস্থিতিতে সকালে সাধন-সমর, বৈকালে তুলসীদাসের 'শ্রীরামচরিতমানস' হিন্দী রামায়ণ এবং রাত্রি নয়টার পর মহাভারতের অন্তর্গত শান্তিপর্ব নিয়মিতভাবে প্রত্যহ পাঠ হইত। কথা প্রসঙ্গে মায়ের নানাবিধ সুন্দর সুন্দর উপদেশ ও আধ্যাত্মিক বিষয়ের আলোচনায় সকলে পরিতৃপ্ত হইত। সাধনপিপাসু সাধু, সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারিগণ মায়ের নির্দেশমত অধিকাংশ সময় সাধন-ভজনে, জপ-ধ্যানে অতিবাহিত করিতেন। এক কথায় বলিতে গেলে বলিতে হয় রায়পুরের নির্জন জঙ্গলে ও তপোভূমি হিমাচলের পাদদেশে শ্রীশ্রীমাকে উপলক্ষ্য করিয়া একটি সুন্দর 'সাধক সংঘ' গড়িয়া উঠিয়াছিল। আশ্রম নির্মাণের যাহা প্রকৃত উদ্দেশ্য তাহা সেই সময় রায়পুরে বেশ পরিস্ফুট হইয়াছিল। নিকটবর্তী গ্রাম ও সুদূর দেহরাদুন শহর হইতে মায়ের বহু ভক্তসন্তান মায়ের উপদেশামৃত শ্রবণ ও তাঁহার মধুর সঙ্গ প্রাপ্ত হইবার জন্য প্রাতঃকাল হইতে রাত্রি নয়টা পর্যন্ত সর্বদাই উপস্থিত থাকিতেন। মায়ের ঘরের দ্বার দিন রাত্রিতে কখনও বন্ধ হইত না। সর্বদাই সকলের জন্য মায়ের ঘরের দরজা অর্গলমুক্ত থাকিত। সেই সময় বিভিন্ন মঠ ও আশ্রম হইতে সাধু, সন্ন্যাসী এবং শ্রীশ্রীমায়ের আশ্রিত বহু ধর্মপরায়ণ সাধক মায়ের অদ্ভুত আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া সেখানে আগমন করেন এবং

অখণ্ডরূপে অষ্টপ্রহর ধ্যান ও জপে আশ্রমটি জাগাইয়া তুলিয়াছিলেন। বাহির হইতে আসিলেই স্থানটির প্রভাব অনায়াসে বুঝিতে পারা যায়।

আমি সেখানে যাইবার পর একদিন মা কি জানি কেন কথায় কথায় হঠাৎ আমাকে বলিলেন, "আশ্রম হইতে কোথায়ও যাইতে হইলে এই শরীরটাকে জিজ্ঞাসা করিয়া যাইও।" মা এই কথা কেন যে আমাকে বলিলেন তাহা আমি সেই সময় কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই। আমি মনে মনে চিন্তা করিলাম, আমি তো আর শিশু নহি। আমি একজন পরিণত বয়স্ক মানুষ—তবে মা এই কথা বলিলেন কেন? মায়ের এই আদেশের মধ্যে কি উদ্দেশ্য বা সার্থকতা থাকিতে পারে? এত বিচার-বুদ্ধি খরচ না করিয়া, বিনা বিচারে শিশুর মত মায়ের নির্দেশ পালন করিতে পারিলে জীবনে অনেক দুঃখ-কষ্ট ও আপদ-বিপদের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যাইতে পারে। আমাদের অহংকার ও প্রাক্তন কর্ম তাহা করিতে দেয় কই? প্রারব্ধ টানিয়া লইয়া যায় বিবশের মত ভোগের দিকে, বিপদের দিকে, দুর্গতির দিকে ও বিবিধ লাঞ্ছনার অভিমুখে। সেইজন্য পদে পদে আমাদের ভোগ করিতে হয় কতই না দুঃখ, কষ্ট, দুর্গতি ও উৎপীড়ন। আমরা বিপদে না পড়ি, দুঃখ না পাই সেইজন্য মা তো আমাদের কতভাবেই সাবধান করিয়া দিতেছেন, কিন্তু আমরা মায়ের সেয়ানা ছেলে সেইদিকে কর্ণপাতই করি না। বিপদে পড়িলে, দুঃখ পাইলে দোষ দেই মাকে, ভগবান্‌কে। কেন মা আমাকে সতর্ক করিয়া দিলেন না? অপরের স্কন্ধে দোষ চাপাইতে আমরা সিদ্ধহস্ত। ইহাই হইল সংসারাসক্ত জীবের স্বভাব!

আষাঢ় মাস এই উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে আমের সময়। দেহরাদুনের বাজারে নানাবিধ ভাল ভাল লেংড়া, বোম্বাই, কিশনভোগ আম উঠিয়াছে। এই সংবাদ পাইয়া পরম শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ স্বামী অখণ্ডানন্দ গিরিজী মহারাজ (পূর্ব নাম—ডাক্তার শশাঙ্ক মোহন মুখোপাধ্যায়) শ্রীশ্রীমাকে আম দিয়া ভোগ দিবেন মনস্থ করিয়াছেন। তাঁহার নিয়ম ছিল মাকে আম ভোগ না দিয়া আম

খাইতেন না। আশ্রমের অতি পুরাতন ব্রহ্মচারী এবং মায়ের একান্ত অনুগত সন্তান শ্রীকমলাকান্তজীকে তিনি দেহরাদুনের বাজার হইতে কিছু অধিক পরিমাণে নানা প্রকার আম আনিতে পাঠাইতেছেন। ব্রহ্মচারীজী বাজারে যাইবার সময় আমাকে বলিলেন, "আমি আম কিনিতে দেহরাদুন যাইতেছি। আপনি যদি আমার সঙ্গে চলেন তাহা হইলে ভাল হয়। দুইজনে দেখিয়া শুনিয়া মায়ের জন্য ভাল আম আনা যাইবে।" আমি মনে করিলাম আমার তো এখন কোন কাজ নাই। আমি সঙ্গে গেলে যদি কমলাকান্তজীর একটু সুবিধা হয় তাহাতে আমাব আর কি আপত্তি? আমি বাজার করিতে অতিশয় অনভিজ্ঞ ও অপটু জানিয়াও ব্রহ্মচারীজী কেন যে আমাকে বাজারে যাইবার জন্য অনুরোধ করিলেন তাহা বুঝিতে পারিলাম না। এখন বুঝিতেছি তিনি আমাকে আম ক্রয় করিতে দেহরাদুন না লইয়া গেলে স্নেহময়ী শ্রীশ্রীমাযের একটি স্নেহের লীলা এইভাবে আজ জগতে প্রকাশিত হইত না। সন্তানদের প্রতি করুণাময়ী মায়ের যে কত স্নেহ ও করুণা তাহা আমি কি করিয়া অনুভব করিতাম। আমার এই অকিঞ্চিৎকর জীবনের ইহা একটি অতিশয় স্মরণীয় বিশেষ ঘটনা।

বেলা অনুমান অপরাহ্ণ তিন ঘটিকার সময় আমরা দুইজনে রায়পুর আশ্রম হইতে হাঁটিয়াই দেহরাদুন যাত্রা করিলাম। যে সময়কার এই ঘটনা সেই সময় ঐ পথে মোটর বাসের চলাচল হয় নাই এবং সেখানে কোন প্রকার যান-বাহনও পাওয়া যাইত না। আশ্রম হইতে গমন করিবার প্রাক্কালে আমার একবার মনে হইয়াছিল মাকে বলিয়া যাওয়া উচিত, কারণ মা তো আমাকে পূর্বেই বলিয়াছিলেন কোথায়ও যাইতে হইলে যেন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া যাই। আবার মনে মনে বিচার করিয়া দেখিলাম অধিক দূরে তো আর যাইতেছি না এবং শীঘ্রই তো ফিরিব, তবে আর মায়ের অনুমতি লইবার প্রয়োজন কি। আর একটি কথা—তখন মা মধ্যাহ্নের ভোগের পর একান্তে বিশ্রাম করিতেছিলেন। বিশ্রামের সময় তাঁহাকে বিরক্তকরা সঙ্গত মনে করিলাম না। বুদ্ধিমানের মত এইসব অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করিয়া মায়ের বিনানুমতিতেই

এবং তাঁহাকে না জানাইয়াই ব্রহ্মচারীর সঙ্গে তাঁহার এই নির্বোধ সন্তান আম ক্রয় করিতে শহরে চলিল। আম কিনিয়া আশ্রমে প্রত্যাবর্তন করিতে যে এত বিলম্ব হইবে তাহা যাইবার সময় অনুমান করিতে পারি নাই। দেহরাদুন শহর হইতে আম লইয়া যখন আমরা রায়পুর আশ্রমে ফিরিলাম তখন রাত্রি দশটা বাজিয়া গিয়াছিল।

যখনকার কথা লিখিতেছি তখন রায়পুর আশ্রমে জলের কোনরূপ ব্যবস্থা ছিল না। সেইজন্য হাত মুখ ধুইতে আশ্রমের বাহিরে যেখানে জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য জলের কল আছে সেইখানে যাইতে হইত। আমিও সেখানে ছিলাম। ঘোর অন্ধকার রাত্রি। তাড়াতাড়িতে সম্মুখে কোন হারিকেন লণ্ঠন না পাওয়ায় বিনা আলোতেই হাত-মুখ ধুইতে আশ্রমের বাহিরে যাইতে হইয়াছিল। বর্তমান সময়ের মত তখনকার দিনে টর্চের এত প্রচলন ছিল না। যখন বাহির হইতে আবশ্যকীয় সব কাজকর্ম সমাপন করিয়া আশ্রমে প্রত্যাবর্তন করিতেছিলাম তখন পথে আমগাছ তলায় অন্ধকারের মধ্যে কিসে যেন আমার বাম পায়ের কড়ে আঙ্গুলের পার্শ্বে কামড়াইল। সেইস্থান হইতে আশ্রমে আসিবার পথেই আমার পায়ে অসহ্য যন্ত্রণা হইতে লাগিল। আমার সমস্ত বাঁ পা'খানা বিশেষ করিয়া উরু হইতে কোমর পর্যন্ত যেন ফাটিয়া যাইতেছিল। এই রকম অসহনীয় যাতনা লইয়াই সন্ধ্যার আহ্নিক রাত্রি দশটায় ছাতের উপর করিতে বসিলাম। গরমের দিন বলিয়া আমি সায়ং সন্ধ্যা ছাতে বসিয়াই করিতাম। সন্ধ্যা-আহ্নিক আর কি করিব! শরীরের কষ্টে ছটফট করিতে লাগিলাম। কষ্টে সৃষ্টে কোন রকমে সংক্ষেপে নিয়ম রক্ষার মত আহ্নিক কৃত্য সারিলাম। আমার নিকটেই দিদিমা অর্থাৎ শ্রীশ্রীমায়ের গর্ভধারিণী বসিয়া জপ করিতে-ছিলেন। সন্ধ্যা করিবার সময় আমি বারবার মাটিতে শুইয়া পড়িতেছি, পুনরায় উঠিয়া বসিতেছি। এই প্রকারে ছটফট করিতেছি দেখিয়া তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি এমন করিতেছ কেন? তোমার কি হইয়াছে?" তাঁহাকে অতি সংক্ষেপে উত্তর দিলাম, "শরীরটা ভাল লাগিতেছে না, তাই এমন করিতেছি।"

কারণ তাঁহাকে প্রকৃত সকল ঘটনা বলিলে যদি তিনি একটা হইচই বাঁধাইয়া দেন এবং মাকে জানান সেই আশঙ্কায় তাঁহাকে আর বিশেষ কিছু বলিলাম না।

আহ্নিক করিতে করিতে মনে মনে পুনঃপুনঃ বিচার করিতে লাগিলাম, 'অহমেব পরব্রহ্ম' অর্থাৎ আমিই পরমাত্মা পরব্রহ্ম। আমি শরীর নহি, ইন্দ্রিয় নহি, মন নহি, বুদ্ধি নহি, চিত্ত নহি এবং অহংকার নহি। কারণ এই সকল হইল বিনাশশীল জড়পদার্থ। বাস্তবিকপক্ষে আমি হইলাম নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ ও মুক্ত স্বভাব পরমাত্মা। দৈহিক যন্ত্রণা তো দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, চিত্ত ও অহংকার যুক্ত যে জীব সে ভোগ করে। জীবের দুঃখ, জীব ভোগ করুক। তাহাতে আমার কি? আত্মার কি? ব্রহ্মের কি? আমি তো জীব নহি। আমি সর্বপ্রকার দৈহিক যাতনাশূন্য হইয়া আপন কাজ করি না কেন? একজনের ভোগ কি অপর একজন্ ভোগ করে? দেহের ভোগ দেহাশ্রিত যে জীব সে ভোগ করুক। আমি দেহ হইতে সম্পুর্ণ পৃথক্ আত্মা—সচ্চিদানন্দস্বরূপ ব্রহ্ম। এই কথাই তো শ্রীভগবান্ শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতায় বলিয়াছেন, "অহমাত্মা গুড়াকেশ সর্বভূতাশয়স্থিতঃ।" হে জিতনিদ্র! আমি সকল প্রাণীর হৃদয় মধ্যে আত্মারূপে অবস্থিত আছি। সেই আত্মাই তো আমি। এইভাবে বারংবার বিচার করা সত্বে কোনই ফল হইল না। শরীরে যে আত্মবুদ্ধি, ইহা এত সহজে এবং এত শীঘ্র যায় না। শরীরের অসহ্য ও তীব্র কষ্ট বিচার বুদ্ধিকে কোথায় উড়াইয়া দিয়া অহংঅভিমানী বা দেহাভিমানী আমাকে যাতনায় ব্যাকুল করিয়া তুলিল। যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া আমি ছটফট করিতে করিতে মাটিতে পড়িয়া গড়াগড়ি দিতে লাগিলাম।

আষাঢ় মাসে রায়পুরে (দেহরাদুন) ভীষণ গরম পড়ে। গরমের জন্য মা রাত্রিতে খোলা ছাতে, উন্মুক্ত আকাশের নীচে শয়ন করিতেন। তিনি রাত্রিতে হলঘরের বড় ছাতে একখানা তক্তপোষের উপর শুইয়া সকলের সঙ্গে নানা প্রকার ধর্মপ্রসঙ্গ লইয়া আলোচনা করিতেছিলেন। আমি মায়ের চরণে প্রণাম করিয়াই তখন নীচে হলঘরে চলিয়া যাইতেছিলাম তখন তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা

করিলেন, "তুমি এখনই এত তাড়াতাড়ি কোথায় যাইতেছ?" তখন আমি ঘটনাটি না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। আমি উত্তর দিলাম, "মা! বাহির হইতে হাতমুখ ধুইয়া আশ্রমে আসিবার সময় রাস্তায় ঐ আমগাছ তলায় অন্ধকারে কিসে যেন আমার বাঁ পায়ের কড়ে আঙ্গুলের পাশে কামড়াইয়াছে। ভয়ানক যন্ত্রণা হইতেছে। আমি কোন রকমেই এক মুহূর্তও স্থির হইয়া থাকিতে পারিতেছি না। সেইজন্য নীচে হলঘরে যাইতেছি। আমি এখানে থাকিলে সারারাত কাহারও বিশ্রাম বা নিদ্রা হইবে না।" আমার সব কথা শুনিয়া মা বলিলেন, "তুমি এখানেই থাক। তোমাকে এখন নীচে হলঘরে যাইতে হইবে না।"

এই কয়েকটি কথা কোন রকমে সংক্ষেপে মাকে নিবেদন করার সঙ্গে সঙ্গেই আমি আর বসিতে না পারিয়া ছাতের উপর শুইয়া পড়িলাম। যাতনা এতই তীব্র আকার ধারণ করিয়াছিল যে আমি ছাতের উপর গড়াইয়া ছটফট করিতে লাগিলাম। দুই চারি সেকেণ্ডও কিছুতেই স্থির থাকিতে পারিতেছিলাম না। আমার এই অবস্থা দেখিয়া মা বলিলেন, "ও তো সাধারণতঃ এমন অধৈর্য হয় না। খুবই কষ্ট হইতেছে।" এই কথা বলিয়াই স্নেহময়ী জননী আমার, তাঁহার বিছানা হইতে নীচে নামিয়া ছাতের মেঝেতে বসিয়া আমার মাথাটা তাঁহার কোলের উপর টানিয়া লইলেন। আমার মাথার ব্রহ্মতালু হইতে পিঠের শেষ পর্যন্ত মেরুদণ্ডের উপর শ্রীশ্রীমা তাঁহার পদ্মহস্তখানি বারংবার অতিশয় স্নেহ ও আদরের সহিত বুলাইতে লাগিলেন। আশ্রমের দুইটি মেয়েকে বলিলেন কাপড় গরম করিয়া আমার পা হইতে কোমর পর্যন্ত সেক দিতে। এইভাবে পরম করুণাময়ী মা অনেকক্ষণ অবধি আমার শিরদাঁড়ার উপর হস্ত সঞ্চালন করিতে করিতে যন্ত্রণা একটু কম হইতেছে দেখিয়া আমার মনে হইতেছিল আমার এই দারুণ অসহ্য যাতনা যেন মা তাঁহার নিজের শরীরে আকর্ষণ করিয়া লইতেছেন। সেইকারণে মায়ের কোল হইতে আমার মাথাটা উঠাইয়া লইয়া তাঁহাকে বলিলাম, "মা! তুমি আমাকে ছুঁইয়ো না। তুমি আমার দেহের এই অসহ্য কঠিন কষ্ট তোমার আপন

দিব্যদেহে টানিয়া লইতেছ।" এই কথা বলিয়া মাকে বারবার সরাইয়া দিতেছি এবং দয়াময়ী মা আমার, তাঁহার স্নেহাপ্লুত ক্রোড়ে আমার মস্তকটা পুনঃপুনঃ টানিয়া লইতেছিলেন। এইরকম করিয়া রাত্রি প্রায় এগারটা হইতে রাত্রি তিনটা পর্যন্ত কাটিয়া গেল।

সারারাত্রি শ্রীশ্রীমায়ের ও আশ্রমবাসী কাহারও বিশ্রাম বা নিদ্রা হইল না। ঐ গভীর রাতে মা আশ্রমের একজন ব্রহ্মচারীকে গ্রামে পাঠাইয়া গরুর টাটকা দুধ আনাইয়া তাহাতে গব্যঘৃত ও হরিদ্রাচূর্ণ মিলাইয়া তাঁহার হাতে আমাকে খাওয়াইয়া দিলেন। রাত্রি প্রভাত হইবার সঙ্গে সঙ্গে আমার সেই দুঃসহ তীব্র যাতনা ক্রমশঃ ক্রমশঃ হ্রাস পাইতে লাগিল। যতটা আমার মনে পড়ে একবার মা শহর হইতে সিভিল সার্জনকে আনিবার প্রস্তাবও করিয়াছিলেন। মায়ের দয়ায় অবশ্য সিভিল সার্জনকে আনয়নের প্রয়োজন হয় নাই। যাহা করিবার তাহা শ্রীশ্রীমাই স্বয়ং করিয়াছিলেন।

শ্রীশ্রীমায়ের এই অপরিসীম স্নেহের কথা আমার হৃদয়ে চিরদিনের জন্য অঙ্কিত ও জাগ্রত হইয়া থাকিবে। মায়ের এই অতুলনীয় করুণা ও স্নেহ জগতে কোথায়ও কি অন্বেষণ করিয়া পাওয়া যাইবে? আমার মনে হয় সন্তান বড় হইলে গর্ভধারিণীও এইরূপ স্নেহের সহিত শুশ্রূষা করিতে পারেন না, যেমনটি সেদিন আমাদের স্নেহ ও করুণাময়ী মা আমাকে করিয়াছিলেন। ইহা কেবল আমাদের শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ীর পক্ষেই সম্ভব। মা যখন যাহা করেন তাহাই পূর্ণরূপে করিয়া থাকেন, তাহাতে কোথায়ও কোন প্রকার ত্রুটি দৃষ্টিগোচর হয় না। এই মায়ের সদৃশ আর একটি মা জগতে কোথায়ও খোঁজ করিয়া পাওয়া যাইবে কিনা সন্দেহ! মা পরে বলিয়াছিলেন, তিনি দেখিয়াছিলেন, একটি সুন্দরী স্ত্রীমূর্তি মাড়োয়ারী মেয়েদের মত রঙ্গিন শাড়ী পরা, চাদর গায়ে ও কপালের উপর মাথার চুলের সঙ্গে সোনার ফুল ঝোলান— সেখান হইতে চলিয়া গেলেন। ঐটি নাকি "বিষহরী দেবীর" মূর্তি ছিল। মা মনসার একটি নাম বিষহরী। এখন বেশ বুঝিতে পারিতেছি—মা কেন আমাকে বলিয়াছিলেন আশ্রম হইতে

কোথাও যাইতে হইলে যেন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া যাই। মা তো আমাকে পূর্বেই সতর্ক করিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার কথা না মানিলে দোষ কাহার। সেইজন্য পাইয়া থাকি আমরা নানা প্রকার দুঃখ, কষ্ট ও লাঞ্ছনা।

গত ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দের শরৎকালীন শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা মায়ের উপস্থিতিতে সোলনে হইয়াছিল। সোলন সিমলা পাহাড়ের মধ্যে একটি সুন্দর ছোট শহর। এই অল্পায়তন মনোরম শহরটী সিমলা শহরের বত্রিশ মাইল নীচে এবং কালকা রেলওয়ে ষ্টেশনের প্রায় ত্রিশ মাইল উপরে পাহাড়ের গায়ে অবস্থিত। বর্তমান সময়ে সোলন হিমাচল প্রদেশের অন্তর্গত একটি সমৃদ্ধশালী নগর ও রাজধানী। বাঘাট নরেশ শ্রীদুর্গা সিংজীর আন্তরিক অনুরোধে শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী কাশী হইতে সোলন চলিয়াছেন। করুণাময়ী মা দয়া করিয়া আমাকে তাঁহার সঙ্গে যাইবার জন্য বলিলেন। কোনও কারণ-বশতঃ প্রথমে আমি তাঁহার সাথে যাইতে একটু আপত্তি করিয়া-ছিলাম। কিন্তু আমার অসম্মতি সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত আমাকে মায়ের সঙ্গে সোলন যাইতেই হইয়াছিল। আমরা সকলে ভালয় ভালয় কালকা ষ্টেশন পর্যন্ত গিয়া পৌঁছিলাম। কালকা হইতে সোলন অনুমান ত্রিশ মাইল পথ যাইতে হয়, রেলে, বাসে কিংবা মোটর গাড়ীতে। শ্রীশ্রীমায়ের জন্য রাজাসাহেব দুর্গাসিংজী তাঁহার আপন মোটর গাড়ী পাঠাইয়াছেন এবং মায়ের সঙ্গীয় অপর সকলের জন্য মোটর বাস আসিয়াছে। আমরা যে যাহার মালপত্র লইয়া বাসে স্থান গ্রহণ করিয়াছি। মায়ের গাড়ী যখন ছাড়িবে তাহার পূর্বক্ষণে হঠাৎ মা আমার খোঁজ করিতে লাগিলেন। আমাদের মধ্যেই কেহ গিয়া মাকে সংবাদ দিলেন যে আমি বাসে বসিয়াছি। সেই লোকটির দ্বারাই মা আমাকে তাঁহার গাড়ীতে যাইবার জন্য ডাকাইয়া পাঠাইলেন। আমি বাসে ভাল জায়গাতেই বসিয়াছিলাম, কোন অসুবিধা ছিল না। মায়ের নির্দেশ মত গিয়া দেখি মা, দিদিমা এবং গুরুপ্রিয়া দেবী বসিয়াছেন গাড়ীর পিছনের সিটে এবং স্বামী পরমানন্দজী সম্মুখের সিটে ড্রাইভারের (চালকের) পার্শ্বে বসিয়া চলিয়াছেন।

গাড়ীতে আমার বসিবার কোন স্থান না থাকায় মায়ের নির্দেশ মত আমি শ্রীশ্রীমায়ের পদপ্রান্তে বসিয়াই দুর্গাপূজা দর্শন মানসে সোলন চলিলাম। আমি কখন স্বপ্নেও কল্পনা করিতে পারি নাই যে আমি মায়ের গাড়ীতে যাইতে পারি। তাহাও আবার মায়ের চরণতলে বসিয়া। করুণাময়ী শ্রীশ্রীমায়ের দয়ায় অসম্ভবও সম্ভবে পরিণত হইতে পারে। একদিন একব্যক্তি কোন একজন মহাত্মাকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, ভগবান্ কি করে? প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন, ভগবান্ রাজাকে ফকির করেন এবং ফকিরকে রাজা করিয়া থাকেন। শ্রীভগবানের কাছে অসম্ভব বলিয়া কোন কথা নাই। তিনি সবই করিতে পারেন। অমোঘ শক্তি তাঁহার!

পার্বত্যপথে সর্পিলগতিতে আঁকিয়া বাঁকিয়া মায়ের মোটর ক্ষিপ্রবেগে চলিয়াছে। ইহার ফলে আমার মাথা ঘুরিতে লাগিল এবং সঙ্গে সঙ্গে একটু বমির ভাবও হইতেছিল। মা আমার মুখচোখ দেখিয়া এবং অবস্থা বুঝিতে পারিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি, মাথা ঘুরিতেছে বুঝি?" আমি উত্তর দিলাম, "হ্যাঁ মা! মাথা তো ঘুরিতেছে, সাথে সাথে একটু বমির ভাবও আছে।" মা আমার অবস্থা দেখিয়া বলিলেন, "শুইয়া পড়, শুইয়া পড়।" আমি মাকে উত্তর দিলাম, "মা! তুমি তো শুইতে বলিতেছ। কোথায় শুইব? জায়গা কোথায়?" মা অতি সংক্ষেপে উত্তর দিলেন, "কেন, কোলে।" আমি মায়ের অনুজ্ঞা পাইয়া আর এক মুহূর্তও বিলম্ব না করিয়া মায়ের অতিশয় বাধ্য ও সুবোধ ছেলেটির মত স্নেহময়ী মায়ের কোলে শুইয়া পড়িলাম। মায়ের কোলে না শুইয়া আর কোনও উপায়ও তখন ছিল না, কারণ আমার মাথা ঘোরা ও বমির ভাব এতই বৃদ্ধি হইয়াছিল যে মায়ের ক্রোড়ে শয়ন না করিলে বোধ হয়—বোধ হয় কেন; নিশ্চয়ই গাড়ীর মধ্যে বমন করিয়া ফেলিতাম এবং পরিধানের বস্ত্রাদি নষ্ট হইয়া যাইত। সেইদিন কি যে একটা কাণ্ড হইত তাহা ভাবিলেও লজ্জায় মাথা নত হইয়া আসে।

সুদীর্ঘ এই ত্রিশ মাইল পথ মায়ের কোলে মাথা রাখিয়া

পরমানন্দে ও আরামে দুই ঘণ্টার পর আমাদের গন্তব্যস্থান সোলন রাজধানীর সম্মুখে আসিয়া পৌঁছিলাম। এখন মনে হইতেছে এই পথটা আরও কিছু দীর্ঘ হইলে ভাল হইত, কারণ তাহা হইলে অধিকতর সময় মায়ের স্নেহ মাখা কোলে সুখে শয়ন করিবার সুযোগ পাইতাম। মায়ের ক্রোড়ে মাথা রাখিয়া শুইবার পর মাথাও ঘোরে নাই এবং বমিও হয় নাই। পরমস্নেহময়ী শ্রীশ্রীমায়ের কোলে একবার শুইতে পারিলে জগতের ত্রিতাপ অর্থাৎ আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক দুঃখ চিরতরে দূর হইয়া যায়। মায়ের এই সর্বদুঃখহরা স্নেহের কোল কোন প্রকার সাধন, ভজন, যোগ, আরাধনার দ্বারা যে প্রাপ্ত হওয়া যায় না ইহা সুনিশ্চিত ও অতি সত্য কথা। এখানে প্রশ্ন উঠা অতিশয় স্বাভাবিক, তবে মায়ের কোল পাওয়া যায় কিসে? এই জিজ্ঞাসার উত্তরে বলা যাইতে পারে, মায়ের কোল পাওয়া যায় একমাত্র তাঁহার অহৈতুকী কৃপায়।

আমার সকল সাধনা বিফল হ'য়েছে,
তোমার কৃপার আশায় শুধু রয়েছি।
জানি জানি মাগো, তুমি কত যে দয়াল,
কেবল এই ভরসায় বুক বেঁধেছি॥

আপন শক্তির উপর ছিল বড় জোর,
সাধন করিয়া মাগো, দেখা পাব তোর।
শেষের দিনে দেখি সব গণ্ডগোল,
কিছুই নাই সকল খুইয়ে মাগো ফেলেছি॥

অহমিকা ছাড়া বাড়ে নাই কিছু,
উঁচু মাথা মোর তব পায় হয় নাই নীচু।
আলেয়ার পিছে মিছে ছুটে ছুটে,
বড়ই ক্লান্ত হ'য়ে মাগো পড়েছি॥

সন্তান বলিয়া মাগো ক্ষম অপরাধ,
কোলে উঠিতে মনে হয় বড়ই সাধ।
নেও নেও জননী, কোলে তুলে লও,
না হয় ধূলা কাদা কতই মেখেছি ॥

একাধারে শ্রীশ্রীমায়ের যে কেমন কঠোর ও কোমল-হৃদয় তাহার অপর একটি দৃষ্টান্ত যাহা আমি স্বয়ং অনুভব করিয়াছি তাহা এইস্থানে বর্ণনা করিতেছি।

১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের শীতের সময় মা তাঁহার বিন্ধ্যাচল পাহাড়ের উপর সুন্দর আশ্রমটিতে বিরাজ করিতেছিলেন। জানুয়ারী মাসে এই পশ্চিমাঞ্চলে যেমন ভীষণ শীত পড়ে তেমনি বৃষ্টি ও প্রবল বাতাস প্রবাহিত হয়। বিন্ধ্যাচল পাহাড়ের উপরও ভয়ানক শীত পড়িয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে যেমন ঝড়-তুফান তেমনিই অবিশ্রান্ত বৃষ্টিপাত চলিতেছে। ঠাণ্ডায় সকলেই আমরা জড়সড় হইয়া পড়িয়াছি। প্রাকৃতিক এই মহাদুর্যোগের মধ্যে মায়ের শরীর অত্যন্ত খারাপ—সর্দি, কাশি, জ্বর, টন্‌সিল ফোলাদি বহু উপসর্গ বর্তমান। সন্ধ্যা হয় হয়, এমন সময় মায়ের দোতালার ঘরের দরজা ও জানালা সব বন্ধ করিয়া দিদিমা (মায়ের গর্ভধারিণী), শ্রীমৎ স্বামী নির্গুণানন্দজী (মুক্তিবাবা), স্বামী পরমানন্দজী প্রভৃতি কয়েকজন মাতৃভক্ত মায়ের নিকট বসিয়া আছেন। মুক্তিবাবার পরামর্শমত কেট্‌লিতে জল গরম করিয়া মা গলায় ভাপ লইতেছেন। ঘরের বাহিরে যেমন বৃষ্টি তেমনই তুফান। কাহার সাধ্য ঘরের বাহির হয়। এমন ভয়ানক দুর্যোগপূর্ণ রাতের মধ্যে এলাহাবাদ হইতে একজন বিশিষ্ট ভদ্রমহিলা মায়ের কাছে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি তাঁহার স্বামী এবং পুত্র-কন্যাগণ সকলেই শ্রীশ্রীমাকে যথেষ্ট ভালবাসেন এবং ভক্তিশ্রদ্ধা করেন। তিনি এই ভয়ঙ্কর ঝড়বৃষ্টির মধ্যে মায়ের নিকট আসিয়া বলিলেন, "মা! আজ দুপুরবেলা তোমার ছেলেকে (অর্থাৎ তাঁহার পতিকে) কলাইয়ের (কড়াইয়ের) ডাল রান্না করিয়া খাওয়াইয়া-ছিলাম। তিনি ঐ ডাল খাইয়া আমাকে বলিলেন, বিন্ধ্যাচলে মা আছেন, তাঁহাকে কলাইয়ের ডাল রাঁধিয়া খাওয়াইয়া আস। তাই

মা, তোমার জন্য কলাইয়ের ডাল লইয়া আসিয়াছি"। এই ঘোর দুর্যোগের মধ্যে কেহ শীতে ঘরের বাহির হইতে পারে না। ইহার মধ্যে তিনি মাকে কড়াইয়ের ডাল খাওয়াইবার জন্য এত কষ্ট করিয়া এলাহাবাদ হইতে বিন্ধ্যাচল পাহাড়ের উপর আসিয়াছেন। ধন্য ইহাদের শ্রীশ্রীমায়ের প্রতি শ্রদ্ধা, ভক্তি ও ভালবাসা। মাকে কতখানি ভালবাসিতে পারিলে মানুষ নিজের শারীরিক দুঃখ, কষ্ট উপেক্ষা করিয়া এইভাবে এমন প্রাকৃতিক ঘোর দুর্দিনে এত দূরে আসিতে পারে! শ্রীশ্রীমায়ের প্রতি ইহাদের ভালবাসা সত্যই যে প্রশংসার যোগ্য তাহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহের অবকাশ নাই।

ভদ্রমহিলার মুখে এই কথা শ্রবণ করিয়া এবং তাঁহার যথার্থ আন্তরিকতার অভিব্যক্তি দেখিয়া মা আনন্দে হাসিয়া বলিলেন, "বেশ মা বেশ! তোমার আনা কড়ায়ের ডাল কালই এই শরীর খাইবে।" মা আজ কয়েকদিন যাবৎ সামান্য একটু সাবু কি হর্লিকস্ খাইয়া আছেন। গলার বেদনার জন্য কিছুই খাইতে পারেন না বা খান না।

আমিও সেই সময় ঐ ঘরেই মায়ের নিকট বসিয়াছিলাম। সুযোগ বুঝিয়া আমার স্কন্ধে তখন একটা ভূত আসিয়া চাপিল। মায়ের মুখে কলাইয়ের ডাল খাওয়ার প্রস্তাব শুনিয়া আমি অমনি বলিয়া ফেলিলাম, "মা! আজ কয়েকদিন যাবৎ যেমন তোমার সর্দি, কাশি, গলাব্যথা তেমনই জ্বর। এই অবস্থার মধ্যে ঠাণ্ডা কলাইয়ের ডাল দিয়া কাল ভাত খাওয়াটা কি উচিত হইবে? আমার গর্ভধারিণীর যদি এমন অসুস্থ শরীর হইত তাহা হইলে আমি কিছুতেই তাঁহাকে কলাইয়ের ডাল দিয়া ভাত খাইতে দিতাম না। তুমি যে কিছু খাও না, ইহাই আমাদের দুঃখ। তুমি ভাল হইয়া, সুস্থ হইয়া কলাইয়ের ডাল দিয়া ভাত খাইও। ইহা খুবই আনন্দের কথা।" আমার এই অবাঞ্ছনীয় ও অনধিকার চর্চায় উপস্থিত মায়ের ভক্তদের মধ্যে কেহ কেহ ঘোর অসন্তোষের ভাব প্রকাশ করিয়াছিলেন। একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি তো প্রকাশ্যভাবে আমাকে বলিয়াই ফেলিয়াছিলেন, মা আপন ইচ্ছামত আহার করিবেন, তাহাতে প্রতিবাদ করিবার আপনার কি

অধিকার আছে? শ্রীভগবানের ভোগ গ্রহণেও বাধা। আমি যে কি ভাব লইয়া কথাটা বলিয়াছিলাম—আমার মনে হয় তাহা উপস্থিত কেহই ঠিক ঠিক হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই। আমি বুঝিলাম এইরূপ ক্ষেত্রে আমার এই প্রকার অভিমত প্রকাশ করাটা ভাল হয় নাই। সেই স্থানে দিদিমা, মুক্তিবাবা ও পরমানন্দজী ছিলেন, তাঁহারা তো কেহই কিছু বলিলেন না? আমি কেন উপযাচক হইয়া মাকে বলিতে গেলাম? এই সম্বন্ধে বিচার করিবার আর একটা দিকও আছে। এই ঠাণ্ডার মধ্যে অসুস্থ শরীর লইয়া, জ্বরের মধ্যে কড়াইয়ের ডাল সহ অন্ন গ্রহণ করিবার ফলে যদি মায়ের শরীর অধিক খারাপ হইয়া পড়ে তাহা হইলে হয় তো মা-ই বলিবেন, আমি না হয় কড়াইয়ের ডাল গ্রহণে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলাম, তোমরা তো সকলে সেইখানে উপস্থিত ছিলে, তোমরা ত উহা নিষেধ কর নাই? মায়ের এই কথার উত্তরে আমাদের বলিবার কিছু থাকিত কি? এই সব অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা করিয়া আমি মাকে সরলভাবে নিবেদন করিলাম, "মা! আমার স্বভাবটা বড়ই মন্দ। আমাকে কেহ কিছু জিজ্ঞাসা না করিলেও কখন কখন এই রকম একেকটা অপ্রীতিকর ও অনুচিত কথা বলিয়া ফেলি। মা! এখন হইতে যতক্ষণ তোমার নিকট থাকিব ততক্ষণ মৌন হইয়া থাকিতে চেষ্টা করিব।" আমার বক্তব্য শেষ হইতে না হইতেই মা অমনি বলিয়া উঠিলেন, "তুমি মৌন হইবে কেন? এই শরীরটাই (আপনাকে লক্ষ্য করিয়া) মৌন হইয়া যাইতেছে।"

শ্রীশ্রীমায়ের মুখ হইতে এই কথা বাহির হইবার পরই আমি সন্ধ্যা করিতে "ভজনালয়ে" (স্বনামধন্য ও দানবীর শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয়ের বিন্ধ্যাচলের পাহাড়ের উপরকার বাড়ীর নাম "ভজনালয়"।) চলিয়া আসিলাম। আমি মনেও ভাবি নাই এই সাধারণ কথাটা এত গুরুতর আকার ধারণ করিতে পারে। আমি মায়ের ঘর হইতে চলিয়া আসার পর শ্রীমান্ অভয় ব্রহ্মচারী আমার নাম ধরিয়া ডাকিয়া বলিলেন, "আপনি মাকে কি বলিয়া গেলেন দেখুন আসিয়া, মা একেবারে কথা বলা বন্ধ করিয়া

দিয়াছেন।" তাহার কথা শুনিবার সাথে সাথেই আমি পুনরায় মায়ের কাছে ফিরিয়া আসিলাম। আমি মায়ের কাছে গিয়া দেখিলাম, মা তাঁহার বিছানার উপর স্থির হইয়া বসিয়া আছেন— মায়ের মুখে হাসি নাই, কথা নাই, যেন একটি পাষাণে গড়া মূর্তি। আমি মায়ের পা দুইখানি ধরিয়া কথা বলিবার জন্য কত কাকুতি-মিনতি করিলাম কিন্তু কিছুতেই আমি তাঁহার মুখ হইতে একটি কথাও বাহির করিতে পারিলাম না। দুঃখে, কষ্টে ও অপমানে আমি অবসন্ন হইয়া পুনরায় জননীর চরণ দুইখানি ধারণ করিয়া বলিলাম, "মা! আমি এইভাবে যদি পাথরের মূর্তির কাছে অনুনয় বিনয় করিয়া প্রার্থনা করিতাম তাহা হইলে উহাকে দিয়াও কথা বলাইতে পারিতাম। কিন্তু মা! তুমি এতই কঠোর, এতই নির্মম, এতই পাষাণ যে তোমার মুখ হইতে একটি শব্দও নির্গত করিতে পারিলাম না। মা! আমার এই অপরাধটা কি এতই গুরুতর ও অমার্জনীয় যে উহা ক্ষমা হইতে পারে না।"

আমি কতটা আপন ভাবিয়া যে মাকে ঐ কথাটা বলিয়াছিলাম তাহা কেহই বুঝিল না, ফল হইল হিতে বিপরীত। এই সকল ভাবিয়া মনের দুঃখে আমিও কাহার সহিত কথা না বলিয়া মৌন হইয়া গেলাম। পরের দিন প্রাতে যখন আমি ভজনালয়ে নারায়ণ পূজা করিতেছিলাম সেই সময় মা আমার ঘরের দরজায় আসিয়া তিনবার নারায়ণ, নারায়ণ, নারায়ণ এবং বৃন্দাবন, বৃন্দাবন বলিলেন। খুবই অল্প ইঙ্গিতে মা আমাকে বুঝাইয়া দিলেন নারায়ণকে গলায় বাঁধিয়া তাঁহার সঙ্গে বৃন্দাবন যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে। যখন এই অপ্রীতিকর ঘটনাটি সংঘটিত হইয়াছিল তখন আমি মায়েরই নির্দেশমত বিন্ধ্যাচলে আমার পূর্বপুরুষের একটি শালগ্রামশিলা সঙ্গে লইয়া শ্রীমহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয়ের ভজনালয়ে বাস করিতেছিলাম। সেই শালগ্রামটিকেই সঙ্গে লইয়া বৃন্দাবনে যাইবার জন্য মা আমাকে সঙ্কেত করিলেন। ইহার পর মা পুনরায় আশ্রমে আর গেলেন না। মহেশবাবুর ভজনালয়েই রহিয়া গেলেন। নারায়ণের পূজার পর আমি তাঁহার জন্য ভোগ

পাকের কোন প্রকার ব্যবস্থা করিতেছি না। ইহা দেখিয়া মা আশ্রমের একটি মেয়ের দ্বারা খিচুড়ি রাঁধাইয়া ভোগ নিবেদন করিবার জন্য নারায়ণের সম্মুখে লইয়া গেলেন। ঠাকুরকে ভোগ উৎসর্গের পর উহা হইতে কিছু অংশ শ্রীমান্ অভয়কে দিলেন যেহেতু গত রাত্রিতে যে কোন কারণেই হউক তিনিও অনাহারেই ছিলেন। প্রসাদের অবশিষ্ট অংশ মা থালা সমেত আমার সম্মুখে দিলেন। গত দিনের অবাঞ্ছনীয় ঘটনার জন্য আমি বড়ই মানসিক অশান্তিতে ছিলাম, সেই নিমিত্ত আমার কিছুই খাইবার ইচ্ছা হইতেছিল না। মা যখন দেখিলেন আমি প্রসাদ খাইতেছিনা তখন করুণাময়ী স্বয়ংই আমার মুখে খিচুড়ির গ্রাস তুলিয়া দিতে লাগিলেন। শ্রীশ্রীমায়ের অতি পুরাতন ভক্ত ও বিশেষ কৃপার পাত্র শ্রীজিতেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় সেই সময় সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি আমাকে তাঁহার ছোট ভাইয়ের মত স্নেহ করেন। তিনি আমাকে আমার পূর্বের নামে সম্বোধন করিয়া একটু তিরস্কারের সহিত বলিলেন, "বেশী বাড়াবাড়ি ভাল নয়। মা তোমাকে নিজের হাতে তিন গ্রাস খাওয়াইয়া দিলেন, এখন তুমি নিজের হাতে খাও।" আমিও চিন্তা করিয়া দেখিলাম সকলেরই একটা সীমা আছে—লেবু অধিক কচ্লাইলে তিক্ত হইয়া যায়। মায়ের সঙ্গে এত অভিমান আমার মত ক্ষুদ্র জীবের শোভা পায় না। আমি আমার আপন মূল্য নির্ধারণ করিতে পারিয়া মর্মবেদনায় অভিভূত হইয়া আপন হাতে খাইতে লাগিলাম। মা হাত ধুইয়া আশ্রমে চলিয়া গেলেন।

এই নারায়ণের একটি সুন্দর চিত্তাকর্ষক লীলা এইখানে উল্লেখ না করিয়া স্বস্তি বোধ করিতেছি না। শ্রীশ্রীমায়ের আদেশানুসারে আমার পৈতৃক এই নারায়ণ শিলাটিকে লইয়া আমি শ্রীমহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয়ের ভজনালয়ে বাস করিতেছি। একদিন পূজার পর বেলা অনুমান বারটার সময় খিচুড়ি পাক করিয়া নারায়ণকে ভোগ নিবেদনের পর আমি চক্ষু মুদিয়া একটু ধ্যান করিতেছি। ধ্যানটি সুন্দর জমিয়াছে। ধ্যানের মধ্যে আমি দেখিতেছি—খিচুড়ির থালার পার্শ্বে একটি মাটির হাঁড়িতে দধি রহিয়াছে।

নারায়ণ একবার দধির হাঁড়ির মধ্যে ডুব দিতেছেন, আবার ভুশ করিয়া উপরে উঠিতেছেন। এই প্রকার বারবার করিবার ফলে সারা ঘর দধির ছিটায় ভরিয়া গেল। ঐ ধ্যানের মধ্যেই আমি মাকে বলিতেছি, "দেখ তো মা! নারায়ণের কাণ্ড দেখ। এই সম্পুর্ণ ঘরটি নারায়ণ এঁটো দধি দিয়া ভরাইয়া ফেলিলেন। এই পাহাড়ের উপর এত জল আমি কোথায় পাইব যে এঁটো ধুইয়া পরিষ্কার করিব"।

শ্রীশ্রীনারায়ণ যখন এই দধিলীলা ভজনালয়ে করিতেছিলেন তখন শ্রীশ্রীমা আশ্রমে ভোগ গ্রহণ করিতেছিলেন। মার অতি পুরাতন ভক্ত এবং বাবা ভোলানাথের প্রথম মন্ত্রশিষ্য শ্রীচিন্তাহরণ সমদ্দার মহাশয়ের স্ত্রী মায়ের জন্য গোদুগ্ধ নির্মিত দধি মায়ের ভোগের কাছে লইয়া গিয়াছেন। তিনি মায়ের কাছে দধি লইয়া যাইতেই মা তাঁহাকে বলিলেন, "ভজনালয়ে নারায়ণের ভোগ নিবেদন হইতেছে। তুমি তাড়াতাড়ি গিয়া এই দধি নারায়ণকে দিয়া আস।" মায়ের এই নির্দেশের সংগে সংগে তিনি দধি লইয়া আমার ঘরের দ্বারে আঘাত করিতে লাগিলেন। আঘাতের শব্দে আমার ধ্যান ভঙ্গ হইয়া গেল। ঘরের দরজা খুলিয়া দেখি চিন্তা-হরণবাবুর স্ত্রী দধি হস্তে দ্বারে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। তিনি দধির ভাণ্ডটি আমার হাতে দিয়া বলিলেন, "নারায়ণকে ভোগ দিবার জন্য মা এই দধি পাঠাইয়া দিয়াছেন। আপনি নারায়ণকে নিবেদন করিয়া দিবেন"। আমি নারায়ণকে পুনরায় মায়ের প্রেরিত দধি নিবেদন করিয়া ভোগ দিলাম।

শ্রীশ্রীনারায়ণ যে ভজনালয়ে এই দধিলীলা করিতেছিলেন তাহা মা আশ্রমে ভোজনে বসিয়া জানিলেন কি করিয়া? শ্রীশ্রীমা ও শ্রীশ্রীনারায়ণ যে অভিন্ন এই ক্ষুদ্র ঘটনাটির দ্বারা কি অনুমান করা যায় না? ইহা কি চিন্তা করিবার বিষয় নহে! সেই সময় পরমপূজ্য শ্রীমৎ স্বামী প্রেমানন্দ তীর্থ মহারাজ তাঁহার দুইজন শিষ্য শ্রীসদানন্দ ব্রহ্মচারী ও শ্রীনরেশ ব্রহ্মচারীকে লইয়া ভজনালয়ে বাস করিতেন। তাঁহারা প্রত্যহ এই নারায়ণের প্রসাদ যাচিয়া গ্রহণ করিতেন। শ্রবিভূতিভূষণ কর নামে একটি পরম

বৈষ্ণবও সেখানে থাকিতেন, তিনিও নিত্য নারায়ণের প্রসাদ অতিশয় ভক্তি সহকারে লইতেন।

আমরা আমাদের আলোচ্য প্রসঙ্গ হইতে একটু দূরে চলিয়া গিয়াছি। পুনরায় আমাদের আলোচ্য বিষয়ে ফিরিয়া যাই। পরের দিন সকালে মায়ের আদেশমত নারায়ণশিলা গলায় বাঁধিয়া বৃন্দাবন যাত্রা করিলাম। বৃন্দাবনে গিয়া মা বর্ধমান-কুঞ্জে উঠিলেন। শ্রীযোগেন্দ্রনাথ কাব্যতীর্থ মহাশয় বর্ধমান-কুঞ্জের ম্যানেজার। মায়ের বসবাসের সকল ব্যবস্থা তিনিই করিয়া দিলেন। সেখানে গিয়াও মা কথা বলিতেছেন না—মৌনই আছেন। তাঁহার অতিশয় গম্ভীর ভাব দেখিয়া আমিও তাঁহার সঙ্গে বাক্যালাপ করিতে সাহস করিতেছি না। মায়ের এইভাবে কথা বন্ধ হওয়ায় আমরা সকলেই বিশেষ দুঃখিত। সকলের দুঃখ হইবারই কথা! কিন্তু ইহার প্রতিকারের কোন উপায়ও খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না।

এই ঘটনার পূর্বে শ্রীশ্রীমায়ের সঙ্গে আমরা দেহরাদুন হইতে অনুমান বার, তের মাইল দূরে ডোঙ্গায় জমিদার রায় বাহাদুর শ্রীশের সিং চৌধুরীর নব নির্মিত বাড়ীতে ছিলাম। তখন মা আমাকে আগামী পৌষ সংক্রান্তি বা উত্তরায়ণ সংক্রান্তি হইতে গায়ত্রী পুরশ্চরণ করিতে নির্দেশ দিয়াছিলেন। সেই শুভদিনের আর অধিক বিলম্ব নাই। কাশী গিয়া ঐদিনে আমাকে অনুষ্ঠানটি বিধিপূর্বক আরম্ভ করিতে হইবে। মায়ের সঙ্গে এই বিষয় লইয়া আলোচনা করিবার কোন সুযোগ পাইতেছি না বলিয়া আমি একটু চঞ্চল হইয়া পড়িয়াছি।

মা মৌন হইবার সাত দিন পর অষ্টম দিনের দিন অর্থাৎ যে বারে তিনি প্রথম বিন্ধ্যাচলে কথা বলা বন্ধ করিয়াছিলেন পুনরায় সেই বারের সকাল প্রায় দশটা কি এগারটার সময় মা তিনবার নারায়ণ, নারায়ণ, নারায়ণ উচ্চারণ করিয়া—আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কথা বল না কেন?" আমি অতিশয় অপরাধীর মত সসম্ভ্রমে মাকে নিবেদন করিলাম, "মা! তোমার এই প্রকার গম্ভীর ভাব দেখিয়া তোমার সঙ্গে কথা বলিতে আমার সাহস হয়

নাই। আজ একটা অতি আবশ্যকীয় কথা জিজ্ঞাসা করিবার প্রয়োজন উপস্থিত হইয়াছে।”

মা প্রশ্ন করিলেন,—কি কথা?

আমি—মা! তুমি যখন ডোঙ্গায় ছিলে তখন তুমি আমাকে আগামী উত্তরায়ণ সংক্রান্তির দিন হইতে গায়ত্রী পুরশ্চরণ করিতে আদেশ করিয়াছিলে। উত্তরায়ণ সংক্রান্তির আর তিনদিন মাত্র বাকী আছে। এখন আমি কি করিব?

মা—আজই সন্ধ্যার গাড়ীতে কাশী চলিয়া যাও। তোমার সঙ্গে যেন উদাস ও বিবেক যায়। উহাদের পরমানন্দ স্বামীর নিকট পৌঁছাইয়া দিও। উহারা দুইজনে এখন কিছু দিন মহিলাশ্রমে কাশীতে থাকিবে। (বর্তমানে শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী কন্যাপীঠের নাম পূর্বে মহিলাশ্রম ছিল। ‘কন্যাপীঠ’ নাম মুক্তিবাবা অর্থাৎ স্বামী নির্গুণানন্দজী মহারাজ রাখিয়াছিলেন।) শ্রীশ্রীমায়ের আদেশানু-সারে সেই দিনই সন্ধ্যার গাড়ীতে উদাস ও বিবেককে সঙ্গে লইয়া আমি কাশী যাত্রা করিলাম। মা সেই দিনই পুনরায় সূর্যাস্তের পূর্বে মৌন হইয়া গেলেন। প্রত্যেক বৃহস্পতি কি শুক্রবার দিন মা বেলা প্রায় এগারটার সময় মৌন ভঙ্গ করিয়া সকলের সঙ্গে কথা বলিতেন এবং সূর্যাস্তের পূর্বে আবার মৌন হইয়া যাইতেন। সকলের আবশ্যকীয় কথাবার্তা যাহা থাকিত এই কয়ঘণ্টার মধ্যেই সারিয়া লইতেন। ইহার পর এক সপ্তাহ মা মৌন হইয়া থাকিতেন। এই নিয়ম পূর্ণ দুইটি বৎসর চলিয়াছিল। এই পর্যন্ত মায়ের কঠোর ও নির্মম দিকটাই বর্ণন করা হইল। এখন তাঁহার কোমল ও মধুর ব্যবহারের দিকটা লইয়া আমরা কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

অনুমান দুই বৎসরের পরের কথা। একদিন মা ভোগের পর কাশী আশ্রমের কন্যাপীঠের নীচের গুহায় দুপুর বেলা বিশ্রাম করিতেছিলেন। গ্রীষ্মকাল কাশীতে বেলা দ্বিপ্রহরে অত্যধিক গরম পড়ায় আমি মায়ের কাছে বসিয়া একখানা তালপাতার পাখা লইয়া তাঁহাকে বাতাস করিতেছি। অপরাহ্ণ আন্দাজ তিনটা কি চারিটার সময় কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীজীবন শঙ্কর যাজ্ঞিক এবং সেখানকার রিসার্চ স্টুডেণ্ট ও শ্রীশ্রীমায়ের পুরাতন

অনুরাগী ভক্ত শ্রীগোবিন্দ গোপাল মুখোপাধ্যায় (বর্তমানে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের প্রধান অধ্যাপক) অনেকদিন পর মায়ের দর্শন অভিলাষে আসিয়াছেন। তাঁহারা উভয়েই অত্যন্ত দুঃখের সহিত মাকে বলিলেন, "মা! তোমার কাছে এত দূর হইতে আসিয়া তোমার মুখের কোন কথা শুনিতে পাই না, ইহা বড়ই দুঃখের বিষয়।" তাঁহারা দুইজনেই কিছুক্ষণ মায়ের কাছে বসিয়া অতিশয় ক্ষুণ্ণ মনে চলিয়া গেলেন। তাঁহাদের বিদায়ের সাথে সাথেই আমি করুণাময়ী শ্রীশ্রীমায়ের পা দুইখানি দুই হাতে ধরিয়া অতি কাতরভাবে নিবেদন করিলাম, "মা! আমার খুব শাস্তি হইয়াছে। এখন তুমি দয়া করিয়া তোমার মৌন ভঙ্গ কর। কথা বল। আমি লজ্জায় লোকের কাছে মুখ দেখাইতে পারিতে-ছিনা। সকলেই একবাক্যে বলিতেছে তুমি আমারই কথায় মৌন হইয়া গিয়াছ। কথা বলা বন্ধ করিয়াছ। আমার এই দুর্ণাম এখন তুমি কৃপা করিয়া ঘুচাও। আমি আর এই অপবাদ সহ্য করিতে পারিতেছি না।" আশ্চর্য! এই প্রার্থনা করিয়া মার শ্রীচরণে প্রণাম করিতেই তিনি বলিলেন, "গঙ্গা, গঙ্গা, গঙ্গা"। তিনবার গঙ্গা নাম উচ্চারণ করিবার পর সেইদিন আর কোন কথা মা বলিলেন না। পুনরায় তিনি মৌন হইয়া গেলেন। তিনবার গঙ্গা, গঙ্গা, গঙ্গা, বলা যে মায়ের মৌন ভঙ্গের পূর্ব সূচনা ইহা কোন প্রকারেই বুঝিতে পারি নাই। পরের দিন আমার সঙ্গে সাক্ষাৎকার হইলে করুণাময়ী মা অনুগ্রহ করিয়া বলিলেন, "যদি এই রকম খেয়ালটা থাকে তাহা হইলে এই শরীর (নিজেকে লক্ষ্য করিয়া) কথা বলিবে কিন্তু তোমাকে মৌন হইয়া যাইতে হইবে। দেখ, যে দিন এই শরীরটা বিন্ধ্যাচলে প্রথম মৌন হইয়াছিল সেদিন কেবলই মৌন হইবার খেয়াল হইতেছিল। তুমি একটা নিমিত্ত হইয়াছিলে মাত্র। মৌন শরীরটা আপন খেয়ালেই হইয়াছিল।" সেইদিন হইতে মা কৃপা করিয়া কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন এবং মায়ের আদেশানুসারে আমি কথা বলা বন্ধ করিয়া দিলাম। সেই মৌন অদ্যাপি মায়ের আশ্রমে কেহ না কেহ এক সপ্তাহ করিয়া রক্ষা করিয়া আসিতেছেন।

বিন্ধ্যাচলে যে দিন মা প্রথম মৌন হইয়াছিলেন সেইদিন তাঁহার চরণ ধরিয়া কথা বলিবার জন্য কতই না কাতর হইয়া বিনীত প্রার্থনা জ্ঞাপন করিয়াছিলাম। কিন্তু কোন প্রকারেই সেদিন তাঁহার মুখ হইতে একটি কথাও বাহির করিতে পারি নাই। এমনই হইয়াছিলেন তিনি সেইদিন স্নেহশূন্য ও নির্মম। আজ কাশীতে সামান্য একটু প্রার্থনা জানাইতেই করুণাময়ী শ্রীশ্রীমা করুণায় আর্দ্র হইয়া গেলেন এবং তাঁহার দুই বৎসরের মৌন এক মুহূর্তে ভঙ্গ করিয়া ফেলিলেন। তাই বলিতেছিলাম, মা যেমন বজ্র অপেক্ষাও অত্যন্ত কঠোর ও মমতাশূন্য পক্ষান্তরে তিনি কুসুম হইতেও অতিশয় কোমল ও বাৎসল্যময়ী। কোমলতা ও নির্মমতার যুগপৎ সমাবেশ কখন কখন কার্যক্ষেত্রে আমরা শ্রীশ্রীমায়ের মধ্যে দেখিতে পাই। ইহার পশ্চাতে কি যে গুহ্য কারণ থাকে তাহা কেবল মা-ই জানেন। অন্যের জানিবার কোন উপায় নাই। বিশ্বপ্রসবিনী মহামায়ার লীলারহস্য মানুষ কোন ছার—ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর পর্যন্ত উদ্‌ঘাটন করিতে সমর্থ নহেন। তাই মায়ের সম্বন্ধে চণ্ডীতে বলা হইয়াছে—

চিত্তে কৃপা সমরনিষ্ঠুরতা চ দৃষ্টা।
ত্বয্যেব দেবি বরদে ভুবনে ত্রয়েঽপি ॥

হৃদয় তোমার মুক্তিপ্রদানে ব্যগ্র এবং সীমাহীন দয়ায় পরিপূর্ণ অথচ যুদ্ধক্ষেত্রে তুমিই কঠোরতায় মৃত্যুসদৃশ। ত্রিভুবনে এইরূপ বিরুদ্ধ গুণের একত্র সমাবেশ একমাত্র তোমাতেই দৃষ্টিগোচর হয়। হে দেবি! হে বরদে! তোমার কীর্তি এই ত্রিভুবনে কে বর্ণন করিতে পারে? তুমি মা! মানববুদ্ধির অগোচর। এমন মাকে জানিতে কি বুঝিতে যাওয়ার সাহসকে বলিহারি!

মাতৃ-লীলা

১

মায়ের কাজের মতলব বোঝা ভার।
মা কি যে করেন, কেনই বা করেন,
ভেবে ভেবে রাত হ'লো কাবার।
মায়ের কাজের মতলব বোঝা ভার।

২

মায়ের জন্য ব্যাকুল যারা, পায় না কাছে আসতে তারা,
মায়ের আমার একি ব্যবহার।
মায়ের কাজের মতলব বোঝা ভার।

৩

মা খাবেন আজি সকাল সকাল, আবার খেতে চান না হ'লেও বিকাল,
মায়ের আমার অদ্ভুত কারবার।
মায়ের কাজের মতলব বোঝা ভার॥

৪

মা আমার লজ্জাশীলা লজ্জাবতী, যাঁর দেখতে পাই না পায়ের নখের জ্যোতি,
তিনিই আবার কাপড় ছেড়ে, চাদর বেঁধে দেখান রূপের বাহার।
মায়ের কাজের মতলব বোঝা ভার॥

৫

মায়ের ঘরের বেড়া ছুঁলে, কাঁদেন শুচি গেল ব'লে,
তিনিই আবার খানা খেতে, চান যেতে ঘরেতে মোল্লার।
মায়ের কাজের মতলব বোঝা ভার॥

৬

মা করেন যখন গঙ্গাপান, তখন কোন মেম যদি ঘরে যান,
দিবা নিশি মা থাকেন অনাহার।
মায়ের কাজের মতলব বোঝা ভার॥

৭

আবার ছত্রিশ জাতকে একত্রেতে, দিচ্ছেন প্রসাদ নিজের হাতে,
সেই প্রসাদই তারা পুনঃ মুখে দিচ্ছে মার।
মায়ের কাজের মতলব বোঝা ভার॥

৮

মায়ের শুদ্ধাচারের বলিহারি, তাঁর রন্ধন করেন সব ব্রহ্মচারী,
তিনিই আবার খাইতে যান কুকুরের খাবার।
মায়ের কাজের মতলব বোঝা ভার॥

৯

পতিব্রতা মা জননী, নারীকুলের শিরোমণি,
তিনিই আবার পতি ম'লে, সিন্দুরপরে হাসেন চমৎকার।
মায়ের কাজের মতলব বোঝা ভার॥

১০

পুত্র* মরিলে কাতর হ'য়ে, উঠতে চান না থাকেন শুয়ে,
পুত্রশোকে মা যে আমার থাকেন অনাহার।
মায়ের কাজের মতলব বোঝা ভার॥

১১

তিনিই পুনঃ মাসেক পরে, মৌজে বেড়ান দেশটা জুড়ে,
মায়ের কাজের কেহ ক'রোনা বিচার॥
মায়ের কাজের মতলব বোঝা ভার॥

১২

মেয়েদের মা দেন না বিয়ে, ছেলেদের জন্য খোঁজেন মেয়ে,
দিদির গলায় পৈতা পরান, রাখান মাথায় শিখা গোলাকার।
মায়ের কাজের মতলব বোঝা ভার॥

১৩

মা পত্নী ছাড়িয়ে আনেন পতি, পতি ছেড়েও আসেন সতী,
মায়ের লীলার নাইকো পারাবার।
মায়ের কাজের মতলব বোঝা ভার॥

---

* বাবা ভোলানাথের আদেশে শ্রীশ্রীমা শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র রায় "ভাইজীকে" ধর্মপুত্ররূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন।

১৪

মা মেয়েদের করেন ছিন্নকেশী, ছেলেরা সব আজ এলোকেশী,
কতই খেলা আরো দেখবো যে তাঁহার।
মায়ের কাজের মতলব বোঝা ভার।

১৫

ভালমানুষ সব এলে কাছে, রাখেন তাদের সবার পাছে,
দুষ্টু ছেলে কতই আবার আদর পাচ্ছে মার।
মায়ের কাজের মতলব বোঝা ভার॥

১৬

মায়ের বারান্দায় সব নরনারী, স্থানাভাবে ঠেলাঠেলি,
মায়ের ঘরটি জুড়ে ব'সে একা পাকা লম্বা দাড়ি যার*।
মায়ের কাজের মতলব বোঝা ভার॥

১৭

মায়ের বিপরীত সব কাণ্ড দেখে, বিশ্বাস কি আর গো থাকে,
এমন মাকে বুঝতে যে চায়, তার সাবাস অধিকার।
মায়ের কাজের মতলব বোঝা ভার॥

১৮

ভাবতে ভাবতে মাথা গরম, লিখতে চায় না থামল কলম,
মায়ের কাজের যেন না করি বিচার।
মায়ের কাজের মতলব বোঝা ভার॥

---

* ডাক্তার গোপাল প্রসাদ দাসগুপ্ত মায়ের ঘরে একলা বসিয়া তাঁহার সঙ্গে কথা বলিতেন। অন্য সকলকে মায়ের ঘরের অপরিসর ছোট বারান্দায় দাঁড়াইয়া থাকিতে হইত। ঘরে যাইবার অনুমতি ছিল না।

শ্রীশ্রীমায়ের অদ্ভুত আকর্ষনী শক্তি

শ্রীশ্রীমায়ের সংস্পর্শে আসিবার পর হইতে তাঁহার অসাধারণ আকর্ষণী শক্তি ক্রমশঃ ক্রমশঃ অনুভব করিতে লাগিলাম। যতটা অধিক সময় তাঁহার চরণ প্রান্তে বসিবার সুযোগ পাইতাম তাহা পারতপক্ষে বড় ছাড়িতাম না। যেমন পতিতপাবনী মা গঙ্গার পবিত্র জলে অবগাহন করিলে মানবের দেহ, মন ও প্রাণ পূত এবং শীতল হইয়া যায় তেমনি মায়ের নিকট বসিলে অন্ততঃ পক্ষে সেই সময়ের জন্যও যে সর্ব শরীর, মন ও প্রাণ বিশুদ্ধ হয় তাহা ভালভাবেই অনুভব করিতে লাগিলাম। যতটা সময় তাঁহার সান্নিধ্যে থাকা যায়, ততটাকাল যে মনে কোন প্রকার পঙ্কিল চিন্তা, আসে না—আসিলেও যে মায়ের পবিত্র প্রভাবে তাহা অধিকক্ষণ স্থায়ী হইতে পারে না তাহা মর্মে মর্মে হৃদয়ঙ্গম করিতে লাগিলাম এবং সঙ্গে সঙ্গে একটা আনন্দ ও মনের স্থৈর্য উপলব্ধি করিতে আরম্ভ করিলাম। পরমহংস ঠাকুর রামকৃষ্ণ বলিতেন—'যাঁহার কাছে গেলে মন শান্ত হয় এবং ভগবানের নাম কিংবা ইষ্টমন্ত্র জপ স্বতঃই স্ফুরিত হয় তাঁহাতেই ভগবানের বিশেষ প্রকাশ জানিবে।'

যেমন যেমন শ্রীশ্রীমায়ের সঙ্গে একটু একটু করিয়া ঘনিষ্ঠরূপে মিশিতে লাগিলাম তেমন তেমন আমার সঙ্কোচ ভাবটাও ধীরে ধীরে হ্রাস পাইতে লাগিল। এই মা হইতে যে জগতে কোন আপনজন থাকিতে পারে কোন রকমেই তাহা বহু চিন্তা করিয়াও মনে আনিতে পারিতাম না। যেমন যেমন মায়ের উপর মমত্ব বাড়িতে লাগিল তেমন তেমন সংসারের অপর সকলের উপর আসক্তি যে ক্ষীণ হইতে ছিল তাহা বেশ বুঝিতে পারিতেছিলাম। মায়ের প্রতি শ্রদ্ধালু ব্যক্তিদের কাহারও সঙ্গে সাক্ষাৎকার হইলে কেবল মায়ের কথাই বলিতাম। তাঁহার সম্বন্ধে একই কথা বার বার বলিলেও কোন প্রকার অরুচি বা বিরক্তি আসিত না।

মায়েয় বিষয় লইয়া কথা বলার নেশাটা যেন আমাকে পাইয়া বসিয়াছিল। সন্ধ্যার পর প্রায় প্রত্যহই শ্রীমৎ স্বামী শঙ্করানন্দ সরস্বতী ও আমি শ্রীযুক্ত নির্মলবাবুর বাড়ীতে মায়ের সংবাদের জন্য যাইতাম। সেখানে আমরা কয়েকজন এক সঙ্গে বসিয়া মায়ের বিষয় লইয়া আলোচনা করিতাম। এইভাবে শ্রীশ্রীমা কখন যে অলক্ষিতভাবে আমার হৃদয় ও মন অধিকার করিয়া বসিলেন তাহা আমি জানিতেও পারিলাম না।

মানুষকে আকর্ষণ করিবার মায়ের অদ্ভুত শক্তি। এই শক্তি দেখিয়াই কেহ কেহ বলিয়া থাকেন শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী বশীকরণ বা বিমোহন মন্ত্র জানেন। একবার যে মাকে একটু অন্তরঙ্গভাবে পাইয়াছে সে-ই মুগ্ধ হইয়াছে। বিভিন্ন জাতির, ভিন্ন প্রকৃতির, ভিন্ন ভিন্ন সংস্কারের ও রুচির নরনারীকে মা খুব অল্প সময়ের মধ্যেই এমন আপন করিয়া লন যে মনে হয় যেন তিনি কত কালের পরিচিত এবং কতই না নিকট ও ঘনিষ্ঠ আত্মীয়। বালক, বৃদ্ধ, যুবক, স্ত্রী কিংবা পুরুষ যে কেহ তাঁহার সংস্পর্শে একবার বিশেষভাবে আসিয়াছেন তিনিই মনে করেন মা আমাকেই সব চাইতে অধিক ভালবাসেন। ইহাও প্রত্যক্ষ করিয়াছি,—কি বালক, কি বৃদ্ধ, কি স্ত্রী, কি পুরুষ সকলেই মায়ের স্নেহ, আদর ও ভালবাসা পাইবার জন্য লালায়িত। দুই চারি দিন তাঁহার নিকট হইতে ভালবাসা ও আদর না পাইলে ছোটদের তো দূরের কথা বড়দের পর্যন্ত মায়ের উপর কত যে অভিমান হয় তাহার আর সীমা নাই। আমার তো মনে হয় শ্রীভগবানকে জানিবার বা চিনিবার ইহা একটি প্রকৃষ্ট ও সহজ উপায়, তাঁহাকে আপন মনে করা। কারণ একমাত্র তিনিই তো জীবের হৃদয়ে আত্মারূপে নিবাস করিতেছেন এবং আত্মাই হইল সব হইতে সকলের অতি প্রিয়। কঠোপনিষদে শ্রুতি ভগবতী বলিতেছেন—

> "আত্মাঽস্য জন্তোর্নিহিতো গুহায়াম্।" ১।২।২০
>
> "অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষোঽন্তরাত্মা সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ।" ২।৬।১৭
>
> "এই আত্মা প্রত্যেক জীবের হৃদয়-গুহায় অবস্থিত।"

"অঙ্গুষ্ঠপরিমিত অন্তরাত্মা পুরুষ সর্বজনের হৃদয়ে সর্বদা অবস্থিত আছেন। একটু স্থির হইয়া বিচার করিলে অতি সহজেই অনুধাবন করা যায়—এই জগতে পিতা মাতা, ভাই ভগিনী, স্ত্রী পুত্র, সখা স্বামী, প্রভু সেবক, এমন কি আপন শরীর ও ইন্দ্রিয়াদি অপেক্ষাও আত্মা অধিক প্রিয়। আত্মার প্রিয়তার জন্যই আমরা জগতের সকলকে ভালবাসিয়া থাকি। একটি প্রসিদ্ধ কিংবদন্তি আছে, "আত্মানং সততং রক্ষেৎ ধনৈরপি দারৈরপি।" ভগবতী শ্রুতি সেইজন্য উদাত্তস্বরে ঘোষণা করিতেছেন—

স হোবাচ ন বা অরে পত্যুঃ কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবত্যাত্মনস্তু কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি। ন বা অরে জায়ায়ৈ কামায় জায়া প্রিয়া ভবত্যাত্মনস্তু কামায় জায়া প্রিয়া ভবতি। ন বা অরে পুত্রাণাং কামায় পুত্রাঃ প্রিয়া ভবন্ত্যাত্মনস্তু কামায় পুত্রাঃ প্রিয়া ভবন্তি। ন বা অরে বিত্তস্য কামায় বিত্তং প্রিয়ং ভবত্যাত্মনস্তু কামায় বিত্তং প্রিয়ং ভবতি। ন বা অরে ব্রহ্মণঃ কামায় ব্রহ্ম প্রিয়ং ভবত্যাত্মনস্তু কামায় ব্রহ্ম প্রিয়ং ভবতি। ন বা অরে ক্ষত্রস্য কামায় ক্ষত্রং প্রিয়ং ভবত্যাত্মনস্তু কামায় ক্ষত্রং প্রিয়ং ভবতি। ন বা অরে লোকানাং কামায় লোকাঃ প্রিয়া ভবন্ত্যাত্মনস্তু কামায় লোকাঃ প্রিয়া ভবন্তি। ন বা অরে দেবানাং কামায় দেবাঃ প্রিয়া ভবন্ত্যাত্মনস্তু কামায় দেবাঃ প্রিয়া ভবন্তি। ন বা অরে ভূতানাং কামায় ভূতানি প্রিয়াণি ভবন্ত্যাত্মনস্তু কামায় ভূতানি প্রিয়াণি ভবন্তি। ন বা অরে সর্বস্য কামায় সর্বং প্রিয়ং ভবত্যাত্মনস্তু কামায় সর্বং প্রিয়ং ভবতি। আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যো মৈত্রেয়্যাত্মনো অরে দর্শনেন শ্রবণেন মত্যা বিজ্ঞানেনেদং সর্বং বিদিতম্॥ বৃহদারণ্যকোপনিষৎ ॥২।৪।৫

ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য তাঁহার প্রিয় পত্নী মৈত্রেয়ীকে বলিলেন যাহা দ্বারা অমরত্ব লাভ করা যায় তাহা যখন আমি তোমার নিকট ব্যাখ্যা করিতে থাকিব, তখন তুমি উহার অর্থ নিশ্চিতরূপে নিদিধ্যাসন বা ধ্যান করিতে যত্ন করিও।

"হে প্রিয়ে! পতির জন্যই যে পতি জায়ার প্রিয় হন তাহা

নহে; পত্নীর আপনার প্রয়োজনেই পতিপ্রিয় হন। হে প্রিয়ে! পত্নীর জন্যই যে পত্নী পতির প্রিয় হন তাহা নহে; পতির আত্ম-প্রয়োজনেই পত্নীপ্রিয় হন। হে প্রিয়ে! পুত্রদিগের জন্যই যে পুত্রগণ পিতামাতার প্রিয় হয় তাহা নহে; পিতামাতার আত্মপ্রয়োজনেই পুত্রগণ প্রিয় হয়। হে প্রিয়ে! সম্পদের জন্যই যে সম্পদ্ প্রিয় হয় তাহা নহে; মানুষের আত্মপ্রয়োজনেই সম্পদ্ প্রিয় হয়। হে প্রিয়ে! ব্রাহ্মণের জন্যই যে ব্রাহ্মণ অপরের প্রিয় হন তাহা নহে; অন্যের আত্মপ্রয়োজনেই ব্রাহ্মণ প্রিয় হন। হে প্রিয়ে! ক্ষত্রিয়ের জন্যই যে ক্ষত্রিয় অপরের প্রিয় হন তাহা নহে; অন্যের আত্মপ্রয়োজনেই ক্ষত্রিয় প্রিয় হন। হে প্রিয়ে! লোকসমূহের জন্যই যে লোকসমূহ জীবগণের প্রিয় হয় তাহা নহে; জীবগণের আত্মপ্রয়োজনেই লোকসমূহ প্রিয় হয়। হে প্রিয়ে! দেবগণের জন্যই যে দেবগণ যাজ্ঞিকাদির প্রিয় হন তাহা নহে; যাজ্ঞিকাদির আত্মপ্রয়োজনেই দেবগণ প্রিয় হন। হে প্রিয়ে! ভূতবর্গের জন্যই যে ভূতবর্গ প্রিয় হয় তাহা নহে; আত্মার জন্যই ভূতগণ প্রিয় হয়। হে প্রিয়ে! সর্ববস্তুর জন্যই যে সর্ববস্তু প্রিয় হয় তাহা নহে; আত্মার জন্যই সর্ববস্তু প্রিয় হয়। হে প্রিয়ে মৈত্রেয়ি! আত্মাই দ্রষ্টব্য, শ্রোতব্য, মন্তব্য ও নিশ্চিতরূপে ধ্যেয়। হে প্রিয়ে! শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনের দ্বারা আত্মার দর্শন হইলে তদ্দ্বারাই এই সমস্ত বিদিত হয়।"

এই কারণেই আমাদের শ্রীশ্রীমাকে সকলে অতিশয় প্রিয় ও আপনজন বলিয়া মনে করে এবং ভালবাসে। কারণ মা-ই যে সকলের হৃদয়-গুহায় আত্মারূপে বিরাজ করিতেছেন। মা-ই সকল জীবের আত্মা এবং আত্মাই মা। মা এবং আত্মা অভিন্ন বা এক। আবার অনাম ও অরূপেও মা-ই।

কেবল যে আমাদের দেশের লোকই মায়ের প্রতি আকৃষ্ট হন ও তাঁহাকে ভালবাসেন তাহাই নহে। পক্ষান্তরে বিদেশী লোক, যাঁহারা মায়ের কথা বোঝেন না, মায়ের বিষয় কিছু জানেন না, তাঁহাদের মধ্যেও কেহ কেহ মাকে দেখিয়া এমন ভাবে মুগ্ধ হইয়াছেন যে তাঁহারা আপন দেশ, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ও

উপজীবিকাদি সব কিছু পরিত্যাগ করিয়া নানাপ্রকার ক্লেশ স্বীকার করিয়াও তাঁহার পদতলে পড়িয়া আছেন। আমার মনে হয় ইহাই হইল শ্রীশ্রীমায়ের সব হইতে বড় বিভূতি। অবাক্ হইতে হয় মায়ের প্রতি ইহাদের অনুরাগ দেখিয়া। দেশ বিদেশের নানা অবস্থার, নানা প্রকৃতির, নানা সংস্কারের ও নানা রুচির নরনারী-সকল কিভাবে দিন-দিন তাঁহার প্রতি প্রগাঢ়রূপে আকৃষ্ট হইয়া পড়িতেছেন দেখিয়া বিস্ময়ে বিমুগ্ধ হইতে হয়।

কেবল মানুষই যে মায়ের প্রতি আকৃষ্ট হয় তাহাই নহে, মূক পশুও মাকে দেখিবার জন্য, তাঁহার নিকট আসিবার জন্য ও তাঁহার আদর ও ভালবাসা পাইবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া তাঁহার কাছে ছুটিয়া আসে। একটি ঘটনা উদাহরণস্বরূপ এখানে উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিতেছি না। শ্রীশ্রীমায়ের যে কি অপূর্ব শক্তি তাহা যত দেখিতেছি ততই মুগ্ধ হইতেছি।

বাঙ্গলা ১৩৫৮ সনের ফাল্গুন মাসে (১৯৫১ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে) আমরা অনেকেই শ্রীশ্রীমায়ের সহিত বৃন্দাবনে আছি। তখনও বৃন্দাবনে মায়ের বর্তমান আশ্রম নির্মিত হয় নাই। বৃন্দাবনের প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব সাধু ও মহাপ্রভু শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেবের পরমভক্ত শ্রীহরিবাবাজী মহারাজের আশ্রমের অতি নিকটে এক বাড়ীতে মায়ের থাকিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। আমরাও অনেকেই তাঁহার সঙ্গে সেই বাড়ীতেই বাস করিতেছি। শ্রীহরিবাবাজীর বিশেষ আগ্রহেই মায়ের সেখানে যাওয়া হইয়াছে। যতটা আমার মনে পড়ে শ্রীহরিবাবা মহারাজজীর শুভ জন্মোৎসব উপলক্ষ্য করিয়া মায়ের বৃন্দাবন গমন। মা প্রত্যহই তিনবার শ্রীহরিবাবার সৎসঙ্গে নিয়মিতরূপে গমন করিয়া থাকেন।

একদিন বেলা অনুমান এগারটার সময় সৎসঙ্গের "রাসলীলা" সমাপ্ত হইবার পর আশ্রমের পশ্চিম-দিকের ছোট দরজা দিয়া মা তাঁহার থাকিবার ঘরে যাইতেছেন। আমরাও সকলে মায়ের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের অবস্থানের নির্দিষ্ট স্থানে যাইতেছি। যেই আমরা সকলে মায়ের পশ্চাতে আশ্রম হইতে গলিতে নামিয়াছি, দেখি উত্তরদিক হইতে একটি কৃষ্ণবর্ণের হৃষ্ট-পুষ্ট সুন্দর গাভী পুচ্ছ উচ্চ

করিয়া ছুটিতে ছুটিতে আমাদের দিকে আসিতেছে। গরুটি আমাদের অভিমুখে দৌড়াইয়া আসিতেছে দেখিয়া আমরা সকলে দুইভাগ হইয়া উহাকে যাইবার জন্য পথ ছাড়িয়া দিলাম। গাভীটি কিন্তু ছুটিয়া আসিতে আসিতে হঠাৎ শ্রীশ্রীমায়ের সম্মুখে থমকিয়া দাঁড়াইয়া গেল। ইহা দেখিয়া আমরা মাকে লইয়া বাড়ীর দরজার ভিতর প্রবেশ করিতে লাগিলাম। গরুটিও মায়ের পিছনে পিছনে দরজার মধ্যে যাইতে উদ্যত হইল। উহাকে কোন রকমেই আমরা বাধা দিতে পারিতেছিলাম না। যতই আমরা উহার গতি রোধ করিবার চেষ্টা করিতেছিলাম ততই গাভীটি ভিড়ের মধ্য দিয়া লোকজনকে ঠেলিয়া মায়ের ঘরের ভিতর যাইবার নিমিত্ত যেন পাগল হইয়া উঠিল। লোকের ঠেলাঠেলির মধ্যে মা কোন ফাঁকে যেন তাঁহার ঘরে আসিয়া তাঁহার বিছানার উপর বসিয়া পড়িয়াছেন। গরুটিও লোকজনকে ধাক্কা দিয়া সরাইয়া মায়ের ঘরের দরজার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। মা আপন বিছানা হইতে উঠিয়া আসিয়া উহার কপালে হাত বুলাইতে বুলাইতে আদর করিয়া বলিলেন, "এই তো মা দেখা হইল। এখন এসো তো মা, এখন এসো।" মায়ের আদর পাইয়া এবং তাঁহার বরদহস্তের স্নেহমাখা স্পর্শসুখ অনুভব করিয়া গরুটি শান্ত হইয়া ধীরে ধীরে যেদিক হইতে আসিয়াছিল সেইদিকে আপন মনে চলিয়া গেল। গাভীটি যেন মায়ের আদর ও স্নেহ প্রাপ্ত হইবার কারণেই ব্যাকুল হইয়া ছুটিয়া আসিয়াছিল।

মহাপুরুষদের মুখে শুনিয়াছি এবং ভাগবতাদি পুরাণেও পড়িয়াছি দ্বাপরযুগে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনে নানাপ্রকার গোষ্ঠলীলা করিতেন। সেইসময় ধেনুবৎস সকল শ্রীগোবিন্দের বংশীধ্বনি ও সুমধুর ডাক শুনিয়া তাঁহার নিকট ছুটিয়া আসিয়া দাঁড়াইত। যাহা শুনিয়াছিলাম এবং গ্রন্থাদিতে পড়িয়াছিলাম তাহাই আজ স্বচক্ষে দর্শন করিলাম। তবুও সন্দিগ্ধ বা অবিশ্বাসী মন কিছুতেই মানিতে চাহে না, বিশ্বাস করিতে রাজী নহে সেই শ্রীভগবানই আজ কলিযুগের অধম জীবকে উদ্ধার করিতে স্নেহমধুর মাতৃরূপ ধারণ করিয়া এই ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়াছেন।

মা হইয়া অবতরণের কারণ—বর্তমান যুগে জড়বাদী মানবদিগকে শাসন দ্বারা ধর্মপথে আনা কোন রকমেই সম্ভব নহে। কেবল স্নেহ, আদর ও ভালবাসা দিয়াই শনৈঃ শনৈঃ সন্দিগ্ধচিত্ত জীবকে ধর্মের দিকে আনয়ন করা হয় তো কিছুটা সম্ভবপর হইতে পারে। সেইজন্যই জগন্মাতা সন্তানদের প্রতি অনুকম্পা করিবার নিমিত্ত শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ীরূপে আগমন করিয়াছেন। এত দেখিয়া শুনিয়াও হতভাগ্য জীবের অবোধ মন কিছুতেই বিশ্বাস করিতে সম্মত নহে যে এই মা-ই সেই সনাতনী বিশ্বজননী। জীবের স্বভাবই অবিশ্বাস করা—জগদ্ধাত্রী মা সর্বদা বলিয়া থাকেন; "জীবত্ব বুদ্ধি থাকা পর্যন্ত মানুষ কখনও সম্পূর্ণভাবে কাহাকেও বিশ্বাস করিতে পারে না। সেইজন্য কাহাকেও কোন প্রকার দোষ দেওয়া যায় না। ইহাই হইল জীবস্বভাব।"

নির্গুণ, নিরুপাধি, নিষ্ক্রিয় ব্রহ্মকে মানা বা স্বীকার করা সহজ কিন্তু সগুণ, সোপাধি, মনুষ্যকে ভগবান বলিয়া স্বীকার করা বা মানিয়া লওয়া বড়ই কঠিন। জীবের বুদ্ধি পরিশুদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত পুরাপুরি বিশ্বাস আসিতে পারে না। ক্ষণিকের জন্য বিশ্বাস আসিলেও পূর্ব-সংস্কারবশতঃ তাহা স্থায়ী হইতে দেয় না। শরীরধারী মানুষকে, যিনি আমাদের ন্যায় সর্বপ্রকার লোক-ব্যবহার করিতেছেন তাঁহাকে ভগবান বলিয়া স্বীকার করা কি চারটি খানি কথা। ইহার জন্যই চিত্ত-শুদ্ধির এত মাহাত্ম্য আমাদের সর্বশাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে।

শ্রীশ্রীমায়ের মহিমা

১

তোমারি মহিমা গায় চরাচর,
মাগো, বিশ্বভুবন মাঝে।
দেবতা মানব পশুপাখী গায়
দিবস রজনী সাঁঝে ॥

২

আকাশে বাতাসে গুঞ্জরিছে সদা,
মাগো, তোমারি মহিমা গান।
নদ-নদী নির্ঝরিণী গায়,
তুলিয়া মোহন তান ॥

৩

যত দেববালা ল'য়ে ফুলডালা,
মা, করিছে গো পূজা তব।
মাগো, লহ লহ মোর জীবন-অর্ঘ্য,
জানি না, কেমনে তোমারি হব ॥

৪

তরুলতা আর মহামহীরুহ,
মাগো, নীরবে করিছে স্তুতি।
ধ্যানী জ্ঞানী যত ঋষি মুনি,
তব চরণে করিছে নতি ॥

৫

পাহাড় পর্বত গিরিমালা যত,
তব স্মরণ করিছে ধ্যানে।
বেদ পুরাণ গীতা ভাগবত,
তোমার মহিমা ঘোষিছে গানে ॥

৬

চন্দ্র সূর্য আর যত নীহারিকা,
মাগো, আরতি করিছে তব।
হৃদয়বাসিনী হে মোর দেবতা,
তোমার চরণে সঁপিনু সব ॥

৭

হিমাদ্রি সুমেরু ওহে বিন্ধ্যাচল,
গ্রীবা উচ্চ করি কি হেরিছ বল।
দেখেছ কি মায়ের শ্রীমুখকমল,
যাহার মাধুর্যে আজ জগৎ পাগল ॥

৮

লহ লহ মোরে তোমারি করিয়া,
মাগো, ঠেলিও না আমায় পায়।
জানি জানি, তোমার কত যে করুণা,
ভোলা কি কভু গো যায় ॥

৯

আমি বুঝিয়াছি মাগো, তুমি কত যে দয়াল,
সবে ডেকে ডেকে লও কোলে।
আমায়, কাঙাল বলিয়া ক'রো না গো হেলা,
মোরে, রেখো গো চরণতলে ॥

* * *

বিদেশী মানুষও শ্রীশ্রীমাকে কি রকম যে ভালবাসেন তার একটি দৃষ্টান্ত এখানে উল্লেখ করিতে প্রয়াস করিতেছি। বাঙ্গালা ১৩৬৪ সনের (১৯৫৭ খৃষ্টাব্দের) গুরুপূর্ণিমার পর মা দেহরাদুন হইতে কাশী আসিয়া আশ্রমে বাস করিতেছেন। সেই সময় একদিন দুপুরবেলা একজন মার্কিনদেশীয় প্রৌঢ় সাহেব ও একটি মেম মাকে দর্শন করিবার মানসে আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মা তখন ভোগের পর তাঁহার দোতালার ছোট্ট শয়নকক্ষটিতে বিশ্রাম করিতেছিলেন। তখন দর্শনার্থীদের কাহারও তাঁহার সঙ্গে দেখা করিবার সময় নহে। যখনকার এই ঘটনা তখন মায়ের সঙ্গে

সকলের সাক্ষাতের নির্দিষ্ট সময় ছিল বৈকাল পাঁচটার পর। মায়ের দর্শনের নির্ধারিত সময় যে অপরাহ্ণ পাঁচ ঘটিকার পর তাহা ঐ সাহেব ও মেমকে জানান হইল। তাঁহারা উভয়ে বৈকাল পাঁচটা পর্যন্ত অপেক্ষা করিতে প্রস্তুত, তথাপি মাকে না দেখিয়া তাঁহারা যাইবেন না। তাঁহারা দুইজনেই শ্রীশ্রীমাকে দর্শন করিয়া সেই দিনই কাশী ত্যাগ করিয়া অন্যত্র চলিয়া যাইবেন। তাঁহারা ইহাও জানাইতে ভুলিলেন না যে শ্রীশ্রীমায়ের সাক্ষাৎকারের নিমিত্তই তাঁহাদের কাশী আগমন। কাশীতে তাঁহাদের অন্য কোন কাজ নাই।

আশ্রমবাসিনী কোন এক মহিলা এই সংবাদটি মায়ের নিকট দয়া করিয়া পৌঁছাইলেন। সাহেব ও মেম বিকাল পাঁচটা পর্যন্ত অপেক্ষা করিতে রাজী তবুও মায়ের সঙ্গে দেখা না করিয়া তাঁহারা আশ্রম ছাড়িয়া যাইবেন না তাঁহাদের এই কথা শুনিয়া এবং দর্শনের আগ্রহ বিবেচনা করিয়াই মনে হয় করুণাময়ী শ্রীশ্রীমা উহাদের মায়ের বিশ্রামের স্থানেই লইয়া যাইবার জন্য অনুমতি প্রদান করিয়া স্বয়ং বিছানার উপর উঠিয়া বসিলেন। আগন্তুকেরা মনেও ভাবেন নাই যে এই অসময়ে মায়ের দর্শন পাওয়া সম্ভব হইবে। মায়ের আদেশানুসারে আশ্রমের কেহ গিয়া মেম ও সাহেবকে জানাইল যে এখনই তাঁহাদের মাতৃ-দর্শন হইবে। অপ্রত্যাশিতভাবে এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া মার্কিন দম্পতি পরমানন্দে হাসিতে হাসিতে মায়ের বিশ্রামের ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা আসিয়া দেখিলেন মা তাঁহার শয্যার উপর স্থির হইয়া বসিয়া আছেন। একজন দোভাষীর মাধ্যমে মায়ের কথা তাঁহাদের এবং তাঁহাদের কথা মাকে বুঝাইয়া দেওয়া হইতেছিল। মা কথায় কথায় আপন শরীরটিকে দেখাইয়া বলিলেন, your baby অর্থাৎ "তোমাদের ছোট্ট বাচ্চা।" এখানে উল্লেখ করা আশাকরি খুব বেশী অপ্রাসঙ্গিক হইবে না, যে মা আজকাল মাঝে মাঝে এইরূপ দুই-চারিটি ইংরাজী শব্দ বলিয়া থাকেন। বলা বাহুল্য শব্দগুলি যথাস্থানে প্রয়োগ ও যথাযথভাবে উচ্চারণ করিতে দেখিয়া অনেকেই বিশ্বাস করিতে পারেন না যে তিনি ইংরাজী ভাষা আদৌ জানেন না।

আর যাইবে কোথায়! শ্রীশ্রীমায়ের মুখ হইতে এই শব্দ দুইটি বাহির হইবার সঙ্গে সঙ্গে মেমটি মায়ের কাছে গিয়া তাঁহাকে ধরিয়া আপন ছোট মেয়েটির মত খুব আদর করিতে লাগিলেন। মাতৃস্নেহে মেমটি একেবারে আত্মহারা হইয়া উঠিলেন এবং বাৎসল্যরসের বন্যায় তাঁহার হৃদয় প্লাবিত হইয়া গেল। বহুকাল পরে স্বীয় গর্ভজাত সন্তানকে পাইয়া যেমন গর্ভধারিণীর অপত্যস্নেহ উথলিয়া উঠে তেমনি শ্রীশ্রীমাকে প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার ভালবাসা উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। মেমটি কি ভাবে যে তাঁহার হৃদয়ের প্রেম প্রকাশ করিবেন তাহা যেন তিনি বুঝিতে পারিতে ছিলেন না। ভালবাসার আতিশয্যে বা আধিক্যে এমনই তিনি বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছিলেন।

সাহেবটি স্থিরভাবে বসিয়া দেখিতেছিলেন তাঁহার পত্নীর আন্তরিক ভালবাসার অভিব্যক্তি। তিনিও তাঁহার হৃদয়ের গভীর প্রেম আর চাপিতে না পারিয়া শ্রীশ্রীমায়ের নিকটে গিয়া তাঁহার মাথাটি নিজের কাঁধের উপর রাখিয়া এমন মমতার সহিত আদর করিতে লাগিলেন যেন সত্যই তাঁহার ছোট কন্যাটিকে দীর্ঘকাল পর ফিরিয়া পাইয়াছেন। এই ব্যবহারের মধ্যে কোথায়ও ছিল না একফোঁটা কৃত্রিমতা বা লোক দেখান ভাব। ইহা ছিল পরিপূর্ণ বিশুদ্ধ বাৎসল্য প্রেম। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ মহাশয় বলিতেন যে কোন জ্ঞান, যে কোন ভালবাসা পূর্ণতা প্রাপ্ত হইলে তাহাই ভগবৎ-জ্ঞানে ও ভগবৎ-প্রেমে পরিণত হয়। মার্কিনদম্পতির শ্রীশ্রীমায়ের প্রতি এই পবিত্র ও নিঃস্বার্থ ভালবাসা জগতে অতিশয় দুর্লভ। অনেকক্ষণ পর্যন্ত তাঁহারা দুইজনে নীরবে বসিয়া অনিমেষ নয়নে শ্রীশ্রীমাকে—তাঁহাদের 'বেবীকে' দেখিতেছিলেন। মাকে অবলোকন করিয়া তাঁহাদের আর আশা মিটিতেছিল না। মাকে কেবল তাঁহাদের দেখার নেশায়ই দেখিতে-ছিলেন—এই দেখার মধ্যে কোথাও কোন প্রকার স্বার্থের বা মতলবের নাম-গন্ধও ছিল না। মাকে দেখিতে দেখিতে যেন তাঁহারা একেবারে সমাহিত হইয়া পড়িলেন। কিছু সময় এইরূপ ভাবে-নিমগ্ন থাকিয়া তাঁহারা পুনরায় ফিরিয়া আসিলেন আমাদের

এই প্রাকৃতিক জগতে। তখন পতি-পত্নীর মুখে এক অপূর্ব স্বর্গীয় সুষমা ভাসিয়া উঠিল।

শ্রীশ্রীমায়ের নিকট হইতে উহারা বিদায় লইবার সময় দুই জনেরই চোখের কোণে দেখা গেল সন্তানের প্রতি পিতামাতার বাৎসল্য-রসের অতীব পবিত্র অশ্রুকণা। মায়ের কাছ হইতে যাইতে যেন তাঁহাদের মন চায় না। তাঁহারা যাইবার সময় এক এক পা গমন করেন আবার মায়ের সুন্দর ঢলঢল মুখখানির দিকে ফিরিয়া ফিরিয়া চাহেন এবং তাঁহাদের সজল নয়ন রুমাল দিয়া মোছেন। যেন কোন পরম আত্মীয়ের নিকট হইতে তাঁহারা কোন এক অতি দূর দেশে চিরদিনের জন্য বিদায় লইয়া যাইতেছেন। সেই বিচ্ছেদের মর্মান্তিক করুণ দৃশ্যটি অদ্যাপি আমার চোখের সম্মুখে জ্বল্‌জ্বল্‌ করিয়া ভাসিয়া আছে। তাঁহারা চলিয়া যাইবার পর পরম করুণাময়ী শ্রীশ্রীমা তাঁহাদের আন্তরিক ভালবাসার অভিব্যক্তি দেখিয়া বলিয়াছিলেন, "আজ এই সাহেব যেমন আদর করিল, এই শরীরের বাবাও কোন দিন এমন ভাবে এই শরীরটাকে আদর করেন নাই।"

* * *

কেবল যে স্থূল শরীরধারী মানুষ ও পশুই শ্রীশ্রীমায়ের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার নিকট আসিতেন তাহাই নহে। কত অশরীরী বা সূক্ষ্মশরীরধারী আত্মাও তাঁহার আকর্ষণে বিশেষরূপে আকৃষ্ট হইয়া যে আগমন করিয়া থাকেন তাহার কয়েকটি উদাহরণ নিম্নে দেওয়া যাইতেছে। গত ১৯৫৭ খৃষ্টাব্দের গরমের সময় যখন মা দেহরাদুনের কিষণপুর আশ্রমে অবস্থান করিতেছিলেন তখন তাঁহার শরীর অত্যন্ত অসুস্থ হইয়া পড়ে। এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া কাশী হইতে শ্রীশ্রীমায়ের একনিষ্ঠ ও অনুগত ভক্ত-সন্তান মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয়, সোলন হইতে মাতৃগত প্রাণ ও পরম ভক্ত বাঘাট নরেশ শ্রীদুর্গা সিংজী (যোগীভাই), বৃন্দাবন হইতে প্রসিদ্ধ গৌরভক্ত বৈষ্ণব মহাত্মা শ্রীহরিবাবাজী মহারাজ এবং পরম ভাগবত ও ত্যাগমূর্তি শ্রীকৃষ্ণানন্দ অবধূতজী প্রভৃতি মাতৃ-সন্তানগণ তাঁহার জন্য চিন্তিত ও ব্যাকুল হইয়া তাঁহাকে দেখিতে

দেহরাদুন গিয়াছিলেন। মায়ের শরীরের অবস্থা অবলোকন করিয়া আমরা তাঁহার জন্য বিশেষ ভীত ও উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়িয়াছিলাম। কিছু করিবারও উপায় ছিল না কারণ তিনি তো কোন ঔষধাদি ব্যবহার করেন না। রোগ মুক্তির জন্য কেবল তাঁহার চরণে প্রার্থনাই ছিল আমাদের একমাত্র সম্বল। কঠিন বিপদ আশঙ্কা করিয়া একদিন শ্রীঅবধূতজী বলিলেন, আজ সারারাত্রি মায়ের ঘরে বসিয়া অখণ্ডভাবে যেন জপ রক্ষা করা হয়। সেইদিনই গভীর রাত্রিতে মায়ের প্রতি অনুরাগবশতঃ যোগিবর ও ব্রহ্মনিষ্ঠ মহাপুরুষ কাশীর বিখ্যাত শ্রীত্রৈলঙ্গস্বামী মহারাজ এবং আরো কয়েকজন উচ্চকোটির জীবন্মুক্ত মহাত্মা সূক্ষ্ম শরীরে মায়ের নিকট আসিয়াছিলেন। শ্রীত্রৈলঙ্গস্বামীজী মহারাজ আসিয়া মায়ের সম্মুখে মাটিতেই বসিয়া পড়িলেন। অবশিষ্ট মহাত্মাগণ মাকে প্রদক্ষিণ করিয়া কি যে তাঁহাকে প্রার্থনা জানাইয়াছিলেন তাহা কেবল মা-ই জানেন। তবে আমরা লক্ষ্য করিয়াছিলাম ইহার পর হইতেই মায়ের অবস্থা একটু একটু ভালর দিকে পরিবর্তন হইতেছিল। আমরা ধারণা করিয়াছিলাম মহাত্মাদের কৃপাতে এবং তাঁহাদের আকুল প্রার্থনায়ই সে যাত্রা আমরা আমাদের স্নেহময়ী শ্রীশ্রীমাকে ফিরিয়া পাইয়াছিলাম।

এই ঘটনাটি অনেক পরে কথা প্রসঙ্গে আমরা মায়ের মুখে শুনিয়াছিলাম নচেৎ ইহা আমরা জানিব কি করিয়া? কখন সখন মায়ের মুখ হইতে হঠাৎ এজাতীয় ঘটনা প্রকাশ হইয়া পড়ে তাই আমরা জানিতে পারি। এই সব ঘটনা মা অনেক সময়ই গোপন রাখেন।

* * *

কয়েক বৎসর পূর্বে শ্রীশ্রীমা যখন বৃন্দাবনে অবস্থান করিতেছিলেন সেই সময় একদিন তিনি আপন খেয়ালে আশ্রমের খোলা মাঠে পায়চারি করিতে করিতে ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন। আপন ভাবে হাঁটিতে হাঁটিতে তিনি হরিকুঞ্জ, রামকুঞ্জ ও কৃষ্ণকুঞ্জের অর্থাৎ আশ্রমের দক্ষিণ দিকে আসিয়া পড়িলেন। তৎকালে শ্রীশ্রী মাকে একান্তে পাইয়া সেখানকার একখানা বড় পাথর হইতে মনুষ্য

শরীরধারী মহাপুরুষ উঠিয়া মাকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন। এই ঘটনাটি দূর হইতে অকস্মাৎ মায়ের এক গুজরাটি ভক্ত শ্রীদীনবন্ধু পারিখ দেখিয়াছিলেন। পরে তিনি মাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, মা! সেইদিন ঐ পাথর হইতে বাহির হইয়া কে তোমাকে প্রণাম করিয়াছিলেন? মা তাঁহাকে আর কিছু না বলিয়া কেবল জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমিও কি তাঁহাকে দেখিয়াছিলে?" মায়ের প্রশ্নের উত্তরে তিনি মাকে বলিয়াছিলেন, "আমি দেখিয়াছিলাম ঐ বড় পাথরটা হইতে একজন মানুষ নির্গত হইয়া তোমাকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন এবং কি যেন তিনি তোমাকে জিজ্ঞাসাও করিয়াছিলেন। তারপর পুনরায় তিনি অদৃশ্য হইয়া গেলেন।" ঐ গুজরাটি ভদ্রলোকটি পরে ঐ পাথরের চারিদিকটা শ্বেতপ্রস্তরদ্বারা বাঁধাইয়া তার উপর একখানা অষ্টকোণ পাকা ঘর নির্মাণ করিয়া তাহাতে একান্তে সাধন-ভজন করিতেন। শ্রীদীনবন্ধু পারিখ ধনীপিতার একমাত্র পুত্র এবং উচ্চ শিক্ষিত। অল্প বয়সেই সংসার ত্যাগ করিয়া মায়ের আশ্রমে থাকিয়া জীবন যাপন করিত। •

* * *

এইভাবে শরীরী, অশরীরী, সাধু ও মহাত্মাগণ কতই যে শ্রীশ্রীমায়ের নিকট আসিতেছেন এবং তাঁহার কৃপা, স্নেহ, আদর ও ভালবাসা পাইতেছেন তাহার কতটুকু সংবাদই বা আমরা পাই। অকস্মাৎ তাঁহার শ্রীমুখকমল হইতে দুই একটি ঘটনা কখনও কখনও প্রকাশ হইয়া পড়ে তাই আমরা জানিতে পারি, নচেৎ এইসব সুন্দর সুন্দর অভিনব আকস্মিক ঘটনা আমাদের জানিবার কোনই উপায় নাই।

একবার গুরুপূর্ণিমার সময় আমরা অনেকেই মায়ের সঙ্গে সোলনে ছিলাম। একদিন কথায় কথায় মা বলিলেন, "ভোলা-নাথের বড় ভাই এমন জায়গায় আসিয়া দাঁড়াইলেন যেখান দিয়া এই শরীর তাঁহার কাছে যাইতেই এই শরীরের মুখ হইতে মহামন্ত্র বাহির হইল। "হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে। হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।" "এই মহামন্ত্র শুনিয়া তিনি বলিলেন, "ইহা তোমার মুখ হইতে শুনিবার জন্যই তো

এখানে দাঁড়াইয়া আছি।" এই কথা বলিয়াই তিনি ঐখানেই মিলাইয়া গেলেন।"

মহামন্ত্রের পাঠ দুই রকম দেখিতে পাওয়া যায়। একটি পাঠ হইল কলি সন্তরণ উপনিষদ্ প্রসিদ্ধ "হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে। হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে॥" এই মন্ত্রের অধিকারী সকলে নহে। ইহাই শ্রীশ্রীমায়ের মুখকমল হইতে নির্গত হইয়াছিল। অপরটি হইল গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রচলিত মন্ত্র "হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥" ইহার জপ ও কীর্তন সকলেই করিতে পারে। এই মন্ত্রে অধিকারী ও অনধিকারীর কোন বিচার নাই। কলি যুগের সর্ব সাধারণের জন্য এই ভুবনমঙ্গল মহামন্ত্র জীব উদ্ধারের জন্য শ্রীমন্মহাপ্রভু কৃষ্ণ চৈতন্য প্রদান করিয়া গিয়াছেন।

শ্রীভোলানাথের অগ্রজ অর্থাৎ লৌকিক সম্বন্ধে শ্রীশ্রীমায়ের ভাসুর ৺রেবতীমোহন চক্রবর্তী মহাশয় (আশুর পিতা) প্রায় পঞ্চাশ বৎসর হয় দেহত্যাগ করিয়াছেন। তিনি এতদিন পর্যন্ত অপেক্ষা করিতেছিলেন শ্রীশ্রীমায়ের মুখকমল হইতে মহামন্ত্র নাম শ্রবণের জন্য। শ্রীশ্রীমা কি ভাবে, কাহাকেও কখন যে কৃপা করিবেন তাহা তিনিই জানেন।

করুণাময়ী শ্রীশ্রীমায়ের অহৈতুকী কৃপা

ইংরাজী ১৯৪২ খৃষ্টাব্দে কর্মস্থল হইতে অসময়ে অবসর গ্রহণ করিয়া পরমস্নেহময়ী শ্রীশ্রীমায়ের কাছে দেহরাদুন গিয়াছি। সেই সময় তিনি দেহরাদুন শহর হইতে অনুমান তিন চারি মাইল দূরে অবস্থিত রায়পুর শিবালয়ে বাস করিতেছিলেন। স্থির হইল মায়ের পবিত্র উপস্থিতিতে সেইবার শারদীয়া শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা সেখানে অনুষ্ঠিত হইবে। কথার কথায় একদিন মা আমাকে দুর্গাপূজা করিতে বলিলেন। আমি তাঁহার শ্রীচরণে নিবেদন করিলাম, মা! আমি এখনও কাহারও নিকট হইতে তান্ত্রিক দীক্ষা গ্রহণ করি নাই। আমাদের প্রচলিত নিয়ম আছে অদীক্ষিত ব্যক্তির শক্তিপূজার অধিকার নাই। তা ছাড়া আমি এই সকল জানিও না। সেইজন্য আমি এই দুর্গাপূজা করিতে সাহস করি না। আমার এই কথার পর ঠিক হইল মায়ের পুরাতন ভক্ত দেহরাদুন নিবাসী শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এবার দুর্গাপূজা করিবেন। তন্ত্রধারকের কাজ করিবেন শ্রীশোভন বাগচী। এই শোভন বাগচীও মায়ের অতি পুরাতন ভক্ত এবং বর্তমানে শ্রীকৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী নামে পরিচিত।

এইস্থানে উল্লেখ করাটা আশা করি খুব বেশী অনুচিত বা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে আমি তান্ত্রিক মন্ত্রে দীক্ষিত না হইলেও তিনবার নিয়মিতরূপে সন্ধ্যা ও গায়ত্রীজপ করিতাম এবং সব সময় চলিতে ফিরিতে বৈদিক ব্রহ্মগায়ত্রী স্মরণে রাখিতে চেষ্টা করিতাম। ব্রাহ্মণ বালকদের উপনয়ন সংস্কারের সময়ই সাবিত্রী মন্ত্রে দীক্ষা হইয়া যায়। এক দৃষ্টিতে দেখিতে গেলে উপনয়ন দ্বারা সংস্কৃত বা উপবীত ব্যক্তিই শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত। বৈদিক ব্রহ্মগায়ত্রী জপের সময় অহৈতুকী কৃপার নিদর্শনস্বরূপ কখন কখন এক দেবীমূর্তি চকিতেয় জন্য দর্শন দিতেন। বর্তমান সময়ে ঐ ধারায় সাধন না

করিলেও তিনি সন্তানের উপর করুণা করিতে কৃপণতা করিতেছেন না। স্বপ্নাদিতে কিংবা জপ সময়ে তিনি নানা ভাবে দর্শন দিয়াই আসিতেছেন। আমার মনে হয়, পূর্ব কোন জন্মে ইষ্টরূপে তাঁহাকে উপাসনা করিয়াছিলাম, তাই জননী দয়া করিয়া এই অধম সন্তানকে নিমেষের জন্য হইলেও দর্শন দিয়া স্মরণ করাইয়া দিতেন যে তিনি তাঁহার এই অবোধ বালককে ভুলেন নাই। শ্রীগুরুকৃপায় একবার শ্রীশ্রীইষ্টদেবতার সহিত যুক্ত হইলে সেই সম্বন্ধ কখনও বিচ্ছিন্ন হয় না। আমার ব্যক্তিগত দৃঢ় বিশ্বাস গায়ত্রী মন্ত্রের মধ্যেই সব কিছু নিহিত রহিয়াছে। যাঁহাদের এই বৈদিক ব্রহ্মগায়ত্রীতে অধিকার আছে তাঁহাদের এই গায়ত্রী উপাসনাদ্বারাই মনুষ্যের যাহা পরম-পুরুষার্থ সেই নিঃশ্রেয়স বা মুক্তি পর্যন্ত লাভ হইতে পারে। যে উপাসনা আত্মজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞান প্রাপ্ত করায় তাহা কি সাধারণ উপাসনা ?

শ্রীমদ্ভাগবত, তন্ত্র, পুরাণ ও রামায়ণ—সর্বত্রই গুরুদ্বারা দীক্ষিত হইবার জন্য নির্দেশ রহিয়াছে। ভাগবতে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার পরমভক্ত উদ্ধবকে বলিতেছেন, "বৈদিকী তান্ত্রিকী দীক্ষা মদীয়ব্রত-ধারণম্" (১১।১।৩৭)। হে প্রিয় উদ্ধব! বৈদিক এবং তান্ত্রিক পদ্ধতি অনুসারে দীক্ষা গ্রহণ করিবে ও আমার ব্রতাদি পালন করিবে। তন্ত্রসারে স্পষ্ট উল্লেখ আছে কলিকালে আগমোক্ত বিধানে দেবারাধনা করিবে, অন্য বিধানে আরাধনা করিলে দেবতা প্রসন্ন হন না। তারাপ্রদীপে বলা হইয়াছে—

আগমোক্তবিধানেন কলৌ দেবান্ যজেৎ সুধীঃ।
ন হি দেবাঃ প্রসীদন্তি কলৌ চান্যবিধানতঃ ॥ ৩৯ ॥

সত্যযুগে শ্রুত্যুক্ত বিধান, ত্রেতাযুগে স্মৃত্যুক্ত বিধান, দ্বাপরে পুরাণোক্ত বিধান এবং কলিযুগে আগমোক্ত বিধানই প্রশস্ত। তন্ত্রসারে এমন পর্যন্ত লিখিত আছে। অদীক্ষিত ব্যক্তি মৃত্যুর পর নরকে গমন করে, মরণান্তে তাহার পিশাচত্ব দূর হয় না; অতএব সযত্নে তান্ত্রিক গুরুর নিকট দীক্ষিত হইবে। আমাদের সর্ব শাস্ত্রে গুরুর মহিমা যে ভাবে বর্ণন করা হইয়াছে এইরূপ অন্য কোন ধর্মে আছে কিনা জানি না।

কৃতে শ্রুত্যুক্তমার্গঃ স্যাৎ ত্রেতায়াং স্মৃতিসম্ভবঃ।
দ্বাপরে তু পুরাণোক্তঃ কলাবাগমসম্মতঃ ॥ ৪০ ॥
অদীক্ষিতোঽপি মরণে রৌরবং নরকং ব্রজেৎ।
অদীক্ষিতস্য মরণে পিশাচত্বং ন মুঞ্চতি।
তস্মাদ্দীক্ষাং প্রযত্নেন সদা কুর্বীত তান্ত্রিকাৎ ॥ ৮৭ ॥

মহাত্মা শ্রীতুলসীদাস গোস্বামী তাঁহার প্রসিদ্ধ শ্রীরামচরিত-মানসে বলিয়াছেন সদ্‌গুরু লাভ হইলে সন্দেহ এবং ভ্রম অর্থাৎ অজ্ঞান নষ্ট হইয়া যায়, যেমন বর্ষাঋতুতে পৃথিবী কীটাদিদ্বারা পূর্ণ হইয়া যায় এবং শরদ্‌ঋতুর আগমনে সেই কীটসমূহ বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

ভূমি জীব সংকুল রহে গএ সরদ রিতু পাই।
সদ্‌গুরু মিলেঁ জিমি সংসয় ভ্রম সমুদাই ॥

আমরা আমাদের আলোচ্য বিষয় হইতে একটু বিষয়ান্তরে চলিয়া গিয়াছি। চলুন, আমরা পুনরায় দেহরাছনের রায়পুরের শিবালয়ে ফিরিয়া যাই। যে সময়কার বিবরণ লিপিবদ্ধ করিতে যাইতেছি সে সময় শ্রীশ্রীমায়ের নির্দেশমত দেহরাছনের রায়পুর গ্রামে তাঁহার আশ্রমের উপরের অংশে পাহাড়ের উপর "ব্রহ্মলোক" নামে সাধু, সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারীদের বাসের উপযোগী পাঁচখানা খড়ের ঘর নির্মাণ করা হইয়াছিল। উহার মধ্যে একখানা ঘরে দিনরাত্রি চব্বিশ ঘণ্টা অখণ্ডভাবে ধ্যান ও জপ চলিত। এই শুভ কার্যক্রমের মধ্যে আমিও সামান্য একটু অংশ প্রাপ্ত হইবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলাম। রাত্রি বারটা হইতে রাত্রি তিনটা পর্যন্ত এই তিন ঘণ্টা সময় কেহ জপ ও ধ্যান করিতে স্বীকার না হওয়ায় আমিই স্বেচ্ছায় সানন্দে ঐ তিন ঘণ্টা সময় জপ ও ধ্যানের জন্য গ্রহণ করি। আমার পরবর্তী ব্যক্তি রাত্রি তিনটায় না গিয়া প্রায়ই ভোর চারিটার সময় যাইতেন। সুতরাং আমাকে রাত্রি বারটা হইতে প্রত্যূষ চারিটা পর্যন্ত, নিত্য না হইলেও প্রায়শ বসিতে হইত। ইহাতে আমার কোন ক্ষোভের কিংবা অনুযোগের কারণ ছিল না। যেহেতু এই অজুহাতে শ্রীশ্রীমা দয়া করিয়া আমাকে একটু অধিক সময় জপ ও ধ্যান করিবার সুযোগ দিয়াছিলেন।

বলা বাহুল্য আমার জপের অন্য কোন মন্ত্র না থাকার দরুন আমি একটি বিশিষ্ট ছন্দে বা তালে ব্রাহ্মণদের বৈদিক ব্রহ্মগায়ত্রীই ঐ সময় জপ করিতাম। পূর্বোক্ত সেই মহাদেবী অহৈতুকী কৃপা করিয়া এই হতভাগ্যকে সেই সময়ও মাঝে মাঝে দর্শন দিয়া কৃতার্থ করিতেন।

এই সংসারটা যে বাস্তবিকপক্ষে অনিত্য ও ক্ষণভঙ্গুর, যাহাদের পরম আত্মীয় ভাবিয়া কতই সুখের ও মধুর স্বপ্ন মনে মনে গড়িয়া তুলিয়াছিলাম, তাহারাও যে চক্ষুর সম্মুখে চিতার অগ্নিতে ভস্মীভূত হইয়া যাইবে। এই প্রকার বৈরাগ্য উৎপাদক দৃশ্য সকল তিনি করুণা করিয়া দর্শন করাইতেন। যিনি জীবন মরণের একমাত্র সম্বল ও অতি প্রেয় ও শ্রেয় তাঁহাকে যে পরম আপন জ্ঞানে স্বীয় হৃদয়ে ধারণ করিতে হইবে, তাহাও তিনি কৃপা করিয়া দেখাইয়াছিলেন। জীবনের একমাত্র আধারস্বরূপ এবং পরম কল্যাণময়ী সেই মহাদেবী কেবল দর্শন দিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, তাঁহাকে বক্ষে ধারণ করিলে যে কি সুখ, শান্তি এবং কি আনন্দ তাহাও জননী আমার দয়া করিয়া অনুভব করিবার সুযোগ দিয়াছিলেন। একটু স্থির ও শান্ত মনে সেই ব্রহ্মলোকের ধ্যানমগ্ন শুভমুহূর্তটি এখনও স্মরণ করিলে সর্বশরীর আনন্দে পুলকিত হইয়া উঠে। ঐ সময় স্থিরাসনে রাখিয়া কোন বিশেষ ক্রিয়াও তিনি দুই দিন এই দেহটাকে দিয়া করাইয়াছিলেন।

গভীর মহানিশায় জগৎ যখন গাঢ় নিদ্রায় নিমগ্ন তখন আসনে স্থির হইয়া উপবেশনকরতঃ আমি বিশেষ একটি ছন্দোবদ্ধভাবে গায়ত্রী মন্ত্র জপ করিতেছিলাম। জপের প্রায় এক ঘন্টা পর, না জানি কোন অচিন্তনীয় শক্তির প্রভাবে আমার এই শরীরটা আসনে বসিয়াই ধীরে ধীরে দক্ষিণাবর্তে আবর্তিত বা ঘূর্ণিত হইতে আরম্ভ করে। উহার বেগ ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া কুম্ভকারের চক্রের ন্যায় ঘূর্ণায়মান হইতে থাকে। আমি ভাবিতে লাগিলাম ইহা আবার কি হইতেছে? ইহার মধ্যে আমার বিন্দুমাত্রও প্রযত্ন বা চেষ্টা ছিল না, বরং চেষ্টা করিয়াও উহা আমি নিবারণ বা রোধ করিতে সক্ষম হই নাই। কিছু সময় এইরূপ হইবার পর নিজে নিজেই

উহা ধীরে ধীরে শান্ত হইয়া গেল। যতক্ষণ পর্যন্ত এই ক্রিয়া আমার শরীরের দ্বারা হইতেছিল ততক্ষণ সঙ্গে সঙ্গে একটা শব্দ আমার ভিতর হইতে নির্গত হইতেছিল। আমি আশঙ্কা করিতেছিলাম ঐ শব্দে যদি পার্শ্বের ঘরের সুপ্ত ব্যক্তি জাগিয়া যায় তাহা হইলে তিনি কি মনে করিবন? এই ভয়ে আমি উহা বন্ধ করিবার চেষ্টা করিতেছিলাম। সেই সময় আমার মনে যদি হইত যে, এই শব্দ আমারই শুনিবার কথা অপরের নহে তাহা হইলে আমি ঐ ক্রিয়াটি বন্ধ করিতে চেষ্টা করিতাম না। হয় তো ইহার ফল ভালই হইত। পরের দিনও ঐ রকম হইয়াছিল কিন্তু উহার বেগ পূর্বদিন অপেক্ষা কম এবং সময়ের পরিমাণও স্বল্প ছিল। তৃতীয় দিন অথবা পরে আর কোন দিন উহা আর হয় নাই*।

এই ঘটনার প্রায় দশ বৎসর পর পুণার প্রসিদ্ধ যোগী শ্রীগুলবনী মহোদয়ের সহিত আমার মহারাষ্ট্রদেশীয় পুরাতন বন্ধু শ্রীরাজারাম গোবিন্দ আকুতের বাড়ী দেখা হয়। সেখানে শুনিলাম কুণ্ডলিনী শক্তির জাগরণের জন্য তিনি এই ক্রিয়া তাঁহার শিষ্যদের দিয়া থাকেন। কথা প্রসঙ্গে শ্রীগুলবনীজীকে আমার ঐ দিনের অভিজ্ঞতার কথা বিবৃত করায় তিনি বলিলেন, স্বাভাবিকভাবে আপনার কুণ্ডলিনী শক্তি জাগ্রৎ হইবার ক্রিয়া হইতেছিল। আপনি উহা নিবারণের চেষ্টা করিয়া আপনার প্রগতির পথে বাধা দিয়াছেন। কিছু না হইবার হইলে এই রকমই বুদ্ধি ও যোগাযোগ হইয়া থাকে। আধ্যাত্মিক উন্নতির সুযোগ জীবনে একবারই আসে, বার বার আসে না। করুণাময়ী মা সন্তানদের সর্বপ্রকার দুঃখ হইতে মুক্ত করিবার জন্য কতই তো ব্যবস্থা করিতেছেন কিন্তু আমাদের প্রারব্ধ এতই প্রবল ও বিপরীত যে উহা সফল হইতে দেয় না।

এই সকল অভাবনীয় ঘটনা একদিন সুযোগ পাইয়া স্নেহময়ী শ্রীশ্রীমায়ের চরণে নিবেদন করাতে তিনি আগামী শ্রীশ্রীকালীপূজার

* করিতকর্মা ব্যক্তির নিকট এই ক্রিয়া শিক্ষা করিতে হয় কিংবা স্বভাব হইতে যদি কাহারও মধ্যে ইহা শ্রীশ্রীমাতৃকৃপায় স্ফুরিত হয় তাহা হইলেই ইহা করা উচিত নচেৎ হিতে বিপরীত হইতে পারে।

মহানিশাতে কোন "নাম" গ্রহণের কথা বলিলেন। দেখিতে দেখিতে সেই শুভদিন আসিয়া উপস্থিত হইল। মায়ের রায়পুর (দেহরাডুন) আশ্রমে সেইবার শ্রীশ্রীকালীমাতার পূজারও আয়োজন হইয়াছিল। যে শিল্পী শ্রীশ্রীদুর্গা প্রতিমা গড়িয়াছিলেন তিনিই শ্রীশ্রীকালী প্রতিমাও সেই সময় প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীমায়ের নীচের শয়নকক্ষে পূজার কথা হইয়াছে। দুর্গাপূজার সময় হইতে এ পর্যন্ত ঐ কামরাতেই শ্রীশ্রীমাকালীর মূর্তিখানি একখানা সাদা চাদর দিয়া ঢাকা ছিল।

শ্রীশ্রীকালীপূজার পূর্বে একদিন শ্রীশ্রীমা দয়া করিয়া আমাকে তাঁহার সঙ্গে একান্তে বসিয়া কথা বলিবার একটু সুযোগ দিয়াছিলেন। কথায় কথায় তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কি 'নাম' আমার অধিক ভাল লাগে এবং কোন দেবতার "মূর্তি" আমি বেশী ভালবাসি। এইসব আলোচনার সময় এক অভিনবভাবে 'নাম' গ্রহণের সঙ্কেত মা দয়া করিয়া বলিলেন।

* * *

সেই অভিনব সঙ্কেতটি যে কি তাহা এইখানে বিস্তারিতরূপে বিবৃত করা হইল না। কারণ ইঁহা একটি নূতন রকমের প্রক্রিয়া। এই উপায়টি এতই সুন্দর ও মর্মস্পর্শী যে ইহা জানিতে পারিলে হয় তো কেহ কেহ ইহার অনুকরণ করিতে পারেন এই আশঙ্কায় ইহার পূর্ণ বিবরণ দানে নিরস্ত রহিলাম। পরমারাধ্যা শ্রীশ্রীমাও যে ইহা প্রকাশ করা অনুমোদন করিবেন না ইহা সুবিদিত। কাহারও যদি ইহা জানিবার তীব্র আকাঙ্ক্ষা থাকে তাহা হইলে করুণাময়ী শ্রীশ্রীমাকে প্রকৃত জিজ্ঞাসুর আকুতি লইয়া জিজ্ঞাসা করিতে পারেন। তিনি যদি দয়া করিয়া ইহা কখনও প্রকাশ করেন তাহা হইলেই এই অভিনব সঙ্কেতটি প্রচারিত হইবে নচেৎ ইহা গুপ্তই থাকিবে*।

---

* এই অপূর্ব ও নূতন ধরণের সঙ্কেতটি আমি প্রকাশের জন্য লিখিয়াছিলাম, পরে অগ্রপশ্চাৎ বিচার করিয়া বাধ্য হইয়া বাদ দিতে হইল।

এইভাবে প্রস্তুত হইয়া শ্রীশ্রীকালীমাতার পূজা আরম্ভ হইলে মহানিশায় শ্রীশ্রীমাকে আমার বাসস্থানে ডাকিয়া আনিবার জন্য আমাকে বলিয়া রাখিলেন। তাঁহার নির্দেশানুসারে আমি প্রস্তুত হইয়া যথা সময়ে তাঁহাকে আসিবার জন্য প্রার্থনা করিতেই করুণাময়ী মা আমার কৃপা করিয়া পূজার স্থান হইতে উঠিয়া সোজাসোজি আমার থাকিবার ঘরে শুভাগমন করিলেন এবং অপর কাহাকেও ঐ কক্ষে প্রবেশ করিতে নিষেধ করিলেন। পরম করুণাময়ী শ্রীশ্রীমা আসনে উপবেশন করিয়াই প্রথম বলিলেন "তোমার সেইটি লইয়া আস। যেমন বলা হইয়াছিল, তেমন হইয়াছে কিনা, দেখি।" মায়ের আদেশমত সেইটি মায়ের সম্মুখে আনিতেই তিনি নিরীক্ষণ করিযা বলিলেন, "হাঁ, ঠিক হইয়াছে।" পরের কর্মটি সমাপ্ত করিয়া মায়ের সম্মুখে সম্পূর্ণ জিনিসটি ধরিতেই মা পুনরায় বলিলেন, "এই নামটি গ্রহণ কর।" আনুষ্ঠানিক ক্রিয়া সমাপনান্তে শ্রীশ্রীমায়ের শ্রীপাদপদ্মে প্রণাম করিলে তিনি কৃপা করিয়া তাঁহার বরদ শ্রীহস্তখানি আমার শিরে স্থাপন করতঃ আশীর্বাদ করিলেন। এইরূপে মহাপুণ্যক্ষণে শ্রীশ্রীকালীপূজার মহানিশাতে পরম কৃপাময়ী শ্রীশ্রীমায়ের দ্বারা প্রদত্ত "নামদান" ক্রিয়াটি সুসম্পন্ন হইল। সেদিন হইতে প্রত্যহ রাত্রি বারটা হইতে ভোর তিনটা পর্যন্ত "ব্রহ্মলোকে" বসিয়া এই অভিনবভাবে প্রাপ্ত "নামই" সাধন করিতে আমাকে নির্দেশ দিলেন। আমার এই ক্ষুদ্র ও অতিশয় নগণ্য জীবনে ইহা মায়ের একটি অহৈতুকী করুণার নিদর্শন ব্যতীত আর কি বলিব। মাতৃপ্রদত্ত নাম সাধনের প্রভাব মনের উপর কি কার্য করিয়াছিল তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ একটু এখানে দিতে চেষ্টা করিতেছি।

কিছুদিন মায়ের আদেশ মত রাত্রি বারটা হইতে প্রত্যূষ তিনটা কি চারিটা পর্যন্ত নাম করিবার ফলে আমার মনের মধ্যে একটা ভাবের উদয় হইল। আমি ভাবিতাম এই সংসারে আমার ন্যায় আর কেহই এমন দীন, হীন ও অপদার্থ বা অকর্মণ্য ব্যক্তি নাই। আমার এই দৈন্য ও অযোগ্যতার জন্য সকলেই আমাকে অতিশয় ঘৃণা বা উপেক্ষার দৃষ্টিতে দেখিয়া থাকে। এই কারণে প্রায় সকল সময়ই আমি ঘরের মধ্যে একলা থাকিতাম। কাহারও সঙ্গে

কথাবার্তা বলা তো দূরের কথা কাহারও সহিত দেখা পর্যন্ত করিতাম না। কাঁদিয়া কাঁদিয়া চোখের জলে বালিশ ভিজাইয়া ফেলিতাম। এইরূপ মর্মান্তিক বেদনা ও গ্লানি বুকে লইয়া বেশ কিছুদিন কাটিল। এমন ভারাক্রান্ত মন লইয়া মায়ের সঙ্গে পর্যন্ত দেখা করি না। ঘর হইতে বাহির হই না দেখিয়াই বোধহয় একদিন বৈকালবেলা স্নেহময়ী শ্রীশ্রীমা দয়া করিয়া একাই আমার থাকিবার ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আমার ঘরে যখন তিনি প্রবেশ করিয়াছিলেন তখন আমি শয্যায় শয়ন করিয়া অশ্রুধারায় উপাধান সিক্ত করিতে-ছিলাম। মা আমার শয্যা পার্শ্বেই উপবেশন করতঃ অতিশয় স্নেহের সহিত আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমাকে দেখিতে পাই না কেন? ঘর হইতেও বাহির হও না, কাহারও সঙ্গে কথাবার্তাও বল না। হইল কি তোমার?" করুণাময়ী শ্রীশ্রীমায়ের স্নেহভরা কণ্ঠে এই প্রশ্ন শুনিয়া আমি মর্মব্যথায় একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িলাম—আমার বাক্‌শক্তি রুদ্ধ হইয়া গেল। ক্ষণেকের মধ্যেই ধৈর্য ধারণ করিয়া তাঁহার প্রশ্নের উত্তরে আমি আমার সেই সময়-কার মানসিক অবস্থা সব তাঁহার রাতুল চরণে নিবেদন করিলাম। তিনি আমার হৃদয় বেদনার কথা শ্রবণ করিয়া খুবই অল্প কথায় বলিলেন, 'সাধনার অবস্থায় কাহারও কাহারও এই রকম মনের ভাব হয়।" এই কথাটি বলিয়াই সন্তানবৎসলা জননী আমার তাঁহার বরদহস্তখানি কয়েকবার আমার মাথায় ও বুকে বুলাইয়া দিলেন। কি আশ্চর্য! কি অদ্ভুত মায়ের শক্তি! ইহা আমার মনের উপর মন্ত্রশক্তির ন্যায় কার্য করিল। মনের এইরূপ বিষাদগ্রস্ত অবস্থা যদি আরও কিছুদিন আমার চলিত তাহা হইলে হয় তো আমি পাগল হইয়া যাইতাম অথবা মানসিক রোগে আক্রান্ত হইয়া পড়িতাম। এইভাবে সেইদিন তিনি আমাকে এক আসন্ন বিপদ্‌ হইতে রক্ষা করিয়া আমার মহা উপকার করিয়াছিলেন। ইহাও কিন্তু আমার জীবনে স্নেহময়ী মায়ের একটি অহৈতুকী কৃপারই পরিচয়। না ডাকিতে, প্রার্থনা না করিতে, তিনি যে আসেন এবং আমাদের বিপদ হইতে মুক্ত করেন তাহার নিদর্শন হইল উপর্যুক্ত ঘটনাটি।

মঙ্গলময়ী শ্রীশ্রীমায়ের মঙ্গল স্পর্শ পাইবার পর হইতেই আমার সেই মানসিক অবসাদ বা গ্লানি একেবারে দূরীভূত হইয়া গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে আমি অনুভব করিতে লাগিলাম, এই জগতে কে কাহাকে ঘৃণা করে ? কে কাহাকে উপেক্ষা করে ? সকলই তো সেই এক শ্রীভগবানেরই সচল ও অচল বিগ্রহ। সব প্রাণীর মধ্যে—এমন কি সমস্ত গাছপালা, লতাপাতা ও গুল্মাদির মাঝেও সেই একমাত্র পরমাত্মাই নিবাস করিতেছেন। অতএব এই সংসারে কেহই ঘৃণ্য বা উপেক্ষণীয় নহে বরং সকলেই শ্রদ্ধার পাত্র ও নমস্য।

সেই সময় একদিন শৌচাদির পর নহরের (খালের) ধারে বসিয়া দন্তধাবনের (দাঁতন করিবার) জন্য বৃক্ষের শাখা ভাঙ্গিতে গিয়া কেবলই মনে হইতেছিল—আমার হাতখানা কেহ মোচড়াইলে যেমন আমার ব্যথা লাগে গাছের ডাল ভগ্ন করিলে উহারও তো ঠিক তেমনি বেদনা অনুভব হয়। ইহার পর হইতে বৃক্ষের শাখা ভঙ্গ করিয়া দন্তধাবন চিরদিনের জন্য বন্ধ হইয়া গেল। আচার্য শ্রীজগদীশচন্দ্র বসু বলিতেন—এই বিশ্বের প্রতিটি উদ্ভিদের মধ্যে এক অখণ্ড শাশ্বত সত্য নিহিত রহিয়াছে। ইহা যে অতি সত্য কথা, ইহা যেন একটু একটু অনুভব হইতে লাগিল। ইহা যে আমার করুণাময়ী মায়েরই স্পর্শশক্তির অমোঘ ফল তাহা আমি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেছি। এই অযোগ্য সন্তানের উপর তাঁহার অহৈতুকী কৃপার জন্য তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে আমি পুনঃ পুনঃ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

*   *   *

দেবতাত্মা হিমালয়ের পাদদেশে দেহরাদুন শহর অবস্থিত। সেখান হইতে অনুমান আঠার মাইল পশ্চিমে ডোংগাগ্রাম। সেই গ্রামের জমিদার রায় বাহাদুর শ্রীশের সিং চৌধুরী। তিনি ছিলেন শ্রীশ্রীমায়ের একজন অতি পুরাতন ভক্ত এবং তিনি মাকে স্বয়ং ভগবতী মনে করিয়া অত্যন্ত সমীহ করিতেন। তিনি সেখানে পাহাড়ের উপর চিরগাছের (cedar) জঙ্গলের মধ্যে মায়ের জন্য সুন্দর ছবির মত একখানি ছোট্ট আশ্রম নির্মাণ করাইয়া রাখিয়াছেন। স্থানটি অতিশয় নির্জন এবং ছোট বড় বহু চিরবৃক্ষের

দ্বারা পরিবেষ্টিত। পাহাড়ের উপর ও আশ্রমটির আশেপাশে অপর কোন লোকালয় নাই। শোনা যায় মাঝে মাঝে ঐ স্থানে বাঘও বাহির হয় কারণ উহার নীচেই একটি জল-প্রপাত। জল পান করিতে বাঘ সেখানে আসিয়া থাকে। ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দের শ্রীশ্রীকালীপূজার অব্যবহিত পরই কার্তিক মাসের শেষের দিকে শ্রীশ্রীমা তাঁহার রায়পুর আশ্রম হইতে মাত্র কয়েকজন সন্ন্যাসীকে সঙ্গে লইয়া ডোংগা গিয়াছেন। ঐ দলের মধ্যে সন্ন্যাসী ব্যতীত আমরা দুইজন কেবল সাদা বস্ত্রে—ব্রহ্মচারী শ্রীমান অভয় ও আমি। চৌধুরী শ্রীশের সিং ও তাঁর স্ত্রী শ্রীমতী শান্তি চৌধুরাণীর বিশেষ আগ্রহেই মায়ের এখানে শুভাগমন হইয়াছে। তাঁহাদের একান্ত বাসনা শ্রীশ্রীমা সাধু, সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারীদের, লইয়া সেখানে কয়েক দিন বাস করেন। বলা নিষ্প্রয়োজন, সকল প্রকার ব্যবস্থা তাঁহারাই করিতেছেন। পরম করুণাময়ী শ্রীশ্রীমায়ের সঙ্গে আমরা বেশ পরমানন্দে দিন কাটাইতেছি।

অগ্রহায়ণ মাসের প্রথমে অল্প অল্প শীত পড়িয়াছে, একদিন মধ্যাহ্নের ভোগের পর দুপুরবেলা মা আশ্রমের সম্মুখের বারান্দায় একটু রৌদ্রে বসিয়াছেন। আমরাও সকলে তাঁহাকে ঘিরিয়া বসিয়াছি। তিনি আমাদের সঙ্গে কথা বলিতে বলিতে সহসা ভাবাবিষ্ট হইয়া পড়িলেন। তাঁহার লালিমাযুক্ত সুন্দর চক্ষু দুইটি ভাবে ঢুলু ঢুলু। মায়ের সদ্য প্রস্ফুটিত শুভ্র শতদল সদৃশ মুখখানিতে ছিল এক অনির্বচনীয় অপূর্ব লাবণ্য মাখা স্মিত মধুর হাসি। সেই ভাবাবস্থাতেই তিনি একখানা গেরুয়া রং করা নূতন বস্ত্র চাহিলেন। শ্রীশ্রীমায়ের দক্ষিণে ও বামে দুই পার্শ্বে বসিয়াছিলেন বৃদ্ধ সন্ন্যাসী স্বামী শঙ্করানন্দ, স্বামী নির্গুণানন্দ (মুক্তি বাবা) এবং স্বামী পরমানন্দ। মা নূতন গৈরিক বসন চাহিবার সঙ্গে সঙ্গে স্বামী পরমানন্দ তাড়াতাড়ি উঠিয়া গিয়া তাঁহার একটি নূতন গেরুয়া রংয়ের আলখাল্লা (সাধুদের পরিধানের যোগ্য লম্বা ঢিলা জামা বিশেষ) আনিয়া শ্রীশ্রীমায়ের হাতে দিলেন। মা আলখাল্লাটি হাতে লইয়া একটু একটু তুলিতেছেন আর ঐটি কাহারও গাত্রে ছুড়িয়া ফেলিবেন এই রকম ভাব

দেখাইতেছিলেন। সে ভাবমগ্ন অবস্থাতেই শ্রীশ্রীমায়ের মুখকমল হইতে স্বতঃই মাঝে মাঝে অস্পষ্টস্বরে দুই একটি মন্ত্র নির্গত হইতেছিল। মায়ের অতি নিকটে দক্ষিণ দিকে আমি বসিয়াছিলাম। তাঁহার শ্রীমুখ নিঃসৃত কয়েকটি মন্ত্রের মধ্যে একটি মন্ত্র সেই সময় আমি বেশ স্পষ্ট শুনিলাম। উপস্থিত আমাদের মধ্যে অপর কেহ ঐ মন্ত্রটি শ্রবণ করিয়াছিলেন, কি না বলিতে পারি না। আমরা অনেক সময় লক্ষ্য করিয়াছি, মা যাহাকে উদ্দেশ্য করিয়া যাহা বলেন কেবল সেই তাহা শুনিতে পায় বা বুঝিতে পারে। অন্য বহুলোক কাছে উপস্থিত থাকিলেও তাহারা শোনেন না বা বোঝেন না। ইহার প্রায় আট বৎসর পর ১৯৫০ খৃষ্টাব্দে বৈশাখ মাসের অক্ষয় তৃতীয়ার দিন কাশীতে গঙ্গার তটে শ্রীশ্রীমায়ের সম্মুখে সন্ন্যাসগ্রহণের সময় সন্ন্যাসী শ্রীগুরুর মুখকমল হইতে পুনরায় এই মন্ত্র প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। ব্রহ্মবিদ্যারূপিণী মা দয়া করিয়া সন্ন্যাসের বহুপূর্বেই উহা আমাকে শুনাইয়াছিলেন। ভোংগাতে ঐদিন যাঁহারা সেইখানে উপস্থিত ছিলেন তাঁহারা সকলেই অনুমান করিয়াছিলেন ঐ কাষায় আলখাল্লাটি সম্ভবতঃ মা আমার গায়েই নিক্ষেপ করিবেন। কিন্তু তিনি তাহা না করিয়া হঠাৎ আসন হইতে উঠিয়া একেবারে উন্মুক্ত আকাশের তলায় গিয়া আমাকে ডাকিলেন। আমি তাঁহার নিকট যাইতেই একান্তে তিনি আমাকে বলিলেন, "কাশী গিয়া আগামী উত্তরায়ণ সংক্রান্তি হইতে গায়ত্রী পুরশ্চরণ আরম্ভ কর।" শ্রীশ্রীমায়ের খেয়াল অমোঘ। উহা কার্যকরী না হইয়া যায় না। এই কাষায় বস্ত্র দানের বিবরণ যথাস্থানে প্রদান করিবার ইচ্ছা রহিল।

এই ঘটনার পর বিন্ধ্যাচল ও বৃন্দাবন পরিভ্রমণ করতঃ কাশী আসিয়া সেখানকার সুপ্রসিদ্ধ স্মৃতিশাস্ত্রের পণ্ডিত শ্রীশশিভূষণ স্মৃতিতীর্থ মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, গায়ত্রী পুরশ্চরণের বিধি বড় কঠিন। যথা সম্ভব সংক্ষেপে গায়ত্রী পুরশ্চরণের শাস্ত্রীয় বিধি নিম্নে দেওয়া যাইতেছে। গায়ত্রী ব্যতীত অন্য মন্ত্রের পুরশ্চরণেও এই সকল নিয়মই পালন করা কর্তব্য, কেবল জপ সংখ্যা পৃথক্ পৃথক্।

গায়ত্রী পুরশ্চরণের জপ সংখ্যা উত্তম কল্পে চব্বিশ (২৪) লক্ষ, মধ্যম কল্পে চারি (৪) লক্ষ এবং অধম কল্পে এক (১) লক্ষ। কিন্তু কলিযুগে চতুর্গুণ জপ করিলে তবে কার্যসিদ্ধি হইয়া থাকে। "কলৌ চতুর্গুণং প্রোক্তং পুরশ্চরণসিদ্ধয়ে।" "প্রজপেত্বুক্তসংখ্যায়াশ্চতুর্গুণজপঃ কলৌ।" কলিকালে বিহিত সংখ্যার চতুর্গুণ জপ করাই বিধি। পুরশ্চরণের মুখ্য বা প্রধান উদ্দেশ্য হইল মন্ত্রসিদ্ধি বা মন্ত্রচৈতন্য করা। এই কারণে জপসাধকের বিধিপূর্বক নিষ্ঠার সহিত পুরশ্চরণ করা অবশ্য কর্তব্য। পুরশ্চরণ সম্বন্ধে বলা হয়, যেরূপ জীবহীন দেহী সর্বকর্মে অক্ষম, তদ্রূপ পুরশ্চরণ হীন মন্ত্র সিদ্ধিপ্রদানে অক্ষম, অতএব সাধক অবশ্য পুরশ্চরণ করিবেন।

জীবহীনো যথা দেহী সর্বকর্মসু ন ক্ষমঃ।
পুরশ্চরণহীনোঽপি তথা মন্ত্রঃ প্রকীর্তিতঃ॥

উত্তরায়ণের শুক্লপক্ষের কোন শুভদিনে পুরশ্চরণ আরম্ভ করিতে হয়। পূর্বদিন উপবাসী থাকিয়া দশ হাজার (১০,০০০) গায়ত্রী জপান্তে প্রায়শ্চিত্তকরতঃ মস্তক মুণ্ডন বিধেয়। একদিনে দশ হাজার গায়ত্রী জপ না করিতে পারিলে দুই কিংবা তিনদিনেও উপবাসী থাকিয়া জপ করা যাইতে পারে। ইহার পর দিন হইতে অনুষ্ঠান সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত প্রত্যহ ব্রাহ্মমুহূর্তের (সূর্যোদয়ের অব্যবহিত পূর্ববর্তী দুই মুহূর্তকাল অর্থাৎ তিন ঘণ্টা বার মিনিট অথবা দুই দণ্ডকাল অর্থাৎ আটচল্লিশ মিনিট) পূর্বে শয্যা ত্যাগান্তে শৌচাদির পর প্রাতঃস্নান অবশ্য কর্তব্য। দন্তধাবন বা দন্তমার্জন নিষিদ্ধ। মাত্র দ্বাদশবার জলদ্বারা মুখ প্রক্ষালন করিলেই মুখ শুদ্ধ হইবে। দাঁতন করিতে গিয়া যদি মাড়ী হইতে রক্ত নির্গত হয় তাহা হইলে একদিন ক্ষতাশৌচ হয় এবং অশৌচের মধ্যে কোন শুভকার্য করিতে নাই। এই কারণে দন্তধাবন নিষেধ। প্রাতঃস্নানের পশ্চাৎ শুদ্ধ বস্ত্র পরিধান করিয়া এবং উত্তরীয় গ্রহণকরতঃ প্রাতঃসন্ধ্যা করিতে হয়। তৎপশ্চাৎ ঘটস্থাপন পূর্বক শ্রীশ্রীগায়ত্রী দেবীর ষোড়শোপচারে পূজা। পূজান্তে বেলা দ্বিপ্রহর পর্যন্ত সমাহিত চিত্তে স্থির আসনে বসিয়া মানসিক জপ প্রশস্ত। প্রথম দিন যত সংখ্যা

জপ করিবে অনুষ্ঠান শেষ হওয়া পর্যন্ত সেই সংখ্যা জপই প্রত্যহ করিতে হইবে। জপ সংখ্যা হ্রাস কিংবা বৃদ্ধি করা যায় না। আসন সম্বন্ধে নিয়ম—প্রথম কুশাসন, তার উপর মৃগচর্ম (কৃষ্ণসার মৃগের চর্ম প্রশস্ত) অভাবে কম্বল। কৃষ্ণবর্ণের কম্বল কিংবা রেশম বস্ত্র নিষিদ্ধ। অনুষ্ঠান সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত আসন নাড়িতে নাই। প্রয়োজন হইলে অন্য কোন শুদ্ধ বস্ত্রদ্বারা আসনের উপরটা ঝাড়িয়া ফেলা যায়। জপের পূর্বে গায়ত্রী শাপোদ্ধার ও গায়ত্রী হৃদয় পাঠ এবং জপান্তে গায়ত্রীকবচ ও ব্রহ্মযজ্ঞ (গায়ত্রীপাঠ করিয়া পরে চতুর্বেদের প্রথম মন্ত্রগুলি পাঠ করিতে হয়। সর্ববেদী ব্রাহ্মণই প্রথম ঋগ্বেদের, দ্বিতীয় যজুর্বেদের, তৃতীয় সামবেদের এবং সর্বশেষে অথর্ববেদের মন্ত্র পাঠ করিবেন। সামবেদের মন্ত্রটি তিন-বার পড়িতে হয়) অবশ্য কর্তব্য। 'জপারম্ভে চ হৃদয়ং জপান্তে কবচং পঠেৎ'॥ ইহার পর মধ্যাহ্ন স্নান, মধ্যাহ্ন সন্ধ্যা এবং তর্পণ (মৃতপিতৃকের পক্ষে)। স্নানের সময় তৈল ব্যবহার নিষিদ্ধ। গাত্রমার্জনী বা গামছা ব্যবহার করিতে নাই। অনুষ্ঠান আরম্ভ করিবার পূর্ব হইতেই স্থির করিয়া লওয়া আবশ্যক যে 'এত দূরের অধিক কোন স্থানে গমন করিব না'—যেমন স্নানের জন্য গঙ্গা পর্যন্ত গমন কিংবা আহারের বস্তু সংগ্রহের জন্য কোন স্থানে গমন ইত্যাদি। স্বপাক হবিষ্যান্ন গায়ত্রী দেবীকে নিবেদন করিয়া মধ্যাহ্নে একবার মাত্র ভোজন। উত্তম কল্পে ভোজন কেবল গোদুগ্ধ, গব্যঘৃত, আতপতণ্ডুলের অন্ন (ফেন না গালিয়া) এবং সৈন্ধবলবণ। এই কয়েকটি দ্রব্য ব্যতীত অন্য কোন কিছু গ্রহণ নিষিদ্ধ। ফলাদিও নহে। নিতান্ত আবশ্যক হইলে রাত্রিতে গোদুগ্ধ পান করা যাইতে পারে। প্রয়োজন হইলে মাতা এবং স্ত্রীর হাতের পাক অন্ন গ্রহণ করা যায়। আচমনের সময় অন্ততঃপক্ষে দ্বাদশবার কুল্লি বা কুল-কুচা করা প্রয়োজন। খড়িকা ব্যবহার নিষেধ। বিষ্ণুনাম উচ্চারণের দ্বারা মুখশুদ্ধি করিতে হয়। কেহ কেহ তুলসীপত্র, হরীতকী কিংবা আমলকীর দ্বারাও মুখশুদ্ধি করিয়া থাকেন।

ভোজনান্তে অপরাহ্নে পুরাণ পাঠ বিধি সম্মত। দিবা নিদ্রা সর্বতোভাবে বর্জন করা উচিত। মৌন থাকা কর্তব্য, সম্ভব হইলে

ইশারা ইঙ্গিত না করাই ভাল। স্ত্রীলোক সম্ভাষণ ও দর্শন নিষেধ। সূর্যাস্তের পূর্বে স্নান, তারপর সায়ংসন্ধ্যা ও গায়ত্রী দেবীর আরতি ও বৈকালি দান। রাত্রি এক প্রহর পর্যন্ত গায়ত্রীজপ তারপর শয়ন। অধিক রাত্রি পর্যন্ত জাগরণ নিষেধ। শয্যার জন্য কুশাসন ও কম্বল ব্যবহার, উপাধান বা বালিশ ব্যবহার করিতে নাই। তৈল ব্যবহার এবং ক্ষারদ্বারা বস্ত্র পরিষ্কার নিষিদ্ধ। ব্রহ্মচর্যের যাবতীয় নিয়ম পালন করা অবশ্য কর্তব্য। নিজের পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিতে পারিলে ব্রহ্মচর্যরক্ষার পক্ষে যথেষ্ট সাহায্য করে। ব্যসন সর্বপ্রকারে বর্জনীয়।

এই উপর্যুক্ত নিয়মে কোন পবিত্রস্থানে, তীর্থে, গঙ্গাতটে, নদীর-তীরে, গোশালায়, হিমালয়াদি পর্বতে, দেবস্থানে, গুরুগৃহে অথবা চিত্ত বিক্ষেপশূন্য স্থানে বাসকরতঃ অনুষ্ঠান করাই বিধি সম্মত। অনুষ্ঠানের মধ্যে পরের দ্রব্যগ্রহণ না করাই কর্তব্য। যথা সম্ভব অপরিগ্রহ পালন করাই উচিত।

নির্দিষ্ট সংখ্যা জপ সমাপন হইলে, জপের দশমাংশ হোম বা দ্বিগুণ জপ, হোমের দশমাংশ তর্পণ বা দ্বিগুণ জপ, তর্পণের দশমাংশ মার্জন বা দ্বিগুণ জপ, এবং মার্জনের দশমাংশ ব্রাহ্মণ ভোজন ও যথা সাধ্য দক্ষিণা দান। কার্যের আদিতে ও অন্তে শ্রীশ্রীগায়ত্রী দেবীর ষোড়শোপচারে পূজা ও দক্ষিণাদান। নিত্য দশোপচারে কিংবা পঞ্চোপচারে পূজা। কর্মের পূর্ণাঙ্গের জন্য অন্তে কুমারীপূজা, ভোজন ও যথাশক্তি দক্ষিণাদান। হোম, তর্পণ ও মার্জন জপের পর প্রত্যহও করা যায় অথবা সঙ্কল্পিত সম্পূর্ণ জপ সমাপ্ত হইলেও করা যাইতে পারে। ব্রাহ্মণ ভোজন ও কুমারীপূজা অনুষ্ঠানের পরিসমাপ্তিতেই করিতে হয়।

পুরশ্চরণের মধ্যে পরমস্নেহময়ী শ্রীশ্রীমা কৃপা করিয়া কাশীতে এক রাত্রির জন্য শুভাগমন করেন এবং পতিতপাবনী ভাগীরথীর তীরে তাঁহার এই অধম সন্তানকে দর্শন দানে কৃতার্থ করিয়াছিলেন। এই অনুষ্ঠান সমাপ্ত হইলে প্রত্যহ এক হাজার জপ করিবার জন্য তিনি সেই সময়ই আমাকে আদেশ করেন। তাঁহার কাশী আশ্রমে অখণ্ড শ্রীশ্রীসাবিত্রী মহাযজ্ঞ আরম্ভ পর্যন্ত এই জপ তিনি তাঁহার

এই অযোগ্য সন্তানের দ্বারা করাইয়াছিলেন। এই গায়ত্রী পুরশ্চরণ এবং গায়ত্রীজপ যে সাবিত্রী মহাযজ্ঞের প্রস্তুতির নিমিত্ত হইয়াছিল তাহা এখন আমার ধারণা হইতেছে। অবশ্য এই সম্বন্ধে মা আমার নিকট কখন কিছু ব্যক্ত করেন নাই। ইহা আমার ব্যক্তিগত বিশ্বাস বা ধারণা। পরম কল্যাণময়ী শ্রীশ্রীমা অখণ্ড সাবিত্রী মহাযজ্ঞের যজমানরূপে তাঁহার এই অযোগ্য ও অধম সন্তানকেই মনোনয়ন করিয়াছিলেন। মায়ের কাশী আশ্রমের অখণ্ড শ্রীশ্রী সাবিত্রী মহাযজ্ঞের বিবরণ যথাস্থানে উল্লেখ করিবার ইচ্ছা রহিল।

বারাণসীর গঙ্গাবক্ষে একান্তে শ্রীশ্রীমাতৃ-দর্শন

একবার শ্রীশ্রীমা বারাণসীতে শুভাগমন করিয়া উত্তরবাহিনী পতিতপাবনী মা গঙ্গার উপর একখানি বড় বজরায় (নৌকায়) বাস করিতেছিলেন। তখনও মায়ের কাশী আশ্রম স্থাপিত হয় নাই। নৌকাখানা গঙ্গার অপর পারে দশাশ্বমেধ ঘাটের সম্মুখে রাখা হইয়াছিল, উদ্দেশ্য মাকে একান্তে আপন ভাবে কিছুক্ষণ থাকিবার সুযোগ দেওয়া। তিনি না ডাকিলে কাহারও তাঁহার কাছে যাওয়া নিষেধ ছিল। বজরার মধ্যে দুইখানি কুঠুরী। সম্মুখের প্রকোষ্ঠখানা কিঞ্চিৎ বড় এবং পশ্চাতের খানা অপেক্ষাকৃত ছোট। সামনের বড় কামরায় আছেন মায়ের অতি পুরাতন ভক্ত কলিকাতা হাইকোর্টের উকিল শ্রীযতীশচন্দ্র গুহ এবং পিছনের ছোটখানিতে বিরাজ করিতেছেন স্বয়ং শ্রীশ্রীমা। কিছু পূর্বেই ব্রহ্মচারী শ্রীমান্ অভয় মায়ের সঙ্গে কথাবার্তা বলিয়া চলিয়া গিয়াছে। সেই সময় নৌকায় মা ও যতীশবাবু ব্যতীত অপর কোন তৃতীয় ব্যক্তি ছিল না। আমি মায়ের সকাশে গমন করিতেছি এবং অভয় মায়ের নিকট হইতে প্রত্যাবর্তন করিতেছিল। আমাদের উভয়ের মিলন হইল মাঝ গঙ্গায়। সে আমাকে দেখিয়া বলিল, "এখন মার কাছে যতীশদা ছাড়া আর কেহ নাই। যান, মার সঙ্গে দেখা হইবে।" আমি সবে মাত্র বজরায় গিয়া উঠিয়াছি, অমনি মা নৌকার ভিতরের ছোট কুঠুরী হইতে আমার পূর্বেকার নাম লইয়া বলিলেন, "কে অমুকে নাকি?" আমি গদ্‌গদ কণ্ঠে উত্তর দিলাম, "হাঁ মা! আমি।" শ্রীশ্রীমা নৌকার মধ্যে যে স্থানে অবস্থান করিতেছিলেন সেখান হইতে বজরায় কেহ আগমন করিলে তাঁহার দেখিবার কোন সম্ভাবনা ছিল না। মা সে সময় বসিয়াও ছিলেন না। তিনি তাঁহার শয্যায় শয়ন করিয়াছিলেন। কেহ নৌকায় আসিলে শায়িত অবস্থায় দেখা

আরও অসম্ভব। তথাপি তিনি আমার নাম ধরিয়া ডাকিলেন এবং আমাকে তাঁহার সমীপে কামরার ভিতর যাইবার জন্য অনুমতি প্রদান করিলেন। তিনি আমাকে তাঁহার নিকট যাইতে না ডাকিলে আমাকে যতীশবাবুর কাছেই অনির্দিষ্ট কালের জন্য অপেক্ষা করিতে হইত। কারণ যতীশবাবুর উপর আদেশ ছিল, মা না ডাকিলে কেহ যেন তাঁহার কক্ষে না যায়। আমি বিন্দুমাত্রও আশা করি নাই যে এত শীঘ্র মায়ের সঙ্গে আমার দেখা হইবে। ইহা যে স্নেহময়ী শ্রীশ্রীমায়েরই অহৈতুকী কৃপা তাহা বলাই বাহুল্য। মায়ের অনুমতি প্রাপ্তির আনন্দে আমার মন-প্রাণ-দেহ উৎফুল্ল হইয়া উঠিল।

কৃপাময়ী মায়ের অপ্রত্যাশিতভাবে আদেশ পাইয়া অতিশয় আহ্লাদে উল্লসিত হইয়া তাঁহার প্রকোষ্ঠে গিয়া দেখিলাম তিনি তাঁহার ছোট্ট ও অপরিসর শুভ্র শয্যাখানিতে শয়ন করিয়া আপন ভাবে পদযুগল আন্দোলিত করিতেছেন। আমি তাঁহার কক্ষে প্রবেশ করিতেই তিনি উঠিয়া বসিলেন। আমি মাকে প্রণাম করিয়া সম্মুখে উপবেশন করিতেই তিনি কোন প্রকার প্রশ্নাদি না করিয়া হঠাৎ স্বতঃ প্রাণোদিত হইয়া বলিলেন, "দেখ, এই মুদ্রাটি এইভাবে তিনবার করিবে।" ইহা বলিয়া করুণাময়ী মা স্বয়ং মুদ্রাটি করিয়া আমাকে দেখাইলেন। তিনি যেমন প্রদর্শন করিলেন আমিও তাঁহার সম্মুখে তেমনি করিতে চেষ্টা করিলাম। আমার মুদ্রাটি করিবার মধ্যে যেখানে যাহা ত্রুটি ছিল দয়াময়ী মা সেই সকল ন্যূনতা সংশোধন করিয়া দিলেন। মুদ্রার কোন্ অবস্থায় কতক্ষণ থাকিতে হইবে তাহাও তিনি অনুগ্রহ করিয়া বলিয়া দিলেন। তৎ তৎ অবস্থিত অবস্থায় ইষ্টমন্ত্র দ্বারা সংখ্যা রাখিবার নির্দেশ প্রদান করিলেন। আমি তাঁহার চরণে নিবেদন করিলাম, "মা! আমি তো এখন দীক্ষা গ্রহণ করি নাই, তাহা হইলে কি মন্ত্র দ্বারা সংখ্যা রাখিব?" আমার এই কথার উপর তিনি আমাকে প্রণব দ্বারা সংখ্যা রাখিতে আদেশ করিলেন। এইরূপে সেইদিন তিনি দয়া করিয়া আমাকে তিনটি মুদ্রা দেখাইয়াছিলেন। মুমুক্ষু সাধকদের মুদ্রা তিনটি বড়ই আবশ্যকীয় এবং

উপকারী। শ্রীশ্রীমায়ের বিনা অনুমতিতে ঐ সকল মুদ্রার নামও বিশেষ বর্ণনা দেওয়া সমীচীন মনে না করায় বাধ্য হইয়া নিরস্ত রহিলাম।

সেইদিন আমি মাকে দর্শন করিবার অভিলাষেই গিয়াছিলাম, আমার মনে অন্য কোন প্রকার উদ্দেশ্য বা সঙ্কল্প ছিল না। আমার প্রার্থনার অপেক্ষা না রাখিয়া তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই সেইদিন করুণা করিয়া আমাকে মুদ্রা তিনটী দেখাইয়াছিলেন। ইহাকেই বলে অহৈতুকী কৃপা—যাচ্ঞা না করিতে এবং যোগ্যতার বিচার না করিয়া স্বেচ্ছায় যে দান তাহাকে ইহা ব্যতীত আর কি নামে অভিহিত করা যায়?

অনুরূপ একটি ঘটনা গত ১৯৬৩ খৃষ্টাব্দের মার্চমাসে সংঘটিত হইয়াছিল। দোলের সময় আমরা অনেকেই শ্রীশ্রীমায়ের সঙ্গে বৃন্দাবনে অবস্থান করিতেছি। একদিন বেলা অনুমান দশটার সময় তিনি বেড়াইতে বেড়াইতে "ভাগবত ভবনে" (হলঘরে) আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ইহা বলাই অনাবশ্যক, আমরাও অনেকেই তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ হলে গিয়া পৌঁছিলাম। উহারই মধ্যে এক ফাঁকে তিনি আমাকে তাঁহার সঙ্গে যাইবার জন্য বলিয়া শিবমন্দিরে গিয়া প্রবেশ করিলেন। তখনও মন্দিরে শিবপূজা হয় নাই। পূজারী তখনই শিবপূজা করিতে মন্দিরে আসিবেন দেখিয়া আমাকে সঙ্গে লইয়া তিনি শ্রীমন্মহাপ্রভুর মন্দিরে প্রবেশ করিয়াই দরজা বন্ধ করিবার জন্য আদেশ দিলেন। আমি তাঁহার নির্দেশানুসারে মন্দিরের দ্বার রুদ্ধ করিয়া দাঁড়াইতেই পরম করুণাময়ী শ্রীশ্রীমা করুণা করিয়া একটি শ্বাসের ক্রিয়া করিয়া আমাকে দেখাইলেন এবং ধ্যানের পূর্বে উহা ছয়বার করিতে বলিলেন। তাঁহার নির্দেশ মত উহা আমি তাঁহার সম্মুখে করিলাম। এক একবারে উহা কত বার করিতে হইবে তাহাও তিনি সেই সময় অনুগ্রহ করিয়া বলিয়া দিলেন। এই ক্রিয়া ধ্যানের পূর্বে করিলে সাধনায় অর্থাৎ মনের একাগ্রতায় অনেকটা সাহায্য করে। যখন মায়ের মধ্যে কিছু দান করিবার খেয়াল হয় এবং করুণার উদ্রেক অধিক পরিমাণে সঞ্চারিত হয় তখন শ্রীশ্রীমায়ের চরণে প্রার্থনা না করিলেও তিনি এইভাবে

দয়া করিয়া সাধনার পথ প্রদর্শনকরতঃ আমাদের মত অধম ও অযোগ্য সন্তানদের অশেষ কল্যাণ করিয়া থাকেন। শ্রীশ্রীমায়ের করুণা সর্বক্ষণই জীবের প্রতি রহিয়াছে ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। কোন কোন সময় উহার আধিক্য লক্ষিত হয়। মায়ের যোগ্য সন্তানেরা মায়ের কাছ হইতে এই প্রকার কত যে অমূল্য রত্ন পাইতেছেন তাহা গোপনই রহিয়া যাইতেছে। তাহা জানিবার কোন উপায় নাই। আমরা তাঁহার নির্দেশানুসারে কাজ করি না সেইজন্য আশানুরূপ ফলও পাই না। কাজ করিলে অবশ্যই ফল পাওয়া যায়। মা তো দান করিবার জন্য সর্বদাই প্রস্তুত—গ্রহীতা কোথায়? নেয় কে?

একবার আমরা অনেকেই শ্রীশ্রীমায়ের সঙ্গে রাজগৃহের গৃধ্রকূট পর্বতের উপর যেখানে পরম কারুণিক শ্রীবুদ্ধদেব ধ্যানে মগ্ন থাকিতেন সেই স্থানটি দর্শন করিতে গিয়াছিলাম। সেই অতি পবিত্র ও রমণীয় স্থানটি দেখিয়া সকলেই মায়ের সঙ্গে পাহাড় হইতে নীচে অবতরণ করিয়া মধ্যপথে বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। আমি সেই সুন্দর স্থলটিতে উন্মুক্ত আকাশের নীচে মায়ের প্রদর্শিত শ্বাসের ক্রিয়াটি করিয়া ধ্যানে বসিলাম। আমি কতক্ষণ যে সেখানে ধ্যানমগ্ন ছিলাম তাহা সঠিক বলিতে পারিব না। অনুমান করি এক ঘণ্টার কম তো নহেই, কিছু অধিক সময়ও হইতে পারে। এই প্রকার ধ্যান পূর্বে কখনও আমার জমে নাই। জমিলেও অতি অল্প সময়ের জন্যই হইয়াছে, এত অধিক কালের জন্য হয় নাই। এই ধ্যানমগ্ন অবস্থিতির মধ্যে দুই কি তিনবারের বেশী অন্য কোন চিন্তা মনে উদয় হয় নাই! ধ্যান বেশ সুন্দর তৈল-ধারাবৎ একটানা চলিয়াছিল। ইহা যে শ্রীশ্রীমায়ের প্রদর্শিত ক্রিয়ারই ফল ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। মায়ের দিক হইতে কোন রকম উৎসাহের অভাব কিংবা কৃপার কৃপণতা কদাপি দৃষ্টি-গোচর হয় না। আমাদের পূর্বজন্মের কৃত কর্ম সাধনার এত প্রতি-বন্ধক যে কিছুতেই সাধনপথে অগ্রসর হইতে দেয় না। ধ্যানভঙ্গ হইবার পর সেই স্থান হইতে পাহাড়ের নীচে আসিয়া দেখি মা সকলকে লইয়া আশ্রমে প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন।

আমার দীক্ষার একটি ক্ষুদ্র বিবরণ

বাঙ্গালা ১৩৫০ সালের দারুণ গ্রীষ্মের সময় শ্রীশ্রীমায়ের সহিত আমরা অনেকেই আলমোড়া যাইতেছি। কাঠগোদাম হইতে আলমোড়া যাইতে হিমালয়ের বক্ষভেদ করিয়া চুরাশি মাইল পথ সর্পিল গতিতে মোটরবাসে যাইতে হয়। দেবাদিদেব মহাদেবের প্রিয় আবাসস্থল কৈলাস হইতে প্রত্যাবর্তনের সময় এই পবিত্র উত্তরাখণ্ডের তপোভূমিতে মায়ের পরমভক্ত ও অতিশয় অনুগত সন্তান "ভাইজী" শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র রায় তাঁহার সাধনোচিতস্থান মাতৃ-ক্রোড়ে চিরশান্তি লাভ করিয়াছিলেন। আলমোড়ার উপকণ্ঠে পাতালদেবীর মন্দিরের নিকট তাঁহাকে সমাধিস্থ করা হয়। তাঁহার সমাধির উপর সোলনের রাজাসাহেব শ্রীদুর্গা সিংজী একটি অতি সুন্দর মন্দির নির্মাণ করাইয়া তাঁহার স্মৃতি রক্ষা করিয়াছেন। পরে সেই মন্দিরে শ্রীশ্রীমায়ের নির্দেশমত এবং তাঁহার পবিত্র উপস্থিতিতে একটি নর্মদেশ্বর শিবলিঙ্গ শাস্ত্রীয় বিধানমত প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং নিত্য তাঁহার সেবা পূজা চলিতেছে। পাতালদেবীতে তখনও মায়ের কোন আশ্রম নির্মাণ হয় নাই। সমাধি মন্দিরের পূর্বদিকে মায়ের জন্য ছোট্ট একখানি প্রকোষ্ঠ—উহারই দক্ষিণাংশের ঘেরা বারান্দায় তাঁহার ভোগ রন্ধন হইত। উহার উত্তরদিকের বারান্দা হইতে দেখা যায় সুদূরের চিরতুষারমণ্ডিত হিমালয়ের ধবল গিরিশৃঙ্গ। মায়ের পরমভক্ত দেহরাদুন নিবাসী শ্রীপরশুরামজী ঐ স্থানেই শ্রীশ্রীমায়ের জন্য এক বিরাট আশ্রম নির্মাণ করাইয়াছেন। যতটা আমার মনে পড়ে সেইসময় মায়ের সঙ্গে ছিলেন দিদি শ্রীগুরুপ্রিয়া দেবী, স্বামী পরমানন্দজী ও ব্রহ্মচারী শ্রীঅভয়। সংযোগবশতঃ সেই সঙ্গে আমারও অবস্থান করিবার সুযোগ হইয়াছিল। আমরা চারিজন যাহারা মায়ের সঙ্গে আলমোড়ায় গিয়াছিলাম সকলেই রাত্রিতে বাস করিতাম মায়ের ক্ষুদ্র কক্ষে।

মা শয়ন করিতেন তক্তপোষের উপর এবং আমরা সকলে ভূমিতে। দিনের বেলায় আমরা সময় অতিবাহিত করিতাম বাহিরের বারান্দায় অথবা বৃহৎ তুনবৃক্ষের তলায়। পরে যাঁহারা মাতৃসঙ্গের অভিলাষে সেখানে গিয়াছিলেন তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ বাস করিতেন স্বামী হরিহরানন্দজীর সমাধিক্ষেত্রে অথবা পাহাড়ের উপর ভাড়াটিয়া বাড়ীতে। সকাল বৈকাল দুই বেলায় সকলে আসিয়া মায়ের সঙ্গ করিতেন এবং নানা প্রকার ধর্মালোচনার দ্বারা পরিতৃপ্ত হইতেন। দিদি ও আমার উপর মায়ের নির্দেশ ছিল নিত্য গায়ত্রী-যজ্ঞ করিবার জন্য। সেই সময় সেখানে যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন তাঁহারা সকলে মিলিয়া স্থির করিলেন সেবার শ্রীশ্রীমায়ের শুভ-জন্মোৎসব আলমোড়াতেই হইবে। এই উৎসব উপলক্ষ করিয়া মায়ের সন্তানগণ যাঁহারা সেখানে গিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই সুপ্রসিদ্ধ নৃত্যকলাবিশারদ শ্রীউদয়শঙ্করের সেণ্টার এবং ব্রহ্মচারী শ্রীআত্মস্বরূপজীর (শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ সান্ন্যালের) শৈলাবাসে থাকিতেন। অন্যকোন সুবিধাজনক স্থান সেখানে না থাকায় ভাইজীর সমাধিমন্দিরেই শ্রীশ্রীমায়ের তিথিপূজার আয়োজন করা হইয়াছে। স্থির হইয়াছিল ভাইজীর মন্ত্রশিষ্য শ্রীহরিরাম যোশী রাত্রি তিন ঘটিকার সময় শ্রীশ্রীমায়ের পূজা করিবেন। মায়ের তিথিপূজার দিন বরাবরই গুরুপ্রিয়া দিদি উপবাসী থাকিতেন। কি জানি কেন তিনি এবার আমাকেও উপবাস থাকিতে বলিলেন। তাঁহার কথনানুসারে আমি অভুক্ত রহিলাম।

বৈকালবেলা দেখি পাতালদেবীর কুণ্ডের পাড়ে বসিয়া শ্রীহরিরাম ভাই তাম্বুল চর্বণ করিতেছেন। অতিশয় সরলভাবে আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি না আজ রাত্রিতে মায়ের পূজা করিবেন? তবে যে আপনি পান খাইতেছেন? উপবাস করেন নাই?" আমার মনে হয় তিনি জানিতেন না যে মায়ের তিথিপূজা উপবাসী থাকিয়া করিতে হয়। সম্ভবতঃ দিদিও তাঁহাকে এই বিষয় কিছু বলেন নাই। বলিলে তিনি নিশ্চয়ই অভুক্ত থাকিতেন। দিদিও হয় তো ভাবিয়াছিলেন—হরিরাম যখন মায়ের পূজা করিবেন তখন তিনি উপবাস করিবেনই। ইহা আবার তিনি কি বলিবেন!

পূজা করিলে উপবাসী থাকিতেই হয়। আমি যেমন তাঁহাকে সরলভাবে প্রশ্ন করিয়াছিলাম, তিনিও আমার প্রশ্নের উত্তরে সোজাসোজি অতি সহজভাবে আমাকে বলিলেন, "আমি মায়ের পূজা করিতে পারিব না। কারণ আমি ভোজন করিয়াছি। আমি জানিতাম না যে মায়ের পূজা উপবাসী থাকিয়া করিতে হয়। আপনিই আজ মায়ের পূজা করিবেন।" এইসব কথা গুরুপ্রিয়া দিদিকে জানান হইলে তিনিও আমাকেই শ্রীশ্রীমায়ের তিথি পূজা করিতে বলিলেন, কারণ তিনি অবগত ছিলেন যে তাঁহার পরামর্শানুসারে আমি অনাহারী আছি।

মাতৃপূজার অধিকার প্রাপ্ত হইয়া আমার মনে যে অত্যন্ত আনন্দ হইয়াছিল তাহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আমি এক মহাবিপদে পড়িয়া গেলাম। কারণ আমি শালগ্রামে শ্রীশ্রীনারায়ণপূজা ব্যতীত অন্য কোন পূজা জানি না। অদীক্ষিত ব্রাহ্মণদের উপনয়নের পর কেবল নারায়ণ ও শিব পূজার অধিকার আছে, শক্তিপূজার নাকি অধিকার নাই। ইহাই বাল্যকাল হইতে গুরুজনদের মুখে শুনিয়া আসিতেছি। শক্তিপূজা করিতে হইলে তান্ত্রিক গুরুর নিকট হইতে বিধিমত শক্তি-মন্ত্রে দীক্ষিত হওয়া আবশ্যক। দিদি নিশ্চয়ই জানিতেন না যে আমি দীক্ষা গ্রহণ করি নাই। তিনি জানিলে কখনই আমাকে মায়ের পূজা করিতে বলিতেন না। এতদিন পর্যন্ত যে আমি অদীক্ষিত আছি ইহা তিনি কোন রকমেই ভাবিতে পারেন নাই।

বিশ্বজননী পরমাশক্তি শ্রীশ্রীমায়ের শুভ জন্মোৎসবের তিথিপূজা প্রথমে বাবা শ্রীভোলানাথ স্বয়ং করিতেন। তাঁহার দেহরক্ষার পর কয়েক বৎসর যাবৎ শ্রীমন্মথনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এই পূজা করিয়া আসিতেছেন। এইবার আমার ন্যায় অযোগ্য ও অনধিকারী ব্যক্তির উপর এই গুরুভার অর্পিত হইবার দরুন আমি মহাবিপদেই পড়িয়া গেলাম। কাঁহার পূজা, কি পদ্ধতিতে করিলে শ্রীশ্রীমা তাহা গ্রহণ করিবেন? এইসব চিন্তা করিয়া যখন কিছুই মীমাংসা বা সাব্যস্ত করিতে পারিলাম না তখন অত্যন্ত নিরুপায় হইয়া সন্ধ্যার সময় যখন মা সমাধি মন্দিরের সম্মুখে একাকী পাদচারণ (পায়চারি)

করিতেছিলেন তখন সুযোগ পাইয়া তাঁহাকেই এই সমস্যার নিষ্পত্তির জন্য ধরিলাম। অনেকক্ষণ পর্যন্ত তো কোন রকমেই কিছু বলিতে স্বীকার হইলেন না। অবশেষে যখন একেবারে নাছোড়বান্দা হইয়া বিনীতভাবে প্রার্থনা করিতে লাগিলাম, তখন আমার আর্তি বা কাতরতা দেখিয়া বোধ হয় জননীর একটু দয়া হইল। তখন নেহাৎ অনিচ্ছায় করুণাময়ী শ্রীশ্রীমা করুণা করিয়া অতি সংক্ষেপে আমাকে বলিলেন, "যার যার ইষ্ট পূজা।" তাঁহার এই সংক্ষিপ্ত উত্তরে আমি বুঝিলাম যাহার যে ইষ্ট তাঁহার পূজা করিলেই শ্রীশ্রীমায়ের পূজা হয়। ইহাই তিনি সূত্রাকারে আমাকে দয়া করিয়া নির্দেশ করিলেন। ইহার দ্বারা ইহাও ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে যে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যত দেব ও দেবী ইষ্টরূপে পূজিত তথা আরাধিত হইতেছেন সকলই শ্রীশ্রীমায়ের বিভিন্ন রূপ। সকল নাম ও সকল রূপেও তিনি এবং অনাম ও অরূপেও তিনিই। উপাসকদের উপাসনার সুবিধা ও সিদ্ধির জন্য এক ব্রহ্মেরই নানারূপ কল্পনা করা হইয়াছে। যেমন এক ব্রহ্মেরই তিন মূর্তি—ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর। মূলতঃ তিন দেবতাই এক। শাস্ত্রও এই কথাই বলিয়াছেন—

উপাসকানাং সিদ্ধ্যর্থং ব্রহ্মণো রূপকল্পনা।
একো মূর্তিস্ত্রয়ো দেবা ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরাঃ॥

ভাইজী শ্রীজ্যোতিষ চন্দ্র রায় এই পরম সত্যকেই মূলভিত্তি করিয়া তাঁহার রচিত মাতৃবন্দনায় শ্রীশ্রীমাকে বলিয়াছেন 'সর্ব দেবদেবী-ময়ী মা'। মাও কোন সময় আত্মপরিচয় নিতে গিয়া নিজেকে বলিয়াছেন, "পূর্ণব্রহ্মনারায়ণ"। আজও মা আমাকে তাহাই এইভাবে সূত্রাকারে নির্দেশ করিলেন, "যার যার ইষ্ট পূজা"। শ্রীদুর্গাসহস্রনামস্তোত্রেও মহাদেবীকে "সর্বদেবময়ী পুষ্টা ভূষ্যা ভূত-পতিপ্রিয়া" বলা হইয়াছে।

এখন আমার মনে প্রশ্ন উঠিল আমি যখন কোন গুরুর দ্বারা তন্ত্রোক্ত মন্ত্রে দীক্ষিত নহি তখন কে আমার ইষ্ট দেবতা? কাহার পূজা আমি আজ করিব? এই স্বাভাবিক প্রশ্নের উত্তরে আমি

মনে মনে বিচার করিয়া মীমাংসা করিলাম, গত ১৯৪২ খৃষ্টাব্দের শ্রীশ্রীকালীপূজার মহানিশাতে দেহরাদুন রায়পুরে শ্রীশ্রীমা যে এক অভিনব অনুষ্ঠানের দ্বারা একটি নাম গ্রহণ করাইয়াছিলেন সেই নামেরই যিনি নামী বা দেবতা তাঁহাকেই আজ ইষ্টরূপে পূজা করিব স্থির করিলাম। এই অভিনব অনুষ্ঠানের যথাসম্ভব বিবরণ পূর্বে যথাস্থানে উল্লেখ করা হইয়াছে। এই দেবতাকে আমি বহুপূর্বে আমার পাঠ্যাবস্থায় (১৯১৫-১৯১৬ খৃষ্টাব্দে) প্রথম স্বপ্নে দর্শন করি এবং তিনি হাতছানি অর্থাৎ করতল সঞ্চালনপূর্বক ইশারা দ্বারা আমাকে তাঁহার নিকট যাইবার জন্য ডাকিতে-ছিলেন। এখনও কখন কখন তিনি কৃপা করিয়া দর্শন দানে সন্তানকে অনুগৃহীত করিতেছেন। ইষ্টদেবতা সকলেরই নির্ধারিত আছেন সময়মত প্রকাশিত হইয়া থাকেন। তিনি সর্বদাই তাঁহার আশ্রিতজনের প্রতি কৃপাদৃষ্টি রাখেন। এখন সুযোগ পাইয়া কথায় কথায় অতিশয় বিনম্রভাবে শ্রীশ্রীমায়ের চরণে নিবেদন করিলাম।

আমি—মা! আমি তো দীক্ষিত নহি। ইষ্টপূজা কি করিয়া করিব? কাহার পূজা করিব? কে আমার ইষ্টদেবতা?

মা—তুমি এতদিন পর্যন্তও দীক্ষা লও নাই?

আমি—না মা! আমি এখনও দীক্ষা লই নাই। দীক্ষা গ্রহণের সুযোগ জীবনে বহু হইয়াছিল। কারণ অল্প বয়স হইতেই অনেক সাধু, সন্ন্যাসী, যোগী ও বড় বড় পণ্ডিতদের নিকট যাতায়াত করিতাম এবং তাঁহারা সকলেই স্নেহও করিতেন। দীক্ষার জন্য প্রার্থনা করিলেই হয় তো তাঁহারা কৃপা করিয়া দীক্ষা দিতেন। কিন্তু মা! তোমাকে দর্শনের প্রথম দিন হইতেই মনে মনে নিশ্চয় করিয়াছিলাম যদি তোমার নিকট হইতে কোন মন্ত্র কিংবা বীজ প্রাপ্ত হই তাহা হইলেই উহা গ্রহণ করিব নচেৎ যজ্ঞোপবীতের সময় আচার্য গুরুর মুখ হইতে যে গায়ত্রী মন্ত্র পাইয়াছি তাহা লইয়াই জীবন কাটাইয়া দিব। অন্য কাহারও কাছ হইতে দীক্ষা লইব না। মা! দয়া করিয়া যখন তুমি এতটাই করিলে তাহা হইলে কৃপা করিয়া দীক্ষা দিয়া শ্রীচরণে স্থান দেও। মা!

আমার এই বাসনা তুমি অনুগ্রহ করিয়া পূর্ণ কর। ইহার পূর্বে মায়ের নিকট এ জাতীয় কোন প্রার্থনা আমি কখনও করি নাই। বিনা আবেদনে যখন যাহা তিনি প্রয়োজন বুঝিয়াছেন, জননী আমার, তখনই তাহা করুণা করিয়া প্রদান করিয়াছেন। আবেদন নিবেদনের কোন অপেক্ষা রাখেন নাই। ইহা তাঁহার অহৈতুকী কৃপাই বলিতে হইবে। অধিকারের দিক হইতে বিচার করিলে বাস্তবিক পক্ষে মায়ের নিকট হইতে কিছু চাহিবার আমার যোগ্যতা নাই। আমি যে কতখানি যোগ্যতা রাখি তাহা তো আমার সম্যক্ জানা আছে। শ্রীশ্রীমাতৃচরণে দীক্ষার জন্য প্রার্থনা করিতে তিনি বলিলেন, "যদি যোগাযোগ হয় তাহা হইলে শ্রাবণ মাসে বিন্ধ্যাচলে ঝুলন-পূর্ণিমার দিন যাহা হইয়া যায়।" তখন সবেমাত্র বৈশাখ মাস। শ্রাবণ মাসের ঝুলন-পূর্ণিমার এখনও প্রায় তিন মাস বিলম্ব আছে। তথাপি করুণাময়ী শ্রীশ্রীমায়ের মুখকমল হইতে নিঃসৃত এই আশার বাণী প্রাপ্ত হইয়া আমার মনপ্রাণ আনন্দে পূর্ণ হইয়া গেল। সেইদিন হইতে আশায় আশায় আমি দিন গণনা করিতে লাগিলাম সেই শুভ ঝুলন-পূর্ণিমার আর কত দিন বাকী। শ্রীশ্রীমায়ের এই দিব্য শরীরেরও দীক্ষার লীলা এই ঝুলন-পূর্ণিমাতেই সংঘটিত হইয়াছিল। মায়ের শ্রীপাদপদ্মে পুনরায় করজোড়ে প্রার্থনা নিবেদন করিলাম, "মা! আমি মন্ত্র, তন্ত্র, পূজাদি কিছুই জানি না। ভক্তি শ্রদ্ধাও নাই। আমি আজ রাত্রিতে যেভাবে তোমার পূজা করিব, তাহা মা তুমি, দয়া করিয়া গ্রহণ করিও। পূজার ত্রুটি বিচ্যুতি তুমি দেখিও না। তোমার চরণে আজ আমার এই বিনীত প্রার্থনা"।

ঘটনাচক্রে প্রায় তিন মাস পর শ্রাবণ মাসে বর্ষার সময় শ্রীশ্রীমায়ের বিন্ধ্যাচল যাওয়া হইল। গত কয় মাস যাবৎ আমিও মায়ের সঙ্গে সঙ্গেই আছি। দেখিতে দেখিতে সেই বহুদিনের আকাঙ্ক্ষিত ঝুলন-পূর্ণিমার শুভদিন আসিয়া উপস্থিত হইল। সেই পবিত্র দীক্ষাবাসরের স্মরণার্থ খুকুনী দিদি এবং আমরাও কেহ কেহ এই ঝুলন-পূর্ণিমার পুণ্যদিবসে উপবাসী থাকিতাম। সেই কারণে আজ প্রামি অভুক্ত আছি। বিন্ধ্যাচলে যাইবার পর

কয়েকবারই আমি দীক্ষার বিষয় শ্রীশ্রীমাতৃ-সকাশে নিবেদন করিয়াছি।

মধ্যাহ্নের ভোগান্তে মা যখন বিশ্রাম করিবার জন্য উপরের ঘরে যাইতেছিলেন তখন তিনি দয়া করিয়া আমাকেও তাঁহার সঙ্গে দোতালার কক্ষে যাইবার জন্য আদেশ করিলেন। বলা বাহুল্য আজ সকাল হইতে আমি মায়ের সঙ্গে সঙ্গে ছায়ার ন্যায় তাঁহাকে অনুসরণ করিতেছিলাম। কখন তিনি কৃপা করিয়া আমাকে ডাকিবেন এই আশায় একক্ষণের জন্যও মায়ের সঙ্গ ছাড়া হই নাই। মায়ের ঘর হইতে যখন সকলে চলিয়া গেলেন তখন তিনি আমাকে বলিলেন, "দেখ তো ভাইজীর লেখা 'মাতৃ-দর্শন' পুস্তক এখানে কাহারও কাছে আছে কিনা?" আমি অনুসন্ধান করিয়া দেখিলাম কিন্তু দুঃখের বিষয় ঐ পুস্তকখানা তখন কাহারও নিকট পাওয়া গেল না। মাকে এই কথা বলাতে তিনি আমাকে ঘরের সব দরজা বন্ধ করিয়া তাঁহার কাছে বসিতে বলিলেন। তাঁহার আদেশানুসারে কক্ষের সমস্ত দ্বার রুদ্ধ করিয়া তাঁহার পদপ্রান্তে প্রণাম করিয়া বসিলাম। তখনকার দিনে এই সকল কার্য যে অতি গোপনে অনুষ্ঠিত হইত তাহা বলাই অনাবশ্যক। ফলে ইহার গাম্ভীর্য ও মাহাত্ম্য অধিক দেওয়া হইত।

পরম করুণাময়ী শ্রীশ্রীমা তাঁহার শয্যার উপর উপুড় হইয়া শয়নকরতঃ একটি অক্ষর উচ্চারণ করিয়া উহার পরের অক্ষরটি কি, আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি সেই অক্ষরটি উচ্চারণ করিলে, তিনি পুনরায় বলিলেন, "এই অক্ষরটির সহিত "ইহা" যোগ করিলে যাহা হয় তাহাই তোমার বীজমন্ত্র।" এইরূপে মহাশক্তি-রূপিণী শ্রীশ্রীমায়ের নিকট হইতে একটি বীজমন্ত্রের সঙ্কেত প্রাপ্ত হইয়া আমি সেই বীজমন্ত্রটি উচ্চারণ করিলে তিনি বলিলেন "হাঁ', এইটিই তোমার বীজমন্ত্র।" ইহার পর তিনি সেই বীজমন্ত্রের অর্থ এবং কিরূপে বীজমন্ত্রদ্বারা প্রাণায়াম ও জপ করিতে হইবে তাহা সব বিস্তারিতভাবে বলিয়া দিলেন। তদনন্তর বলিলেন বীজমন্ত্রের উপর বিশেষ পূজার পদ্ধতি এবং পূজার পর সেই বীজমন্ত্রদ্বারা যাহা

কিছু করণীয় সেই সকলও বলিলেন। শ্রীশ্রীমায়ের অনুমতি ব্যতীত ইহার অধিক আর কিছু প্রকাশ করা উচিত নহে বিবেচনা করিয়া নিরস্ত রহিলাম। এই সম্বন্ধে যদি কেহ অধিক জানিতে ইচ্ছা করেন শ্রীশ্রীমাকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন। তিনি যদি দয়া করিয়া কিছু বলেন তবেই ইহা প্রকাশ হইবে নতুবা ইহা গুপ্তই থাকিবে।

আমার বহু বীজমন্ত্র জানা আছে। কিন্তু শ্রীশ্রীমাতৃ-প্রদত্ত এই বীজমন্ত্রটি সাধারণতঃ যে সব বীজমন্ত্র লোকে পাইয়া থাকে তাহা হইতে ভিন্ন এবং অর্থও ইহার অতি ব্যাপক ও গুরুত্বপূর্ণ। আমার মত অতি সাধারণ, অযোগ্য ও ভাগ্যহীন জীব ইহা অপেক্ষা আর কি অধিক বিশ্বজননীর নিকট হইতে আশা করিতে পারে? যাঁহারা উচ্চ অধিকারী, সুযোগ্য এবং স্নেহময়ী শ্রীশ্রীমায়ের অনুগত সন্তান সেই সব ভাগ্যবান্ ব্যক্তিরা হয় তো বা তাঁহার মুখকমল হইতে বীজমন্ত্রাদি প্রাপ্ত হইয়া কৃতার্থ হইতেছেন। মন্দভাগ্য ও অবাধ্য সন্তান আমি এইভাবে সংকেতে তাঁহার নিকট হইতে মন্ত্র পাইয়া নিজেকে ধন্য মনে করিলাম। বামন হইয়া চাঁদ ধরিতে যাওয়াকে লোকে উপহাসই করিয়া থাকে, প্রশংসা করে না।

এই ঘটনার অনুমান সাত বৎসর পর গত ১৯৫০ খৃষ্টাব্দে যখন শ্রীশ্রীমায়ের কাশী আশ্রমে শ্রীশ্রীসাবিত্রী মহাযজ্ঞের পূর্ণাহুতি হয় সেই সময় উত্তর-কাশীর প্রসিদ্ধ ও অতি প্রধান মহাত্মা শ্রীমৎ স্বামী দেবী গিরিজী মহারাজ আসিয়া মায়ের বারাণসী আশ্রমে কিছু দিন বাস করিয়াছিলেন। সেই সময় আশ্রমের কতিপয় ব্যক্তি এবং মায়ের ভক্তদের মধ্যেও কেহ কেহ তাঁহার নিকট হইতে দীক্ষা গ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন অতিশয় ত্যাগী, পণ্ডিত ও একজন উচ্চ-কোটির আদর্শ সন্ন্যাসী। বিশ্ববরেণ্যা শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ীর বিশেষ আহ্বানে এই মহাপুরুষ প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পর হিমালয়ের উত্তরা-খণ্ড হইতে সমতল ভূমি, বাবা শ্রীশ্রীবিশ্বনাথের প্রিয় স্থান অবিমুক্ত-ক্ষেত্র বারাণসীতে যজ্ঞের পূর্ণাহুতি উপলক্ষে অবতরণ করিয়াছিলেন। একদিন মা আমাকে বলিলেন, "আজ অনেকে দেবী গিরিজী মহারাজের কাছে দীক্ষা লইতেছে। দেখ, তুমিও তাঁহার নিকট

হইতে দীক্ষা লইবে না কি ?" মায়ের এই জিজ্ঞাসার উত্তরে আমি অতি বিনীতভাবে তাঁহাকে নিবেদন করিলাম, "মা! আমার এই একটা মাথা কয়জনের চরণে সমর্পণ করিব ? একবার নিবেদিত বস্তু পুনরায় কি উৎসর্গ করা যায় ?" আমার এই উত্তর শুনিয়া মা সহাস্যে বলিলেন, "দেখিলাম, যাহা পাইয়াছ তাহাতেই সন্তুষ্ট আছ কিনা ?"

শ্রীশ্রীমায়ের প্রথম দর্শনের অনুমান ষোল কি সতর বৎসর পর তিনি এইরূপে কৃপা করিয়া তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে আশ্রয় দানকরতঃ আমাকে কৃতার্থ করিয়াছিলেন। এই সুদীর্ঘকাল আমাকে যে কিভাবে আশায় আশায় কাটাইতে হইয়াছিল তাহা কেবল অন্তর্যামিনী শ্রীশ্রীমাই জানেন। কোন মুহূর্তে যে তিনি কাহার উপর কিভাবে করুণা করিবেন তাহা তো কাহারও জানা নাই। সেইজন্য চাতকপাখী যেমন স্বাতিনক্ষত্রের ফটিক জলের নিমিত্ত সদা উদ্‌গ্রীব হইয়া আকাশের দিকে চাহিয়া থাকে তদ্রূপ আমাদের শ্রীশ্রীমায়ের করুণার জন্য সর্বক্ষণ উৎকণ্ঠিত হইয়া থাকিতে হইবে।

গুরু বন্দনা

লহ গুরুর চরণে শরণ।
গুরু পতিতপাবন, তিনি অতিশয় আপন,
তিনি ছাড়া ভবে আর কেই বা স্বজন
লহ গুরুর চরণে শরণ॥
তোর জীবনের পথে, গুরু নিত্য থাকেন সাথে,
ভব পারের তিনি পরম কারণ।
লহ গুরুর চরণে শরণ॥
গুরু অতি পরমধন, তুই আর বুঝবি কবে মন;
হৃদয় আসনে তাঁরে কররে স্থাপন।
লহ গুরুর চরণে শরণ॥
গুরু ভব-কর্ণধার, তোর চিন্তা কিরে আর,
অনায়াসে পারে করিবি গমন।
লহ গুরুর চরণে শরণ॥
গুরুর মহিমা অপার, গুরুতত্ত্ব বুঝা ভার,
জানলে তারে দূরে যায় শমন।
লহ গুরুর চরণে শরণ॥
গুরু জ্ঞানের প্রদীপ জ্বালি, ঘোচান মনের সকল কালি,
গুরু আমার জগৎ-উদ্ধারণ।
লহ গুরুর চরণে শরণ॥
তোর সাধনায় কি কাজ, চরণে শরণ লহ আজ,
চরম সাধন তোর আত্মসমর্পণ।
লহ গুরুর চরণে শরণ॥

প্রার্থনা

মাগো, তব চরণতলে দিয়ো মোরে ঠাঁই।
চারিদিকে যখন চাই, দেখি, কিছু ধরিবার নাই,
অকুল সাগরে ভেসে মাগো যাই।
মাগো, তব চরণতলে দিয়ো মোরে ঠাঁই॥

মোর সাধন ভজন নাই, ভক্তি শ্রদ্ধা কোথা পাই,
শেষের দিনে আঁধার দেখি তাই।
মাগো, তব চরণতলে দিয়ো মোরে ঠাঁই॥

জীর্ণ মোর এই দেহতরী, সদা আমি ভয়ে মরি,
এই বুঝি চিরতরে ডুবে মাগো যাই।
মাগো, তব চরণতলে দিয়ো মোরে ঠাঁই॥

নাই বলতে কিছুই নাই, পারের কড়ি কোথা পাই,
খেয়াঘাটে সন্ধ্যাবেলা ভাবি বসে তাই।
মাগো, তব চরণতলে দিয়ো মোরে ঠাঁই॥

আমি যে উপায় হীন, ডাঙ্গাতে যেমন মীন,
ছট্‌ফট্‌ করি আর মায়ের মুখপানে চাই।
মাগো, তব চরণতলে দিয়ো মোরে ঠাঁই॥

তুমি যদি না চাহিবে, দীন কাহার শরণ লবে,
ভেবে ভেবে কেবল মাগো ভাবনা বাড়াই।
মাগো, তব চরণতলে দিয়ো মোরে ঠাঁই॥

সন্ধ্যা যে ঘনিয়ে এলো, কাকে এখন ডাকি বলো,
মা ভিন্ন মোর আর কেহ আপন নাই।
মাগো, তব চরণতলে দিয়ো মোরে ঠাঁই॥

দীন সন্তানের এই নিবেদন, এবে, দেহ মোরে শরণ
তব চরণতলে আমি মাগো পড়িয়া লুটাই।
মাগো, তব চরণতলে দিয়ো মোরে ঠাঁই॥

শ্রীশ্রীমায়ের কাশী আশ্রমের সূত্রপাত

সনাতনধর্মাবলম্বী হিন্দুদের সর্বপ্রধান তীর্থ বারাণসী। ইহার উত্তরে বরুণা নদী এবং দক্ষিণে অসি। এই দুই নদীর মধ্যবর্তী স্থানকে বারাণসী বা কাশী কহে। কাশীর অধিদেবতা বা অধীশ্বর স্বয়ং দেবাদিদেব মহাদেব। এই অতি পবিত্র স্থানটি পতিতপাবনী ভাগীরথী গঙ্গার পশ্চিমতটে অবস্থিত। পূতসলিলা মা গঙ্গা এখানে উত্তরবাহিনী এবং অর্ধচন্দ্রাকৃতি। এই পুণ্যতীর্থে যে কোন জীব দেহত্যাগ করে তাহাকে পুনরায় মাতৃগর্ভে আসিতে হয় না। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীশঙ্কর মৃত্যুসময় জীবের দক্ষিণকর্ণে শ্রীরাম-নামরূপ মহামন্ত্র দান ও জ্ঞানোপদেশ করেন এবং শিবসোহাগিনী মহামায়া স্বহস্তে জীবের অষ্টপাশ অর্থাৎ ঘৃণা, আশঙ্কা, ভয়, লজ্জা, নিন্দা, কুল, মর্যাদা ও সম্পত্তি যাহাদ্বারা জীব বদ্ধ হইয়া সংসারে পরিভ্রমণ করিতেছে তাহা ছিন্ন করিয়া দেন।* মর্যাদা পুরুষোত্তম ভগবান্ শ্রীরামচরিত-মানসে কাশীর মাহাত্ম্য বর্ণন করিতে গিয়া বলিয়াছেন—

'আকর চারি জীব জগ অহহীঁ। কাশী মরত পরম পদ লহহীঁ॥' সংসারে চারি প্রকারের জীব আছে যথা উদ্ভিজ্জ, স্বেদজ, অণ্ডজ ও জরায়ুজ। এই চারি জাতির জীব যে কেহ কাশীতে মরিলে সকলেই স্থানের মহিমায় এবং বাবা শ্রীবিশ্বনাথের কৃপায় পরমগতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

মুক্তি জন্ম মহি জানি গ্যান খানি অঘ হানি কর।
জহঁ বস সংভু ভবানী সো কাসী সেইঅ কস ন॥

---

* ঘৃণা শঙ্কা ভয়ং লজ্জা জুগুপ্সা চেতি পঞ্চমী।
কুলং শীলং চ বিত্তং চ হ্যষ্টপাশাঃ প্রকীর্তিতাঃ॥
বেদান্তসংজ্ঞাবলী। ২১০।

যেখানে সর্বদা শ্রীশিব-পার্বতী বাস করেন, সেই কাশীকে মুক্তির জন্মভূমি, জ্ঞানের খনি এবং পাপসমূহের বিনাশক জানিয়াও মনুষ্য সেই কাশীতে কেন বাস করে না ?

'কাশী মরত মুক্ত করত দেত রামনাম'—কাশীক্ষেত্রে মরণ সময় ভগবান্ শ্রীবিশ্বনাথ রামনাম প্রদান করিয়া জীবকে সংসার বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া দেন।

মহর্ষি শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস তাঁহার স্কন্দপুরাণের অন্তর্গত কাশীখণ্ডে কাশীর মাহাত্ম্য অতি বিশদরূপে বর্ণন করিয়াছেন। মুক্তি অভিলাষী ব্যক্তিমাত্রই কাশীতে দেহত্যাগ মানসে কাশীবাস করিয়া থাকেন। অন্যস্থানে সাধনাদি করিয়া যে ফল লাভ হয় কাশীতে সেই সাধন করিলে তার দশগুণ ফললাভ হইয়া থাকে। এমন যে কাশী সেখানে শ্রীশ্রীমায়ের কোন আশ্রম নাই। তিনি কাশী আসিলে পাঁড়ের ধর্মশালা, হরির বাঙ্গালী ধর্মশালা কিংবা মাড়ওয়ারী ধর্মশালায় উঠিয়া থাকেন। এই সকল ধর্মশালায়ও নির্দিষ্ট কালের অধিক সময় বাস করিবার উপায় নাই। এই কারণে কখন কখন মা কাশী আসিয়া বজরা (বড় নৌকা) ভাড়া করিয়া বাস করিতেন। একবার মা কাশীতে প্রায় একমাস কাল বজরায় ছিলেন। মায়ের ও তাঁহার ভক্তদের বাসের জন্য কাশীতে সেই সময় যত বড় নৌকা ছিল সকল ভাড়া করা হইয়াছিল। তথাপি স্থানের সঙ্কুলান হয় নাই। একমাসে নৌকাভাড়া যতটা আমার মনে পড়ে সাত শত টাকারও কিছু অধিক দিতে হইয়াছিল।

১৯৪২ খৃষ্টাব্দের গ্রীষ্মকালে শ্রীশ্রীমা দেহরাডুন রায়পুরস্থিত শিবালয়ে বাস করিতেছিলেন। একদিন রাত্রি নয় ঘটিকার মৌনের পর সহরের ভক্তবৃন্দ মাকে তাঁহাদের দিনের শেষ প্রণাম নিবেদনান্তে আপন আপন বাসস্থানে ফিরিয়া গিয়াছেন। মা তাঁহার শয়নকক্ষটিতে বিশ্রাম করিতেছিলেন। দিদি গুরুপ্রিয়া দেবী, স্বামী পরমানন্দজী, শ্রীমান্ অভয়, শ্রীঅমল চন্দ্র সেনের স্ত্রী শ্রীমতী প্রমীলা সেন ও আমি মায়ের পদপ্রান্তে উপবেশন করিয়া নানাবিধ তত্ত্বালোচনা করিতেছিলাম। কথায় কথায় প্রসঙ্গ উঠিল কাশীক্ষেত্রে

অহিন্দু যাহারা মুক্তি স্বীকার করে না তাহারা যদি দেহত্যাগ করে তাহাদের মুক্তি হইবে কিনা? এই প্রশ্নের স্বপক্ষে ও বিপক্ষে আমাদের আপন আপন যুক্তিপ্রদান করিবার পর পরিশেষে সিদ্ধান্ত হইল এখানে মুক্তি মানা বা না মানার কোন প্রশ্ন নাই। বিশেষত্ব হইল এখানকার ক্ষেত্র মাহাত্ম্য। কেহ মোক্ষ বিশ্বাস করুক কি নাই করুক যে কেহ এখানে শরীর ত্যাগ করিবে—সে হিন্দুই হউক কি অহিন্দুই হউক, স্থানের প্রভাবে তাহাকে পুনরায় জন্ম গ্রহণ করিতে হইবে না। জানিয়া কি না জানিয়া অগ্নিতে হাত দিলে যেমন হাত পুড়িয়া যায় তেমনি বিশ্বাস করুক বা নাই করুক কাশীতে মৃত্যু হইলেই মুক্তি।

এই প্রসঙ্গের উপর আমি বলিলাম, "মা! কাশী এমন তীর্থ সেখানে আমাদের একটি আশ্রম হওয়া উচিত। মা! তুমি কাশী যাও কিন্তু সেখানে তোমার থাকিবার কোনই ব্যবস্থা নাই। তোমাকে ধর্মশালায় গিয়া উঠিতে হয়। সেখানেও তাহাদের নির্ধারিত সময়ের বেশী সময় বাস করিতে দেয় না। ইহা বড়ই দুঃখের কথা।" আমার এই কথার উপর মা তাঁহার বিছানায় শয়ন করিয়া চরণের উপর চরণ স্থাপন করতঃ সঞ্চালন করিতে করিতে বলিলেন, "তোমাদের সাহস কম নয়! কাশীতে আশ্রম করিতে চাও! এত টাকা কোথায় পাইবে? কাশীতে আশ্রম করা কি এতই সহজ, যে কথা বলিলেই আশ্রম তৈয়ার হইয়া যাইবে।"

আমি—মা! আমি তো সকলের অপেক্ষা তোমার দরিদ্র সন্তান। কাশীতে আশ্রম হইলে আমি এক হাজার টাকা দিব। দিদি! কাশী আশ্রমের জন্য আপনি কত টাকা দিবেন?

দিদি—আমার পাঁচ হাজার টাকার পোষ্টেল ক্যাশ সার্টিফিকেট আছে। কাশীতে মায়ের আশ্রম হইলে আমি ঐ পাঁচ হাজার টাকা দিব।

আমি—প্রমীলাদি! মায়ের কাশী আশ্রমের জন্য আমি এক হাজার টাকা দিব। দিদি পাঁচ হাজার টাকা দিবেন! আপনি কত টাকা দিবেন? দশ হাজার টাকা তো অবশ্যই দিবেন।

শ্রীমতী সেন—আপনাদের দাদাকে (শ্রীঅমল চন্দ্র সেন;

এজেন্ট, হিন্দুস্থান লাইফ ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানী, দিল্লী) জিজ্ঞাসা না করিয়া আমি কিছু বলিতে পারিতেছি না। তবে আমার দিক্ হইতে আমি এক হাজার টাকা যে দিতে পারি এই পর্যন্ত বলিতে পারি। আপনাদের দাদা কত দিবেন সে সম্বন্ধে আমি বলিতে পারি না।

আমি—মা! দেখ, পাঁচ মিনিটের মধ্যে সাত হাজার টাকা কেমন উঠিয়া গেল। তোমার একটু কৃপা হইলে টাকার জন্য চিন্তা করিতে হইবে না। টাকা সংগ্রহ হইয়াই যাইবে। চাই তোমার আশীর্বাদ ও একটু কৃপা দৃষ্টি।

রাত্রিতে মায়ের সম্মুখে এ পর্যন্তই কথা হইল। শ্রীমহামায়া দেবীর পুত্র শ্রীহর্ষনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় (শ্রীমতী লীলার স্বামী) ছিলেন ব্লাড প্রেসারের রুগী। তাঁহার রাত্রিতে নিদ্রা হইত না। সেইজন্য তিনি অনেক রাত পর্যন্ত মায়ের শোবার ঘরের সম্মুখের ছাতে আমগাছ তলায় ঘুরিয়া বেড়াইতেন। মায়ের সঙ্গে কাশী আশ্রম সম্বন্ধে আমাদের যে সকল কথাবার্তা হইতেছিল তিনি বাহির হইতে সে সব শুনিয়াছিলেন। পরের দিন সকালে তিনি আমাকে বলিলেন, "গত রাত্রিতে মায়ের ঘরে আপনাদের কি সব কথা হইতেছিল? হাজার হাজার টাকা সংগ্রহের কথা মাঝে মাঝে আমার কানে আসিতেছিল। ব্যাপারটা কি বলুন দেখি!" আমি হর্ষনাথ-বাবুকে সব বলিলাম, এবং ইহাও জানাইলাম যে, কাশীতে আশ্রমের জন্য সাত হাজার টাকা চাঁদার প্রতিশ্রুতিও পাওয়া গিয়াছে। আমার নিকট হইতে এই সংবাদ শুনিয়া হর্ষনাথবাবু সহর্ষে কাশী আশ্রমের জন্য এক হাজার টাকা চাঁদা দিতে স্বীকার করিলেন। আমি সময় ক্ষেপণ না করিয়া তৎক্ষণাৎ গিয়া মাকে নিবেদন করিলাম, "মা! হর্ষবাবু কাশী আশ্রমের জন্য এক হাজার টাকা দিতে রাজী হইয়াছেন। দেখ মা! দেখিতে দেখিতে কেমন আট হাজার টাকা সংগ্রহ হইয়া গেল। তোমার একটু খেয়াল হইলে টাকা যোগাড় হইয়াই যাইবে।" পরের দিন দিদি সোলনের রাণী সাহেবাকে এই সম্বন্ধে একখানি চিঠি দিলেন। দিদির পত্রের উত্তরে তিনি তিন হাজার টাকার একখানি চেক্ পাঠাইয়া দিলেন। দিদি

গুরুপ্রিয়া দেবী এই এগার হাজার টাকা হাতে পাইয়া কাশী আশ্রমের জন্য চাঁদা তুলিবার জন্য কলিকাতা গমন করিলেন। শ্রীশ্রীমায়ের আশীর্বাদে দিদি কলিকাতা হইতে প্রায় আরও এগার হাজার টাকা আশ্রমের জন্য সংগ্রহ করিতে পারিয়া আনন্দের সহিত ঐ টাকা লইয়া কাশী প্রত্যাবর্তন করিলেন। শ্রীচিন্তাহরণ সমাদ্দার, ডাঃ গিরীন্দ্র কৃষ্ণ মিত্র, শ্রীসরোজ কুমার দত্ত প্রভৃতি মায়ের পুরাতন ভক্তবৃন্দ সকলেই এক হাজার টাকা করিয়া চাঁদা দিয়াছিলেন। কাশী আশ্রমের জন্য যে যাহা দান করিয়াছিলেন দিদি সাদরে তাহাই গ্রহণ করিয়াছিলেন। মায়ের বহু দরিদ্র সন্তান তাঁহাদের সাধ্যানুসারে এক টাকা চাঁদাও দিয়াছিলেন। দিদি ঐ এক টাকাও অতি সমাদরের সহিত স্বীকার করিয়াছিলেন।

১৯৪৩ খৃষ্টাব্দের শ্রীশ্রীদুর্গাপূজার পর মা তাঁহার চারিজন সন্তান শ্রীগুরুপ্রিয়া দেবী, শ্রীমৎ স্বামী পরমানন্দ মহারাজ, ব্রহ্মচারী শ্রীকমলাকান্ত ও ব্রহ্মচারী শ্রীঅভয়কে সঙ্গে লইয়া কাশীতে অজ্ঞাতভাবে কয়েকদিন বজরায় বাস করিবার জন্য আসিতেছেন। আমার উপর আদেশ হইয়াছিল একখানা বড় নৌকা ভাড়া করিয়া রামনগরের কেল্লাব সম্মুখে নাগোয়া ঘাটে প্রস্তুত রাখিবার জন্য। মায়ের নির্দেশানুসারে বজরা যথাস্থানে রাখিয়া তাঁহাকে রাত্রি আটটার পর বেনারস স্টেশন হইতে সোজা নাগোয়া ঘাটে বজরায় লইয়া আসি। মা এবং তাঁহার সঙ্গের লোক চারিজন, কেহই বজরার বাহির হইতেন না। তাঁহাদের আবশ্যকীয় সামগ্রী-সকল আমিই মায়ের নৌকায় যথা সময়ে পৌঁছাইতাম। নাগোয়া গ্রাম হইতে কমলাকান্ত ব্রহ্মচারী গোদুগ্ধ সম্মুখে দোহাইয়া আনিতেন।

একদিন মা একখানি ডিঙ্গি নৌকায় দিদি গুরুপ্রিয়া ও পরমানন্দ স্বামীজীকে সঙ্গে লইয়া অতি প্রত্যূষে দশাশ্বমেধ-ঘাটের দিকে বেড়াইতে বাহির হইয়াছিলেন। মায়ের নৌকা যখন বর্তমান আশ্রমের সম্মুখে উপনীত হইল তখন মা আশ্রমের জমিটি দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই জমিটি কাহার? জমির মালিক কে?" নৌকার বৃদ্ধ জহর মাঝীকে প্রশ্ন করায় সে বলিল, "এই জমি

লহরতারার জমিদার রায় শিবপ্রসাদ আগরওয়ালার। দেনার দায়ে উপস্থিত ইহা সরকারের (court of wards) হাতে আছে। এই জমি বিক্রয় হইবে।" শ্রীশ্রীমায়ের প্রশ্ন হইতে ইহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে এই ভূমিখণ্ডের উপর তাঁহার দৃষ্টি পড়িয়াছে। নচেৎ গঙ্গার তীরে এত জমি থাকিতে এই জমির কথা জিজ্ঞাসা করিলেন কেন? পরে নানা স্থান হইতে সংবাদ লইয়া জানা গেল যথার্থই এই জমির মালিক ছিলেন রায় শিবপ্রসাদ আগরওয়ালা। দেনা পরিশোধের জন্য ইহা court of wards এর তত্ত্বাবধানে আছে এবং ইহা বিক্রয় হইবে। বহু চেষ্টা করিয়া দিদি গুরুপ্রিয়া দেবী এই ভূমিখণ্ড আঠার হাজার টাকা মূল্যে court of wards এর নিকট হইতে ক্রয় করেন। স্বর্গগত রায় শিবপ্রসাদ আগরওয়ালার পুত্র শ্রীসত্যব্রত আগরওয়ালা জমির মূল্যের অতিরিক্ত তিন হাজার টাকা দিদির নিকট হইতে নগদ লইয়া জমি বিক্রয়ের দলিলে দস্তখত বা স্বাক্ষর করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন জমি বিক্রয়ের আঠার হাজার টাকা court of wards তাহার পিতার ঋণ শোধ বাবদ লইবেন। এই টাকার মধ্য হইতে তিনি একটি পয়সাও পাইবেন না। তাঁহাকে তিন হাজার টাকা না দিলে তিনি বিক্রয়ের দলিলে স্বাক্ষর করিবেন না। দলিলে তাহার স্বাক্ষর ব্যতীত কোর্টে রেজেস্টারি হইতে পারিবে না। এই ভূমিখণ্ড যখন আমাদের আশ্রমের জন্য ক্রয় করিতেই হইবে তখন সামান্য টাকার জন্য আর আপত্তি করা কেন? ১৯৪৪ খৃষ্টাব্দের ১২ই ডিসেম্বর জমির দলিল রেজেষ্টারি হইয়া গেল। শ্রীশ্রীমাকে এই সংবাদ তারযোগে জানান হইলে তিনি সূক্ষ্মে দেখিয়াছিলেন এই জমিতে বহু যাগ-যজ্ঞ ও নানাবিধ শুভ ধর্মকার্য এবং দেবদেবীর পূজাদি হইবে। সেইজন্য বহু দেবতা, মুনি, ঋষি ও সাধু মহাত্মাগণ এই ভূমিতে আনন্দে নৃত্য করিতেছেন। এই স্থানটি অনেক বৎসর যাবৎ পতিত অবস্থায় পড়িয়াছিল। মানুষের যেমন ভাগ্যের পরিবর্তন হয় ভূমিরও তদ্রূপ হইয়া থাকে। মায়ের অধিকারে এই জমি আসিবার পর হইতে প্রথমেই শ্রীশ্রীবাসন্তী পূজা হয়, তারপর ক্রমশঃ ক্রমশঃ শ্রীশ্রীসাবিত্রী মহাযজ্ঞ, তুলাদান, সহস্র চণ্ডীপাঠ,

বিষ্ণুমহাযজ্ঞ, মহারুদ্রাভিষেক, দেবীভাগবত পাঠ, শ্রীমদ্‌ভাগবত সপ্তাহ প্রভৃতি বহু সদনুষ্ঠান এবং তের হাজার ব্রাহ্মণ ভোজন ও সহস্রাধিক কুমারীসেবা হইয়াছে। স্থায়িভাবে এই আশ্রমে শ্রীশ্রীমা অন্নপূর্ণা, শ্রীশ্রীমা কালী, শ্রীশ্রীনারায়ণ, শ্রীশ্রীশিব, শ্রীশ্রীগণেশ, শ্রীশ্রীগোপাল ও শ্রীশ্রীঅগ্নিদেবতা নিত্য পূজিত ও সেবিত হইয়া আসিতেছেন।

দুর্বৃত্তশমনে মধুরলীলাময়ী মায়ের অদ্ভুত শাসন

বাৎসল্যময়ী শ্রীশ্রীমায়ের সন্তানদের প্রতি কত যে স্নেহ, কত যে করুণা, কত যে ক্ষমা তাহা একাকী নির্জনে বসিয়া একটু চিন্তা করিলে হৃদয় কৃতজ্ঞতায় ভরিয়া যায় এবং আনন্দে মনপ্রাণ আপ্লুত হয়। মন যখন সংসারের বিবিধ ঘাতপ্রতিঘাতের অবসাদে ভাঙ্গিয়া পড়ে, নৈরাশ্যের অকূলপাথারে নিমগ্ন হয় এবং আশ্রয়হীন বলিয়া অন্ধকার দেখে তখন মায়ের স্নেহ ও করুণার অভিব্যক্তির কথা স্মরণ করিলে মনে কিঞ্চিৎ বলের সঞ্চার হইয়া থাকে। সমুদ্রে নিমজ্জিত ব্যক্তির সম্মুখে সহসা যদি একখানি অর্ণবপোত আসিয়া উপস্থিত হয়, সে যেমন উহাকে পরম আশ্রয় বলিয়া মনে করে তেমনি ভবসাগরে নিমগ্ন আমাদের পক্ষে মা পরম আশ্রয় স্থল। মনে হয় এমন স্নেহময়ী মা যাহাদের বর্তমান তাহাদের জীবন কি এই ভাবে বিফলে যাইবে ?

দরিদ্র পিতামাতার ঘরে জন্মগ্রহণ করা সত্ত্বেও জীবনে গ্রাসাচ্ছাদন সম্পর্কে স্বতন্ত্রতা চিরদিনই রুচিকর ছিল। শ্রীভগবানের কৃপায় যাহা সামান্য কিছু সংস্থান ছিল তাহাদ্বারাই অবশিষ্ট জীবন কোন প্রকারে কষ্টেসৃষ্টে নির্বাহ হইয়া যাইত। যেরূপ বাতাবরণের মধ্যে জীবন গঠিত হইয়াছিল তাহাতে যেমন আয় তেমন ব্যয়ের দ্বারা জীবন-যাত্রা অতিবাহিত করিবার আবশ্যকীয় যোগ্যতা অর্জন করিয়াছিলাম। জীবনের মান (Standard) কোনদিনই ব্যয়বহুল ছিল না। জীবনের আদর্শ ছিল পুরাকালের ঋষিদের অনুরূপ Plain living and high thinking এবং শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছিলাম cut your coat according to your cloth. এই আদর্শকে জীবনে রূপদান করিতে গিয়া গর্বই অনুভব করিতাম, কখনও দৈন্য বোধ করি নাই। ইহাকে ক্ষুণ্ণ করিতে কোনদিনই মনের স্বীকৃতি পাই নাই। আমি স্বীকার করি হয় তো ইহার

পশ্চাতে আমার অবচেতন মনের অন্তরালে সুপ্ত বা লুক্কায়িত কোন অভিমান, আত্মসম্মান বোধ বা Vanity অতিমাত্রায় থাকিতে পারে কিন্তু ইহা জীবনে হীন কার্যসম্পাদন হইতে আমাকে রক্ষাই করিয়াছে, ইহাতে লিপ্ত হইতে দেয় নাই।

কাশীতে গঙ্গার তীরে আশ্রম প্রতিষ্ঠার পর হইতেই পরম স্নেহময়ী করুণাময়ী শ্রীশ্রীমা আমাকে আশ্রমে থাকিবার জন্য বলিতেছেন। আমি এমনই হতভাগ্য যে হৃষ্টচিত্তে তাঁহার প্রস্তাবে স্বীকৃতি দিতে পারিতেছিলাম না। ইহা যে মুক্তিপথের যাত্রীর পক্ষে লক্ষ্য সিদ্ধির মহা অন্তরায় বা প্রতিবন্ধক তাহা বুঝিয়াও যথাযথ ভাবে সম্মতি দিয়া উঠিতে পারিতেছিলাম না। কিসে যেন বাধা দিতেছিল। অকৃত্রিম মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী শ্রীশ্রীমা যাঁহার প্রতি কৃপাদৃষ্টি করেন তাঁহার সর্বপ্রকারে যাহাতে কল্যাণ হয় সেদিকে তাঁহার বিশ্বতঃচক্ষু সদাই উন্মুক্ত রহিয়াছে এবং যে কোন রকমেই হউক তাহা তিনি কার্যে পরিণত করিয়াই থাকেন। এমনই শ্রীশ্রীমায়ের আমার অমোঘ খেয়াল।

বহুদিনকার অতি পুরাতন কাহিনী। যতটা আমার মনে পড়ে ইহা ১৯৪৫ কিংবা ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দের কোন সময়কার কথা। আশ্রম-প্রবেশের পর শ্রীশ্রীমায়ের আদেশমত কয়েকদিন আশ্রমে বাস করিয়া পুনরায় পূর্বের বাসস্থানে ফিরিয়া গিয়াছিলাম। স্থায়িভাবে আশ্রমবাসী হইতেছি না। ইহাও অতি সত্য কথা যে আশ্রমে বাস করিবার মত আবশ্যকীয় যোগ্যতার একান্তই অভাব আমার মধ্যে ছিল।

শ্রীশ্রীমা কাশী আসিয়াছেন। এই সংবাদ পাইয়া অপরাহ্ণে মায়ের দর্শন মানসে আশ্রমে গিয়াছি। মা তখন কন্যাপীঠের ছাতের উপর পায়চারি করিতেছেন দেখিয়া আমরা কয়েকজন দর্শনার্থী নীচ হইতেই তাঁহার অনুমতি লইয়া তাঁহার নিকট গমন করিলাম। কন্যাপীঠে যাইতে হইলে শ্রীশ্রীমায়ের অথবা শ্রীগুরুপ্রিয়া দেবীর আদেশ গ্রহণ করিতে হইত। বিনা অনুমতিতে কন্যাপীঠে প্রবেশ নিষেধ ছিল। ছাতের উপর মায়ের সঙ্গে আমরা কথাবার্তা বলিতেছি, ইতোমধ্যে কেহ আসিয়া মাকে নীচে যাইবার জন্য

প্রার্থনা জানাইলেন। বলার সঙ্গে সঙ্গে মা নীচে নামিয়া গেলেন। আমরা কয়েকজন ছাতেই রহিয়া গেলাম। আমরা ভাবিয়াছিলাম মা বোধ হয় নীচের প্রয়োজনীয় কাজ সারিয়া পুনরায় ছাতে আসিবেন। তখন আমরা আবার মায়ের সঙ্গে কথাবার্তা বলিব।

অল্পক্ষণের মধ্যেই মায়ের কাছে যাইবার জন্য আমার ডাক পড়িল। আমি মায়ের নিকট যাইতেছি দেখিয়া নলিনীদা (শ্রীনলিনী কান্ত ভট্টাচার্য, ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার), হরলালবাবু (শ্রীহরলাল চট্টোপাধ্যায়, বস্ত্র ব্যবসায়ী) প্রভৃতি যাঁহারা ছাতের উপর ছিলেন তাঁহারা সকলেই আমার অনুসরণ করিলেন। আমরা মনে করিয়াছিলাম মা সম্ভবতঃ আর উপরে আসিবেন না তাই আমাদের নীচে ডাকিয়াছেন। আমি নীচে আসিয়া দেখিলাম বর্তমানে যেখানে কন্যাপীঠের অফিস ঘর তার সম্মুখের বারান্দায় মা একখানি সাধারণ দড়ির খাটিয়ার উপর বসিয়া আছেন। আমি মায়ের নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "মা! তুমি নাকি আমাকে ডাকিয়াছ?" মা হাস্যবদনে উত্তর দিলেন, "হ্যাঁ।" সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাঁহার গায়ের চাদরের ভিতর হইতে একটি মাঝারি রকমের কাঁসার বাটি বাহির করিলেন। বাটিটি খাঁটী গরুর দুধের ঘন ক্ষীরে পরিপূর্ণ। ঘন ক্ষীরের উপর চাঁপা ফুলের ন্যায় হলদে মোটা সর। মা আমার হাতে ক্ষীরের বাটিটি দিতে দিতে বলিলেন, "ইহা হইতে এই শরীর খাইয়াছে। এখন তুমি খাও।" দেখিলাম বাটির একপাশ হইতে চামচ দিয়া মায়ের মুখে সামান্য একটু ক্ষীর দেওয়া হইয়াছে। মায়ের জন্য দিদি গুরুপ্রিয়া দেবী কত কষ্ট করিয়া ও অতিশয় যত্নের সহিত বিশেষতঃ মা গ্রহণ করিবেন এই আশায় খাঁটী দুধের অতি সুস্বাদু ঘন ক্ষীর প্রস্তুত করিয়াছেন। তাহা মা না খাইয়া সবটা ক্ষীরই আমাকে দেওয়াতে আমি কেবল দুঃখিতই নহে, একেবারে মর্মাহত হইয়া গেলাম এবং লজ্জিত হইয়া মনে মনে প্রার্থনা করিলাম, হে পৃথিবী মাতা! তুমি দ্বিধা হও, আমি তোমার মধ্যে প্রবেশ করি। দিদিরও যে ইহা ভাল লাগিতে পারে না, ইহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। এই অশোভনীয় ও হাস্যকর

দৃশ্য দেখিয়া বুনি* নাকি আমার অলক্ষিতে একটু ব্যঙ্গ হাসি হাসিয়াছিল। বুনির পক্ষে এইরূপ উপহাস করা অত্যন্ত স্বাভাবিক। ইহার জন্য তাহাকে কোন প্রকার দোষ দেওয়া যায় না। যে মায়ের কথা শোনে না, অবাধ্য, তাহার মুখে ঘন ক্ষীরের বাটি তুলিয়া দেওয়া যে কতটা অশোভন ও হাস্যকর কার্য ইহা আমরা সকলেই স্বীকার করিব। ইহাকেই বলে দুষ্ট ব্যক্তিকে উচ্চাসন দান। ইহা যে কত বড় শাস্তি, যাহার একটুও বুদ্ধি আছে সেই বুঝিতে পারে। এই ব্যঙ্গ হাসির জন্য মা বুনিকে নাকি বলিয়াছিলেন, "তুই হাসিলি যে? তোদের স্বভাব আর সংশোধন হইল না। এই শরীর যদি ক্ষীর আর কখনও একটুও মুখে না নেয়।" মায়ের মুখ হইতে এই কথা শুনিয়া বুনি তো ভয়ে কাঠ হইয়া গেল। পরে আমি দিদির মুখে ইহা শুনিয়াছিলাম। এই ব্যঙ্গ হাসি বা উপহাস যে মায়ের অভিপ্রেত ছিল না ইহা তাঁহার উপর্যুক্ত মন্তব্য হইতেই বুঝিয়া লওয়া যাইতে পারে। শ্লেষ বা প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপ হইতে কাহারও দোষ স্পষ্টাস্পষ্টি বলা ভাল, তাহাতে অপরাধ কম হয়।

ক্ষীরের বাটি আমার হাতে দিয়া মা আমাকে খাইতে বারবার বলিতেছেন। পাগল ছাড়া কোন অবিকৃত মস্তিকের মানুষ ইহা ভক্ষণ করিতে পারে? ক্ষীর খাইতে পুনঃপুনঃ বলাতে আমি আর কোন উপায় না দেখিয়া উপস্থিত সকলকে ঐ প্রসাদী ক্ষীর বিতরণ করিতে যাইতেছি অবলোকন করিয়া মা বলিলেন "ইহা হইতে কাহাকেও একটুও দিতে পারিবে না। সবটাই তোমাকে খাইতে হইবে।" মায়ের এই আদেশের উত্তরে আমি বলিলাম, "ইহা হইতে কাহাকেও প্রসাদ না দিয়া এই বিষ আমি খাইতে পারিব না। ইহা তো ক্ষীরের বাটি নয়। ইহা আমার কাছে বিষের পেয়ালা। ইহা কেউটে সাপের তীব্র হলাহল।"

---

* কুমারী ফুল্ল যূথিকা গুহ। পিতামাতা, ঘরবাড়ী, ভোগ বিলাস সব ত্যাগ করিয়া অল্প বয়স হইতে মায়ের সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিল। মায়ের সম্মুখে শ্রীধাম বৃন্দাবনে অনুমান পঞ্চাশ বৎসর বয়সে সজ্ঞানে চিরশান্তি লাভ করিয়াছে।

মা স্মিতাননে বলিলেন, "এই তীব্র বিষ খাইয়া তুমি কেমন মর, দেখিব।" এইরূপ অপ্রিয় ও কঠোর ভাষা, বিশেষ করিয়া "মর" শব্দ মা সাধারণতঃ বলেন না। আমার ভাগ্যে সেইদিন মায়ের মুখ হইতে এই রকম ভাষা বাহির হইয়াছিল। একটা প্রচলিত কথা আছে, মা যদি সন্তানকে "মর" বলিয়া গালি দেয় তাহা হইলে নাকি সন্তানের আয়ু বৃদ্ধি হয়। সেইজন্যই বোধহয় এত দীর্ঘায়ু হইয়াছি! এখনও মৃত্যুর কোন লক্ষণই দেখা যাইতেছে না।

উপায়ান্তর না দেখিয়া সব ক্ষীরটাই ক্ষণিকের মধ্যে আমাকে গলাধঃকরণ করিতে হইল। অবাধ্যতার, মায়ের কথা না শোনারূপ মহা অপরাধের শাস্তি হইল মায়ের প্রসাদী সুস্বাদু ক্ষীর। ইহা কি কেহ কল্পনা করিতে পারে? আমাদের মা যেমন সৃষ্টিছাড়া তাঁহার শাসনও সৃষ্টিছাড়া, লোক-কল্পনার বহির্ভূত। মা আমাদের সকল অপরাধ ক্ষমাই করিয়া যাইতেছেন। শ্রীশ্রীমায়ের ক্ষমা গুণের নিকট বসুন্ধরাও হার মানেন। আমাদের অপরাধের প্রতিদানে তাঁহার নিকট হইতে পাইতেছি বর্ষার অবিশ্রান্ত জলধারার ন্যায় অকৃত্রিম স্নেহ, ক্ষমা ও করুণা; যাহা বিশ্বের কোথায়ও অন্বেষণ করিয়া পাওয়া যায় না। এমন স্নেহময়ী শ্রীশ্রীমায়ের যথার্থ মর্যাদা দিতে পারিতেছি না বলিয়া আমি নিতান্তই লজ্জিত ও মর্মান্তিক অনুতপ্ত।

আমার আশ্রম আগমনের ক্ষুদ্র ইতিহাস

গত ১৯৪৪ খৃষ্টাব্দের ১২ই ডিসেম্বর শ্রীশ্রীমায়ের আশ্রমের জন্য কাশীর গঙ্গার তটে একখণ্ড জমি খরিদ করা হয়। এই ভূমি সংগ্রহ করিবার জন্য মায়ের বিশেষ কৃপাপাত্রী ও প্রধান সেবিকা শ্রীগুরুপ্রিয়া দেবীকে বেশ কিছুদিন অত্যন্ত হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল। মায়ের অসামান্য শক্তির প্রভাবেই একজন নারীর পক্ষে এইরূপ দুরূহ কার্য করা সম্ভব হইয়াছে, নচেৎ এই প্রকার কষ্টসাধ্য কর্ম সম্পন্ন করা অসম্ভব বলিয়াই মনে হয়। যখন ইট, সিমেণ্ট, লোহালক্কড় পাওয়া খুবই কঠিন ছিল সেই কণ্ট্রোলের বাজারে মায়ের অসীম করুণার দ্বারা পরিপুষ্ট ও সংরক্ষিত শ্রীমৎ স্বামী পরমানন্দ মহারাজের অক্লান্ত পরিশ্রমে ও চেষ্টায় পবিত্র বারাণসী ক্ষেত্রে পতিতপাবনী পূতসলিলা মাতা ভাগীরথীর তীরে এমন সুন্দর একখানি আশ্রম নির্মিত হওয়া যে কি প্রকারে সম্ভবপর হইয়াছিল তাহা ভাবিবার বিষয়। এই আশ্রম হইতে অর্ধচন্দ্রাকৃতি, অনুমান দশম মাইল ব্যাপী গঙ্গার মনোরম দৃশ্য যিনি দেখিয়াছেন তিনিই মুগ্ধ হইয়াছেন। বর্ষাকালের এই প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। বিশেষ করিয়া প্রাতঃকালের বালার্ক উদয়, বাস্তবিকই একটি দর্শনীয় বস্তু। যাঁহারা প্রথম প্রথম এই চিত্তাকর্ষক দৃশ্য অবলোকন করেন তাঁহারাই সহস্র মুখে ইহার অনুপম শোভার প্রশংসা করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন—গঙ্গা দেবী যেন ললাটে সিন্দুরের বড় টিপ পরিয়া বিশ্ববাসীকে সাদর আহ্বান করিতেছেন তাঁহার অপরূপ রূপমাধুরী দর্শন করিবার জন্য। এইরূপ অতি সুন্দর ছবির মত আশ্রমে বাস করিবার জন্য পরম স্নেহময়ী শ্রীশ্রীমা আমাকে পুনঃপুনঃ বলিতেছেন। কিন্তু আমি কিছুতেই সেখানে থাকিতে স্বীকার হইতেছি না। তাহার কারণ আশ্রমবাসী হইবার মত যোগ্যতা যে আমার মধ্যে নাই তাহা

আমি বেশ ভালভাবেই অবগত ছিলাম। আপন রুচি অনুযায়ী স্বতন্ত্রভাবে অবস্থান করাটাই ছিল আমার বিশেষ অভিপ্রেত। এতকাল পর্যন্ত স্বাধীনভাবে জীবন যাপন করিয়া আসিয়াছি, কখনও কাহারও অধীনে বাস করি নাই। আমি জানিতাম কোন সংস্থানে বা প্রতিষ্ঠানে থাকিয়া কখনও ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করা যায় না। বাধ্যবাধকতার অনুরোধে অনেক সময় এমন এমন কার্যের অনুষ্ঠান করিতে হয় যাহা নিজের বিবেকের প্রতিকূল বলিয়া নির্ণীত হইবার যোগ্য। ইহা ব্যতীত শৈশব হইতেই আমার স্বভাব গঠিত হইয়াছিল ভিন্ন রকমে, যাহার দরুন সকলের সঙ্গে সামঞ্জস্য বজায় রাখিয়া ব্যবহার করা আমার পক্ষে সম্ভব হইয়া উঠিত না। প্রারব্ধ কর্মের উপর মানুষের কোন হাত নাই। অনিচ্ছাসত্ত্বেও প্রারব্ধ এমন সব কর্ম করাইয়া লয় যাহা কখন স্বপ্নেও কল্পনা করা যায় না। আমার মত না থাকিলেও বারবার মায়ের বলাতে অবশেষে তাঁহার আদেশ আমাকে পালন করিতেই হইয়াছিল। তিনি যাহা চাহেন বা খেয়াল করেন তাহা কাহারও নিবারণ করিবার শক্তি নাই। তাঁহার ইচ্ছা অমোঘ—অব্যর্থ, পূর্ণ না হইয়া যায় না। আজ হউক, কি কাল হউক, কি দশ দিন পরেই হউক, তিনি যাহা বলিবেন তাহা তিনি কার্যে পরিণত করাইয়াই লইবেন—তাহাতে কেহ বাধা দিতে পারে না। আমার ন্যায় অতি সাধারণ এবং আশ্রমবাসের সম্পূর্ণ অযোগ্য লোকটাকে কেন যে মা তাঁহার আশ্রমে যাইবার জন্য পুনঃপুনঃ বলিতেছেন তাহার হেতু আমি আজ পর্যন্ত কোন প্রকারেই নির্ণয় করিতে সক্ষম হই নাই। তিনি কেন যে কি করেন তাহা মনুষ্যবুদ্ধির অগোচর। বহু চেষ্টা করিয়াও মানব তাহা বুঝিতে পারে না বা বুঝিতে যাওয়া তাহার পক্ষে বাতুলতা। যাহা হৃদয়ঙ্গম করা মানবের অসাধ্য তাহা বোধগম্য করিতে চেষ্টা না করাই বুদ্ধিমানের কাজ? তবে এতদিনের অভিজ্ঞতায় আমি বলিতে পারি, মা যা করেন তাহা দ্বারা মনুষ্যের কল্যাণই হয়, মঙ্গলই হয়। ইহার মধ্যে তাঁহার ব্যক্তিগত কোন উদ্দেশ্য নাই।

আশ্রমের জন্য জমি ক্রয় করিবার পর কোন কারণবশতঃ মনে বিশেষ আঘাত প্রাপ্ত হওয়ায় শ্রীশ্রীমায়ের নিকট যাতায়াত

বন্ধ করিয়াছিলাম। আমি গমনাগমন বন্ধ করিলে কি হইবে মা কিন্তু তাঁহার এই অধম, অবাধ্য ও অযোগ্য সন্তানটাকে ত্যাগ করেন নাই। তাঁহার এই অবোধ কুসন্তানের প্রতি এতই করুণা যে তিনি যে কোন উপায়েই হউক আমাকে তাঁহার শ্রীচরণে পুনঃপুনঃ টানিয়াই লইয়াছেন, দূরে সরিয়া যাইতে দেন নাই। কখনও শাসন করিয়া, কখনও বা স্নেহ দিয়া নিজের নিকটেই রাখিয়াছেন। আমি তাঁহার কাছ হইতে ব্যবধানে চলিয়া গেলে তাঁহার এমন কি ক্ষতি হইত ? আমার ন্যায় অতি তুচ্ছাতিতুচ্ছ সহস্র সহস্র সন্তান মায়ের কতই রহিয়াছে। সন্ধান করিলে যথেষ্টই পাওয়া যাইবে। মাকে আমি ছাড়িয়া গেলে সর্বতোভাবে আমারই ক্ষতি হইত। কিন্তু স্নেহময়ী শ্রীশ্রীমায়ের এমনই করুণা যে যাহাকে তিনি সন্তান বলিয়া একবার চরণে স্থান দিয়াছেন তাহাকে কোন প্রকারেই চরণ ছাড়া করেন না। তাহার শত সহস্র অপরাধ ক্ষমা করিয়া তাহাকে চরণেই রাখেন এবং তাহার সঙ্গে এমন সুন্দর ও মধুর ব্যবহার করেন যেন কিছুই অপ্রীতিকর আচরণ বা ব্যাপার সংঘটিত হয় নাই। মায়ের এই অদ্ভুত সৃষ্টিছাড়া স্নেহের ব্যবহারে বনের পশু পর্যন্ত বশীভূত ও বাধ্য না হইয়া পারে না। আমি এতই ভাগ্যহীন ও অপদার্থ যে এমন স্নেহময়ী, করুণাময়ী জননীকে চিনিতে পারিলাম না! তাঁহার অসীম বাৎসল্যের যথাযথ মর্যাদা দিতে জানিলাম না!! তাঁহার স্নেহের রসাস্বাদন হইতে বঞ্চিত রহিলাম!!! শ্রীশ্রীমায়ের অফুরন্ত স্নেহ আদর, ভালবাসা ও ক্ষমার দিকে দৃষ্টি দিয়া দরদীয়া কবির মরমীয়া ভাষায় বলিতে ইচ্ছা হয়—

"আমার কেশে ধ'রে লওগো টেনে
তোমার চরণ-ছাড়া ক'রো না।
আমি হই না কেন যতই পাপী
আমার দোষের পানে চেয়ো না॥"
"আমি শুনেছি গো লোকের মুখে
তুমি টেনে নাকি লও গো বুকে।
অধম পাতকী ব'লে, লোকে যারে ছোঁয় না॥"

এই স্থানে একটি ক্ষুদ্র ঘটনা উল্লেখ করিলে আশা করি আমার বক্তব্যের অভিপ্রায়টি আরও পরিস্ফুট হইবে। কাহারও প্রতি দোষারোপ করিবার উদ্দেশ্যে বা কাহাকেও হেয় প্রতিপাদন করিবার মনোভাব লইয়া ইহা এখানে প্রকাশ করিতেছি না, বরং মহামহিম-ময়ী শ্রীশ্রীমায়ের মহত্বও সন্তান-বাৎসল্য প্রদর্শন করিবার চেষ্টাই আমার ইহা লিখিবার মুখ্য উদ্দেশ্য। আমার বক্তব্যটি ভাষার মাধ্যমে ঠিকঠিকভাবে ব্যক্ত করিতে যে আমি অক্ষম, তাহা আমি নিঃসঙ্কোচে স্বীকার করিতেছি। তাহার প্রথম কারণ আমার সেই আবশ্যকীয় যোগ্যতার অভাব এবং দ্বিতীয় কারণ মায়ের মহিমা ও স্নেহের অসীমতা। তথাপি উহা লিপিবদ্ধ করিবার ক্ষুদ্র প্রয়াস করিতেছি।

কাশী আশ্রমের জন্য গঙ্গাতীরের ভূমিখণ্ড ক্রয় করার পর আশ্রম-সংক্রান্ত কোন বিষয় লইয়া দিদি শ্রীগুরুপ্রিয়া দেবীর সঙ্গে আমার একটু মতান্তরের সৃষ্টি হয়। তাহার ফলে একদিন শ্রীশ্রীমায়ের সম্মুখে আমি দিদিকে জমি সম্বন্ধীয় সমস্ত হিসাব-পত্র এবং ব্যাঙ্কের পাসবুক ও জমির চাবি প্রভৃতি সব বুঝাইয়া দিয়া বলিলাম, "আজ হইতে আমি আশ্রমের কোন কাজের মধ্যে আর থাকিব না।" ইহার উত্তরে দিদি আমাকে বলিলেন, "যিনি আশ্রমের কোন কাজ করিবেন না, তাহার সহিত আমাদেরও আর কোন সম্পর্ক নাই।" এই কথার উত্তরে আমি পুনরায় বলিলাম, "উত্তম কথা। আজ হইতে আশ্রমের যখন কোন কার্য আমি করিব না তখন আপনাদের সঙ্গেও কোন সম্বন্ধ আমার থাকিবে না। সকল সংস্রব আপনাদের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। কিন্তু একটা কথা, আমি আশ্রমের কোন কাজকর্ম যদি নাই করি তাহাদ্বারা মায়ের সঙ্গে আমার সম্বন্ধ কখন ছিন্ন হইবে না। মায়ের সঙ্গে সন্তানের নিত্য সম্বন্ধ—ইহকাল ও পরকালের সম্পর্ক সেই সম্পর্ক কখন বিচ্ছিন্ন হইবে না এবং হইতেও পারে না।"

এই অপ্রীতিকর পরিস্থিতির পর হইতে আশ্রমের সহিত আমি সর্বপ্রকার যোগাযোগ ছিন্ন করিয়া দেই—কোন প্রকার যোগসূত্র আর রাখিতাম না। শ্রীশ্রীমায়ের কাশী আগমনের সংবাদ পাইলে

তাঁহাকে দর্শন করিতে যাইতাম। এই তিক্ত বিষয়ের বা প্রসঙ্গের অবতারণার কোন সুযোগই আমি বড় দিতাম না। তথাপি কখন কখন অনিচ্ছাসত্ত্বেও আমাকে কটু অভিজ্ঞতা লইয়া মায়ের কাছ হইতে ফিরিতে হইত। ইহাকে পরিহার করিবার নিমিত্ত শ্রীশ্রীমাতৃ-দর্শনেও ক্রমশঃ শিথিলতা আসিয়া পড়িল। মা কাশী আসেন এবং তাঁহাকে দর্শন করিতে যাই না। ইহা যে আমার পক্ষে কি মর্মান্তিক দুঃখ তাহা আমি ভাষার দ্বারা ব্যক্ত বা প্রকাশ করিতে পারিতেছি না। মায়ের দর্শনেয় জন্য যাঁহারা যাইতেন তাঁহাদের মুখেই মায়ের সংবাদাদি পাইতাম। প্রিয়জনের সহিত বিচ্ছেদ যে কি দুঃখদায়ক তাহা ইহার পূর্বে কখনও অনুভব করি নাই। তুষের আগুনের দূরপনেয় মর্মবেদনায় আমার হৃদয় ও মন সর্বক্ষণ মাতৃমিলনের অভাবে ধিক্ ধিক্ করিয়া জ্বলিত। এই মানসিক বিরহ-বেদনা হৃদয়ে ধারণ করিয়া বেশ কিছুদিন আমাকে অতি-বাহিত করিতে হইয়াছিল। এক মুহূর্তও মাকে ভুলিয়া থাকিতে পারিতাম না। সর্বক্ষণই মায়ের প্রত্যেকটি ব্যবহার ও আচরণ মনে হওয়ায় স্বাভাবিকভাবে আমার দৈনন্দিন জীবনযাত্রা নির্বাহ করা কঠিন হইয়া উঠিল।

যথাসময়ে যখন আশ্রমের কন্যাপীঠের অংশ নির্মাণ হইল তখন গৃহ-প্রবেশের পূর্বদিন মা তাঁহার দুইজন সন্তান দ্বারা (শ্রীহরলাল চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য) আমাকে সংবাদ পাঠাইলেন আমি যেন গৃহ-প্রবেশের সময় আমার শ্রীশ্রীনারায়ণকে (শালগ্রাম-শিলা) সঙ্গে লইয়া উপস্থিত থাকি। যাঁহারা আমাকে এই সমাচার প্রদান করিতে গিয়াছিলেন তাঁহাদের আমি বলিয়াছিলাম, "আশ্রমের সঙ্গেই যখন আমার কোন সম্বন্ধ নাই, তখন আশ্রম-প্রবেশের সময় আমার উপস্থিত থাকিবার কোন প্রয়োজন বা সার্থকতা দেখিতেছি না। মায়ের আদেশ রক্ষা করিতে পারিলাম না সেইজন্য আমি বড়ই দুঃখিত। তিনি যেন দয়া করিয়া তাঁহার এই অবাধ্য ও অবোধ কুসন্তানকে নিজগুণে ক্ষমা করেন।"

পরদিন অর্থাৎ আশ্রম-প্রবেশের দিন সকাল অনুমান আট ঘটিকার সময় শ্রীশ্রীমায়ের প্রধান কর্ম-কর্তা ও তাঁহার বিশেষ কৃপার

পাত্র শ্রীমৎ স্বামী পরমানন্দজী মহারাজ অকস্মাৎ আমার বাসস্থানে গিয়া উপস্থিত হইলেন। সেইসময় আমি বাঙ্গালীটোলার মুন্সী-ঘাটের বাসায় থাকিতাম। তিনি আমাকে বলিলেন, “মা আপনাকে আশ্রমে লইয়া যাইবার জন্য আসিয়াছেন। তিনি গঙ্গার ঘাটে নৌকায় বসিয়া আছেন। মা স্বয়ং আপনার নিকট আসিতেছিলেন। আমি মাকে বলিলাম, মা! তোমার এতগুলো সিড়ি ভাঙ্গিয়া উপরে উঠিতে কষ্ট হইবে। আমি গিয়া তোমার আসার কথা প্রথম তাঁহাকে বলি, তাহাতে তিনি যদি না আসেন তাহা হইলে তুমি নিজে যাইও। আপনি নারায়ণ লইয়া চলুন। আপনি যদি আমার সঙ্গে না যান, তাহা হইলে মাকেই এতগুলি সিঁড়ি অতিক্রম করিয়া কষ্ট করিয়া আপনার কাছে আসিতে হইবে। এখন আপনি কি করিবেন বলুন। আমি গিয়া মাকে তাহাই বলিব।”

আমি মহাসমস্যায় পড়িয়া গেলাম। আমি কখন স্বপ্নেও কল্পনা করিতে পারি নাই যে এইভাবে জগজ্জননী স্বয়ং এই দীন-হীন কাঙালের দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইবেন তাঁহার এই অবাধ্য, ঘৃণ্য সন্তানকে আশ্রমে লইয়া যাইবার জন্য। যাঁহার শ্রীপাদপদ্ম ক্ষণিক দর্শন মানসে কত সাধু সন্ত, সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারী, ত্যাগী মহাত্মা, যোগী বিরাগী, রাজা মহারাজ, জজ্-ব্যারিষ্টার, মহা-মহোপাধ্যায় পণ্ডিত এবং রাজকীয় বড় বড় উচ্চপদস্থ কর্মচারী লালায়িত, তিনি স্বয়ং আজ আসিয়াছেন এই অকিঞ্চনের দ্বারপ্রান্তে। আমার নিজের উপর অত্যন্ত ধিক্কার আসিল। মাকে আমি কি করিয়া এই মুখ দেখাইব তাহাই ভাবিতে লাগিলাম। আর মুহূর্তকালও বিলম্ব না করিয়া শ্রীশ্রীনারায়ণকে লইয়া স্বামী পরমানন্দজীর সঙ্গে মাতৃসকাশে গমন করিলাম।

গঙ্গার ঘাটে গিয়া দেখি করুণাময়ী শ্রীশ্রীমা ঘাটটি আলো করিয়া নৌকায় বসিয়া আছেন এবং সঙ্গে দিদি গুরুপ্রিয়াদেবীও আসিয়াছেন। আমি কিছু বলিবার পূর্বেই আমাকে দেখিয়া মা হাসিতে লাগিলেন। আমি নৌকায় উঠিয়া শ্রীশ্রীমায়ের করকমলে সিংহাসন সমেত শ্রীশ্রীনারায়ণকে প্রদান করিতেই তিনি তাঁহার

দুই হস্ত প্রসারিত করিয়া নারায়ণজীকে অতি আদরের সহিত গ্রহণ করিলেন। আজ আমার পরম সৌভাগ্য যে একই সঙ্গে পবিত্র কাশীক্ষেত্রে গুরু, গঙ্গা ও গোবিন্দের দর্শন পাইলাম। গঙ্গার উপর শ্রীগুরুর হস্তে শ্রীগোবিন্দকে দান করিতে পারিয়া আজ আমি নিজেকে ধন্য মনে করিলাম। পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণ শ্রীশ্রীমা শ্রীশ্রীনারায়ণকে আপন ক্রোড়ে লইয়া নবনির্মিত আশ্রমে চলিলেন। আশ্রম প্রবেশের নির্ধারিত শুভলগ্নে মা নারায়ণশিলা হস্তে লইয়া প্রথম প্রবেশ করিলেন। তাহার পর আমরা অন্যান্য সকলে তাঁহার অনুসরণ করিলাম। দেব বিগ্রহ হিসাবে এই শালগ্রাম শিলাই প্রথম আশ্রমে শুভাগমন করিলেন। কয়েকদিন তিনি আশ্রমে বাস করিয়া পুনরায় পূর্বস্থান মুন্সীঘাটের বাড়ী ফিরিয়া আসিলেন। ইহা বলাই বাহুল্য আমিও নারায়ণজীর সহিত আমার বাসা বাড়ীতে প্রত্যাবর্তন করিলাম।

আশ্রমের শ্রীশ্রীচণ্ডীমণ্ডপের অংশ নির্মিত হইলে উহার দ্বিতলে নারায়ণজীর জন্য ঘর, মন্দির ও পাকের স্থান প্রস্তুত হইলে শ্রীশ্রীমা নারায়ণ বিগ্রহ লইয়া স্থায়িভাবে সেখানে বাস করিবার জন্য আমাকে নির্দেশ দিলেন। এই প্রস্তাবে আমি আপত্তি করায় মা একদিন আমার সম্মুখে স্বামী পরমানন্দজীকে বলিলেন, "দেখ পরমানন্দ! ও যখন নারায়ণ লইয়া আশ্রমে আসিবেই না তখন মন্দির রাখিবার আর দরকার কি? উহা ভাঙ্গিয়া ফেল।" এই কথায় আমার মনে ধারণা হইল, মা যেন একটু অসন্তুষ্ট হইয়াই ইহা বলিলেন। তাঁহাকে ক্ষুণ্ণ করার ইচ্ছা আমি ঘুণাক্ষরেও মনে পোষণ করি না এবং সেই সাহসও আমার নাই। আমি ভালরূপেই জানি তাঁহার অসন্তোষের দ্বারা কখনও আমার মঙ্গল হইবে না, বরং তাঁহাকে প্রসন্ন করাই আমার জীবনের লক্ষ্য। শ্রীশ্রীমায়ের আদেশানুসারে গত ১৩৫৩ সনের ২রা অগ্রহায়ণ (১৮ই নভেম্বর ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দ) সোমবার শ্রীশ্রীনারায়ণজীকে লইয়া মায়ের এই বেয়াড়া ছেলেটা স্থায়ীভাবে আশ্রমবাসী হইল। এইরূপে আজ শ্রীশ্রীমায়ের আদেশ পালন করায় আমার মনের গ্লানি অনেকটা দূর হইল। সেই শালগ্রামশিলা এখনও শ্রীশ্রীমায়ের কাশী আশ্রমে

শ্রীশ্রীঅন্নপূর্ণামাতার মন্দিরে বিরাজিত আছেন। তাঁহার সেবা পূজার জন্য আমার ক্ষুদ্র শক্তি অনুসারে প্রদত্ত দুই হাজার টাকা আশ্রম কোষে গচ্ছিত রাখা হইয়াছে। আশ্রম পরিচালনার সহিত কোন প্রকার সম্পর্ক না রাখিয়া আমি স্বতন্ত্রভাবেই আশ্রমবাস করিতে লাগিলাম। যেমন পূর্বে স্বয়ং পাক করিয়া ঠাকুরের ভোগান্তে প্রসাদ গ্রহণ করিতাম, আশ্রমে আসিয়াও তদ্রূপই চলিল।

শ্রীশ্রীমা প্রায়ই বলিয়া থাকেন, "এই শরীরটার তো জগৎ-জোড়া একটাই আশ্রম। তোমরা এই শরীরটাকে যেখানে রাখ তোমরাও সেইখানেই থাক। এই শরীরের এই কথা"। মায়ের সন্তান সকলে মিলিয়া মিশিয়া এক জায়গায় আনন্দে বাস করে ইহাই তিনি চাহেন। আমাদের নিজেদের মধ্যে মনোমালিন্যের সৃষ্টি হইলে উহার প্রভাব গিয়া পড়ে শ্রীশ্রীমায়ের দিব্য শ্রীদেহের উপর। ইহা আমি প্রায় অর্ধ শতাব্দী যাবৎ দেখিয়া আসিতেছি। অতএব আমরা যদি আমাদের মাকে এই প্রকার তিক্ত ও অপ্রীতিকর দৃশ্য অবলোকন করিবার অবসর প্রদান না করি তাহা হইলে আমরা তাঁহাকে অধিকতর প্রসন্ন ও অন্তরঙ্গভাবে প্রাপ্ত হইবার সুযোগ পাইব এবং তাঁহার এই অপ্রাকৃত ভাবঘন চিন্ময় দেহটিকে সুস্থ রাখিতে সাহায্য করিব।

দিদি গুরুপ্রিয়া দেবীর সহিত আমার সেই মন কষাকষি মা কি করিয়া যে মিটাইলেন তাহা না লিখিলে প্রসঙ্গটি অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে। তা ছাড়া যাঁহারা এই ঘটনাটি পড়িবেন তাঁহারা হয় তো ধারণা করিবেন আমার সঙ্গে তাঁহার মনোমালিন্য সম্ভবতঃ এখনও চলিতেছে। অপ্রীতিকর বাদবিসম্বাদ মিটাইবার কৌশল যে শ্রীশ্রীমায়ের কত সুন্দর ও মর্মস্পর্শী তাহা দেখাইবার পরিকল্পনা লইয়াই পরবর্তী কাহিনীটি লিপিবদ্ধ করিবার প্রয়াস করিতেছি।

গত ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে সোলনের রাজা সাহেব শ্রীদুর্গা সিংজী তাঁহার রাজধানী সোলনে (বর্তমান হিমাচল প্রদেশের অন্তর্গত।) অত্যন্ত সমারোহের সহিত রাজোচিত উপচারে শারদীয়া শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা করিয়াছিলেন। সেই উপলক্ষ্যে দুর্গা-সিংজীর বিশেষ আগ্রহ ও প্রার্থনায় তাঁহার ইষ্টরূপিণী শ্রীশ্রীমা সন্তানের

মনোবাসনা পূর্ণ করিবার জন্য তাঁহার ভক্তবৃন্দ সমভিব্যাহারে সেখানে গমন করেন। কাশী হইতে সোলন রওয়ানা হইবার কিঞ্চিৎপূর্বে কি জানি কেন তিনি আমাকেও তাঁহার সঙ্গে যাইবার জন্য আদেশ করিলেন। নিজের আর্থিক অনটন ও দিদির সহিত মতান্তর এই কারণে তাঁহাদের সঙ্গে যাইবার আমার একেবারেই ইচ্ছা ছিল না। মানসিক অশান্তি লইয়া কোন আনন্দোৎসবে যোগদান করা আদৌ শোভন হয় না এবং নিজেরও ভাল লাগে না। কিন্তু মায়ের পুনঃপুনঃ বলার দরুন অগত্যা তাঁহার সঙ্গে আমাকে যাইতেই হইল। দৈবেচ্ছায়, পরেচ্ছায় এবং অনিচ্ছায় প্রারব্ধ অনেক কিছু করাইয়া লয় যাহা মানুষ কখনও কল্পনাও করিতে পারে না।

ষষ্ঠীর দিন সন্ধ্যার প্রক্কালে আমি শ্রীশ্রীদুর্গা প্রতিমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া ঠাকুর দর্শন করিতেছি। শ্রীমান্ বিশু (শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য। মা উহাকে পূজক নির্বাচন করিয়া কাশী হইতে সোলন লইয়া গিয়াছিলেন) আমার নিকট আসিয়া বলিল, "মা আপনাকে ডাকিতেছেন।" মা কোথায় আছেন জিজ্ঞাসা করায় সে বলিল, "মা উত্তরদিকের কোণার ঘরে আছেন।" মা ডাকিতেছেন, এই কথা শুনিয়া আমি তাড়াতাড়ি গিয়া দেখি ঘরের মধ্যে মা ও দিদি গুরুপ্রিয়া দুইজনে মুখামুখি হইয়া দাঁড়াইয়া আছেন। সেখানে আর তৃতীয় কোন ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন না। তাঁহাদের (মাও দিদির) ভাবগতিক দেখিয়া মনে হইল আমার জন্যই যেন তাঁহারা অপেক্ষা করিতেছেন। আমি মায়ের নিকট যাইতেই তিনি কোন প্রকার ভূমিকা না করিয়া হঠাৎ আমার হাত এবং দিদির হাত— উভয়ের হাত, নিজের দুই হস্তদ্বারা ধারণ করিয়া বলিলেন, "তোমরা আগে যেমন ভাই বোনের মত ছিলে আজ হইতে আবার দুইজনে তেমনি ভাবে থাকিবে। যাহা সব হইয়া গিয়াছে, সেইসব অতীত ঘটনা ভুলিয়া যাও।,' এই গুটি কয়েক কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে মায়ের সুন্দর চক্ষু দুইটি যেন ছলছল করিতে লাগিল। দিদি ও আমি দুইজনেই আর কোন প্রকার কথাবার্তা না বলিয়া মায়ের শ্রীচরণে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করতঃ তাঁহার আদেশ মানিয়া

লইলাম। আমাদের মধ্যে বাদ-বিসংবাদ, ঝগড়াঝাঁটি কি মনো-মালিন্য দেখিলে মহাভাবময়ী শ্রীশ্রীমায়ের দিব্য-চিন্ময় দেহের উপর যে তার প্রভাব পড়িয়া থাকে এবং সঙ্গে সঙ্গে যে তাঁহার ভাবের বৈলক্ষণ্য দৃষ্টিগোচর হয় ইহা তাঁহার প্রত্যেক সন্তানই দীর্ঘকাল যাবৎ দেখিয়া আসিতেছেন। এইভাবে পরম স্নেহময়ী শ্রীশ্রীমা আমাদের পরস্পরের মন কষাকষি এক মুহূর্তে মিটাইয়া দিলেন। করুণাময়ী মা কেন যে আমাকে এত আগ্রহ করিয়া কাশী হইতে সোলন দুর্গাপূজায় লইয়া গিয়াছিলেন তাহা এখন উপলব্ধি করিতে পারিলাম।

সন্তানদের প্রতি শ্রীশ্রীমায়ের অসীম স্নেহ

পরমস্নেহময়ী শ্রীশ্রীমা তাঁহার সন্তানদের সুবিধা অসুবিধা এবং খাওয়া দাওয়ার বিষয়ও যে কতখানি ভাবেন তাঁর নিদর্শন-স্বরূপ এখানে একটি ক্ষুদ্র ঘটনা উল্লেখ না করিয়া স্বস্তিবোধ করিতেছি না। সে অনেক দিনেব অতি পুরাতন কাহিনী। যদি আমার স্মৃতিশক্তি আমাকে প্রতারণা না করিয়া থাকে তাহা হইলে আমি অনুমান করি ঘটনাটি ইংরাজী ১৯৪৪ সনে সংঘটিত হইয়াছিল। পশ্চিমে দারুণ গ্রীষ্মের সময় হইল জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় মাস। সেই ভীষণ গরমের মধ্যে শ্রীশ্রীমায়ের সঙ্গে আমরা অনেকেই আলমোড়া যাইতেছি। আলমোড়া যাইতে হইলে কাঠগোদাম পর্যন্ত যাইতে হয় রেলগাড়ীতে। তারপর চুরাশি মাইল পথ যাত্রা করিতে হয় মোটর কারে কিংবা মোটর বাসে। এই চুরাশি মাইল ভ্রমণে এতই কষ্ট যেন মনে হয় চুরাশিলক্ষ যোনি পরিভ্রমণ করিয়া আসিলাম। তাই আমরা বলিয়া থাকি আলমোড়া যাইতে হইলে একেবারে 'আধমরা' হইতে হয়।

কাশী হইতে বেলা দশটায় আহারাদি করিয়া আমরা দেহরাদুন এক্সপ্রেসে রওয়ানা হইয়া রাত্রি প্রায় বারটার সময় গিয়া পৌঁছিলাম বেরেলী জংশনে। সেখানে কয়েক ঘণ্টা বিশ্রাম গৃহে অপেক্ষার পর ভোর পাঁচটার সময় বেরেলী হইতে ছোটলাইনের গাড়ী ধরিয়া বেলা অনুমান এগারটায় কাঠগোদাম ষ্টেশন পৌঁছিলাম। বেরেলী জংশনে আমরা কেহ কেহ রাত্রি থাকিতেই স্নান ও সন্ধ্যাদি সব নিত্যকর্ম সারিয়া লইলাম। প্ল্যাটফর্মের শেষের দিকে একটা বড়গাছ ছিল উহার তলায় বসিয়াই নিত্যকর্মাদি সমাধা করা হইয়াছিল কারণ কাঠগোদাম ষ্টেশনে রৌদ্রের মধ্যে আহ্নিকাদি করিবার কোন সুবিধা ছিল না। কাঠগোদাম হইতে আমাদের আলমোড়ার মোটর বাস ছাড়িবে দুপুর সাড়ে বারোটায়। ষ্টেশনে

গাড়ী হইতে নামিয়া দেখি ভয়ঙ্কর গরম। মাথার উপর যেমন সূর্যের প্রখর উত্তাপ, তেমনই নীচে রাস্তার পীচ্ গরমে গলিয়া পায়ের জুতা আটকাইয়া যাইতেছে। পথে পা রাখা অসম্ভব। আমাদের গন্তব্য স্থানে পৌঁছিতে লাগিবে কমপক্ষে সাতটি ঘণ্টা। অতএব সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার পূর্বে কোন রকমেই আমরা আলমোড়ায় গিয়া উপস্থিত হইতে পারিব না। সেইজন্য কাঠগোদাম ষ্টেশনে নামিয়াই আমাদের মধ্যে কেহ কেহ হাতমুখ ধুইয়া দোকানে লুচি, তরকারি, দধি, চাটনী ও মিষ্টি খাইতে গেলেন। কতিপয় ব্যক্তি ভোজন করিতে লাগিলেন নানাবিধ ফল এবং পান করিলেন বরফ সংযোগে দধির সরবৎ। যাঁহারা রাস্তায় কিছুই আহার করেন না তাঁহারা থাকিবেন নিরম্বু উপবাসী। মায়ের সঙ্গে আমরা নানা রকমের লোকই চলিতেছি। মায়ের সঙ্গে আমরা নানা সংস্কারের লোকই আছি।

মা গাড়ী হইতে অবতরণ করিয়া সোজা গিয়া বসিলেন মোটর বাসে কারণ রাস্তায় দাঁড়াইবার উপায় ছিল না। দারুণ গ্রীষ্মের প্রখর রৌদ্রে মাথার চাঁদি ফাটিয়া যাইতেছে আর রাস্তার গরমে পা পুড়িয়া যাইতেছিল। অতএব বাসে যাইয়া বসা ছাড়া আর উপায় কিছু ছিল না। বিশ্রাম-গৃহেও লোক গিজ্‌গিজ্ করিতেছিল—তিল রাখিবার জায়গা ছিল না। সেখানে বসিবার সুবিধার পরিবর্তে অসুবিধাই ছিল অধিক।

মা খুকুনী দিদিকে (বর্তমানে যিনি শ্রীগুরুপ্রিয়া দেবী নামে পরিচিতা, তাঁহার বাড়ীর ডাক-নাম ছিল "খুকুনী") বলিলেন, "দেখ তো খুকুনী, এখানে দই, তরমুজ ও চিনি পাওয়া যায় কিনা ?" শ্রীশ্রীমায়ের কৃপায় খুকুনী দিদির অদ্ভুত শক্তি। এই ভদ্রমহিলা না পারেন এমন কার্য নাই। অসাধ্য সাধন করিতে পারেন তিনি। কোথাও হইতে তিনি দধি এবং তরমুজ সংগ্রহ করিলেন কিন্তু ষ্টেশনের কাছাকাছি কোথায়ও চিনি পাওয়া যাইতেছে না। তাই তিনি চিনি আনিতে বাজারে চলিলেন। তাঁহাকে বাজারে যাইতে দেখিয়া আমিও তাঁহার সঙ্গে চলিলাম। বাজার হইতে চিনি ক্রয় করিয়া দধি ও তরমুজ লইয়া আমরা দুইজনে গিয়া উপস্থিত হইলাম

মায়ের নিকট। আমি বুঝিতে পারিতেছিলাম না মা দিদিকে এত কষ্ট দিয়া এই সকল জিনিস আনাইলেন কেন? মা দিদিকে বলিলেন তাঁহার মোরাদাবাদী কলাইকরা বড় ঘটিতে দই, তরমুজ ও চিনি দিয়া এক ঘটি সরবৎ প্রস্তুত করিতে। দিদি যখন সরবৎ তৈরী করিতেছিলেন তখন আমি নিকটে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া ভাবিতেছিলাম, মা এই সরবতের জন্য দিদিকে এই প্রচণ্ড রৌদ্রের মধ্যে কতই না কষ্ট দিলেন। আবার মনে মনে চিন্তা করিয়া নিশ্চয় করিলাম, মা এইভাবে বোধ হয় দিদির প্রারব্ধ কর্ম খণ্ডন করিতেছেন।

কেহ কেহ বলেন জীবের কর্ম ভোগব্যতীত শেষ হয় না। ইহা কিন্তু অসম্ভব বলিয়াই আমার মনে হয়। কোটি কোটি জন্মের কর্মফল কখনও জীব ভোগদ্বারা সমাপ্ত করিতে পারে কি? একজন্মের বিবিধ কর্মের ফল মানব দশ জন্মেও ভোগ করিয়া শেষ করিতে পারে না। তাহা হইলে বহুজন্মের কর্মফল জীব কি করিয়া ভোগের দ্বারা পরিসমাপ্ত করিবে? তবে ইহা হইতে নিষ্কৃতি পাইবার কি কোন উপায় নাই? জীব কি অনন্তকাল এইভাবে ভোগ করিয়াই যাইবে? চিন্তার কোন কারণ নাই। ইহার উপায় শ্রীভগবান্ শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতায় বলিয়াছেন, "জ্ঞানাগ্নিঃ সর্বকর্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা"। জ্ঞানাগ্নি সকল প্রকার কর্ম অর্থাৎ প্রারব্ধ, সঞ্চিত ও ক্রিয়মাণ কর্মসমূহ পুড়াইয়া ভস্মসাৎ করিয়া দেয়। কাহারও কাহারও মতে জ্ঞান ক্রিয়মাণ ও সঞ্চিত কর্মসকল নষ্ট করে কিন্তু প্রারব্ধকর্ম যাহা হইতে বর্তমান দেহ প্রাপ্ত হইয়াছে তাহা ভোগ ভিন্ন নাশ হয় না। আমাদের ব্রহ্মবিদ্যাস্বরূপিণী শ্রীশ্রীমা বলেন, "জ্ঞানাগ্নির দ্বারা ক্রিয়মাণ, সঞ্চিত ও প্রারব্ধ তিন প্রকার কর্মই বিনাশ প্রাপ্ত হয়। তাহা না হইলে শ্রীভগবান্ গীতায় 'কর্মাণি' এই বহু বচন ব্যবহার করিতেন না।" এক আঁটি পাটকাঠি বা খড়ে আগুন লাগিল, কিছু খড় কিংবা কিছুটা পাটকাঠি পুড়িবে আর কিছু পুড়িবে না এমন কি হয়? সবই পুড়িয়া ভস্মসাৎ হইয়া যায়। অজ্ঞান বা অবিদ্যা হইতেই কর্মের উৎপত্তি।

এখন প্রশ্ন হওয়া স্বাভাবিক, এই অজ্ঞান বা অবিদ্যা নাশ হইবে কি প্রকারে? আমিই এক, কেবল, আমি কর্তা নহি,

ভোক্তা নহি। আমি নিষ্ক্রিয় আত্মা, ব্রহ্ম। আমার কর্ম কি প্রকারে থাকিতে পারে? যাহার কর্ম নাই, তাহার কর্মভোগও নাই। পরমপূজ্যপাদ আচার্য শ্রীশঙ্কর তাঁহার 'বিবেকচূড়ামণি' নামক গ্রন্থে স্পষ্ট ঘোষণা করিয়াছেন, প্রারব্ধ ততক্ষণই সিদ্ধ হয় যতক্ষণ দেহে আত্মবুদ্ধি বা আত্মভাবনা আছে। দেহে আত্মভাবনা মুমুক্ষুর কদাচ কাম্য নহে। অতএব জ্ঞানীরও প্রারব্ধকর্ম ভোগ হয় এই প্রকার ধারণা ত্যাগ করা উচিত।

প্রারব্ধং সিধ্যতি তদা যদা দেহাত্মনা স্থিতিঃ।
দেহাত্মভাবো নৈবেষ্টঃ প্রারব্ধং ত্যজ্যতামতঃ॥ ৪৬১॥

আমা হইতে জগতে কোন পৃথক বস্তু নাই, 'অহমেব পরং ব্রহ্ম' আমিই একমাত্র পরমাত্মা, 'একমেবাদ্বিতীয়ম্'—অপর দ্বিতীয় কেহ নাই। এক প্রকার শুদ্ধ ব্রহ্মজ্ঞানই এই অজ্ঞান বা অবিদ্যার নিবৃত্তি করিতে পারে অপর কেহ ইহার সমূলে নাশ সাধন করিতে পারে না। আর একটি উপায়ও শ্রীভগবান্ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় নির্দেশ করিয়াছেন। সেইটি হইল—আত্মসমর্পণ-যোগ। তাঁহার শ্রীমুখের বাণী—

সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥

তুমি সর্বপ্রকার ধর্ম ও কর্মকে পরিত্যাগ করিয়া কেবল আমাকেই আশ্রয় কর, আমার শরণাগত হও, তুমি শোক করিও না; আমি তোমাকে সকল প্রকার পাপ অর্থাৎ কর্ম হইতে মুক্ত করিব।

'ধান ভানিতে শিবের গীত' গাওয়া হইয়া গেল। কোথায় দিদিকে দিয়া মা সরবৎ প্রস্তুত করাইতেছিলেন। সেই প্রসঙ্গে উঠিয়াছিল প্রারব্ধ ভোগের কথা। সেই সূত্র অবলম্বন করিয়া এতক্ষণ বলা হইল কর্মফল খণ্ডনের তত্ত্বকথা। সরবৎ তৈরী হইলে দিদিকে বলিলেন ঐ সরবৎ হইতে একটু তাঁহার মুখে দিতে। শ্রীশ্রীমা তাঁহার আপন হাতে প্রায় পঞ্চাশ বৎসর যাবৎ কিছুই গ্রহণ করেন না। সব কিছুই এমন কি মুখ শুদ্ধিটুকুও তাঁহাকে খাওয়াইয়া দিতে হয়। এই সম্বন্ধে তিনি বলেন, জগতে যত হাত আছে সবই

নাকি তাঁহার হাত। কত ব্যাপক তাঁহার দৃষ্টিভঙ্গি*! মোটর বাসে বসিয়া স্বয়ং একটু সরবৎ পান করিয়া ঘটিটি মা নিজের হাতে লইয়া আমাকে ডাকিলেন। আমি কাছে যাইতেই মা আমাকে বলিলেন, "হাঁ কর তো।" আমি অতি সুবোধ বালকটির মত তাঁহার নির্দেশানুসারে মুখব্যাদান করিতেই মা তাঁহার পরিধানের কাপড়ের অঞ্চলখানি জলে ধুইয়া তাহাদ্বারা ঘটির মুখটি ঢাকিয়া কাপড়ছাঁকা করতঃ স্নেহময়ী জননী আমার মুখে সরবৎ ঢালিয়া দিতে লাগিলেন। মা বসিয়াছিলেন মোটর বাসে এবং আমি দাঁড়াইয়াছিলাম নীচে। অতএব আমার মুখে সরবৎ ঢালিতে মায়ের কোন অসুবিধা হইতেছিল না। শ্রীশ্রীমায়ের শ্রীহস্ত হইতে তাঁহার প্রসাদী অমৃততুল্য অতি সুস্বাদু পানীয় পড়িতে লাগিল আমার মুখে এবং আমি পরমানন্দে তৃপ্তির সহিত আকণ্ঠ পান করিতে লাগিলাম। দিদির জন্য একটুও প্রসাদ ঘটিতে অবশিষ্ট ছিল কিনা সঠিক বলিতে পারিব না। থাকিলেও হয়তো উহা যৎসামান্যই ছিল। আনন্দের আতিশয্যে সেদিকে আমার লক্ষ্যই ছিল না। প্রসাদের প্রতি আমার তখনই প্রীতি হয় অধিক যখন প্রসাদটি হয় সুস্বাদু এবং পাওয়া যায় পরিমাণে অধিক। ইহা আমার একটি জন্মগত স্বভাব—কণিকায় তৃপ্তি নাই। উপনিষদে তাই বর্ণিত হইয়াছে, "যৎ বৈ ভূমা তৎসুখং, নাল্পে সুখমস্তি।" ভূমাতেই সুখ, অল্পে সুখ নাই। তাই সকলে চায় ভূমাকে।

শ্রীশ্রীমায়ের এই স্নেহের কথা এত দীর্ঘকাল পরেও স্মরণ করিলে আনন্দ হয় এবং কৃতজ্ঞতায় আমার হৃদয় কাণায় কাণায় ভরিয়া উঠে। প্রথম দর্শনেই শ্রীশ্রীমায়ের সম্বন্ধে আমি যাহা ভবিষ্যৎবাণী করিয়াছিলাম তাহা অন্ততঃ আমার জীবনে যে অক্ষরে অক্ষরে সব ফলিতেছে তাহা আমি মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিতে পারি। মায়ের স্নেহ ও করুণার কথা যদি স্বীকার না করি তাহা হইলে কৃতঘ্নতার পাপে লিপ্ত হইতে হইবে। জগতে কৃতঘ্নতার অর্থাৎ

---

* সর্বতঃ পাণিপাদোঽহমন্তর্যামী সনাতনঃ॥ সবদিকে আমার হস্ত ও পদ। আমিই সনাতন অন্তর্যামী আত্মা॥ শ্রীরামগীতা॥

উপকার পাইয়া তাহা স্বীকার না করার তুল্য আর পাপ নাই। মা আমাদের প্রত্যেকের সুখ ও সুবিধার বিষয় কত যে ভাবেন তাহার অসংখ্য প্রমাণ আমি আমার জীবনে পাইয়াছি। তিনি যে আমাদের বিষয় কেবল চিন্তা করিয়াই ক্ষান্ত হন তাহাই নহে বরং নানা প্রকার কৌশলদ্বারা সকল রকম আরাম ও সুবিধার ব্যবস্থাও তিনি করিয়া থাকেন। দ্বিতীয়তঃ মা কাহারও কোনও নিয়মভঙ্গ করান না বা নিয়মভঙ্গ করিবার অবসর পর্যন্ত দেন না। আমার নিয়ম ছিল ভ্রমণকালে পথে আমি কিছু খাইতাম না। গন্তব্যস্থানে গিয়া স্নান-সন্ধ্যাদি সমাপন করিয়া তবে জল পান ও আহার করিতাম। মা আমার এই নিয়মের বিষয় জানিতেন। আমাকে মা সরবৎ পান করিতে না বলিয়া, কত কৌশলে পানীয় প্রস্তুতকরতঃ তাঁহার স্বহস্তে প্রসাদী সরবৎ পান করাইয়া আমাদ্বারা আমার নিয়মভঙ্গ করাইলেন না অথচ আমাকে দীর্ঘ সময়ের জন্য উপবাসও রাখিলেন না। শ্রীশ্রীমায়ের হস্ত হইতে উহা পান করিবার সময় আমার কিন্তু কোন প্রকার সংস্কারেও আঘাত লাগে নাই। আমি নিজে ইচ্ছা করিয়া কখনও বোধ হয় ঐ ভাবে স্নানাদি না করিয়া সরবৎ পান করিতে পারিতাম না। আমার সংস্কারে বাধা দিত ও বিবেক দংশন করিত। মা যে কাহাকেও তাহার ব্যক্তিগত নিয়ম ভঙ্গ করিতে দেন না—এ সম্পর্কে আর একটি উদাহরণ প্রদান করিতেছি।

১৯৩৬ খৃষ্টাব্দের মে মাসে দেহরাদুন শহর হইতে পাঁচ মাইল উত্তরে হিমালয়ের পাদদেশে কিশনপুর নামক স্থানে শ্রীশ্রীমায়ের শুভ জন্মোৎসবের পুণ্য দিবসে অতি সমারোহ ও বাদ্যভাণ্ডের সঙ্গে শ্রীশ্রীআনন্দময়ী বিশ্বমন্দির স্থাপিত হইল। এই প্রতিষ্ঠানটির প্রধান উদ্যোগী ছিলেন মায়ের বিশিষ্ট ভক্ত ও ভাইজী শ্রীজ্যোতিষ চন্দ্র রায়ের মন্ত্রশিষ্য শ্রীহরিরাম যোশী। তিনি এবং তাঁহার বন্ধু শ্রীহংসদত্ত তিওয়ারী এই মন্দির নির্মাণ কার্যে অক্লান্ত পরিশ্রম না করিলে এত অল্প সময়ের মধ্যে ইহা প্রস্তুত হইতে পারিত না। আশ্রম প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে নানা স্থানের মায়ের ভক্ত সন্তানগণ আসিয়াছেন। ভাইজীর স্নেহের আহ্বানে আমরাও কয়েকজন এই উৎসবে সম্মিলিত হইবার জন্য কাশী হইতে দেহরাদুন গিয়া

উপস্থিত হইয়াছি। শ্রীশ্রীমায়ের সঙ্গে নিরবচ্ছিন্ন আনন্দে আমাদের দিনগুলি বেশ কাটিতেছে।

আশ্রমের মধ্যস্থলে 'হল'। এই ঘরে অনাবশ্যক কথা বলা নিষেধ। এখানে ভগবৎ কথা ও ভগবন্নাম কীর্তনের জন্য দুই বেলাই সকলে দেহরাদুন শহর হইতে আসিয়া মিলিত হন। এই হল-ঘরটির নাম রাখা হইয়াছে "নাম-মন্দির"। ইহার চারি কোণে চারিখানা ঘর। কোন ঘরের নাম "মাতৃ-মন্দির", কোন ঘরের নাম "ভোগ-মন্দির", কোন ঘরের নাম "স্বাধ্যায়-মন্দির", কোন ঘরের নাম "সৎ-সঙ্গ-মন্দির"। উপরের তালায় দুইখানি কক্ষ, একখানি "পিতৃ-মন্দির", অপরখানি "ধ্যান-মন্দির" বা "মৌন-মন্দির"। পরে মন্দির ও আশ্রমবাসীদের নিবাসের জন্য বহু ঘর নির্মিত হইয়াছে। এই সুন্দর ও পরিষ্কার ছবির মতন আশ্রমটিতে কেবল জপ, ধ্যান, নাম, পাঠ ও সৎসঙ্গ ব্যতীত অন্য কোন বৈষয়িক বা রাজনৈতিক আলোচনা সর্বতোভাবে বারণ।

একদিন মধ্যাহ্নে ভোগ মন্দিরে মা ও বাবা ভোলানাথ ভোগে বসিয়াছেন। আমরা কয়েকজন আমাদের আহারাদি সমাপন করিয়া সেখানে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া তাঁহাদের ভোজন দেখিতেছি। শ্রীশ্রীমাকে খাওয়াইয়া দিতেছেন খুকুনী দিদির (তখনও দিদির নাম শ্রীগুরুপ্রিয়া হয় নাই। কেহ খুকুনী, কেহ আদরিণী, কেহ বা খুকুনী দিদি বলিয়া ডাকিতেন।) বড় দিদি শ্রীযুক্তা সরোজিনী দেবী। বাবা ভোলানাথ মায়ের পার্শ্বে বসিয়া স্বতন্ত্রভাবে আনন্দে ভোজন করিতেছেন। মা যখন আহার করিতেছিলেন সেই সময় আমাদের মধ্যে অনেকেই তাঁহার নিকট গিয়া প্রসাদের জন্য হাত পাতিলেই যিনি মাকে খাওয়াইয়া দিতেছিলেন তিনি প্রত্যেকেরই হাতে মায়ের ভোজনের থালা হইতে প্রসাদ বিতরণ করিতেছিলেন। তাহারা সকলে মায়ের প্রসাদ লইয়া অন্যত্র গিয়া আনন্দে উহা গ্রহণ করিতেছিলেন। কারণ "ভোগ-মন্দিরে" মা ও বাবা ছাড়া অন্যের খাওয়া মানা ছিল। আমিও সেখানে দণ্ডায়মান হইয়া দর্শন করিতেছিলাম শ্রীশ্রীমায়ের ভোগলীলা। সকলে মায়ের প্রসাদ লইতেছেন আমি কিন্তু তাঁহার নিকট

প্রসাদ প্রার্থনা করিতেছি না। কারণ আমার নিয়ম ছিল আমি দিনের মধ্যে একবার মাত্র আচমনীয় দ্রব্য অর্থাৎ ভাত, ডাল, রুটি, তরকারি, লুচি ইত্যাদি ভোজন করিতাম। উপনয়নদ্বারা সংস্কৃত ব্রাহ্মণদের ইহাই শাস্ত্রীয় বিধান। আমার এই নিয়মের বিষয় মা জানিতেন। সকলে ভক্তির সহিত মায়ের প্রসাদ গ্রহণ করিতেছেন আর আমি প্রসাদ না লইয়া একধারে দাঁড়াইয়া আছি, ইহা বাবা ভোলানাথ লক্ষ্য করিয়াছিলেন। তিনি আমাকে ইশারা ইঙ্গিতে জিজ্ঞাসা করিলেন আমি কি করিব? মায়ের প্রসাদ গ্রহণ করিব কি না? বাবা ভোলানাথ সেই সময় শ্রীশ্রীমায়ের নির্দেশানুসারে মৌন থাকিতেন। বিশেষ প্রয়োজন হইলে কেবল মায়ের সঙ্গে কথা বলিতেন। অন্য কাহারও সঙ্গে কথা বলিতে হইলে লিখিয়া তাহার মনোভাব ব্যক্ত করিতেন। তিনি আমাকে সঙ্কেত করা মাত্র আমি যেন কেমন ভ্যাবাচ্যাকা খাইয়া গেলাম। আমার আহারের নিয়মের কথা ভুলিয়া আমি মায়ের প্রসাদের জন্য অন্যান্যের ন্যায় হাত পাতিলাম। আমার হাত পাতিবার সঙ্গে সঙ্গেই মা তাঁহার হাত দিয়া আমার হাতখানা সরাইয়া দিলেন। যেহেতু তিনি অবগত ছিলেন যে আমি দিনে একবার ছাড়া অন্নাদি গ্রহণ করিতাম না। আমি আমার আহারের নিয়ম ভুলিলে কি হইবে, মা তো আর তাহা ভুলেন নাই। তিনি কখনও কাহারও নিয়মভঙ্গ করিতে দেন না। কোন নিয়ম একবার করিয়া তাহা ভঙ্গ করাটা তিনি কোন রকমেই সমর্থন করেন না। তবে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে যে মা সাধারণ নিয়ম ভঙ্গ করেন না তাহাও কিন্তু বলা যায় না*। আমার হাত সরাইয়া দেওয়ায় আমি ভীষণ

* বারাণসীতে শ্রীশ্রীমায়ের আশ্রম নির্মাণের পর হইতে প্রত্যেক বৎসরই বসন্তকালে শ্রীশ্রীবাসন্তীদেবীর পূজা হইয়া আসিতেছে। মা কোনবার সেই সময় উপস্থিত থাকেন কোনবার বা তিনি থাকেনও না। একবার শ্রীশ্রী মায়ের উপস্থিতিতে কাশী আশ্রমে বাসন্তীদেবীর পূজা হইতেছে। মহাষ্টমীর দিন বেলা দ্বিপ্রহরের সময় দেবীর ভোগের পর উপস্থিত সকলে প্রসাদ পাইতে বসিয়াছেন। পরম কল্যাণময়ী শ্রীশ্রীমা স্বয়ং স্বহস্তে ভক্তদের মহামায়ার অন্ন-

লজ্জিত হইয়া হাত গুটাইয়া চুপচাপ বোকার মত এক পার্শ্বে গিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। শ্রীশ্রীমায়ের প্রসাদ হইতে বঞ্চিত রহিলাম বলিয়া মনে যে একটু দুঃখ না হইল তাহা অস্বীকার করিতে পারিব না। একটু পরেই মা কি জানি কি ভাবিয়া আমাকে তাঁহার বাঁদিকে বসিতে বলিলেন। তাঁহার আদেশানু-সারে তাঁহার কাছে বসিতেই তিনি বলিলেন, "হাঁ কর"। মায়ের নির্দেশমতো আমি 'হাঁ' করিতেই তিনি তাঁহার ভোজনের থালা হইতে এক গ্রাস প্রসাদ লইয়া আপন করকমলের দ্বারা আমার মুখে আলগোছে ফেলিয়া দিলেন। আমি শ্রীশ্রীমায়ের নিজের হাতে খাওয়াইয়া দেওয়া প্রসাদ পরমানন্দে গ্রহণ করিয়া নিজেকে ধন্য ও কৃতার্থ মনে করিতে লাগিলাম। প্রসাদ গ্রহণের জন্য প্রসারিত হাতখানা অপসারিত করিবার দরুন আমার মনে যে দুঃখ হইয়াছিল তাহা মা এমনি করিয়া দূর করিয়া দিলেন;

প্রসাদ পরিবেশন করিতেছেন। সকলে বিশ্বজননীর করকমল হইতে মহাষ্টমীর পুণ্য বাসরে বাসন্তীদেবীর প্রসাদ প্রাপ্ত হইয়া মহানন্দে "জয়ধ্বনি" দিতে দিতে অতিশয় শ্রদ্ধা ও ভক্তির সহিত উহা গ্রহণ করিতে লাগিলেন। মা প্রসাদ বিতরণের সময় "মহাপ্রসাদ," "মহাপ্রসাদ" বলায় সকলেরই মনে অত্যন্ত ভক্তির সঞ্চার হইয়াছে। যাঁহারা সেইসময় সেখানে উপস্থিত ছিলেন তাঁহারা সকলে পরমারাধ্যা মায়ের হাত হইতে "মহাপ্রসাদ" পাইয়া নিজেকে ধন্য মনে করিতেছিলেন। সকলকে "মহাপ্রসাদ" প্রদান করিয়া করুণাময়ী মা কন্যাপীঠের দরজায় আসিয়া প্রথমে দিদিকে তারপর কন্যাপীঠের কুমারী কন্যাদের সেই "মহাপ্রসাদ" দিলেন। তাঁহারা সকলে মহা আনন্দের সহিত ভক্তিভাবে উহা মাথায় স্পর্শ করিয়া গ্রহণ করিলেন। শ্রীশ্রীমা ঐ "মহাপ্রসাদ" লইয়া আশ্রমের সদর দরজায় আসিয়া একেবারে মাটিতেই বসিয়া পড়িলেন। মা আজ শ্রীশ্রীঅন্নপূর্ণা মূর্তিতে বিশ্ববাসীকে "মহাপ্রসাদ" বিতরণে তৎপর দেখিয়া আমি অতিশয় বিনীতভাবে তাঁহাকে নিবেদন করিলাম, "মা! আমি এই "মহাপ্রসাদ" হইতে আজ বঞ্চিত রহিলাম কেন?" এই কথার সাথে সাথে করুণাময়ী মা ঐ "মহাপ্রসাদ" হইতে একটি কণা লইয়া আমার মুখে দিলেন। তারপর স্বামী পরমানন্দজীকে ডাকিয়া তাঁহাকেও উহা খাওয়াইয়া

এইভাবে আমার প্রসাদ ভক্ষণের অভিলাষ তিনি পূর্ণ করিলেন এবং স্বয়ং আপন হাতে আমাকে খাওয়াইয়া দিয়া আমাকে নিয়ম-ভঙ্গের প্রত্যবায় হইতেও রক্ষা করিলেন। আমি নিজের হাতে প্রসাদ খাইলে সম্ভবতঃ আমার নিয়মভঙ্গ করা হইত, সেইজন্য পরম কল্যাণময়ী মা তাঁহার আপন হাতে এইভাবে খাওয়াইয়া দিলেন। মহাপুরুষেরা যাহা করেন তাহাদ্বারা জীবের সর্বতোভাবে কল্যাণই সাধিত হয়—কখনও কাহারও অমঙ্গল হয় না বা তাঁহাদের সম্মুখে কাহারও অকল্যাণ হইতে দেন না। এইরূপে মা যে আমাদের কতভাবে ধর্ম সঙ্কট হইতে রক্ষা করিতেছেন তাহা লিখিয়া শেষ করা যায় না।

দিলেন। আর যাইবে কোথায়! যতলোক সেই সময় সেখানে উপস্থিত ছিলেন, সকলেই মার কাছে আসিয়া 'হাঁ' করিয়া দাঁড়াইতে লাগিলেন। সন্তানবৎসলা জননীও তাহাদের মুখে "মহাপ্রসাদ" দিতে লাগিলেন। জাতি-বর্ণ নির্বিশেষে এমন কি পাড়ার মাঝি মাল্লাদেরও শ্রীশ্রীমা নিজের হাতে "মহাপ্রসাদ" খাওয়াইয়া দিলেন। মায়ের সম্মুখে দাঁড়াইয়াছিল আশ্রমের পুরাতন ব্রহ্মচারী ও পরমপূজনীয়া দিদিমার প্রথম মন্ত্রশিষ্য শ্রীমান্ হীরু (বর্তমানে শ্রীতন্ময়ানন্দ) তাহার মনে কিভাব উদয় হইয়াছিল জানি না, সে ঐ 'মহাপ্রসাদ' হইতে একগ্রাস লইয়া বিশ্বমাতার শ্রীমুখে প্রদান করিল এবং তিনিও নিঃসঙ্কোচে ও অম্লান বদনে ঐ 'মহাপ্রসাদ' ভক্ষণ করিলেন। ইহা বলা নিষ্প্রয়োজন ঐ 'মহাপ্রসাদ' যে সকল জাতির লোকের দ্বারা স্পৃষ্ট হইয়াছিল তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ ছিল না। শ্রীশ্রীমায়ের পরমভক্ত ও অনুগত সন্তান ডাক্তার গোপাল প্রসাদ দাসগুপ্ত প্রায়ই ক্ষোভের সহিত বলিতেন, মায়ের আশ্রমে ছোঁয়া ছুঁয়ি বিচারটা বড়ই বেশী। তিনি সেই সময় আশ্রমের অতি নিকটেই বাস করিতেন। তাই মা তাঁহার অপর এক পরমভক্ত ও অতি বাধ্য সন্তান শ্রীমান্ পটলভাইকে (শ্রীসত্যেন্দ্র কুমার বসু) পাঠাইলেন ডাক্তার গোপাল প্রসাদ দাসগুপ্তকে ডাকিয়া এই শ্রীশ্রীজগন্নাথক্ষেত্রলীলা প্রত্যক্ষ করিতে—তিনি তখন আহারের পর বিশ্রাম করিতেছিলেন সেইজন্য তাঁহাকে নিদ্রা হইতে জাগাইয়া আর এই অচ্ছুৎলীলা দেখান সম্ভব হইল না।

মা যেমন বর্ণাশ্রমধর্ম অক্ষরে অক্ষরে নিষ্ঠার সহিত রক্ষা করেন পক্ষান্তরে উহা ভঙ্গ করিতেও তাঁহার কোনই যে দ্বিধা বা কুণ্ঠা হয় না তাহা দেখাইবার জন্যই এই ঘটনাটি এইস্থানে লিখিত হইল। মায়ের কাছে গড়া ভাঙ্গা দুই সমান। তিনি ভাল-মন্দ, শুচি-অশুচি ইত্যাদি দ্বন্দ্বের বহু ঊর্ধ্বে স্থিত—সংস্কার মুক্ত।

পরমারাধ্যা শ্রীশ্রীমায়ের সঙ্গে নীলাচলে শ্রীশ্রীজগন্নাথ দর্শন

গত ১৩৫৩ (১৯৪৬ খৃষ্টাব্দে) বঙ্গাব্দে পরমারাধ্যা শ্রীশ্রীমায়ের শুভ-জন্মোৎসব দুই স্থানে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। নবদ্বীপের শ্রীশ্রীগোবিন্দ মন্দিরে ১৯শে বৈশাখ আরম্ভ হইয়া মায়ের রমনা আশ্রমে তিথিপূজা হইয়া শেষ হয়। এইবার মায়ের তিথিপূজায় একটু নূতনত্ব নজরে পড়িল। অন্যান্যবার তাঁহাকে তাঁহার বিশিষ্ট বিশিষ্ট তিন চারি জন ভক্ত গিয়া রাত্রি তিনটার সময় পূজাস্থানে আহ্বান করিয়া নিয়া আসেন। মা সেখানে আসিয়াই তাঁহার জন্য সুসজ্জিত নির্দিষ্ট শয্যার উপর শুইয়া পড়েন। শায়িত অবস্থাতেই মায়ের রাজোচিত উপচারে বিশেষ পূজা হয়। পূজা সমাপ্ত হইবার অনেক পর, সকলের প্রণাম ও শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করা শেষ হইলে তবে তাঁহাকে সেইস্থান হইতে অন্যত্র নিয়া আসা হয়। তারপরও তিনি একান্তে অনেকক্ষণ পর্যন্ত ভাবের ঘোরে পড়িয়া থাকেন। এবার কিন্তু তেমনটি দেখা গেল না। এবার মা রাত্রি তিনটার পর যখন রমনা আশ্রমের পঞ্চবটী-তলায় বসিয়া তাঁহার পুরাতন ও বিশিষ্ট ভক্ত বীরেনদাদা (শ্রীবীরেন্দ্র চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, এম, এ) ও অমূল্যদাদা (শ্রীঅমূল্য কুমার দত্তগুপ্ত, এম, এ ; বি, এল.) প্রভৃতিদের সঙ্গে তত্ত্বালোচনা করিতেছিলেন সেই সময় বসা অবস্থাতেই তাঁহার তিথিপূজা হইল। এই বৎসর শ্রীশ্রীমায়ের জন্ম-জয়ন্তী উৎসবে এলাহাবাদ হইতে শ্রীসত্যগোপাল-গীতাশ্রমের আচার্য শ্রীগোপাল চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সপরিবারে ঢাকা গিয়াছিলেন। তিনিও এই আধ্যাত্মিক বার্তালাপে যোগদান করায় আলোচনার আসরটি বেশ জমিয়াছিল। শ্রীগোপাল ঠাকুর ও বীরেনদাদা পাঠ্যাবস্থায় কোন সময় কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজে একসঙ্গে দর্শনশাস্ত্রে এম, এ, পড়িতেন। বহুদিন পর দুই

বন্ধুর সাক্ষাৎকার হওয়ায় তাঁহাদের মায়ের সঙ্গে তত্ত্ব-বিচারটা জমিয়া ছিল ভাল। প্রকৃত জিজ্ঞাসু পাইলে মা তাঁহার জ্ঞান-ভাণ্ডার খুলিয়া দিতে কখনও কৃপণতা করেন না। মা তো সর্বদাই বলিয়া থাকেন, "যেমন বাজাইবে তেমনই শুনিবে।" এইবারের মায়ের তিথিপূজার অধিকার শ্রীশ্রীমায়ের এই অতি অযোগ্য সন্তান প্রাপ্ত হইয়া নিজেকে ধন্য ও কৃতার্থ মনে করিয়াছিল।

কথা হইয়াছিল এই উৎসবের পরই মা কলিকাতা চলিয়া আসিবেন। ঢাকায় বেশীদিন থাকা হইবে না। হঠাৎ শোনা গেল বহরমপুরের শ্রীরামরঞ্জনবাবু মাকে পুরী যাইবার জন্য বিশেষ করিয়া ধরিয়াছেন। তাঁহার ঐকান্তিক অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করিতে না পরিয়া এবং ভক্তবাসনা পূর্ণ করিবার জন্যই ভক্তবৎসলা মা তাঁহার প্রার্থনা স্বীকার করিয়াছেন। শ্রীশ্রীমায়ের সঙ্গে পুরীধামে কে কে যাইবেন তারও নামের তালিকা নাকি প্রস্তুত হইতেছে। পরীক্ষার পর ফল প্রকাশের পূর্বে যেমন পরীক্ষার্থীদের উৎকণ্ঠায় কালাতিপাত করিতে হয় তদ্রূপ শ্রীশ্রীমায়ের সঙ্গে কে কে শ্রীশ্রীজগদ্বন্ধু দর্শনে নীলাচল যাইবেন তাহাদের নাম শুনিবার আশায় আমরাও সকলে উদ্‌গ্রীব হইয়া রহিলাম। শোনা যায় কখনও কখনও নাকি বিড়ালের ভাগ্যে শিকা ছিঁড়ে। কানে আসিল পুরীযাত্রীদের নামের তালিকায় আমার নামও একটু স্থান পাইয়াছে। আমি কখনও আশা করি নাই আমিও শ্রীশ্রীমায়ের সঙ্গে শ্রীক্ষেত্রে জগন্নাথ দর্শনের সৌভাগ্য লাভ করিব। এই শুভ সংবাদে মনে কি পরিমাণ যে আনন্দ হইল তাহা লিখিয়া প্রকাশ করিতে পারিতেছি না। যথাসময়ে ঢাকাবাসী ভক্তগণকে কাঁদাইয়া মা কলিকাতা চলিলেন। বহু মাতৃ-সন্তান সজল নয়নে তাঁহাকে গাড়ীতে তুলিয়া দিতে ঢাকা স্টেশনে উপস্থিত ছিলেন। ইহার পর মা আজ পর্যন্ত ঢাকা গমন করেন নাই।

কলিকাতা হইতে রাত্রি আট ঘটিকায় পুরী এক্সপ্রেসে শ্রীশ্রী মায়ের সঙ্গে আমরা পরমানন্দে রওয়ানা হইলাম। পরদিন বেলা অনুমান দশটায় বহুদিনের অভিলষিত শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের পুরীধামে আসিয়া পৌঁছিলাম। এই মহাপুণ্যক্ষেত্রকে শ্রীক্ষেত্র, শ্রীবিমলাক্ষেত্র,

নীলাচল ও পুরুষোত্তমক্ষেত্রও বলা হয়। কোন সময় এই পবিত্র তীর্থস্থানটি তন্ত্র-সাধকদের অতিশয় প্রশস্ত সাধনক্ষেত্র ছিল। গোবর্ধন মঠের মঠাম্নায়ে উল্লেখ আছে যে এই ক্ষেত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবী শ্রীবিমলা এবং ভৈরব স্বয়ং শ্রীজগন্নাথদেব। এখনও এখানে প্রবাদ আছে যে শ্রীশ্রীবিমলাদেবীর ভোগ নিবেদন না হওয়া পর্যন্ত শ্রীশ্রীজগন্নাথের ভোগ নিবেদন করা হয় না। জগন্নাথের প্রসাদের সঙ্গে যখন বিমলাদেবীর প্রসাদ মিলিত হয় তখন উভয় প্রসাদ মিলিয়া "মহাপ্রসাদ"। শ্রীবিমলাক্ষেত্রে বা শ্রীক্ষেত্রে "মহা-প্রসাদেরই" মাহাত্ম্য অত্যধিক। শ্রীজগন্নাথের মণিকোঠায় ভোগ নিবেদন হইলে উহা কেবল "প্রসাদই" হয়, "মহাপ্রসাদ" হয় না। "মহাপ্রসাদ" না হওয়া পর্যন্ত উহা স্পর্শাদিদোষ রহিত হয় না। কিংবদন্তী আছে যে এখনও শ্রীশ্রীবিমলাদেবীর সম্মুখে বিশেষ বিশেষ পর্বদিনে গুপ্তভাবে বলিদান হইয়া থাকে। শ্রীমন্ মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের পুরী আগমনের পর হইতেই তাঁহার প্রভাবে এই স্থানটি বৈষ্ণবভাবাপন্ন হয়। শ্রীমন্ মহাপ্রভু পুরীর গম্ভীরা নামক স্থানে জীবনের অন্তিম আঠার বৎসর যে অতিবাহিত করিয়াছিলেন তাহার সাক্ষ্য এখনও সেখানে বর্তমান আছে। তিনি কিভাবে শরীর ত্যাগ করিয়াছিলেন সে সম্বন্ধে বহু মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীমন্ মহাপ্রভুর সমসাময়িক পদকর্তাগণ তাঁহার অন্তিমলীলা একেকজন একেক রকম বর্ণন করিয়াছেন। ইহাদ্বারা অনুমান করা যাইতে পারে তাঁহারা কেহই বোধ হয় সঠিক সংবাদ রাখিতেন না সেইজন্য আপন আপন ভাব অনুযায়ী একেক রকম লিখিয়া গিয়াছেন অথবা ইহাও হইতে পারে তাঁহারা যথার্থ সংবাদ জানিতেন, কিন্তু কোন রকমে উহা প্রকাশ করিতে সাহস করেন নাই। আশা করা যায় ভবিষ্যতে বিদগ্ধ ঐতিহাসিকগণ গবেষণার দ্বারা ইহার প্রকৃত রহস্য উদ্ঘাটনে যত্নবান্ হইবেন। শ্রীশ্রীশঙ্করাবতার পূজ্যপাদ শ্রীমৎ শঙ্করাচার্যের চারিটি প্রধান মঠের মধ্যে অন্যতম "গোবর্ধন মঠ" এখানেই প্রতিষ্ঠিত। এই মঠের আচার্য ছিলেন শ্রীপদ্মপাদ।

আমার জীবনে এই আমি প্রথম পুরী আসিলাম। পুরী

স্টেশনে গাড়ী পৌঁছিবার পূর্বেই দূর হইতে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের বিশাল মন্দিরের সুবর্ণ নির্মিত গগনস্পর্শী চূড়া দর্শন করিয়া গাড়ী হইতেই দেবতার উদ্দেশ্যে হাতজোড় করিয়া প্রণাম জানাইলাম।

যথাসময়ে মায়ের সহিত আসিয়া উপনীত হইলাম তাঁহার আশ্রমে। সমুদ্রের বেলাভূমি পার হইলেই ছবির মত সুন্দর আশ্রমখানি। ইহারই পূর্বপার্শ্বে স্বর্গদ্বারের প্রসিদ্ধ মহাশ্মশান এবং সম্মুখে দিগন্তব্যাপী বিশাল সমুদ্র। প্রাচীনদের মুখে শুনিয়াছি এই জলধির নীল জল দেখিয়া আমাদের ভাবের ঠাকুর শ্রীমন্‌মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শ্রীকৃষ্ণের বিরহের ভাবোন্মাদে যমুনা মনে করিয়া ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহার পবিত্র, দিব্য ও চিন্ময়দেহের স্পর্শের কিছু না কিছু প্রভাব তো এখনও বিদ্যমান আছে এই অম্বুধির বিশাল বক্ষে। তাই কেবলই মনে হইতেছিল কতক্ষণে জিনিসপত্র সব আশ্রমে যথাস্থানে রাখিয়া এই পূত নীল পবিত্র সলিলে গিয়া ঝাঁপ দিব। এই ভাবটি মনে জাগরিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই দেখিলাম মা একখানি বড় তোয়ালে শরীরে জড়াইয়া সাগরের জলে স্নান করিতে যাইতেছেন। আমরাও সকলে তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া সাগরাভিমুখে চলিলাম। মেয়েরা মাকে মাঝে রাখিয়া তাঁহার চারিদিকে গোল হইয়া দাঁড়াইয়া পরমানন্দে স্নান করিতেছেন। আমরা পুরুষের দল একটু তফাতে গিয়া স্নান করিতে লাগিলাম। মা আমাদের কাছে আসিয়া তাঁহার কর-কমলের দ্বারা অম্বুনিধির পবিত্র অম্বুরাশি আমাদের সকলের শিরে ছিঁটাইয়া দিতে লাগিলেন। এইভাবে শ্রীশ্রীমা আমাদের সকলের বাসনা পূর্ণ করিলেন। যেহেতু আমরা পুরুষ ভক্ত সেইজন্য মায়ের সঙ্গে স্নান করিতে পারিতেছিলাম না বলিয়া আমাদের মনে আর কোন প্রকার দুঃখ রহিল না। জননী এইরূপে সাগরে স্নান করিয়া সকলকে নিয়া আশ্রমে ফিরিলেন।

সমুদ্র হইতে স্নান করিয়া আশ্রমে প্রত্যাবর্তনের পথে দেখিলাম মায়ের আশ্রমের অব্যবহিত পশ্চিমদিকে একখানা খড়ের বড় ঘর। উহার নাম রাখা হইয়াছে "সাগরপর্ণী" অর্থাৎ সাগর পাড়ের পর্ণ-কুটির। দেখিলাম সাগরপর্ণীর সম্মুখের ছোট্ট বারান্দাখানিতে আমার

বহুদিনের পুরাতন বন্ধু শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য তর্ক-বেদান্ততীর্থ শাস্ত্রী মহাশয় একা আপন ভাবে সমুদ্রের দিকে চাহিয়া বসিয়া আছেন। তিনি বড়ই সজ্জন ও সাধু প্রকৃতির ব্যক্তি এবং চিরকুমার। তিনি পরমহংস শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের পরমভক্ত এবং আমাদের শ্রীশ্রীমায়ের সঙ্গেও তাঁহার বহুকালের পরিচয়। তিনি মাকেও যথেষ্ট শ্রদ্ধা-ভক্তি করেন এবং পক্ষান্তরে মাও তাঁহাকে খুবই স্নেহ ও আদর করিয়া থাকেন। বর্তমান সময়ে দীনেশবাবু বেদান্তের একজন সুপণ্ডিত বলিয়া বিদগ্ধসমাজে বিশেষ খ্যাতিলাভ করিয়াছেন এবং বেদান্ত-শাস্ত্রের উপর তাঁহার কয়েকখানি মৌলিক গ্রন্থও পণ্ডিতসম্প্রদায়ের মধ্যে বিশেষ সমাদৃত। এই দীনেশবাবুই হইলেন আমাদের খুকুনী দিদির অর্থাৎ শ্রীগুরুপ্রিয়া দেবীর উপনয়নের আচার্যগুরু। অনেক দিনের পর অকস্মাৎ অপ্রত্যাশিত ভাবে তাঁহাকে দেখিয়া আমার খুবই আনন্দ হইল এবং তিনিও আমাকে পাইয়া অতিশয় হর্ষ প্রকাশ করিলেন।

মায়ের ছোট আশ্রমখানিতে স্থানাভাব। কারণ মায়ের সঙ্গে আমরা বহুলোক আসিয়াছি, সেইজন্য "সাগরপর্ণীর" বারান্দায় বসিয়া আমি আমার সন্ধ্যা ও নিত্য তর্পণাদি সমাপন করিলাম। বলা বাহুল্য যখনকার এই ঘটনা তখনও আমি সন্ন্যাসীর বেশ ধারণ করি নাই। তর্পণের সময় যখন তিল ও সাগরজল হাতে হইয়া আমি মন্ত্র পাঠ করিতেছিলাম তখন আমার কেবলই মনে হইতেছিল এই সমুদ্রের লবণাক্ত জলের দ্বারা পিতৃ-পুরুগগণ তৃপ্ত হইবেন কি করিয়া? আচমন করিবার সময় আমি যে সামান্য একটু সাগরের জল মুখে দিয়াছি তাহাতেই আমার কণ্ঠ পর্যন্ত লবণাক্ত হইয়া-গিয়াছে। অবশেষে মনে বিচার করিয়া এই মীমাংসায় উপনীত হইলাম, যাঁহাদের উদ্দেশ্যে তর্পণকরা তাঁহারা তো কেবল তিল-জলই গ্রহণ করেন না বরং ঐ সকল বস্তুর সঙ্গে যে শ্রদ্ধা, ভক্তি ও ভাব মিশ্রিত থাকে উহার দ্বারাই তাঁহারা তৃপ্তি লাভ করিয়া থাকেন। শ্রাদ্ধ ও তর্পণের মূলে হইল শ্রদ্ধা, ভক্তি ও ভাব।

কোন প্রকারে নিত্যকর্ম সমাপনান্তে আশ্রমে পা দিতেই শুনিলাম মা বলিতেছেন, "চল, জগদ্বন্ধু দর্শন করিতে সকলে মন্দিরে

চল।" শ্রীশ্রীমায়ের সঙ্গে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের দর্শনের প্রস্তাব কাঁনে যাইতেই সঙ্গীয় ছেলে, বুড়ো, স্ত্রী, পুরুষ সকলে আনন্দে আত্মহারা হইয়া উঠিলেন। নীলাচলে জগন্নাথ দর্শন তাহাও আবার মায়ের সমভিব্যাহারে ইহাতে তো আনন্দ হইবারই কথা! আমিও সকলের সঙ্গে মায়ের পশ্চাতে পশ্চাতে পরমানন্দে শ্রীজগন্নাথ দর্শনের উদ্দেশ্যে মন্দির অভিমুখেই গমন করিলাম।

পথে যাইতে যাইতে বহুদিন পূর্বের আমার পিসীমার মুখে শোনা একটি কথা আমার স্মৃতিপথে হঠাৎ ভাসিয়া উঠিল। তিনি বলিতেন, "শ্রীক্ষেত্রে জগদ্বন্ধু দর্শন করিতে যাইতে হয় খুব শুদ্ধ ও পবিত্র ভাব লইয়া। তাহা না হইলে যে যেভাব লইয়া জগন্নাথ দর্শনে গমন করে সে দেবতাকে তাহার আপন ভাবনানুযায়ী মূর্তিতেই দর্শন করিয়া থাকে। ঠাকুর তাহাকে তাহার মনের ভাব অনুসারেই দর্শন দিয়া থাকেন।" আমার পিসীমা বহুকাল পূর্বে জগন্নাথ দর্শনে পুরীধামে গিয়াছিলেন। তখনও পুরী পর্যন্ত রেলগাড়ি হয় নাই। তাঁহারা সকলে দল বাঁধিয়া কটক হইতে অতি কষ্টে হাঁটিয়া তবে পুরীতে জগন্নাথদেবের দর্শন করিয়াছিলেন। তখন আমার পিসীমা শুনিয়াছিলেন একবার কাহার যেন জগন্নাথ দর্শন করিতে গিয়া অকস্মাৎ মনে পড়িল, তাহার বাড়ীর আঙ্গিনার একপার্শ্বে বাঁশের মাচার উপর কুমড়াগাছে গোটা কয়েক বড় বড় কুমড়া ঝুলিতেছে। মনে এই চিন্তা করিতে করিতেই সে লোকটি জগন্নাথদেবের মন্দিরে প্রবেশ করিয়াছিল। তার ফলে সেই ব্যক্তি মণিকোঠায় রত্নবেদীর উপর শ্রীভগবানের দারুব্রহ্মমূর্তি দর্শন না করিয়া সে অভাগা দেখিল বাঁশের মাচার উপর বড় একটা কুমড়াগাছে বড় বড় সব কুমড়া ঝুলিতেছে। তাই তো বলা হয়, "যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী"—অর্থাৎ যাহার যেমন ভাব তাহার তেমন লাভ। এই ঘটনাটি যে সত্য তাহা আমি শপথ করিয়া বলিতেছি না, তবে এই কাহিনীটি যে অন্ততঃ সেই সময় আমার অবচেতন মনের উপর কোন প্রভাব বিস্তার করে নাই তাহা অস্বীকার করিতে পারিব না।

আমার মন তো আর তেমন বিশুদ্ধ বা নির্মল নয় সেইজন্য

আমার পঙ্কিল বা অশুদ্ধ মনের উপর মানসিক দুর্বলতা আসিয়া আক্রমণ করিল। সিঁড়ি বাহিয়া মন্দিরে উঠিবার সময় আমার বুকটা যেন কেমন কাঁপিয়া উঠিল। মনের দৌর্বল্য সুযোগ পাইয়া আরও যেন চাপিয়া ধরিল। তাই নিরুপায় হইয়া অমনি শ্রীশ্রীমাকে জানাইয়া রাখিলাম (অবশ্য মনে মনেই, প্রকাশ্যে নহে) মা, তুমি দয়া করিয়া আশীর্বাদ কর যেন শ্রীভগবানের দর্শন পাই—মন্দিরের মণিকোঠায় গিয়া যেন যা-তা না দেখি। সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুরকেও অতিশয় কাতর ও বিনীত ভাবে জানাইতে ভুলিলাম না। তাঁহার শ্রীচরণেও প্রার্থনা করিলাম, "হে প্রভো! তোমার প্রকৃত রূপটিই যেন আজ দর্শন পাই। এই কৃপাটুকু ঠাকুর তুমি দয়া করিয়া আমার প্রতি করিও।" যতই মন্দিরের নিকট আমি অগ্রসর হইতেছিলাম ততই ভয়ে ভয়ে মায়ের শ্রীপাদপদ্মে আমার প্রাণের আকুতি ঘন ঘন নিবেদন করিতে লাগিলাম। এইরূপ মানসিক পরিস্থিতির মধ্যে কখন, কি করিয়া এবং কোন দিক দিয়া মায়ের পশ্চাতে পশ্চাতে মন্দিরে গিয়া প্রবেশ করিলাম তাহা আমি বুঝিতে পারিলাম না। আমি যেন যন্ত্র-চালিতের মত হইয়া গিয়াছিলাম।

মন্দিরের ভিতর গিয়া দেখি সম্মুখে শ্বেতপাথরের একটি অতি সুন্দর বেদী। উহার দুইপার্শ্বে দুইটি দুইটি অতিশয় মনোরম কারুকার্য বিশিষ্ট চারিটি স্তম্ভ। বেদীটি উচ্চে অনুমান দুইহাত পরিমাণ হইবে। উহার পিছনের দিকটা নকসাকরা চাঁদির পাত লাগান। আমাদের পরমারাধ্যা স্নেহময়ী শ্রীশ্রীমা ঐ বেদীর সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলেন। মায়ের বামদিকে আমি এবং দক্ষিণে ও পশ্চাতে সঙ্গীয় অপর সব মাতৃ-সন্তানগণ দাঁড়াইয়া ছিলেন। ঘরের মধ্যে লোকজনের ভিড় ছিল না—মায়ের সঙ্গে আমরা যাহারা গিয়াছিলাম তাহারাই। বেলা সেই সময় দ্বিপ্রহর সেই কারণে অনুমান করিলাম মন্দিরে লোক-সমাগম কম ছিল। পরম করুণাময়ী শ্রীশ্রীমা আমার দিকে লক্ষ্য করিয়া তাঁহার দক্ষিণ হস্তখানি শ্রীশ্রীঠাকুরের দিকে প্রসারিত করিয়া অনুকম্পার সহিত বলিলেন, "জগদ্বন্ধু দর্শন কর।" তাঁহার শ্রীমুখের এই তিনটি সুমিষ্ট শব্দ আমার কানে এখনও যেন ঝঙ্কৃত হইতেছে।

আমি দেখিলাম শ্বেতপাথরের বেদীর উপর শ্রীশ্রীজগন্নাথ, শ্রীশ্রী-বলরাম এবং দেবী শ্রীশ্রীসুভদ্রা বিরাজিত রহিয়াছেন। তাঁহাদের পরিধানে শ্বেত, পীত, লোহিত ও সবুজবর্ণের মিশ্রিত রেশমী (সাটিনের) কুঞ্চিত ঘাগরা এবং শরীরে হরিদ্রা রংয়ের সিল্কের জামা। ঘাগরায় ও জামায় জরির পাড় লাগান। তিনজনেরই মাথায় অতি মূল্যবান রত্ন খচিত সোনার মুকুট। গলায় কয়েক লহর জড়োয়া কণ্ঠহার ও মোতির মালা এবং কর্ণে মকরাকৃতি হীরক নির্মিত কুণ্ডল। বহুমূল্য রত্নসম্ভারে বিগ্রহ তিনটি সুসজ্জিত। ঘরখানি মধ্যাহ্নের সূর্যের আলোতে আলোকিত হইলে যেমন উজ্জ্বল হয় তেমন শোভাময়। বেদীর নীচে ঠাকুরদের বামদিকে একখানা উঁচু কাষ্ঠাসনের (টুলের) উপর একজন ব্রাহ্মণ পাণ্ডা বসিয়াছিলেন। তাঁহার চেহারাটি অতিশয় সুন্দর। বয়স প্রায় পঞ্চাশ বৎসর এবং শরীরের বর্ণ গৌর। শ্মশ্রুবিহীন, খালি গা, গলায় তুলসীর মালা, কপালে চন্দনের তিলক, বাঁ কাঁধের উপর ঝোলান পরিষ্কার ধপধপে এক গোছা মোটা যজ্ঞোপবীত এবং মাথায় কাঁচাপাকা মিশ্রিত কেশের গোলাকার মস্ত একটি মোটা শিখা। অবশিষ্ট মস্তকটি একেবারে ক্ষুরদ্বারা মুণ্ডিত। বেদীর উপর বিগ্রহ তিনটি আমাদের এত নিকটে ছিলেন যে ইচ্ছা করিলে আমরা হাত বাড়াইয়া ধরিতে বা ছুঁইতে পারিতাম। আমাদের মধ্যে কেহই দেবতাদের স্পর্শ করিতেছেন না দেখিয়া আমিও হস্ত প্রসারিত করিয়া তাঁহাদের স্পর্শ করিলাম না। মার্বেল পাথরের বেদীর উপর মস্তক রাখিয়া দেবতাদের প্রণাম করিয়া মনে মনে নিবেদন করিলাম, "ঠাকুর! তুমি আজ এই দীনহীনের প্রতি কৃপা করিয়া দর্শন দিলে সেইজন্য তোমাকে আমার অন্তরের অসংখ্য প্রণতি জানাইতেছি।" উপস্থিত আমরা সকলেই শ্রীশ্রীমাকেও ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলাম। তাঁহার আশীর্বাদ ও অসীম করুণায় যে আজ এইভাবে শ্রীশ্রীভগবানের দারু ব্রহ্মমূর্তির দর্শন প্রাপ্ত হইলাম সেইজন্য তাঁহার নিকট আমি চিরকৃতজ্ঞ। করুণাময়ী মা দয়া না করিলে আমার ভাগ্যে শ্রীজগদ্বন্ধুর দর্শন জীবনে কখনও সম্ভব হইত কিনা সন্দেহ।

শ্রীশ্রীজগন্নাথ, শ্রীশ্রীবলরাম ও শ্রীশ্রীসুভদ্রা দেবীর অতি অপূর্ব সুন্দর মূর্তি, পোষাক-পরিচ্ছদ, সাজসজ্জা ও রত্নমণ্ডিত মুকুট এবং অলঙ্কারাদি দেখিয়া আমি মুগ্ধ হইয়া গেলাম। জীবনে ইহার পূর্বে কখনও এমনটি আর কোন স্থানে দেখি নাই। নিজের মনে মনে বলিলাম, জগন্নাথ প্রকৃতই জগতের নাথ। তাহা না হইলে এত রত্ন অলঙ্কার কখনও কোন দেবতার শরীরে দেখিয়াছি বলিয়া তো কই মনে পড়ে না? তবে লোকের মুখে শুনিয়াছি উদয়পুরের নাথদ্বারে শ্রীনাথজীরও নাকি ঐশ্বর্যের প্রাচুর্য অত্যধিক। তবে তাঁহার দর্শন করিবার সৌভাগ্য হয় নাই। জগন্নাথও যে ঐশ্বর্যের ঠাকুর তাহাতে আর কোন প্রকার সন্দেহ নাই। বারাণসীর স্বর্ণ নির্মিত শ্রীশ্রীঅন্নপূর্ণামাতাও অতিশয় ঐশ্বর্যশালিনী কিন্তু তাঁহার দর্শন বৎসরে মাত্র তিন দিনই অন্নকূটের সময় হইয়া থাকে।

মন্দিরের সকল দর্শনীয় স্থান একের পর এক মা ঘুরিয়া ঘুরিয়া সব আমাদের দেখাইলেন, যথা বিমলাদেবীর মন্দির, যেখানে একাদশী তিথিকে বাঁধিয়া রাখা হইয়াছে সেই স্থান, অমৃত কুণ্ড, পাকশালা, ভাঁড়ার ঘর, কুটনো কোটার স্থান ইত্যাদি ইত্যাদি। শ্রীশ্রীমায়ের সঙ্গে শ্রীশ্রীজগদ্বন্ধু দর্শন করিয়া আমরা সকলে আশ্রমে ফিরিয়া আসিলাম। মন্দিরে থাকিতেই আমরা শুনিলাম আজ ঠাকুরদের ভোগ হইতে বিলম্ব হইবে কারণ মন্দির সংক্রান্ত কোন বিষয় লইয়া পাণ্ডাদের সভা বা মিটিং বসিয়াছে। ইহার নিষ্পত্তি বা মীমাংসা না হওয়া পর্যন্ত মন্দিরের মণিকোঠায় ভোগ যাইতে পারিবে না। মন্দির হইতে 'মহাপ্রসাদ' আসিলে শ্রীশ্রীমায়ের ভোগের পর আমরা সকলে পরমানন্দে সেই প্রসাদ পাইয়া ধন্য হইলাম। পরের দিনই দুপুরবেলা পূর্বদিনের পর্যুষিত বা পান্তা মহাপ্রসাদ গ্রহণ করিয়া আমরা সকলে মায়ের সাথে নীলাচল হইতে কলিকাতা যাত্রা করিলাম। এইবার একবার ছাড়া আর দ্বিতীয়বার আমার ভাগ্যে শ্রীশ্রীজগন্নাথ দর্শন হইল না।

এই ঘটনার প্রায় বছর পাঁচেক পর একদিন আমার সন্ন্যাস আশ্রমের শ্রীশ্রীগুরুদেবের সঙ্গে কাশীতে তাঁহার কামরূপ মঠে বসিয়া কথায় কথায় পুরীর শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের অতি অনুপম সুন্দর মূর্তি ও

তাঁহার মণিরত্নাদির এবং ঐশ্বর্যের কথা বলাতে তিনি আমার মুখের দিকে অবাক্ হইয়া চাহিয়া বলিলেন, "আপনি কোথাকার জগন্নাথের কথা বলিতেছেন ? আমি তো সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্বে বহুদিন ক্রমান্বয়ে পুরী ও ভুবনেশ্বরে বাস করিয়াছি। আমি পুরীতে মন্দিরের সম্মুখেই বাস করিতাম এবং প্রত্যহই মন্দিরে গিয়া জগন্নাথ দর্শন করিতাম। কৈ আমি তো শ্রীজগন্নাথের অত গহনাগাটি, পোষাক-পরিচ্ছদ ও ঐশ্বর্যাদি কখনও দেখি নাই? তা ছাড়া ঠাকুরের মণিকোঠা তো অতি অন্ধকার। রত্নবেদী শ্বেতপাথরের নির্মিত নহে কালপাথরের এবং উহা এত উচ্চ যে দেবতাদের নীচ হইতে হাতে নাগাল বা স্পর্শ পাওয়া সাধারণ মানুষের পক্ষে অতীব কঠিন। ঠাকুরদের পরিধানের বস্ত্রাদিও তো অতিশয় সাধারণ।

মদীয় শ্রীগুরুদেব পরমপূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী ভোলানন্দতীর্থ মহারাজ তাঁহার সন্ন্যাসী শিষ্যদের এবং অপর সকলকেও "আপনি" বলিয়াই সম্বোধন করিতেন। স্বনামধন্য মহাত্মা যোগিরাজ শ্রীশ্রীরামঠাকুর মহাশয়কেও দেখিয়াছি তিনি সকলকে "আপনি" বলিতেন। আমি এই বিষয় লইয়া তাঁহার সঙ্গে অনেক কথাবার্তা ও আলোচনা করিলাম কিন্তু আমি পুরীধামে শ্রীশ্রীজগন্নাথকে যেমন দেখিয়াছি তাহা কোন রকমেই তাঁহাকে বিশ্বাস করাইতে পারিলাম না। তিনিও মন্দির এবং জগন্নাথদেবের যে রকম বর্ণনা দিলেন আমি কিন্তু সেখানে তেমনটি দেখি নাই। সুতরাং গুরু শিষ্য আমরা দুইজন এই বিষয়ে একমত হইতে পারিলাম না। তিনি দীর্ঘকাল পুরী অবস্থান করিয়া জগন্নাথকে যেমন দেখিয়াছিলেন তেমনি বলিয়াছেন। তাঁহার দেখা ও বলার মধ্যে কোনই গরমিল ছিল না। তিনি যেমন দেখিয়াছিলেন এবং আমি যেমন দেখিয়াছি আমাদের দুইজনের দেখার মধ্যে এত প্রভেদ যে কি করিয়া হইতে পারে তাহাই বসিয়া কেবল ভাবিতে লাগিলাম। কিন্তু ইহার কোন সমাধান বা মীমাংসা আমি অন্বেষণ করিয়া পাইলাম না। অকস্মাৎ আমার মনে জাগিল সেইদিন মায়ের সঙ্গে শ্রীক্ষেত্রে আমি যেমন জগন্নাথ দর্শন করিয়াছিলাম তেমন কি আমাদের সঙ্গী সকলে দর্শন করিয়াছিলেন? না কেবল আমিই

দর্শন করিয়াছিলাম? তাহা হইলে অন্যান্য সকলে যাঁহারা সেইদিন আমাদের সংগে ছিলেন তাঁহারা কি আমার মত দেখেন নাই? তাঁহারা কি তবে অন্য রকম দেখিয়াছিলেন? আমিও কি তাঁহাদের মত দেখি নাই। এই রকম নানা প্রশ্ন তখন আমার মনে উদয় হইতে লাগিল। মন্দিরে ঠাকুর দর্শনের সময় আমার মনে এজাতীয় জিজ্ঞাসা উঠিবার কোন হেতুই ছিল না। আমার ধারণা ছিল আমি যেমন দেবতাদি দর্শন করিতেছি অপর সকলেও তেমনই দর্শন করিতেছেন। ইহাই শ্রীজগন্নাথদেবের প্রকৃত বা যথার্থ রূপ। এই প্রকার বিশ্বাস হওয়াই তো আমার পক্ষে স্বাভাবিক ছিল। সেই সময় যদি আমার মনে ঘুণাক্ষরেও কোন সংশয় উঠিত তাহা হইলে তখনই সঙ্গের লোকজনদের জিজ্ঞাসা করিয়া ইহার একটা সমাধান বা নিষ্পত্তি করিয়া লইতাম। ইহার মধ্যে যে কি রহস্য লুক্কায়িত আছে তাহা কেবল শ্রীশ্রীমা-ই জানেন আর জানেন ঠাকুর শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব। ইহা মায়েরই অপার করুণা না ঠাকুরেরই অচিন্ত্য মাহাত্ম্য—ইহার নির্ণয় কে করিবে? মাও জগন্নাথ যে অভিন্ন বা এক ইহাই তখন বারবার মনে হইতে লাগিল।

নীলাচলে অতি অল্প সময়ের জন্য অবস্থিতি হইলেও বেশ লক্ষ্য করিয়াছিলাম আত্মজ্ঞান সমাহিতা শ্রীশ্রীমা সেখানে গমন করিয়াই যেন কেমন ভাববিহ্বল হইয়া গেলেন। জলধির উত্তাল তরঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে মায়েরও চোখ, মুখ ও প্রত্যেকটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আনন্দে অধিকতর নৃত্য করিতেছিল। আমাদের এই সাধারণ ও প্রকৃত চোখেও তাহা ধরা পড়িল। মায়ের আনন্দ যেন হৃদয়ে আর ধরে না।

আসিয়াই এ জাতীয় ভাবোন্মাদনা লক্ষিত হইয়াছিল। মায়ের এই ভাবান্তর যে কেবল আমিই লক্ষ্য করিয়াছি তাহাই নহে, নলিনী-দাদাও (অধ্যাপক ডাক্তার নলিনীকান্ত ব্রহ্ম।) তাঁহার "মাতৃ সঙ্গে পুরীধামে" নামক প্রবন্ধে এই রকমই অনেকটা উল্লেখ করিয়াছেন। "পূর্বে তারাপীঠে এবং কক্সবাজারে মাকে পাইলে যেমন আনন্দ হইত এখন পুরীতে মাকে পাইলে যেন সেই রকম অথবা ততোধিক আনন্দ হয়। মার সহিত শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের যে বিশেষ সম্বন্ধ আছে তাহা যেন পরিস্ফুট হইয়া উঠে। সেই সম্বন্ধ যে কি তাহা বুঝিতে না পারিলেও একটা সম্বন্ধ যে আছে তাহাতে সন্দেহ থাকে না।" এইবার শ্রীশ্রীমায়ের সঙ্গে নীলাচলে শ্রীশ্রীজগদ্বন্ধু দর্শন আমার এই অকিঞ্চিৎকর জীবনের একটি বিশেষ ঘটনা। এই অভূতপূর্ব সঙ্ঘটনটি আমার হৃদয়ফলকে এমন একটি রেখাপাত করিয়া দিয়াছে যাহা কালের ব্যবধান দ্বারা কখনও ম্লান হইবার নহে! জয় জগন্নাথ, জয় মা।

কাশী আশ্রমে তিন বৎসরব্যাপী শ্রীশ্রীসাবিত্রী মহাযজ্ঞ

আমি আশ্রমবাসী হইবার মাসখানেক পর শুনিতে পাইলাম আগামী ১৩৫৩ সনের উত্তরায়ণ বা পৌষ সংক্রান্তি (১৪ই জানুয়ারী ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দ) হইতে শ্রীশ্রীমায়ের কাশীর গঙ্গাতটের আশ্রমে শ্রীশ্রীসাবিত্রী মহাযজ্ঞ আরম্ভ হইবে। এই বিরাট অনুষ্ঠানের যজমান মা তাঁহার এই সন্তানকেই যে মনোনীত করিবেন এই সংবাদ আমার কানে আসিল। এই সংবাদ শুনিয়া আমি আকাশ হইতে পড়িলাম। কারণ আমি জীবনে এমন কোন শুভকর্ম করি নাই যাহার ফলস্বরূপ এত বড় এক অনুষ্ঠানের যজমানপদে ব্রতী হইতে পারি। এই প্রস্তাব শুনিয়া আমি বহু আপত্তি করিয়াছিলাম কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমার একটিও অসম্মতি টিকিল না। শ্রীশ্রীমায়ের ইচ্ছাই পূর্ণ হইল। মায়ের খেয়াল অমোঘ। তিনি যাহা বলেন বা ইচ্ছা করেন তাহা পূর্ণ না হইয়া যায় না। এই অকিঞ্চনের নামেই এক কোটি গায়ত্রী মন্ত্রপূত আহুতি সমন্বিত সাবিত্রী মহাযজ্ঞের সঙ্কল্প করা হইয়াছিল। ইহা যে দীর্ঘকালব্যাপী এক মহানুষ্ঠান ইহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে কারণ গায়ত্রী মন্ত্রদ্বারা এক একটি আহুতি প্রদান করা সহজ কথা নহে।

আশ্রম প্রাঙ্গণের ঠিক মধ্যস্থলে চারিদিকে চারিটি তোরণযুক্ত ষোল হাত লম্বা এবং ষোল হাত চওড়া এবং এক হাত উচ্চ একটি ইষ্টক নির্মিত পাকা যজ্ঞমণ্ডপ তৈয়ার হইল। উহার মাঝখানে অন্তর মেখলাযুক্ত এক কোটি আহুতির উপযুক্ত এক বিরাট যজ্ঞ-কুণ্ড। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থাপত্যবিদ্যায় পারদর্শী (Engineer) এবং শ্রীশ্রীমায়ের অতি পুরাতন ভক্ত শ্রীমনোমোহন ঘোষ মহাশয়ের বিশেষ তত্ত্বাবধানে এই যজ্ঞমণ্ডপ ও যজ্ঞকুণ্ড বিধিমত প্রস্তুত হইয়াছিল। মণ্ডপের অগ্নিকোণের বেদিতে শ্রীগণেশ ও ষোড়শ

মাতৃকা, নৈঋ্‌তকোণের বেদিতে বাস্তুদেবতা, বায়ুকোণের বেদিতে চতুঃষষ্ঠী যোগিনী ও ক্ষেত্রপাল, ঈশানকোণের বেদিতে রুদ্র ও নবগ্রহ, ঈশান ও পূর্বদিকের মধ্যে মূল বেদিতে ঘটের উপর স্বুবর্ণ নির্মিত শ্রীশ্রীগায়ত্রীদেবী স্থাপিত হইয়াছিলেন। মূল দেবতার রাজোপচারে মহতী পূজা এবং অন্যান্য দেবতাদিগের ষোড়শোপচারে পূজান্তে চারি তোরণে চারি বেদের মন্ত্রপাঠের পবিত্র ধ্বনির মধ্যে মহাশক্তি-রূপিণী শ্রীশ্রীমায়ের করকমলের দ্বারা স্পৃষ্ট পঁচিশ বৎসর যাবৎ আরাধিত ও সেবিত অগ্নিদেবকে যজ্ঞের জন্য নির্মিত বিরাট কুণ্ড মধ্যে বাদ্যভাণ্ডের সহিত মহানন্দে স্থাপন করা হইল। এই অগ্নি মায়ের ঢাকা আশ্রমে এতদিন সুরক্ষিত ছিলেন এবং সেখানে ব্রহ্ম-চারীদের দ্বারা ইহাতে নিত্য আহুতি প্রদান করা হইত। সেই অগ্নিই সেখান হইতে সাদরে আহ্বান করিয়া এই যজ্ঞের জন্য কাশীতে আনা হইয়াছিল। যজ্ঞমণ্ডপটি নানা বর্ণের রেশমী ধ্বজা ও পতাকার দ্বারা অতিশয় সুসজ্জিত হওয়ায় উহা একটি দর্শনীয় বস্তু হইয়াছিল। এই বিরাট যজ্ঞের আচার্য বা পুরোহিত ছিলেন বেদজ্ঞপণ্ডিত ও প্রসিদ্ধ কর্মকাণ্ডী শ্রীঅগ্নিহোত্রী শাস্ত্রী। ইনি কাশীতে সাধারণতঃ 'বাটুদা' নামেই পরিচিত ছিলেন। ব্রহ্মার কার্যে নিযুক্ত বা ব্রতী হইয়াছিলেন শ্রীশ্রীমায়ের অতিপুরাতন ও সর্বপ্রথম ব্রহ্মচারী শ্রীকমলাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়। শ্রীশ্রীমায়ের ঢাকা আগ-মনের সময় হইতে তিনি স্বেচ্ছায় মাতৃ-সেবায় নিজেকে সমর্পণকরতঃ তাঁহার নিকটে থাকিয়া সাধন ভজনে নিরত আছেন। এই যজ্ঞের সদস্যরূপে ব্রতী ছিলেন চিরকুমার শ্রীসদানন্দ চক্রবর্তী। প্রত্যহ প্রাতে মণ্ডপস্থ সকল দেব-দেবীর পূজান্তে গায়ত্রীদ্বারা মন্ত্রপূত করিয়া প্রজ্বলিত হুতাশনে আহুতি প্রদান করা হইত। আহুতির দ্রব্য ছিল তিল, যব, চাউল, ঘৃত, চিনি ও পঞ্চ মেওয়া অর্থাৎ বাদাম, পেস্তা, কিশমিশ, কাজু ও আখরোট মাখানা। হোতাগণ সকলেই ছিলেন আশ্রমবাসী ব্রাহ্মণ কুমার। আমার উপর করুণাময়ী শ্রীশ্রীমায়ের বিশেষ নির্দেশ অনুসারে প্রত্যেক আহুতি দিবার সময় মনে রাখিতে হইত—এই প্রজ্জ্বলিত অগ্নিতে নিজেকে আহুতি দিতেছি। মায়ের এই আদেশ আমি যথাসাধ্য পালন করিতে চেষ্টা করিতাম।

সকালে যতক্ষণ পর্যন্ত যজ্ঞকুণ্ডে আহুতি প্রদান করা হইত ততক্ষণ আশ্রমবাসী একজন ব্রাহ্মণ বসিয়া গায়ত্রী জপ করিতেন। ইহার উদ্দেশ্য ছিল যদি কাহারও আহুতি দিবার সময় অসাবধানতাবশতঃ কোন প্রকারে গায়ত্রীপাঠে ভুল হইয়া যায় তাহা ইহাদ্বারা পূর্ণ হইবে। ইহা মায়ের নির্দেশমতই করা হইত। সন্ধ্যার সময় দৈনিক গায়ত্রী দেবীর যথানিয়মে আরাত্রিক (আরতি) করা হইত এবং প্রতিদিন যত সংখ্যক আহুতি দেওয়া হইত তত সংখ্যা গায়ত্রী জপ হোতাগণ পুনরায় করিতেন। প্রত্যেক অমাবস্যা ও পূর্ণিমায় শ্রীগায়ত্রী দেবীর বিশেষ পূজা ও চরুদ্বারা আহুতি দেওয়া হইত। সংক্রান্তির দিন মায়ের ব্যবস্থামত শ্রীশ্রীগায়ত্রী দেবীর খিচুড়ি, পাঁচ রকম ভাজা, চাট্নি ও পরমান্নদ্বারা বিশেষ ভোগ ও আরতি হইত। মা কাশীতে উপস্থিত থাকিলে এই বিশেষ ভোগ নিবেদনের সময় স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া সব ব্যবস্থা করিতেন। তাঁহাকে কয়েকবার বলিতে শুনিয়াছি, "এখানে দেবতা জাগ্রত রহিয়াছেন। তোমাদের কত ভাগ্য যে তাঁহার সেবা করিবার অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছ। কয়জনের জীবনে ইহা ঘটিয়া থাকে ?" কোন কোন দিন প্রাতঃ-কালেই আহুতি প্রদানের সময় তিনি যজ্ঞশালায় শুভাগমন করিয়া হোতাদের আনন্দ ও উৎসাহ বর্ধন করিতেন। ত্রুটি-বিচ্যুতি যাহা তিনি যজ্ঞমণ্ডপে লক্ষ্য করিতেন তাহা তিনি সকল ব্রতীদের বলিয়া দিতেন এবং তাহাদের দ্বারা ঐ সকল ভুল-ভ্রান্তি সংশোধন করাইয়া লইতেন। যজ্ঞটি যাহাতে নিখুঁতভাবে সম্পন্ন হয় সেদিকে তাঁহার লক্ষ্য পূর্ণমাত্রায় ছিল। ব্রতীদের সুখ সুবিধার দিকেও স্নেহময়ী শ্রীশ্রীমায়ের দৃষ্টি সর্বদা লক্ষিত হইত।

মহাপবিত্র বারাণসীক্ষেত্রে উত্তরবাহিনী পতিতপাবনী মা গঙ্গার তটে মহাশক্তিরূপিণী শ্রীশ্রীমায়ের পূত উপস্থিতিতে সমস্বরে বৈদিক গায়ত্রীমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া আহুতি প্রদান করিতে যে কি আনন্দ অনুভব করিতাম তাহা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। প্রজ্জ্বলিত হোমাগ্নিতে যে সময় হবন সামগ্রী (তিল, যব, চাউল, গব্য ঘৃত, চিনি ও পঞ্চ মেওয়া) দ্বারা আহুতি দেওয়া হইত সেই সময় পবিত্র যজ্ঞধূমের গন্ধে যজ্ঞশালাটিতে এক অপূর্ব ভাবোদ্দীপক

পরিবেশের সৃষ্টি হইত। সারাদিনরাত্রি অষ্ট প্রহর হোমের অতি মনোমুগ্ধকর দিব্য সুবাসে সম্পূর্ণ আশ্রমখানি ভরপূর হইয়া থাকিত। কেবল সমগ্র আশ্রমটিই নহে বরং সারা পল্লীটি হোমের সুগন্ধে আমোদিত হইত। এই বিরাট যজ্ঞ দুই মাস, ছয় মাস নহে—সম্পূর্ণ তিনটি বৎসরব্যাপী চলিয়াছিল। এক কোটি আহুতি, দশ লক্ষ তর্পণ, এক লক্ষ মার্জন বা অভিষেক এবং দশ সহস্র ব্রাহ্মণ-ভোজন সমাপনান্তে তৃতীয় বৎসরের শেষে ১৩৫৬ সালের শুভপুণ্য উত্তরায়ণ সংক্রান্তির দিন (১৪ই জানুয়ারী, ১৯৫০ খৃষ্টাব্দ) বিশ্বজননী পরম কল্যাণময়ী শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ীর করকমল স্পর্শ করাইয়া মহাসমারোহে বিপুল বাদ্যভাণ্ডযোগে যজ্ঞের পূর্ণাহুতি মঙ্গলমত সুসম্পন্ন হইয়াছিল। পূর্ণাহুতি প্রদানের অব্যবহিতপূর্বে মায়ের নির্দেশমত অতি মূল্যবান একখানি বেনারসী শাড়ি শ্রীশ্রীগায়ত্রী মাতার উদ্দেশ্যে যজ্ঞকুণ্ডের প্রজ্জ্বলিত লেলিহান অগ্নিশিখাকে বেষ্টন করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। ইহা দেখিয়া যজ্ঞের আচার্য শ্রীঅগ্নিস্বাত্তা শাস্ত্রী অতিশয় বিস্মিত হইয়াছিলেন। তিনি ধারণা করিতে পারেন নাই যে এত দামী বেনারসী শাড়ি কেহ এইভাবে পলকের মধ্যে হোমাগ্নিতে দেবতার উদ্দেশ্যে ভস্মীভূত করিয়া দিতে পারে। শ্রীশ্রীমায়ের সকল কার্যই অদ্ভুত ও নৈসর্গিক। যাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া এই মহাযজ্ঞ তাঁহাকে মা প্রত্যক্ষ দেখিতেছেন—এই হোমাগ্নির কালী, করালী, মনোজবা, সুলোহিতা, সুধূম্রবর্ণা, স্ফুলিঙ্গিনী ও দেবী বিশ্বরুচী নামের সপ্ত জিহ্বারূপে। মায়ের দৃষ্টিতে বেনারসী শাড়ি পোড়াইয়া ফেলা হয় নাই শ্রীশ্রীদেবীকে পরান হইয়াছে।

কালী করালী চ মনোজবা চ সুলোহিতা যা চ সুধূম্রবর্ণা।
স্ফুলিঙ্গিনী বিশ্বরুচী চ দেবী লেলায়মানা ইতি সপ্তজিহ্বাঃ॥

এই যজ্ঞ প্রথমে কেবল তিন জনের (ব্রহ্মা, সদস্য ও যজমান) দ্বারা আরম্ভ করা হইয়াছিল এবং প্রত্যহ তিন হাজার মাত্র আহুতি দান করা হইত। ক্রমশঃ হোতার সংখ্যা বাড়িতে বাড়িতে যজ্ঞের শেষের দিকে ষোলজনে পরিণত হইয়াছিল এবং আহুতির

পরিমাণও ষোল সহস্র দাঁড়াইয়াছিল। যেমন যেমন যজ্ঞের জন্য অর্থ আসিতে লাগিল তেমন তেমন হোতা ও আহুতির সংখ্যাও বৃদ্ধি পাইতে ছিল। প্রত্যেকটি হোম সামগ্রী ভাল করিয়া ঝাড়িয়া বাছিয়া গঙ্গা জলে ধৌত ও রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া তবে শাকল্য বা হবনীয় দ্রব্য প্রস্তুত হইত। আহমেদাবাদ হইতে নিজেদের গোশালায় প্রস্তুত বিশুদ্ধ গব্য ঘৃত দ্বারা এই যজ্ঞের আহুতি প্রদানের ব্যবস্থা ছিল। যখন মাল চলাচল রেলপথে নিষিদ্ধ ছিল তখন এই বিশুদ্ধ ঘৃত অধিক ব্যয়ে আহমেদাবাদ হইতে কাশী বিমানযোগে আনা হইত তথাপি বাজারের ঘৃত ব্যবহার করা হইত না। এইরূপ নিষ্ঠা ও বিশুদ্ধতার সহিত যজ্ঞ বর্তমান যুগে কুত্রাপি দৃষ্টিগোচর হওয়া তো দূরের কথা শোনা পর্যন্ত যায় না।

এই যজ্ঞের পূর্ণাহুতি উপলক্ষে বহু দূর হইতে সাধু, সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত ও মাতৃ সন্তানগণ আসিয়া এই মহানুষ্ঠানটিকে সর্বতোভাবে সাফল্যমণ্ডিত করিয়াছিলেন। এই পূর্ণাহুতি-মহোৎসবটি একমাস কাল ব্যাপী চলিয়া ছিল। যাঁহারা ইহা দেখিয়াছিলেন তাঁহারা একবাক্যে ইহার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছিলেন এবং কেহ কেহ এমনও মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন যে এমন যজ্ঞ বর্তমান যুগে হয় নাই। ভবিষ্যতেও শীঘ্র হইবে কিনা তাহা বলা যায় না। নানা স্থান হইতে ব্রাহ্মণ ভোজনের জন্য প্রয়োজন অপেক্ষা এক অধিক টাকা আসিয়াছিল যে দশ হাজারের স্থানে তের হাজার ব্রাহ্মণকে পরিতুষ্ট করিয়া ভোজন করাইয়া দক্ষিণা দেওয়া হইয়াছিল। বাঙ্গালী, হিন্দুস্থানী, মাদ্রাজী, মহারাষ্ট্রীয়, গুজরাটী, নেপালী প্রভৃতি নানা প্রদেশের ব্রাহ্মণগণ এই উপলক্ষে কৃপা পূর্বক উপস্থিত হইয়া ভোজন করিয়া আমাদিগকে কৃতার্থ করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের রুচি অনুসারে ভোজ্য দ্রব্য তাঁহারা নিজেরা প্রস্তুত করিয়া লইতেন। কাশীর সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ও অধ্যাপকমণ্ডলী এই উৎসব উপলক্ষে নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া শুভাগমনকরতঃ আমাদের ধন্য ও উৎসাহিত করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগকে সসম্মানে মালা, চন্দন ও পিতলের গামলায় ফল, মিষ্টি ও দক্ষিণার দ্বারা পূজা করা হইয়াছিল।

এই উপলক্ষে সংস্কৃতভাষায় লিখিত প্রবন্ধের জন্য ছাত্রগণকে যথামানে দুইশত, একশত ও পঞ্চাশ টাকা নগদ পারিতোষিক প্রদান করা হয়।

বিশ্বজননী পরমস্নেহময়ী শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ীর অসীম কৃপায় শ্রীশ্রীসাবিত্রী মহাযজ্ঞ মঙ্গলমত সুসম্পন্ন হইয়া যাওয়ায় সকলেরই অতিশয় আনন্দ হইয়াছিল। কিন্তু হোতাগণের মধ্যে কাহারও কাহারও আনন্দের সঙ্গে মুখে বিষাদের ছায়াও দেখা গিয়াছিল কারণ যজ্ঞ সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যহ যজ্ঞ করিবার যে এক অপরিসীম আনন্দ তাঁহারা অনুভব করিতেন তাহা হইতে তাঁহারা চিরদিনের জন্য বঞ্চিত হইয়া গেলেন। কদাচিৎ কাহারও ভাগ্যে এ জাতীয় শুভকর্মে যোগদান করিবার সুযোগ সংঘটিত হয়। আমাদের অদৃষ্টে যে ইহার যোগাযোগ হইয়াছিল তাহা কেবল আমাদের পরমারাধ্যা শ্রীশ্রীমায়ের অহৈতুকী কৃপা ব্যতীত আর কি বলিব? শ্রীশ্রীসাবিত্রী মহাযজ্ঞের সংক্ষিপ্ত বিবরণ এইস্থানে সন্নিবেশিত করিবার একটু হেতু আছে—বিনা কারণে ইহা করা হয় নাই। এই পবিত্র অনুষ্ঠানের মধ্যে এক বিশেষ শুভদিনের শুভ মাহেন্দ্রক্ষণে পরমস্নেহময়ী শ্রীশ্রীমা তাঁহার এই অধম ও অযোগ্য সন্তানটাকে যে ভাবে অহৈতুকী করুণা করিয়া তাহার জীবন ধন্য করিয়াছিলেন তাহাই এইস্থানে লিপিবদ্ধ করিতে প্রয়াস করিতেছি। কারণ এই ঘটনাটি আমার এই অকিঞ্চিৎকর জীবনে একটি বিশেষ স্থান অধিকার করিয়াছে।

এই বিরাট সাবিত্রী মহাযজ্ঞের দ্বিতীয় বৎসর শেষ হয় যে উত্তরায়ণ বা পৌষ সংক্রান্তির দিন (১৪ই জানুয়ারী, ১৯৪৯ খৃঃ) সেইদিন প্রাতঃকালে কুমারী শ্রীস্বর্ণকুমারী যশপাল (বিল্লোজী) দ্বারা শ্রীশ্রীমা দয়া করিয়া সংবাদ পাঠাইলেন, আমি যেন যজ্ঞে যাইবার পূর্বে তাঁহার শয়নকক্ষে গিয়া তাঁহার সঙ্গে দেখা করি। সকাল সাত ঘটিকার সময় আপন নিত্যকর্ম সন্ধ্যা, তর্পণ ও নারায়ণ পূজা শেষ করিয়া শ্রীশ্রীমায়ের প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিতেই তিনি সহাস্যে আমাকে বলিলেন, "একটু পূর্বে তোমার ঘরে এই শরীর (নিজেকে লক্ষ্য করিয়া) গিয়াছিল। তুমি নারায়ণ পূজা করিতেছিলে তাই

শরীরটা চলিয়া আসিয়াছে।” শ্রীশ্রীমায়ের মুখ হইতে এই কথা শ্রবণ করিবার সঙ্গে সঙ্গে আমি তাঁহাকে সবিনয়ে নিবেদন করিলাম, “মা! এইভাবেই ভগবান্ হয় তো করুণা করিয়া কখন কখন আমাদের মত অভাগাদের কৃপা কবিবার নিমিত্ত শুভাগমন করেন। আমরা নানা কাজকর্মে ব্যস্ত থাকি দেখিয়া তিনি ফিরিয়া চলিয়া যান।” পরম স্নেহময়ী মা আমাকে দরজায় খিলদিয়া তাঁহার সম্মুখে বসিতে বলিলেন। মায়ের আদেশানুসারে আমি ঘরের তুইটি দ্বারই বন্ধ করিয়া তাঁহার সম্মুখে উত্তরমুখী হইয়া চরণতলে উপবেশন করিলাম। তিনি তাঁহার চৌকির উপর শয্যায় দক্ষিণাস্য হইয়া বসিয়াছিলেন। আমি করুণাময়ী শ্রীশ্রীমায়ের পদপ্রান্তে উপবেশন করিলে তিনি তাঁহার বালিশের তলা হইতে একখানি গেরুয়া রংকরা চাদর বাহির করিয়া আমার হাতে প্রদান করিতে উদ্যত হইলে আমি অতিশয় আশ্চর্য হইয়া অতি বিনীতভাবে তাঁহার চরণে নিবেদন করিলাম, “মা! এ কি?” তিনি বলিলেন, “যজ্ঞ করিবার সময় এখানা মাথায় বাঁধিয়া যজ্ঞ করিও।” আমি উত্তম-রূপেই জানিতাম যে এই গৈরিক বস্ত্র ধারণ করিবার যোগ্যতা আমার নাই। উপযুক্ত না হইয়া গৈরিক ধারণ যে নিষিদ্ধ তাহাও আমি ভালভাবেই অবগত ছিলাম। আমাকে কখনও যে গেরুয়া বস্ত্র গ্রহণ করিতে হইবে তাহা আমি স্বপ্নেও কল্পনা করি নাই। সেইজন্য আমি মায়ের শ্রীচরণে বিনম্র নিবেদন জ্ঞাপন করিলাম, “মা! আমি গেরুয়া কাপড় পরিবার উপযুক্ত নহি। মা! তুমি আমাকে দয়া করিয়া ক্ষমা কর।” ইহার উত্তরে তিনি আমাকে পুনরায় বলিলেন, “তুমি উপযুক্ত কিনা, তাহা তোমার বিচার করিবার প্রয়োজন নাই। এই শরীর বলিতেছে, তুমি প্রত্যহ এই বস্ত্রখানা মাথায় বাঁধিয়া যজ্ঞ করিও।” এই অল্প কয়েকটি কথা বলিয়াই মা গেরুয়া রংকরা কাপড়খানা আমার হাতে তুলিয়া দিলেন। আমি আর কোন প্রকার উত্তর প্রত্যুত্তর না করিয়া স্নেহময়ী শ্রীশ্রীমায়ের বরদ করকমল হইতে অতিশয় আদরের সহিত গৈরিক বস্ত্রখানি গ্রহণকরতঃ উহা মস্তকে লইয়া তাঁহার শ্রীচরণে প্রণাম করিলাম। আমার প্রণতাবস্থায় করুণাময়ী মা আমার

ব্রহ্মতালু হইতে সমগ্র মেরুদণ্ডের (শিরদাঁড়ার) উপর তাঁহার শ্রীহস্তখানি তিনবার সঞ্চালন করিতে করিতে বলিলেন, "তুমি মা-গঙ্গাকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম কর।" মা তাঁহার তক্তপোশের উপর বিছানায় দক্ষিণদিকে মুখ করিয়া বসিয়াছিলেন। আমি জননীর শ্রীচরণতলে তাঁহার আদেশ মত পূর্বদিকে মুখ করিয়া অর্থাৎ মাকে আমার বামে রাখিয়া সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিলাম। প্রণামান্তে মস্তকে গৈরিক বস্ত্র বাঁধিয়া পুনরায় যখন শ্রীশ্রীমায়ের শ্রীপাদপদ্মে মস্তক রাখিয়া প্রণাম করিলাম তখন করুণাময়ী জননী আমার, এই অধম সন্তানের ব্রহ্মতালুতে তাঁহার বরদ হস্তখানি স্থাপন করিয়া দুইবার উচ্চারণ করিলেন, "মুক্ত, মুক্ত।" এই অভাবনীয় কার্যকলাপে আমি অত্যন্ত আশ্চর্য এবং বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়িলাম। আমি তো কখনও স্বপ্নেও কল্পনা করি নাই যে স্বয়ং ব্রহ্মময়ী বিশ্বজননী শ্রীশ্রীমা স্বতঃ প্রণোদিত হইয়া—আমার প্রার্থনার অপেক্ষা না রাখিয়া এইরূপে আমাকে অতি পবিত্র গৈরিক বস্ত্র প্রদান করিবেন এবং ব্রহ্মরন্ধ্রে তাঁহার কল্যাণপ্রদ করকমলখানি স্থাপন করিয়া "মুক্ত, মুক্ত" বলিয়া আশীর্বাদ করিবেন। শ্রীশ্রীমায়ের নিকট হইতে অপ্রত্যাশিতভাবে এবং এই প্রকার অচিন্তনীয় অনুষ্ঠানের সহিত কাষায় বস্ত্র প্রাপ্ত হইয়া পরম আনন্দের সহিত আমি মায়ের নিকট প্রার্থনা করিলাম, "মা! তুমি আশীর্বাদ কর তোমার প্রদত্ত এই গেরুয়া বসনের মর্যাদা যেন যথার্থভাবে রক্ষা করিতে পারি। মা! আমার একটা ধারণা ছিল, সেইটা আজিকার এই অভূতপূর্ব ব্যাপারে একেবারে বদলাইয়া গেল।" করুণাময়ী শ্রীশ্রীমা কৃপা করিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার কি ধারণা আজ বদলাইল?" আমি মাকে নিবেদন করিলাম, "মা! আমার ধারণা ছিল, তুমি আমার উপর নানা কারণে অসন্তুষ্ট আছ। কিন্তু অদ্যকার এই অবিশ্বাস্য ও অচিন্তনীয় ঘটনায় আমার আজ বিশ্বাস হইল, তুমি আমার উপর সন্তুষ্ট না হইলেও অসন্তুষ্ট নহ। কারণ তুমি যদি আমার উপর অসন্তুষ্ট হইতে তাহা হইলে মা! তুমি আজ কখনও আমার প্রতি এইরূপ আচরণ করিতে না।" আমার এই কাতরোক্তি শুনিয়া মা বলিলেন, "তোমার উপর সন্তুষ্ট, সন্তুষ্ট, সন্তুষ্ট। বল আর

কয়বার বলিব সন্তুষ্ট।" আমার ন্যায় শ্রদ্ধা, ভক্তি, সাধন ও ভজন-হীন অতি ক্ষুদ্র জীব বিশ্বজননী মহামহিমময়ী—শ্রীশ্রীমায়ের নিকট হইতে ইহা অপেক্ষা অধিক আর কি আশা করিতে পারে? তাই বারবার কেবলি বলিতে ইচ্ছা হয়—

"মাগো, অনেক ভক্ত এসেছে তোমার চরণতলে
অনেক অর্ঘ্য আনি।
আমি অভাগা এনেছি বহিয়া নয়নজলে
ব্যর্থ সাধনখানি॥"

করুণাময়ী জননী আমার! যে ভাবে আজ কাষায় বস্ত্র কৃপা করিয়া তাঁহার এই অত্যন্ত তুচ্ছ সন্তানকে আশাতীতরূপে প্রদান করিলেন এবং ইহার বহুপূর্বে দেহরাদুনের রায়পুর ও ডোংগায় যথাক্রমে মহাবাক্য ও সন্ন্যাস মন্ত্র দান করিয়া স্বীয় চরণে টানিয়া লইয়াছিলেন সেইজন্য আমি তাঁহার রাতুলপদে পুনঃপুনঃ আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতার সহিত প্রণতি জানাইতেছি।

আমি তো মায়ের আশ্রয় ত্যাগ করিয়া একাধিকবার দূরে চলিয়াই গিয়াছিলাম। ডাকিলেও অভিমানে তাঁহার কাছে যাই নাই। তথাপি তিনি আমাকে অবাধ্য ও অধম মনে করিয়া এক-দিনের জন্যও ত্যাগ করেন নাই বরং স্নেহও আদর দানে তাঁহার চরণে টানিয়াই রাখিয়াছেন। চরণ ছাড়া করেন নাই। ইহাতে শ্রীশ্রীমায়ের স্নেহ, ক্ষমা ও করুণারই পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। নবদ্বীপের অতি দুর্বৃত্ত জগাই ও মাধাইয়ের জীবনে যেমন পতিত-পাবন শ্রীমন্মহাপ্রভু কৃষ্ণচৈতন্যের একটি বিশেষস্থান ও অবদান আছে এবং তদ্দ্বারা তাঁহার পতিতপাবন নাম সার্থক হইয়াছে তদ্রূপ শ্রীশ্রীমা দয়া করিয়া তাঁহার এই অবাধ্য ও অযোগ্য সন্তানকে আজ যাহা দান করিলেন তাহাদ্বারা প্রসিদ্ধ শ্রীশ্রীজগন্মাতার দেব্যপরাধ-ক্ষমাপন স্তোত্রে যে বলা হইয়াছে "কুপুত্রো জায়তে ক্বচিদপি কুমাতা ন ভবতি" সেই বাক্যটির যথার্থ মহিমা জগতের নিকট প্রকাশিত হইল। মরমীয়া কান্ত কবির মর্মস্পর্শী ভাষায় আমি নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারি—

"আমি তো তোমারে চাহিনি জীবনে
তুমি অভাগারে চেয়েছ !
আমি না ডাকিতে হৃদয় মাঝারে
নিজে এসে দেখা দিয়েছ ॥

ওপথে যেয়োনা ফিরে এসো বলে
কানে কানে কত কয়েছ।
আমি তবু চলে গেছি ফিরায়ে আনিতে
পিছু পিছু ছুটে গিয়েছ ॥

চির আদরের বিনিময়ে সখা
চির অবহেলা তুমি পেয়েছ।
আমি দূরে সরে যেতে দু'হাত প্রসারি
বুকে টেনে মোরে লয়েছ ॥

আমার নিজ হাতে গড়া বিপদের মাঝে
কোলে তুলে তুমি নিয়েছ।
এই চির অপরাধী পাতকীর বোঝা
হাসিমুখে তুমি বয়েছ ॥"

আপন শত চেষ্টায় যাহা কখনও সম্ভব হইত না স্নেহময়ী ক্ষমাময়ী করুণাময়ী শ্রীশ্রীমায়ের অহৈতুকী কৃপায় তাহা আজ এইভাবে কার্যে পরিণত হইল। যিনি এত দয়া করিয়াছেন, সেই বাৎসল্যময়ী মাকে পুনঃপুনঃ অন্তরের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি এবং তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে করজোড়ে নিবেদন জানাইতেছি, হে মহাশক্তিরূপিণী স্নেহময়ী মা! তুমি তোমার এই অযোগ্য ও অবোধ সন্তানের অপরাধ ক্ষমা করিয়া তাহার উপর অশেষ করুণা করিয়াছ। সেই কারণে তোমার চরণে এই দীনের বারবার প্রণাম, প্রণাম, প্রণাম।

যা দেবী সর্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ ॥ নমস্তস্যৈ ॥ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥

যা দেবী সর্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ ॥ নমস্তস্যৈ ॥ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥
যা দেবী সর্বভূতেষু দয়ারূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ ॥ নমস্তস্যৈ ॥ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥
যা দেবী সর্বভূতেষু ক্ষান্তিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ ॥ নমস্তস্যৈ ॥ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥
মৎসমঃ পাতকী নাস্তি পাপঘ্নী তৎসমা ন হি।
এবং জ্ঞাত্বা মহাদেবি যথা যোগ্যং তথা কুরু ॥

হে মহাদেবি! আমার সমান কোন পাপী নাই এবং তোমার সমান কোন পাপনাশিনীও নাই, ইহা জানিয়া হে মাতঃ! যেমন তুমি উচিত বুঝ তেমন কর। ইহা ব্যতীত মা তোমার চরণে এই অধম সন্তানের আর কি প্রার্থনা থাকিতে পারে?

শ্রীশ্রীমায়ের অতি দীন-হীনের কদন্ন গ্রহণ

পরম করুণাময়ী শ্রীশ্রীমা যে অতি দরিদ্রের কদন্ন আগ্রহের সহিত যাচিয়া গ্রহণ করেন তার একটি ক্ষুদ্র ঘটনা এখানে লিপিবদ্ধ করিতেছি। কাহারও কাহারও মুখে শুনিতে পাওয়া যায় এবং আমাদের শোনাইবার জন্যই তাহারা বলিয়া থাকেন, "আনন্দময়ী মা তো বড়লোকের মা। তিনি দরিদ্রের দিকে তাকাইয়াও দেখেন না। ধনী কিংবা উচ্চপদস্থ কোন রাজকর্মচারী তাঁহার নিকট আসিলে তাহার কত আদর-যত্ন তিনি করেন।" এজাতীয় ব্যঙ্গোক্তির পশ্চাতে থাকে তাহাদের প্রচ্ছন্ন ঈর্ষা ও অতৃপ্ত বাসনার তীব্রদাহ। জগন্মাতার সন্তান সকলেই। কেহই বাদ পড়ে না। ধনী দরিদ্র, বিদ্বান্ মূর্খ, ত্যাগী ভোগী, বড় ছোট, সাধু অসাধু, রাজা প্রজা, সন্ন্যাসী গৃহী, জ্ঞানী অজ্ঞানী সকলকে লইয়াই চলিয়াছে আমার শ্রীশ্রীমায়ের বিরাট লীলা খেলা। উদার দৃষ্টি লইয়া বিশ্বমাতার লীলা অবলোকন না করিলে উহার যথার্থ রসাস্বাদন করা যায় না। যাহারা সেই রসমাধুর্যে বঞ্চিত তাহাদের কাছ হইতেই আসে এইরূপ বিদ্রূপ বাক্য ও উষ্মা। আমি কোন্ ধনী, বিদ্বান্, ত্যাগী, জ্ঞানী ও উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী? এই সকল গুণ না থাকা সত্ত্বেও তিনি আমাকে কৃপা করিতে বিন্দুমাত্রও কৃপণতা করেন নাই এবং কম করিয়াও কিছু দেন নাই। মা হইলেন শুদ্ধ স্ফটিকের ন্যায় স্বচ্ছ—অতিশয় নির্মল। স্ফটিকের নিজস্ব কোন রং নাই। যে কোন রং উহার নিকট রাখা যায় স্ফটিক সেই রংয়ের মতই দেখা যায়। সেই রকম মায়ের আপন কোন সংস্কার বা ভাব নাই। যে ভাব বা সংস্কার লইয়া আমরা তাঁহার কাছে যাই সেইরূপেই আমরা তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়া থাকি। রঘুনন্দন ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র গুরু বিশ্বামিত্রের সঙ্গে মিথিলায় ধনুর্যজ্ঞ দেখিতে গিয়াছেন। জনকনন্দিনী শ্রীজানকীকে লাভ করিবার জন্য বহু রাজা, গন্ধর্ব, রাক্ষস

(মনুষ্য শরীর ধারণ করিয়া) সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা শ্রীরাঘবেন্দ্রকে কেমন দেখিয়াছিলেন ইহা বর্ণন করিতে গিয়া শ্রীতুলসীদাস গোস্বামী তাঁহার 'শ্রীরামচরিতমানসে' স্পষ্ট ভাষায় বলিয়াছেন—

'জিন্‌হ কেঁ রহি ভাবনা জৈসী। প্রভু মূরতি তিন্‌হ দেখী তৈসী'॥ যাহার যেমন ভাবনা সেই সময় ছিল প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের মূর্তি তাহারা সেইরূপই দেখিয়াছিলেন। কেহ বীররূপে, কেহ কালরূপে, কেহ নরপতিরূপে, কেহ বিরাটরূপে, কেহ আপন সন্তান-রূপে, কেহ স্বীয় ইষ্টদেবতারূপে, কেহ পরম তত্ত্বরূপে দেখিয়াছিলেন। সীতা প্রভুকে কিরূপে যে দেখিয়াছিলেন তাহা ভাষায় বর্ণন করা যায় না।

আলোচ্য ঘটনাটি সংঘটিত হইয়াছিল যতটা আমার মনে পড়ে ১৩৫৫ সালের ভাদ্রমাসে। সেই সময় পূর্ণ উদ্যমে কাশী আশ্রমে চলিতেছিল অখণ্ড শ্রীশ্রীসাবিত্রী মহাযজ্ঞ। যে সময়কার এই কাহিনী সেই সময় ছিল কণ্ট্রোলের বাজার। আমি তখন শ্রীশ্রীমায়ের কাশী আশ্রমে স্থায়িভাবে থাকিতে শুরু করিয়াছি। আশ্রম পরিচালনার সঙ্গে আমার কোন সম্বন্ধ ছিল না। প্রাতঃকালে সাবিত্রী যজ্ঞে আহুতি দিতাম এবং বৈকালে যজ্ঞশালায় বসিয়া গায়ত্রী জপ করিতাম। স্বপাক অন্নই ছিল সেই সময় আমার আহার। অপরের দ্বারা পক্ক অন্নাদি আমি ভোজন করিতাম না। আশ্রমে যখন আমি আগমন করি সেই সময় আমার পূর্বপুরুষের অতি পুরাতন একটি শালগ্রামশিলা (নারায়ণশিলা) আমার সঙ্গে ছিলেন। তাঁহার আশ্রম আগমনের ইতিহাসটি অতি সুন্দর। তাহা যথাস্থানে প্রকাশ করা হইয়াছে। শ্রীশ্রীনারায়ণ আমাকে অধম ও তাহার সেবার অতি অযোগ্য জানিয়াও তাঁহার পূজা ও সেবার একটু অধিকার দিয়াছিলেন। সেই ঘটনাটি এখানে উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হইলেও ইহা পাঠক ও পাঠিকাদের রুচিকর হইতে পারে ভাবিয়া ইহা লিখিতে সাহস করিতেছি।

আমাদের পারিবারিক বিপর্যয় হেতু কিছু দিনের জন্য শ্রীশ্রী নারায়ণশিলাটিকে আমার নিকট রাখার কতগুলি অন্তরায় বা

বাধা সৃষ্টি হইয়াছিল। প্রথম কারণ হইল আমি আমার কর্মস্থলে ভোর ছয়টায় চলিয়া যাইতাম এবং সেখান হইতে প্রত্যাবর্তন করিতে বাজিয়া যাইত অপরাহ্ণ তিন ঘটিকা। আমার বৃদ্ধা পিসীমা ছিলেন তিনিও হইয়া পড়িলেন দৃষ্টিশক্তি হীন। অতএব তাঁহার সেবার জন্য বাধ্য হইয়া নিয়োগ করিতে হইল একটি ব্রাহ্মণ কন্যা বিধবা পাচিকা এবং একটি পরিচারিকা। পিসীমা আশি বৎসর বয়স পর্যন্ত কখনও জীবনে বেতনভোগী পাচক বা পাচিকার হাতের অন্ন ভোজন করেন নাই এবং নারায়ণকেও কখনও ঐ অন্নের ভোগ দেওয়া হয় নাই। উপায়ান্তর না থাকায় পিসীমা পাচিকার হাতে অন্ন গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। নারায়ণের শীতকালে ছয়টার মধ্যে পূজা এবং অপরাহ্ণ তিনটা পর্যন্ত তাঁহাকে অভুক্ত রাখা কোন প্রকারেই যুক্তিযুক্ত মনে না করায় অগত্যা তাঁহাকে আমার পূর্বাশ্রমের ভ্রাতুষ্পুত্রদের নিকট রাখিতে হইয়াছিল। সেখানেও নারায়ণের পূজা করিতেন বেতনভোগী দেবল ব্রাহ্মণ। তাহাও যথাসময় পূর্বাহ্ণে হইত না এবং তাহার ভোগ প্রদানেরও কোন নির্দিষ্ট সময় ছিল না। পূজারীর সুবিধামত ঠাকুরের পূজা ও ভোগ হইত, ঠাকুরের সময়মত নহে। আমি যখন শুনিলাম নারায়ণের সেবার নানা প্রকার ত্রুটি হইতেছে তখন আমার মনটা বড়ই খারাপ হইয়া গেল। একদিন স্বপ্নে দেখি, নারায়ণ শিলা হইতে নির্গত একটি শিশু—বর্ণ কাল, ডাগর ডাগর চোখ, কুঞ্চিত-ঘন-কৃষ্ণ-কেশ মাথায়, মুখখানি অপ্রসন্ন—দুহাতে আমার গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিতেছেন, "আমাকে তোর কাছে লইয়া যা। আমার এখানে ঠিকমত সেবা যত্ন হয় না। তুই যখন, যাহা দিবি তাতেই আমি সন্তুষ্ট থাকিব।" এই স্বপ্ন দেখার পর কে এমন নিষ্ঠুর ব্যক্তি থাকিতে পারে যে এমন ঠাকুরকে নিজের কাছে না আনিবে। পরদিনই আমি নারায়ণকে আমার নিকট লইয়া আসিলাম এবং যেমন-তেমনভাবে তাঁহার সেবা পূজা চলিতে লাগিল। ইতোমধ্যে পিসীমা কাশীলাভ করিলেন। পূর্ব হইতে আমার সঙ্কল্প ছিল পিসীমার দেহত্যাগের পর আমি আর চাকুরী করিব না। আমার ছুটি পাওনা ছিল। আট মাস বিদায় লইবার

পর অসময়ে অসুস্থতা নিবন্ধন চাকুরী হইতে অবসর (Invalid Pension) গ্রহণ করিলাম। মনে ভাবিয়াছিলাম যাহা সামান্য কিছু পেনসন্ পাইব তাহা দ্বারাই নারায়ণকে লইয়া কাশীবাস করিতে পারিব। সচ্ছলভাবে না হউক কোন রকমে দুঃখে কষ্টে দিন অতিবাহিত হইয়াই যাইবে। সেই প্রিয় নারায়ণ শিলাটিকে সঙ্গে লইয়া আমি স্থায়িভাবে আশ্রমবাসী হইয়াছি।

একদিন বৈকালে কণ্ট্রোলের দোকানে চাউল কিনিতে গিয়া দেখি গাবের বিচির মত লাল লাল মোটা চাউল একটু সস্তা দামে বিক্রি হইতেছে। গরীব লোকেরা সেই চাউলই কিনিতেছে। আমারও তো টাকার অভাব—মা কমলা কোনদিনই আমার উপর সুপ্রসন্না ছিলেন না। তিনি ভুল করিয়াও কোন সময় আমাকে সুনজরে দেখেন নাই। সেইজন্য কণ্ট্রোলের দোকান হইতে দরিদ্রের খাদ্যের উপযোগী লাল লাল মোটা চাউল টাকায় এক সের চৌদ্দ ছটাক দরে ক্রয় করিয়া আনিলাম। এই চাউল যখন রন্ধন করা হইত তখন উহার আকৃতি দেখিয়া গৃহ নির্মাণের মাখা 'সুরকি' বলিয়া ভ্রম হইত। একদিন ঐ রকমের অন্ন ও কিঞ্চিৎ ঢেঁড়সের তরকারী রাঁধিয়া বেলা দ্বিপ্রহরের পর শ্রীশ্রীনারায়ণকে আমি ভোগ নিবেদন করিতেছি। শুনিয়াছি নারায়ণের নাকি ভোগ হয় ক্ষীর, ছানা, দধি ও মাখন দিয়া, কিন্তু আমার নিকটে নারায়ণের আগমনের পর হইতে তিনি ঐ সব বস্তু চোখেও দেখিতে পান নাই। তাঁহার ভোগ হইয়াছে শাক ও অন্ন দিয়া। অবস্থার দুর্বিপাকে পড়িয়া এখন একটু একটু আমি কোন রকমে রন্ধন করিতে শিখিয়াছি। অবস্থায় পড়িয়া ভবিষ্যতে যে আমাকে নিজের হাতে রাঁধিয়া খাইতে হইবে তাহা জানিয়াই তো মা পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে প্রথম পরিচয়ে আমাকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন—আমি রাঁধিতে জানি কিনা বা রাঁধিতে পারি কিনা? তখন আমি কিন্তু মায়ের এই প্রশ্নের মর্ম বা উদ্দেশ্য বুঝিতে পারি নাই। দীর্ঘকাল পরে হইলেও আমাকে যে জীবনে কখন স্বয়ংপাকী হইতে হইবে তাহা মা আমাকে প্রথম দেখিয়াই বুঝিয়াছিলেন। মা যে আমাদের ভবিষ্যত জানেন তাহা এই সব ছোট ছোট ঘটনার মধ্য দিয়া ধরা পড়ে।

যখন আমি ঘরের দ্বার রুদ্ধ করিয়া নারায়ণকে ভোগ নিবেদন করিতেছিলাম সেই সময় সেখানে নারায়ণ ও আমি ব্যতীত অপর কেহ ছিলেন না। ভোগ নিবেদন সমাপন করিয়া যখন আমি শ্রীশুকদেব বিরচিত দ্বাদশাক্ষর স্তোত্র পাঠ করিতেছিলাম, তখন কোন্ সময় যে শ্রীশ্রীমা আমার পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন তাহা আমি মোটেই জানিতে পারি নাই। স্তব পাঠ শেষ করিয়া প্রণামান্তে উঠিয়া দেখি জননী আমার, দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দেখিতেছেন আমার ভোগ নিবেদন এবং শ্রবণ করিতেছেন আমার স্তব পাঠ। স্তবটি অতি সুন্দর ও চিত্তাকর্ষক সেইজন্য উহা নিম্নে দেওয়া যাইতেছে।

দ্বাদশাক্ষর স্তোত্র।

(ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়)

ওম্ ইতি জ্ঞানমাত্রেণ রাগা জীর্যন্তি নির্জিতাঃ।
কালনিদ্রাং প্রপন্নোঽস্মি ত্রাহি মাং মধুসূদন ॥ ১ ॥
ন গতির্বিদ্যতে নাথ ত্বমেব শরণং মম।
পাপপঙ্কে নিমগ্নোঽস্মি ত্রাহি মাং মধুসূদন ॥ ২ ॥
মোহিতো মোহজালেন পুত্রদারগৃহাদিষু।
তৃষ্ণয়া পীড্যমানোঽস্মি ত্রাহি মাং মধুসূদন ॥ ৩ ॥
ভক্তিহীনঞ্চ দীনঞ্চ দুঃখশোকাতুরং প্রভো।
অনাশ্রয়মনাথঞ্চ ত্রাহি মাং মধুসূদন ॥ ৪ ॥
গতাগতেন শ্রান্তোঽস্মি দীর্ঘসংসারবর্ত্মসু।
পুনর্নাগন্তুমিচ্ছামি ত্রাহি মাং মধুসূদন ॥ ৫ ॥
বসামি গর্ভবাসেষু বিবিধেষু পুনঃপুনঃ।
গর্ভবাস-মহাদুঃখাৎ ত্রাহি মাং মধুসূদন ॥ ৬ ॥
তেন দেব প্রপন্নোঽস্মি ত্রাণার্থং ত্বৎপরায়ণঃ।
দুঃখার্ণব-নিমগ্নং ত্বং ত্রাহি মাং মধুসূদন ॥ ৭ ॥
বাচা যচ্চ প্রতিজ্ঞাতং কর্মণা নোপপাদিতম্।
তৎপাপাব্ধি-নিমগ্নোঽস্মি ত্রাহি মাং মধুসূদন ॥ ৮ ॥

সুকৃতং ন কৃতং কিঞ্চিদ্ দুষ্কৃতঞ্চ কৃতং ময়া।
সংসারার্ণব-মগ্নোঽস্মি ত্রাহি মাং মধুসূদন ॥ ৯ ॥
দেহান্তর-সহস্রেষু প্রাপিতং ভ্রমতা ময়া।
তির্যক্ত্বং মানুষত্বঞ্চ ত্রাহি মাং মধুসূদন ॥ ১০ ॥
বাচয়ামি যথোন্মত্তঃ প্রলপামি তবাগ্রতঃ।
জরামরণভীতোঽস্মি ত্রাহি মাং মধুসূদন ॥ ১. ॥
যত্র যত্র চ জাতোঽস্মি স্ত্রীষু বা পুরুষেষু বা।
দেহি তত্রাচলাং ভক্তিং ত্রাহি মাং মধুসূদন ॥ ১২ ॥
গত্বা গত্বা নিবর্তন্তে চন্দ্রসূর্যাদয়ো গ্রহাঃ।
অদ্যাপি ন নিবর্তন্তে দ্বাদশাক্ষরচিন্তকাঃ ॥ ১৩ ॥
দ্বাদশাক্ষরং মহাস্তোত্রং সর্বকামফলপ্রদম্।
গর্ভবাস-নিরাসায় শুকেন পরিভাষিতম্ ॥ ১৪ ॥
দ্বাদশাক্ষরং নিরাহারো যঃ পঠেদ্ধরিবাসরে।
স গচ্ছেদ্ বৈষ্ণবং ধাম যত্র যোগেশ্বরো হরিঃ ॥ ১৫ ॥

ইতি শ্রীশুকবিরচিতং দ্বাদশাক্ষরস্তোত্রং সমাপ্তম্।

এই স্তবটি আমি সকালে পূজার পর দুপুরে ভোগের পর এবং সন্ধ্যায় আরতির পর নিত্য তিনবার পাঠ করিতাম। ইহা আমার অত্যন্ত প্রিয় স্তব ছিল। আমি মাকে পশ্চাতে দাঁড়ান দেখিয়া অতিশয় আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "মা! তুমি কখন আসিয়াছ? তুমি যে এখানে আসিয়াছ তাহা আমি জানিতেই পারি নাই।" মা উত্তরে বলিলেন, "অনেকক্ষণ হয় আসিয়াছি। তোমার ভোগ নিবেদন দেখিতেছিলাম। স্তোত্রপাঠও শুনিয়াছি।"

শ্রীশ্রীমা ঘরেই রহিলেন আমি দরজা বন্ধ করিয়া দিলাম এবং ঘরের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলাম। নিয়ম আছে—দেবতার ভোগের পর কিছু সময়ের জন্য তাঁহার আহারের নিমিত্ত দেবতাকে ঘরে রাখিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া বাহিরে প্রার্থনা করিতে হয়—দয়া করিয়া ভোগ গ্রহণ করিবার জন্য। একটু পর দরজা খুলিয়া নারায়ণকে তাঁহার নির্দিষ্টস্থান মন্দিরে রাখিয়া আসিলাম। তাঁহাকে সিংহাসনের উপর রাখিয়া মাকে প্রণাম করিতেই মা

বলিলেন, "এই শরীর আজ তোমার এখানে নারায়ণের প্রসাদ পাইবে।" যে মাকে কত প্রার্থনা ও সাদর-আহ্বান করিয়া বড় বড় ধনীরা আহারের জন্য তাঁহাদের প্রাসাদতুল্য ভবনে ক্ষণিকের জন্য নিতে পারেন না সেই মা কিনা স্বয়ং যাচ্‌ঞা করিলেন নারায়ণের প্রসাদ! ইহা হইতে আশ্চর্যের বিষয় আর কি হইতে পারে? 'কিমাশ্চর্যমতঃ পরম্'। মহালক্ষ্মীস্বরূপিণী শ্রীমতী রুক্মিণী দেবীর প্রস্তুত নানাবিধ সুস্বাদু পক্কান্ন হইতে নাকি শ্রীকৃষ্ণের অধিক মধুর লাগিত বিদুর পত্নীর প্রদত্ত কদলীর খোসা। মা আমার রূপ বদলাইয়াছেন স্বভাব বদলান নাই। তাই কখন সখন স্বরূপ প্রকাশ হইয়া পড়ে।

মায়ের মুখ হইতে এই কথা শুনিয়া আমার তো মাথার উপর আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। মাকে কি দিয়া আমি খাওয়াইব এখানে? এই তো সুরকির মত লাল লাল মোটা চালের কাই কাই ভাত আর একটু ঢেঁড়স চচ্চড়ি। এই দিয়া কি আর শ্রীশ্রীমাকে খাওয়ান যায়? এই প্রসাদ আমি কি করিয়া রাখিব বিশ্বমাতার সম্মুখে? নারায়ণকে সবরকম ভোগই দেওয়া যায় কারণ তিনি তো আমার মত পামরকে মুখ ফুটিয়া কিছু বলিবেন না। আমি জানি এবং ভাল করিয়াই জানি শ্রীশ্রীমাও কিছু বলিবেন না। তাঁহাকেও 'পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং' যাহাই প্রদান করা হউক না কেন তাহাই তিনি দয়া করিয়া গ্রহণ করিবেন। কিন্তু আমি তাঁহাকে ইহা অর্পণ করিব কি করিয়া—এই প্রসাদ আমি মায়ের মুখে কি করিয়া দিব। আর মায়ের সম্মুখে একটা পিতলের থালাতে ঐ অন্ন নামের পদার্থটা বাহির করিতে আমার ভীষণ লজ্জা করিতেছিল। শ্রীশ্রীমায়ের জন্য শ্রীগুরুপ্রিয়া দেবী দেহরাদুনের উৎকৃষ্ট বাস্‌মতি-চাউলের অতি সুগন্ধ যুঁই ফুলের মত সাদা ধপধপে সরু অন্ন এবং নানা রকমের সুখাদ্য ও সুস্বাদু ব্যঞ্জনাদি ভোজন-সামগ্রী নিজের হাতে রন্ধন করিয়া মাকে ভোজন করাইবেন বলিয়া তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন।

শ্রীশ্রীমা আজ নারায়ণের প্রসাদ গ্রহণ করিবেন এই কথা তাঁহার মুখ হইতে নির্গত হইবার সঙ্গে সঙ্গে উদাস ও বুনি (মায়ের

দুইটি অতি প্রিয় সন্তান। প্রথমটি কাশ্মীরীও দ্বিতীয়টি বাঙ্গালী কুমারী কন্যা। দুইজনেই অতি অল্প বয়সে মায়ের আশ্রমে আসিয়া তাঁহার সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। প্রথমটি বর্তমানে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া মায়ের সঙ্গেই আছেন। দ্বিতীয়টি কয়েক বৎসর পূর্বে মায়ের সম্মুখে সজ্ঞানে বৃন্দাবনে শরীর ত্যাগ করিয়া শান্তিলাভ করিয়াছেন।) নিমেষের মধ্যে আসন পাতিয়া মেঝেতে গঙ্গাজল ছিটাইয়া, মায়ের জন্য ভোগের ঠাঁই করিয়া দিল। গুরুপ্রিয়া দিদি লইয়া আসিলেন তাঁহার আপন হাতে অতি পবিত্রভাবে গঙ্গাজলে রাঁধা মায়ের ভোগ। মুহূর্তের মধ্যে মায়ের সম্মুখে নানাবিধ ব্যঞ্জনাদি ভোজ্য দ্রব্য থরেবিথরে সব সাজান হইয়া গেল। মা আসনে বসিয়াই আমাকে নারায়ণের প্রসাদ আনিতে বলিলেন। মায়ের আদেশানুসারে আমি নারায়ণকে নিবেদন করা ভোগ হইতে হাতে করিয়া একটু অতি অল্প পরিমাণ প্রসাদ আনিয়া মায়ের রুপার থালার এক পার্শ্বে রাখিলাম। আমাকে একটুখানি প্রসাদ আনিতে দেখিয়া মা বলিলেন, "নারায়ণের এতটুকু প্রসাদ আনিলে কেন? থালা সমেত সব প্রসাদ এখানে লইয়া আস।" আমি অতিশয় বিনীতভাবে মাকে নিবেদন করিলাম, "মা! প্রসাদ আবার কতখানি গ্রহণ করে? দেবতার প্রসাদ তো কণিকামাত্রই লয়। তা ছাড়া তোমার প্রসাদ লইবার প্রয়োজনই বা কি? প্রসাদ তো আমাদের চিত্তশুদ্ধির জন্য। তোমার তো আর চিত্ত নাই যে তাহার শুদ্ধি করিতে হইবে। তোমার প্রসাদের কোন দরকার নাই।" সকলের সম্মুখে ঐ প্রসাদ বাহির করিতে লজ্জায় আমার মাথা কাটা যাইতেছিল। আমি মনে মনে প্রার্থনা করিলাম, হে ধরিত্রী-দেবি! তুমি দ্বিধা হও আমি তোমার মাঝে প্রবেশ করি। দেবী ধরিত্রী আমার প্রার্থনায় কর্ণপাতও করিলেন না—অগত্যা মায়ের নির্দেশমত নারায়ণের প্রসাদ থালা সমেত তাঁহার সম্মুখে আনিয়া রাখিতে হইল। এতটা করিয়াই তিনি ক্ষান্ত হইলেন না। তিনি আমাকেই ঐ প্রসাদ খাওয়াইয়া দিতে বলিলেন। তিনি বহুদিন যাবৎ নিজের হাতে কোন জিনিস মুখে দেন-না। অন্ততঃপক্ষে গত পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে আমি তাঁহাকে একদিনের জন্যও কখন আপন হাতে ভোজন

করিতে দেখি নাই। এমন কি পিপাসা পাইলে এক গ্লাস জলও কখন আপন হাতে পান করেন না। এই সকল নিয়ম মা নিজে ইচ্ছা করিয়া করেন নাই। আপনা আপনি হইয়া গিয়াছে। মায়ের আদেশ অলঙ্ঘনীয়—তিনি মুখ দিয়া যাহা বাহির করিবেন তাহা কার্যে পরিণত না করিয়া ছাড়িবেন না। থালা হইতে অতি অল্প পরিমাণ প্রসাদ লইয়া যখন আমি মায়ের শ্রীমুখে তুলিয়া দিতে যাইতেছি তখন মা আবার বলিলেন। "ঠাকুরের প্রসাদ এতটুকু দিতেছ কেন? বড় বড় করিয়া গ্রাস দেও।"

যে মায়ের মুখে তাঁহার বিত্তশালী ও বিশিষ্ট ভক্তগণ নানা প্রকার অতি সুস্বাদু ও উপাদেয় খাদ্য সামগ্রী যেমন ক্ষীর, ছানা, মাখন, মালপুয়াদি প্রস্তুত করিয়া দিতে পারেন না তার এক কণা, আজ অভাগা আমি মায়ের সেই মুখকমলে তুলিয়া দিতে লাগিলাম বড় বড় গ্রাসে মানুষের অখাদ্য সেই লাল লাল সুরকির ডেলার মত কাই কাই ঠাণ্ডা ভাত আর ঢেঁড়সের অতি সাধারণ একটু চচ্চড়ি। স্নেহময়ী জননী আমার তাহাই খাইতে লাগিলেন পরমানন্দে আর ঐ প্রসাদের কতই না প্রশংসা করিতে লাগিলেন। আমার সহৃদয় পাঠক ও পাঠিকারা কেহই হয় তো বলিলে বিশ্বাস করিবেন না, যে মা দেহরাদুনের অতি উৎকৃষ্ট বাস্‌মতি চালের অতি সুগন্ধ ও সুন্দর অন্নও দুইচারি গ্রাসের অধিক মুখে নেন না; সেই মা আজ যাচিয়া যাচিয়া এই অতি দীন-হীন দরিদ্রের অতিশয় কদর্য অন্ন প্রসাদ প্রায় অর্ধেকেরও বেশী ভোজন করিলেন। আমি দিলে হয়তো, হয়তো কেন নিশ্চয়ই, সবটা প্রসাদ গ্রহণ করিতেন। লীলাময়ী শ্রীশ্রীমায়ের এই অসীম করুণার কথা স্মরণ করিয়া আমার দুই চক্ষু জলে ভরিয়া গেল, আমি উহা আর তাঁহার মুখে দিতে পারিলাম না। আমি মাকে খাওয়াইতে খাওয়াইতে উঠিয়া পড়িলাম এবং দরজার আড়ালে মুখ লুকাইয়া অশ্রু বিসর্জন করিতে লাগিলাম। মায়ের ভোগ সমাপ্ত হইতে না হইতেই আমি উঠিয়া পড়িলাম দেখিয়া গুরুপ্রিয়া দিদি তাঁহার রাঁধা অন্ন ব্যঞ্জনাদি হইতে মাকে খাওয়াইতে লাগিলেন। দিদির হাতে মা দুইচারি গ্রাস খাইয়াই ভোগ শেষ করিয়া উঠিয়া পড়িলেন। এমন দীনবৎসলা করুণাময়ী শ্রীশ্রীমাকে নাকি

কেহ কেহ বলেন, মা বড় লোকের মা, ধনীর মা, পদস্থ রাজ-কর্মচারীদের মা!

সহৃদয় পাঠক ও পাঠিকাদের নিকট এই ঢেঁড়স চচ্চড়ির ক্ষুদ্র কাহিনীটি উল্লেখ না করিলে ঘটনাটি থাকিয়া যাইবে অসম্পূর্ণ। সেইজন্য ইহার অবতারণা এখানে করিতে বাধ্য হইতেছি। যে সময়কার এই বৃত্তান্ত সেইসময় শ্রীশ্রীবাবা বিশ্বনাথের অবিমুক্ত-বারাণসীক্ষেত্রে মায়ের আশ্রমে চলিতেছিল অখণ্ড শ্রীশ্রীসাবিত্রী মহাযজ্ঞের বিরাট অনুষ্ঠান। এক কোটি আহুতির সঙ্কল্প লইয়া আরম্ভ হইয়াছিল এই মহাযজ্ঞ। গোটা তিনটি বৎসর চলিয়াছিল এই বিরাট যজ্ঞের আহুতি প্রদান। প্রত্যহ যজ্ঞ শুরু হইত সকাল সাতটায় আর শেষ হইতে দুপুর বারটা বাজিয়া যাইত। আমি আপন নিত্য কাজকর্ম ও নারায়ণ পূজা সারিয়া যজ্ঞে গিয়া বসিতাম সকাল ঠিক সাতটায়। আমি যজ্ঞে বসিলে তবে উহা আরম্ভ হইত। সুতরাং যথাসময়ে আমি যজ্ঞে উপস্থিত হইতে চেষ্টা করিতাম। পারতপক্ষে কখনও এই কার্যে যোগদান করিতে বিলম্ব করিতাম না।

মায়ের কাশী আশ্রমে তখন এক ভদ্রলোক বাস করিতেন। তাঁহাকে আশ্রমবাসী ছেলে বুড়ো, স্ত্রী পুরুষ সকলেই 'যজ্ঞেশ্বরদা' বলিয়া ডাকিতেন। তাঁহার প্রকৃত নাম ছিল শ্রীযজ্ঞভূষণ মৌলিক। তিনি ছিলেন একজন পরোপকারী সদাচারী নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ। অতিশয় ভাল মানুষ। আশ্রমের সকলের বাজার হাট করা ও যাবতীয় কেনাকাটা তিনি স্বেচ্ছায় আনন্দের সহিত করিতেন। তাঁহাকে কোনরকম কাজের কথা বলিতে আমরা কখনও সঙ্কোচ-বোধ করিতাম না। তিনি ছিলেন একজন গভর্ণমেণ্টের পেনশন প্রাপ্ত ব্যক্তি এবং শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী কন্যাপীঠের পরমহিতৈষী। আমি যজ্ঞে গিয়া বসিবার পূর্বে তাঁহাকে বলিয়া দিতাম আমার জন্য বাজার হইতে কি কি জিনিস আনিতে হইবে। যে দিনকার এই ঘটনা সেইদিন আমি মনে মনে ভাবিয়াছিলাম আজ আমি আমার শ্রীশ্রীনারায়ণজীকে ঢেঁড়সের তরকারি দিয়া ভোগ দিব। সেদিন ঘটনাচক্রে আমার পূজা হইতে উঠিবার পূর্বেই যজ্ঞেশ্বরদা বিশেষ কারণে বাজারে চলিয়া গিয়াছিলেন। সেইজন্য আমি তাঁহাকে

বলিতে পারি নাই যে আমার জন্য বাজার হইতে ঢেঁড়স আনিতে হইবে। যখন যাহা হইবার তাহার সংযোগ এই ভাবেই হইয়া থাকে!

এদিকে সেদিন আমার ভাঁড়ারে মা ভবানী বসিয়াছিলেন। ভাঁড়ার ছিল বাড়ন্ত—ঐ লাল লাল গাবের বিচির মতন মোটা চারটি চাল আর একটু সৈন্ধব লবণ মাত্র ছিল। এমন কি একটা আলুও ছিল না ঘরে। যজ্ঞ করিতে যাইবার সময় মনে মনে চিন্তা করিলাম, নারায়ণ আজ তোমার ভোগ হইবে কি দিয়া। চাউল ও লবণ ছাড়া ঘরে তো ঠাকুর আর কিছুই নাই। যজ্ঞ করিয়া বেলা বারটার সময় এই কাঠফাটা রৌদ্রে আমি তরকারি আনিতে বাজারে যাইতে পারিব না। ঠাকুর! তুমি যজ্ঞেশ্বরদাকে একটু দেরী করিয়া বাজারে পাঠাইতে পারিলে না। তাহা হইলেই তো আমি তাঁহাকে ঢেঁড়স আনিতে বলিতে পারিতাম। তা যখন তুমি ঠাকুর করিলে না, তোমাকে আজ শুধু লবণ ভাত খাইতে হইবে। যাহা মনে মনে ভাবিয়াছিলাম, কাজেও আমি তাহাই করিলাম। যজ্ঞ করিয়া উঠিয়া প্রখর রোদের মধ্যে তরকারি কিনিতে আর আমি গেলাম না। রান্না করিয়া যেই আমি ভাতের হাঁড়ি মাটিতে নামাইয়াছি অমনি কে আসিয়া রাস্তায় দরজার কাছে হাঁক দিল, "বাবু! ভিণ্ডি লেওগে।" আমি আমার দোতলার ঘর হইতে জিজ্ঞাসা করিলাম, "তুম্হারে পাস আওর ক্যা হ্যায়?" সে আমার প্রশ্নের উত্তরে বলিল, "আওর কুছ নহী হ্যায় সির্ফ ভিণ্ডি হ্যায়।" ঢেঁড়স ছাড়া আর কিছু আমার কাছে নাই। আমি নীচে নামিয়া গিয়া দেখি খুব বৃদ্ধ একটি মানুষ একখানি ডালাতে টাট্কা গুটি কয়েক ঢেঁড়স লইয়া আসিয়াছে। ঢেঁড়সগুলি দেখিয়া মনে হইতেছিল যে এখনি ঐগুলি গাছ হইতে ছিঁড়িয়া লইয়া আসিয়াছে। আমি সেই বুড়োকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "ইন্ ভিণ্ডিয়োঁ কা ক্যা দাম লেওগে।" সে বলিল, "তিন পয়সা।" আমি আর কোন কথা না বলিয়া তিনটি পয়সা দিয়া ঢেঁড়স কয়টি কিনিয়া আনিলাম। এই ঢেঁড়স দিয়াই সেদিন নারায়ণের ভোগের ঢেঁড়স চচ্চড়ি রান্না করা হইয়াছিল। এই হইল সেদিনকার সেই ঢেঁড়স চচ্চড়ির ক্ষুদ্র কাহিনী।

এই ব্যাপারটি হয় তো জগতের কাছে অতিশয় সাধারণ বলিয়া মনে হইতে পারে। কেহ কেহ সম্ভবতঃ বলিবেন ইহা "কাক-তালীয়বৎ" হইয়া গিয়াছে অর্থাৎ পরস্পর সম্বন্ধহীন অথচ অকস্মাৎ একসঙ্গে সজ্ঘটিত হইয়াছে দেখিয়া মনে হয় যেন পরস্পর কার্যকারণ সম্বন্ধযুক্ত। কিন্তু এই ঘটনাটি আমার হৃদয়ে এমন একটি অতি গভীর রেখা কাটিয়া দিয়া গিয়াছে যাহা কোন যুক্তিতর্কের দ্বারা কোন কালেই মিটিবে না। মাও সেইদিনই ঐ ঢেঁড়সের তরকারি দিয়াই যাচিয়া এই কাঙালের ঘরের কদন্ন গ্রহণ করিয়াছিলেন। কাঠফাটা রোদের মধ্যে দুপুরবেলা কে যে ঐ ঢেঁড়স লইয়া আমার দ্বারে উপস্থিত হইয়াছিল ইহা কি একটু ভাবিবার বিষয় নহে! একটি অশীতি বৎসরের বৃদ্ধ না জানি কতদূর হইতে ভিণ্ডি লইয়া আমার দ্বারে আসিতে পারে, আর আমি সমর্থ ব্যক্তি দুই পা গিয়া নারায়ণের জন্য তরকারি আনিতে পারিলাম না, ইহা কোন প্রকারেই সমর্থন করা যায় না। ইহাকে সেবাপরাধের মধ্যেই ধরা হইবে। দেব সেবায় অলসতা কোন মতেই প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নহে।

বাজিতপুর থাকাকালীন কোন সময় শ্রীশ্রীমা "পূর্ণ-ব্রহ্ম-নারায়ণ" বলিয়া আত্মপরিচয় দিয়াছিলেন। শ্রীভগবান্ যেমন তাঁহাকে উদ্দেশ্য করিয়া দেওয়া ভোগ সূক্ষ্মে গ্রহণ করিয়া থাকেন পক্ষান্তরে তিনি স্থূল শরীর ধারণ করিয়াও যে সেই ভোগ আহার করেন তার একটি প্রমাণ আজ এইভাবে পাইলাম। আমি আপন ঘরে বসিয়া মনে মনে কি ভাবিয়াছিলাম এবং নারায়ণকে কি বলিয়াছিলাম তাহা তো মায়ের জানিবার কোনই হেতু ছিল না। অথচ তিনি নারায়ণকে ভোগ নিবেদনের সময় আমার অলক্ষ্যে ঠিক সময় সেখানে উপস্থিত হইয়া তাঁহার উদ্দেশ্যে যে ভোগ দেওয়া হইয়াছিল তাহা সূক্ষ্মে অর্থাৎ দৃষ্টিদ্বারা গ্রহণ করিলেন পুনরায় সেই ভোগই তিনি প্রসাদরূপে স্বয়ং যাচ্ঞা করিয়া স্থূলে ভোজন করিয়াছিলেন। আমার মনে হয় আমাকে শিক্ষা দিবার জন্যই স্নেহময়ী শ্রীশ্রীমায়ের এই লীলার অবতারণা। এই ঘটনার পূর্বে কিংবা পরে কখনও কিন্তু তিনি এইভাবে আমার কাছে স্বয়ং যাচ্ঞা

করিয়া কিছু নেন নাই। ইহার মধ্যে যে কি গুহ্য রহস্য নিহিত আছে তাহা কেবল শ্রীশ্রীমা-ই জানেন। যদি কখন তিনি কৃপা করিয়া ইহার মর্ম উদ্‌ঘাটন করেন তবেই ইহা আমাদের পক্ষে জানা সম্ভব হইবে নচেৎ ইহা চিরকালের জন্যই প্রহেলিকাবৎ থাকিয়া যাইবে।

অনুরূপ একটি ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল সোলনে। হিমাচল প্রদেশের অন্তর্গত সোলন নগরে বাঘাট নরেশ শ্রীদুর্গা সিংজী বাস করিতেন। তিনি ছিলেন শ্রীশ্রীমায়ের অতিশয় পুরাতন ভক্ত এবং মাকে তিনি তাঁহার ইষ্টদেবীরূপেই পূজা করিতেন। পক্ষান্তরে মাও তাঁহাকে সন্তানের মত স্নেহ ও কৃপা করিতেন। মা আদর করিয়া তাঁহার নাম রাখিয়াছিলেন "যোগীরাজ" এবং সকল ভক্ত মাতৃসন্তান তাঁহাকে "যোগীভাই" বলিয়া ডাকিতেন। বর্তমান-যুগে তাঁহার ন্যায় একজন আস্তিক, স্বধর্মপরায়ণ ও নিরভিমান ত্যাগী রাজা বড় দেখা যায় না।

তিনি সোলনে একবার শ্রীশ্রীদেবী ভাগবতের নবাহ পারায়ণ করাইয়াছিলেন। মূল সংস্কৃত পাঠ করিতেন কাশীর বেদজ্ঞ পণ্ডিত শ্রীঅগ্নিহোত্রী শাস্ত্রী এবং হিন্দীতে ব্যাখ্যা করিতেন সিমলা সনাতনধর্ম কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীদিবাকর শাস্ত্রী এম, এ. মহোদয়। রাজা শ্রীদুর্গা সিংজীর বিশেষ আগ্রহে শ্রীশ্রীমা এই অনুষ্ঠানটিকে সর্বপ্রকারে সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্য সোলন গিয়াছিলেন। আমরা অনেকেই মার সঙ্গে এই উপলক্ষ্যে সোলন যাইবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলাম। মা সকালে মূল পাঠে এবং বৈকালে ব্যাখ্যার সময় উপস্থিত থাকিয়া সকলের আনন্দবর্ধন করিতেন। প্রত্যহই শ্রোতাগণের মধ্যে কেহ কেহ শ্রীমাকে এবং ব্যাখ্যাতাকে ফুল, ফল, মালা ও বস্ত্রাদি দিতেন। একদিন দেখা গেল এক দরিদ্র বৃদ্ধা মহিলা শ্রীশ্রীমাকে প্রণাম করিয়া একটি পাতার ঠোঙ্গায় কিঞ্চিৎ যবের ছাতু ও একটু গুড় অতি শ্রদ্ধার সহিত মায়ের চরণে নিবেদন করিলেন। পাহাড় অঞ্চলে এ জাতীয় উপঢৌকন বা উপহারকে 'ভেট' কহে। সাধু, সন্ন্যাসী

কি মহাত্মাদের নিকট কিংবা পাঠাদি শ্রবণ করিতে কেহ রিক্ত হস্তে গমন করে না। কিছু না কিছু, অন্ততঃ একটি ফুলও 'ভেট' লইয়া যাইবে। মহিলাটি মাকে ছাতু ও গুড় দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মা উহা আশ্রমের একটি মেয়েকে সরাইয়া রাখিতে বলিলেন এবং মায়ের আহারের সময় ঐ ছাতু ও গুড় তাঁহাকে দিতে নির্দেশ করিলেন। যথা সময়ে মা ভোজনে বসিয়া সেই আশ্রমবাসিনী কন্যাটিকে উহা আনিতে আদেশ দিলেন। ছাতু ও গুড় মায়ের সম্মুখে আনা হইলে প্রথম উহা হইতে একটু গ্রহণ করিয়া পরে মা রাজার বাড়ীর আর সব অন্নব্যঞ্জনাদি ভোজন করিলেন। শ্রীমদ্ভাগবতে আমরা দেখিতে পাই দ্বারকাধিপতি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার বাল্যসখা দরিদ্র শ্রীসুদামা ব্রাহ্মণের তণ্ডুলকণা যত আগ্রহ করিয়া ভোজন করিয়াছিলেন তত ঔৎসুক্যের সহিত মহালক্ষ্মীরূপিণী তাঁহার প্রধানা পাটরাণী শ্রীমতী রুক্মিণী দেবীর দেওয়া অতিশয় সুস্বাদু অন্নাদিও তেমনভাবে গ্রহণ করেন নাই। বিদুর পত্নীর প্রদত্ত কলার খোসা তিনি যত উপাদেয় বলিয়া খাইতেন মহারাণী শ্রীমতী সত্যভামা দেবীর নিবেদিত সুমিষ্ট ফল ও নানাবিধ পক্কান্নও তত প্রীতির সহিত গ্রহণ করিতেন না। শ্রীভগবানের স্বভাবই হইল দীনের কদর্য অন্নও অতিশয় অনুরাগের সহিত গ্রহণ করা। শ্রীশ্রীমা তাঁহার নাম বদলাইয়াছেন, রূপ পালটাইয়াছেন কিন্তু স্বভাব পরিবর্তন করেন নাই, তাই মাঝে মাঝে ধরা পড়িয়া যান ব্যবহারে।

শ্রীশ্রীমায়ের আত্মপরিচয় দান

বহুদিন পূর্বে যখন শ্রীশ্রীমা বাজিতপুর থাকিতেন তখন একদিন শ্রীজানকীবাবুর প্রশ্নের উত্তরে "পূর্ণ ব্রহ্ম-নারায়ণ" বলিয়া তিনি আত্ম-পরিচয় দিয়াছিলেন। এই প্রকার আরও কয়েকবার মা কথা প্রসঙ্গে আপন পরিচয় দিয়াছেন। উহার মধ্যে একটি ঘটনার বিবৃতি নিম্নে দিবার প্রয়াস করা যাইতেছে।

শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী আশ্রমে শ্রীগুরুপ্রিয়া দেবী ছাড়া আরও তিনজন অক্লান্ত কর্মী আমরা দেখিতে পাই। একজন হইলেন শ্রীমৎ স্বামী পরমানন্দজী, দ্বিতীয় হইলেন শ্রীকমলা প্রসন্ন ভট্টাচার্য (বর্তমানে ব্রহ্মচারী বিরজানন্দ) এবং তৃতীয় হইলেন শ্রীপানু ব্রহ্মচারী (শ্রীকনকাংশু বসু)। বারাণসীতে আশ্রম প্রতিষ্ঠার পর হইতে সেখানে প্রত্যেক বৎসরই বসন্তকালে শ্রীশ্রীবাসন্তী দেবীর পূজা হইয়া আসিতেছে। এই পূজায় কোনবার মা উপস্থিত থাকেন, অধিকাংশ সময়ই তিনি থাকিতেন না। উপর্যুক্ত তিনজন কার্যদক্ষ মায়ের সন্তানদের চেষ্টায় ও পরিশ্রমে বসন্তকালীন দুর্গোৎসব এযাবৎ সম্পূর্ণরূপে সুসম্পন্ন হইতেছে। শ্রীশ্রীমা উপস্থিত থাকিলে যে এই পূজা অতিশয় সমারোহের সহিত হইয়া থাকে ইহা বলাই বাহুল্য।

একবার এই বাসন্তীপূজার সময় মা দয়া করিয়া কাশী আসিয়াছিলেন কিন্তু বিশেষ কারণবশতঃ উপর্যুক্ত তিনজন কর্মীর মধ্যে কেহই কাশীতে সেই সময় ছিলেন না। মায়ের নূতন আশ্রম নির্মাণ কার্যের জন্য স্বামী পরমানন্দজী বৃন্দাবন গিয়াছিলেন এবং অপর দুইজন আশ্রমের বিশেষ কার্যোপলক্ষে কাশীর বাহিরে ছিলেন। এই হেতু মা তাঁহার এই অকেজো সন্তানকে কি জানি কেন একটু কাজকর্ম দেখিতে বলেন।

বাসন্তীপূজার দ্বিতীয় দিন অর্থাৎ মহাষ্টমীর দিন দেবীর পূজা ও

ভোগের বিশেষ ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ভগবতীর পূজা দেখিতে ও ভোগের প্রসাদ পাইতে বহুলোক আসিয়াছেন। ইহার মধ্যে নিমন্ত্রিত ও অনিমন্ত্রিত সকল রকম লোকই আছেন। আশ্রমখানি লোকে পরিপূর্ণ—কোথাও একটু স্থান খালি নাই। মায়ের তত্ত্বাবধানে যথাসময়ে দেবীর পূজা, পুষ্পাঞ্জলি, ভোগ ও আরতি অতিশয় সুষ্ঠুভাবেই সম্পন্ন হইয়াছে। এখন সকলের প্রসাদ পাইবার পালা। জননী আমার স্বয়ং এখানে সেখানে ঘুরিয়া ঘুরিয়া সকলকে মধুর ব্যবহারে আপ্যায়িত করিতেছেন। যেখানে কাজের জন্য যাইতেছি সেখানেই দেখিতেছি মা গরদের কাপড় পরিয়া, খড়ম পায়ে দিয়া, রাজরাজেশ্বরী মূর্তিতে মৃদু মধুর হাসিতে বিরাজিতা। ভক্তদের সঙ্গে নানা প্রকার কথাবার্তা, হাস্যপরিহাস করিয়া মা আনন্দময়ী আনন্দের হাট বসাইয়াছেন। মায়ের মাথায় পিছন হইতে শ্রীমান্ পটলভাই ছাতা ধরিয়া চলিতেছে। অল্প বয়সের কুমারী মেয়েরা সব দল বাঁধিয়া মাকে অনুসরণ করিতেছেন। দেবী মহামায়া যেন 'যোগিনী-কোটি-পরিবৃতা' হইয়া চলিয়াছেন। আমি একটু ব্যস্ততার সহিত সকলের প্রসাদ পাইবার ব্যবস্থা করিতেছিলাম। এমন সময় মায়ের সঙ্গে আমার দেখা হইল আশ্রমের "সেবালয়ের" কাছে। আশ্রমের অফিসের (Office) নাম দিয়াছেন মা ' সেবালয়" কারণ এখান হইতেই আশ্রমের যাবতীয় কার্য সম্পাদন হইয়া থাকে। আশ্রমের সব কাজই সেবা বলিয়া মনে করা হয়। এই ভাবটি মনে রাখিতে পারিলে তবেই কর্ম হয় চিত্তশুদ্ধির কারণ নতুবা কর্ম সৃষ্টি করে অভিমান ও বন্ধন। মা আমাকে বলিলেন— 'সকলের প্রসাদ পাইবার কি ব্যবস্থা করিতেছ? দেখিতেছ না, বেলা কত হইয়াছে। তাড়াতাড়ি সবাইকে প্রসাদ পাইতে বসাইয়া দেও। আর দেরী করিও না।'

আমি—হাঁ মা! সকলের প্রসাদ গ্রহণের ব্যবস্থাই তো করিতেছি। আগে সব নিমন্ত্রিত লোকদের বসাইয়া দেই, তারপর অনিমন্ত্রিত ব্যক্তিদের বসাইয়া দিব। বিনা প্রসাদ গ্রহণে কাহাকেও যাইতে দিব না। সকলেই প্রসাদ পাইবে।

মা—চৈত্র মাসের দিন, অনেক বেলা হইয়া গিয়াছে। নিমন্ত্রিত,

অনিমন্ত্রিত সবাইকে এক সঙ্গে প্রসাদ পাইতে বসাইয়া দেও। আর দেরী করিও না। সকলেই তো প্রসাদ পাইতে আসিয়াছে।

আমি—মা! সকলকে একসঙ্গে বসাইয়া দিলে কি করিয়া হইবে? আমাদের তো ব্যবস্থা করা হইয়াছে তিনশত লোকের। আর লোক যাহা দেখিতেছি তাহাতে অনুমান হয় লোক-সংখ্যা চারিশতের উপরে হইবে। একসঙ্গে সকলকে বসাইলে কি করিয়া কুলাইবে? (মায়ের দৃষ্টিতে নিমন্ত্রিত ও অনিমন্ত্রিত সবাই সমান। সকলেরই শ্রীশ্রীবাসন্তীদেবীর প্রসাদে তুল্য অধিকার।)—আমার এই কথার উপর বেশ একটু জোরের সহিত হঠাৎ মায়ের মুখকমল হইতে বাহির হইল, "ভাবনা কি? একসঙ্গে সকলকে প্রসাদ পাইতে বসাইয়া দাও। আমি তো আছি, চিন্তা কি?" এই রকম কথা মা সাধারণতঃ বড় বলেন না। "আমি" শব্দ তো মা খুবই কম বলেন। "আমি" শব্দের স্থানে মা প্রায়ই "এই শরীরটা" বলিয়া থাকেন। সেইদিন কি জানি কেন মায়ের শ্রীমুখ হইতে এই প্রকার কথা বাহির হইয়া পড়িয়াছিল। অকস্মাৎ মায়ের মুখ হইতে এই কথা শুনিবার সঙ্গে সঙ্গে আমার সর্বশরীর রোমাঞ্চ দিয়া উঠিল। মায়ের আদেশমত নিমন্ত্রিত ও অনিমন্ত্রিত স্ত্রী, পুরুষ, বালক, বালিকা সব-মিলিয়া প্রায় চারিশত লোককে একসঙ্গে প্রসাদ গ্রহণের জন্য বসাইয়া দেওয়া হইল। কন্যাপীঠের নীচে, উপরে হলঘরে, বারান্দায়, ছাতে ও উঠানে সকলে পাতা পাতিয়া মা দুর্গার 'প্রসাদ' পাইতে বসিয়া গেলেন। আশ্রমের ব্রহ্মচারী ও ব্রহ্মচারিণীরা সকলে কোমরে ও গায়ে গামছা বা তোয়ালে জড়াইয়া পরিবেশন করিতে লাগিলেন। আর জননী আমাদের স্বয়ং শ্রীশ্রীঅন্নপূর্ণামূর্তিতে মাথায় হরিদ্রা রংয়ের ভিজা তোয়ালে জড়াইয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া মহা-আনন্দে মহাষ্টমীর দেবীর প্রসাদ বিতরণ করিতে তৎপর হইলেন। মায়ের কৃপায় এত লোক অতি শৃঙ্খলার সহিত প্রসাদ পাইয়া "আনন্দময়ী মায়ের ও বাসন্তীদেবীর জয়ধ্বনি" দ্বারা আকাশ-বাতাস ও ভাগীরথীর তীর গুঞ্জরিত করিয়া যে যার গন্তব্য স্থানে গমন করিলেন। সেদিন এইভাবে মা ঘোর সঙ্কট হইতে আমাদের রক্ষা করিয়াছিলেন, নচেৎ কি অবস্থা যে সেদিন হইত তাহা বলা যায় না।

এতক্ষণ আমার চিন্তা করিবার সময় ছিল না। সকলের প্রসাদ পাওয়া শেষ হইবার পর হর্ষ ও বিষাদে আমার মন অতিশয় অভিভূত হইয়া পড়িল। দুঃখ এইজন্য হইয়াছিল—যে মায়ের নির্দেশমত সকলকে একসঙ্গে প্রসাদ পাইতে না বসাইয়া আগে নিমন্ত্রিতদের বসাইয়া পরে অনিমন্ত্রিতদের বসাইবার প্রস্তাব মায়ের সম্মুখে করিয়া আমি বড়ই অন্যায় ও গর্হিত কার্য করিয়াছিলাম। মায়ের আদেশ মানিয়া সকলকে একসঙ্গে প্রসাদ পাইতে বসানই আমার উচিত ছিল। মানুষের অহং বুদ্ধি কি এত সহজে যায়। সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে ইহাও উদয় হইল যদি আমি মায়ের কথা মত সকলকে একসঙ্গে প্রসাদ পাইতে বসাইয়া দিতাম এবং মায়ের কথার প্রতিবাদ না করিতাম তাহা হইলে তো মহামায়া শ্রীশ্রীমায়ের শ্রীমুখ হইতে তাঁহার আত্মপরিচয় এইভাবে হঠাৎ সেইদিন বাহির হইত না এবং আমারও মায়ের মুখ হইতে উহা শ্রবণ করিবার সৌভাগ্য হইত না। মায়ের কথা না শোনাতেই তো মা জোরের সহিত আমাকে তাঁহার স্বরূপের পরিচয় স্বয়ং এইরূপে অকস্মাৎ দিয়া ফেলিয়াছিলেন। মায়ের আজ্ঞা পালন না করিবার জন্য বিষাদ এবং তাঁহার আত্ম-পরিচয় প্রাপ্তি হেতু হইয়াছিল মহা আনন্দ—যুগপৎ এই দুইটি ভাব আমার হৃদয়কে অত্যন্ত তোলপাড় করিতে লাগিল। মায়ের আমার সবই অদ্ভুত—সকলই সৃষ্টিছাড়া। কোথায় মানুষ তাহার কথা না শুনিলে হয় অসন্তুষ্ট—করিয়া থাকে রাগ। পরন্তু মায়ের আদেশ পালন না করায় জানিলাম তাঁহার স্বরূপ বা আত্মপরিচয়। ইহা কি আমার পক্ষে কম লাভের কথা!

তিনশত লোকের ভোজন সামগ্রী দিয়া চারিশত লোককে একসঙ্গে খাওয়াইতে বসাইতে কে সাহস করিতে পারে? তার উপর সকলেই সকাল হইতে অভুক্ত। এইরূপ পরিস্থিতির মধ্যে এই রকম কথাই বা জোর দিয়া কে বলিতে পারে? যিনি সর্ব-শক্তিমান, সর্বজ্ঞ, সর্বব্যাপী, কর্তুম্ অকর্তুম্ অন্যথা কর্তুম্ শক্তঃ—তিনিই মাত্র এই কথা এত জোরের সহিত বলিতে পারেন, **"আমি তো আছি—চিন্তা কি?"**

শ্রীশ্রীমায়ের জন্য ব্যাকুল হইতে পারিলে তিনি দর্শন দেন

একটি অতি প্রচলিত কিংবদন্তী বা জনশ্রুতি আছে মানুষ যদি শ্রীভগবান্‌কে পাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া এক পা অগ্রসর হয় ভগবান্ তাঁহার ভক্তের নিকট ধরা দিবার নিমিত্ত শত পা আগাইয়া আসেন। ইহা যে অত্যন্ত সত্য কথা তাহা আমরা শ্রীশ্রীমা আনন্দ-ময়ীর লীলাকাহিনীতে পাইয়া থাকি। আমরা দেখিয়াছি কেহ যদি মাকে দর্শন করিবার জন্য আত্যন্তিকভাবে ইচ্ছা করেন, জননী তাঁহার কাছে যাইবার জন্য যেন সর্বদাই প্রস্তুত হইয়া আছেন। আপন সুবিধা-অসুবিধার দিকে এমন কি স্বীয় শরীরের দিকে পর্যন্ত দৃষ্টি না দিয়া অসুস্থ দেহ লইয়াও তাঁহার বাসনা পূর্ণ করিবার মানসে ছুটিতেছেন অতি দূর দেশে। হয় তো কেহ কলিকাতায় অসুস্থাবস্থায় মাতৃদর্শনের অভিলাষে মায়ের চরণে আকুল হইয়া নিবেদন করিয়াছেন, অমনি জননী আমার উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের দারুণ গ্রীষ্মের মধ্যে এক হাজার মাইল দূর হইতে তাঁহাকে দর্শন দিতে চলিলেন। কলিকাতায় তাঁহাকে দর্শন দানে শান্ত করিয়া পুনরায় বারশত মাইল ভয়ানক গরমের মধ্যে প্রত্যাবর্তনকরতঃ অপর ভক্তের বাসনা পূর্ণ করিতেছেন। টাকা পয়সা, সুবিধা অসুবিধা, এমন কি নিজের স্বাস্থ্যের দিকেও ভ্রূক্ষেপ না করিয়া দর্শন-প্রার্থীকে দর্শনদানে পরিতৃপ্ত করিতেছেন। কেবল তিনি দেখেন কতটা আবেগের সহিত বা কতখানি ব্যাকুলতা লইয়া সে 'মাকে' দেখিতে চাহিতেছে। মাকে কেহ একান্ত আগ্রহের সহিত ডাকিলে মা যে-কোন প্রকারেই হউক তাঁহার আকাঙ্ক্ষা পূরণ করিয়াই থাকেন। প্রকৃত ভক্ত জানেন শ্রীভগবানকে পাইতে হইলে একমাত্র উপায় প্রেম বা ভালবাসা। তাই নিজ্ঞেয়-সন্ধানী অর্থাই Mystic সুফিরা মরমের সহিত বলিয়া থাকেন, "There is no stronger bond

than love to unite God and man, and Sufis recognised no other feeling more powerful than love."

ভগবানের সহিত মানবের মিলনের ভালবাসা হইতে অন্য কোন দৃঢ়তর উপায় নাই এবং সুফিগণ প্রেম হইতে অধিক শক্তিশালী অন্য কোন হৃদয়-ভাব বিশ্বাস করেন না বা স্বীকার করেন না। প্রেমপাগলিনী ও ভগবানের পরম ভক্ত মীরা ও তাঁহার ভজনে বলিয়াছেন, "বিনা প্রেম সে না মিলে নন্দলালা।" শ্রীমদ্ভাগবতের নবম স্কন্ধে শ্রীভগবান্ ঋষি দুর্বাসাকে স্পষ্ট বলিয়াছেন—

অহং ভক্তপরাধীনো হ্যস্বতন্ত্র ইব দ্বিজঃ।
সাধুভির্গ্রস্তহৃদয়ো ভক্তৈর্ভক্তজনপ্রিয়ঃ॥ ৯।৪।৬৩

হে দ্বিজ, আমি ভক্তের অধীন সুতরাং স্বাধীন হইয়াও আমি একরূপ পরাধীন, ভক্তজন আমার প্রিয় এবং সাধু ভক্তগণ আমার হৃদয় অধিকার করিয়া রাখিয়াছেন। শ্রীশ্রীমায়ের লীলার উদাহরণ বহু আছে তার মধ্যে দুইটি এখানে উল্লেখ করিলে আমার বক্তব্যটি অধিক পরিস্ফুট হইবে।

শ্রীমৎ স্বামী নির্গুণানন্দজী মহারাজ শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের একজন বৃদ্ধ সন্ন্যাসী। সাধারণের নিকট 'মুক্তিবাবা' নামেই ছিলেন পরিচিত। তিনি ব্রহ্মচারী অবস্থায় শ্রীশ্রীসারদা মায়ের নিকট হইতে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং সন্ন্যাস লইয়াছিলেন শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দজী (রাখাল মহারাজের) কাছ হইতে। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ মিশনে থাকাকালীন তিনি জীবনে বহু সেবাকার্য করিয়াছিলেন। পরবর্তী জীবনে শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ীর প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইয়া গত ১৯৪১ কি ১৯৪২ খৃষ্টাব্দ হইতে তাঁহার আশ্রয়ে থাকিয়া সাধন-ভজনে কালাতিপাত করিতে আরম্ভ করেন। শ্রীশ্রীমাকে তিনি স্বয়ং জগদম্বা বলিয়াই মনে করিতেন। তিনি অত্যন্ত বুদ্ধিমান ব্যক্তি ছিলেন এবং তাঁহার মত প্রত্যুৎপন্নমতিসম্পন্ন ব্যক্তি সাধারণতঃ বড় দেখা যায় না। তিনি গত ১৯৫১ খৃষ্টাব্দের ৩১শে ডিসেম্বর শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের মন্দিরে পা ভাঙ্গিয়া সেখানকার সরকারী হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য ভর্তি হইয়াছিলেন। সেই সময়

শ্রীশ্রীমাও পুরীতেই ছিলেন। সেখানে তাঁহার চিকিৎসার ভাল ব্যবস্থা হইবে না জানিয়া মা স্বয়ং তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া কলিকাতায় লইয়া আসেন এবং প্রেসিডেন্সী জেনারেল হাসপাতালে ক্যাবিনে রাখিয়া সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করিয়া দেন। স্বামিজীর সেবা-শুশ্রূষার যতটা সুবন্দোবস্ত হওয়া সম্ভবপর ছিল তাহাও মায়ের দয়ায় সব হইয়াছিল। এক মাসের মধ্যে মা পুরী হইতে কলিকাতায় তিনবার গিয়া 'মুক্তি মহারাজকে' দেখিয়া আসিয়াছিলেন। মায়ের স্থানীয় ভক্তদের মধ্যে অনেককে তাঁহার দেখাশোনা ও পুষ্টিকর খাদ্যের ব্যবস্থার জন্যও মা বলিয়া দিয়াছিলেন। আশ্রমের দুইজন উচ্চশিক্ষিত ব্রহ্মচারী মায়ের নির্দেশমত সদাসর্বদা তাঁহার নিকট থাকিতেন। ইহা ছাড়া হাসপাতালের শুশ্রূষাকারিণী বা নার্স ইত্যাদি তো ছিলই। মোট কথা মায়ের দয়ায় তাঁহার চিকিৎসা, সেবা, শুশ্রূষা ও ঔষধ-পথ্যাদির কোন ত্রুটি ছিল না।

১৯৫২ খৃষ্টাব্দের মার্চ ও এপ্রিল মাসে শ্রীশ্রীবাসন্তী পূজার সময় শ্রীশ্রীমায়ের সঙ্গে আমরা অল্প কয়েকজন দেহরাদুন হইতে একচল্লিশ মাইল দূরে গঙ্গার তটে আনন্দকাশীতে আছি। টিহিরী গাড়ওয়ালের রাজমাতা শ্রীআনন্দপ্রিয়াজীর বিশেষ আগ্রহেই মা এখানে আসিয়াছেন। রাজমাতার এই নামটি আমাদের শ্রীশ্রীমায়ের দেওয়া নাম। তাঁহার প্রকৃত নাম হইল শ্রীমতী কমলেন্দু সাহ। স্থানটি অত্যন্ত মনোরম ও অতি নির্জন। চারিদিকে পর্বতরাজ হিমালয়ের অভ্রভেদী অতিশয় উচ্চ শৃঙ্গ এবং ইহারই উপত্যকার মাঝখান দিয়া আঁকিয়া বাঁকিয়া চলিয়াছেন মা ভাগীরথী গঙ্গা উত্তরবাহিনী হইয়া। গিরিরাজের গাত্র বাহিয়া বক্রভাবে উঠিয়া গিয়াছে পুণ্যতীর্থ বদরিকাশ্রমের পার্বত্য পথ। শ্রীশ্রীমায়ের বিশ্রামের পক্ষে এইটি খুবই উপযুক্ত স্থান মনে করিয়াই মাতৃপ্রিয়া রাজমাতা শ্রীকমলেন্দু সাহ মাকে এখানে আনিয়াছেন। হিমাদ্রির প্রাকৃতিক সুন্দর পরিবেশের মধ্যে মা আপন খুশিমত যতক্ষণ ইচ্ছা ততক্ষণ স্বীয়ভাবে পড়িয়া থাকেন। প্রোগ্রামের কোনই বালাই নাই এখানে। সকাল সন্ধ্যায় মা যখন বসেন তখন তাঁহার সঙ্গে বিবিধ ধর্মালোচনা হয় এবং তিনিও প্রসঙ্গতঃ সুন্দর সুন্দর উপদেশ

প্রদান করিয়া আমাদের অবস্থানটি সর্বপ্রকারে আনন্দপ্রদ করিয়া তুলিয়াছিলেন। মাকে কেন্দ্র করিয়া আমাদের দিনগুলি বেশ একটানা ভালই কাটিতেছিল। বিশ্রামের দরুণ মায়েরও শরীর মোটামুটি ভালই ছিল। অতিশয় নিপুণতার সহিত রাজমাতাই সব ব্যবস্থা করিতেছিলেন। মা আরও কিছুদিন এই স্বভাব সুন্দর প্রকৃতি মাতার আরামদায়ক স্নেহের ক্রোড়ে অতিবাহিত করিতে পারিলে স্বাস্থ্যের উন্নতি হইত। সেখানে মায়ের নিকট সংবাদ পৌঁছিল মুক্তিবাবার ভাঙ্গা পা খানা প্ল্যাষ্টার (Plaster) করিয়া এবং পায়ের মধ্যে একটি লৌহ-শলাকা প্রবেশ করাইয়া উঁচুভাবে টানাইয়া রাখা হইয়াছে। তিনি কলিকাতার হাসপাতালে যাতনায় ছট্‌ফট্ করিতেছেন এবং মাকে দেখিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া মা, মা বলিয়া কাতর কণ্ঠে ডাকিতেছেন। সন্তানের প্রাণের আকুল প্রার্থনা স্নেহময়ী জননীর বক্ষে গিয়া লাগিয়াছে। মা কি আর সন্তানের কাছে না গিয়া অত দূর-দেশে বিশ্রামে থাকিতে পারেন? সন্তানবৎসলা মায়ের আমার স্বভাবই যে এই রকম।

সে বৎসর শ্রীশ্রীমায়ের শুভ জন্মোৎসব ২রা মে হইতে ১২ই মে পর্যন্ত পাঞ্জাবের লুধিয়ানা জিলার খান্না নামক স্থানে শ্রীমৎ স্বামী ত্রিবেণীপুরী মহারাজের সমাধিক্ষেত্রে অবধূত শ্রীকৃষ্ণানন্দজীর তত্ত্বাবধানেও বিশেষ আগ্রহে হওয়া স্থির হইয়াছিল। কথা হইয়াছিল জন্মোৎসবের কিছুদিন পূর্বে মা আনন্দকাশী হইতে দেহরাদুন কিষণপুর আশ্রমে কয়েক দিন বাস করিয়া তারপর খান্না যাইবেন। দেহরাদুন হইতে খান্না নামক স্থান অধিক দূরও নহে। মোটর গাড়ীতে চার পাঁচ ঘন্টায় যাওয়া যায়। আর দিন একুশ পর মায়ের জন্মোৎসব খান্নায় আরম্ভ হইবে। অতএব এই কয়টা দিন মা অনায়াসে আনন্দকাশী ও দেহরাদুন অবস্থান করিয়া পরে খান্না যাইতে পারিতেন। গরমের সময় এদিকটা বসবাসের পক্ষে সর্বতোভাবে অনুকূল ও আরামপ্রদ।

এপ্রিল মাসের শেষের দিকে উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে যে কি রকম 'লু' (মারাত্মক ভীষণ গরম বায়ু-প্রবাহ) চলিয়া থাকে তাহা কাহারও অবিদিত নাই। মায়ের সেইদিকে কোন লক্ষ্যই নাই। যেহেতু

মুক্তিবাবা মাকে দেখিবার জন্য কলিকাতায় হাসপাতালে রোগের নিদারুণ যন্ত্রণায় কাতর হইয়া ছট্‌ফট্‌ করিতেছেন এবং 'মা, মা' বলিয়া আর্তনাদ করিতেছেন। করুণাময়ী শ্রীশ্রীমা দেহরাদুন হইতে এই ভয়ঙ্কর গ্রীষ্মের মধ্যে প্রায় এক হাজার মাইল ব্যবধান কলিকাতায় তাঁহাকে দর্শন দিবার নিমিত্ত ছুটিলেন। পথের অসহনীয় ক্লেশ উপেক্ষা করিয়া ছত্রিশ ঘণ্টার পথ অতিক্রমের পর শ্রীশ্রীমা মুক্তিবাবার শয্যা পার্শ্বে অকস্মাৎ গিয়া উপস্থিত হইলেন। মাকে দেখিয়া তিনি এই ভীষণ রোগ যন্ত্রণার মধ্যেও আনন্দে বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহাকে দর্শনদানে একটু সুস্থির ও শান্ত করিয়া পুনরায় এই দুর্দান্ত গরমের মধ্যে পুনরায় যথা সময়ে আসিয়া উপস্থিত হইলেন খান্নায়। যেহেতু অবধূত শ্রীকৃষ্ণানন্দজীর বিনীত প্রার্থনা ও সনির্বন্ধ অনুরোধ ছিল ২রা মে হইতে ১২ই মে পর্যন্ত যেন মা তাঁহার গুরুদেব শ্রীমৎ স্বামী ত্রিবেণীপুরী মহারাজের সমাধিক্ষেত্রে উৎসবে উপস্থিত থাকেন। মধুর ব্যবহারে সকলকে তুষ্ট করিতে মায়ের মত এমন আর দ্বিতীয়টি দেখা যায় না—এই বিষয়ে মা যে আমাদের 'অদ্বিতীয়া' ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। মায়ের অশেষ গুণের মধ্যে ইহা যে একটি বিশেষ গুণ ইহা এক বাক্যে সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন। এইভাবে দারুণ গ্রীষ্মের অসহ্য গরম ও অসুবিধা ভোগ করিয়াও উভয় সন্ন্যাসীর প্রার্থনা পূর্ণ করিয়াছিলেন। এই রকম কর্ম ও ব্যবহার কেবল শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ীর পক্ষেই সম্ভব। বিশেষ করিয়া মা সন্ন্যাসীদের বিশেষ সম্মান দিয়া থাকেন। এমন স্নেহময়ী জননী বড় দেখা যায় না।

বহুদিনকার পুরাতন অনুরূপ আর একটি ঘটনা। একজন অতি বৃদ্ধ বৈষ্ণব সাধু, বয়স অনুমান পঁচাত্তর কি আশি হইবে। তাঁহার দৃষ্টিশক্তিও ছিল অত্যন্ত কম এবং একখানা পাও ছিল আঘাত প্রাপ্ত, ফলে তাঁহার চলাফেরা করিতে অতিশয় কষ্ট হইত। এই রকম জরাজীর্ণ শরীর লইয়া তিনি বহুকালাবধি পুরীধামে অতি নিষ্ঠার সহিত সাধন ভজন করিতেছিলেন। এই বৈষ্ণব মহাত্মার নাম ছিল শ্রীশ্যামদাস বাবাজী। তিনি ছিলেন ফরিদপুরের প্রসিদ্ধ মহাত্মা শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধুর শিষ্য বা অনুরাগী ভক্ত। শ্রীশ্যামদাস

বাবাজী কাহারও মুখ হইতে শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ীর নাম, লীলা-কথা ও যোগজ বিভূতির বিষয় শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য বড়ই ব্যাকুল হইয়া পড়েন। বাবাজীর সেবা শুশ্রূষার নিমিত্ত একজন লোক তাঁহার নিকট থাকিতেন। একদিন ঐ বৃদ্ধ সাধুটি তাঁহার সঙ্গীয় সেবকটিকে বলিলেন, "দেখ, শুনিলাম শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী এখন পশ্চিমের দেহরাদুন কিংবা বিন্ধ্যাচলে আছেন। কিছুদিন পূর্বে নাকি তিনি পুরী আসিয়াছিলেন। তখন মায়ের সংবাদ পাই নাই, সেইজন্য তাঁহাকে দর্শন করিতে পারি নাই। তিনি আবার কবে যে এখানে আসিবেন তার তো নিশ্চয়তা নাই। আমার এই জরাজীর্ণ দেহও যে আর কতদিন থাকিবে তার কোন স্থিরতা নাই। অতএব তিনি এখন যেখানে আছেন সেইখানে আমাকে লইয়া চল। মাকে গিয়া একবার দর্শন করিয়া আসি।" বৃদ্ধের মুখে এই কথা শুনিয়া সেই সঙ্গীয় সেবকটি বলিল, "আপনার শরীর খারাপ, বয়সও যথেষ্ট হইয়াছে। আপনি উঠিয়া গিয়া নিজের আবশ্যকীয় কাজগুলি পর্যন্ত স্বয়ং করিতে পারেন না। এই অবস্থায় আপনাকে কি করিয়া এতদূর পশ্চিমে লইয়া যাওয়া সম্ভব হইবে? আপনি তো অনেক দিন যাবৎ এই নীলাচলধামে বাস করিতেছেন। কখনও তো এইস্থান ত্যাগ করিয়া অন্যত্র যাইতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন নাই। তবে মা আনন্দময়ীকে দেখিবার জন্য আজ আপনার এত আগ্রহ কেন? সেবকের মুখে এই কথা শুনিবার পর বৈষ্ণব মহাত্মা বলিয়াছিলেন, "শ্রীশ্রীমায়ের কথা শুনিবার পর হইতেই কি জানি কেন তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য মনটা বড়ই ব্যাকুল হইয়াছে। চল না আমাকে নিয়া, মাকে দর্শন করিয়া আসি।"

পুরী হইতে দেহরাদুন কিংবা বিন্ধ্যাচল কম দূর নয়। এই দীর্ঘ পথ ঐ অশীতি বৎসরের অচল বৃদ্ধকে লইয়া যাওয়া এবং পুরীতে ফিরিয়া আসা সহজ ব্যাপার নহে। সেই নিমিত্ত বাবাজীর সঙ্গের লোকটি কিছুতেই তাঁহাকে লইয়া অত দূরদেশে যাইতে স্বীকার হইতেছিলেন না। বাবাজীরও শরীরে এমন শক্তি ছিল না যাহাতে তিনি অপরের সাহায্য ব্যতীত একাকী

এত দূরদেশে যাইতে পারেন। অতএব মাতৃদর্শনের কোন আশা তাঁহার আর নাই জানিয়া তিনি একেবারে হতাশ হইয়া পড়িয়াছিলেন। বৃদ্ধ বৈষ্ণবসাধুটিকে এইভাবে নিরাশ হইতে অবলোকন করিয়া কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী ও দানবীর শ্রীমহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয়ের ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীতারকনাথ ভট্টাচার্য মহাশয় তাঁহাকে বলিলেন, "আপনি এত হতাশ হইয়া পড়িতেছেন কেন? মা আনন্দময়ী নাকি সকলের মনের ভাব জানিতে পারেন। সত্য সত্যই তিনি যদি অন্তর্যামী হন, তাহা হইলে তিনি আপনার এই প্রকার ব্যাকুলতা দেখিয়া কখনও দর্শন না দিয়া থাকিতে পারিবেন না। তিনি অবশ্যই এখানে আসিয়া আপনাকে দেখা দিবেন। আপনি ধৈর্য ধারণ করুন—শান্ত হউন। মাকে আকুল প্রাণে ডাকুন।"

বৃদ্ধ মহাত্মার ঐকান্তিক ব্যাকুলতার মর্মস্পর্শী ডাক আসিয়া বাজিল দূরে—বহুদূরে অবস্থিত স্নেহময়ী শ্রীশ্রীমায়ের কোমল হৃদয়ে। সন্তানকে দর্শন না দিয়া মা কি আর স্থির থাকিতে পারেন অত দূর-দেশে। সন্তানবৎসলা মা তখনই আবার ছুটিলেন পুরী। এইমাত্র অল্প কয়েকদিন হয় মা পুরী হইতে ফিরিয়াছেন। এখনই পুনরায় সেখানে যাইবার যে কি প্রয়োজন থাকিতে পারে তাহা আমরা কোন প্রকারেই ধারণা করিতে পারিলাম না। কাহারও নিকট কোন কারণ ব্যক্ত না করিয়া দেহরাদুন হইতে বিন্ধ্যাচল আসিয়া মা পুনরায় সোজা নীলাচলে চলিলেন। এইবার পুরী যাইবার সময় সঙ্গে মাত্র বাবা শ্রীভোলানাথ ও শ্রীবিরাজমোহিনী দেবী ছাড়া আর কোন লোকজন লইলেন না। কলিকাতা গিয়া বাবা ভোলানাথকে অনেক করিয়া সান্ত্বনা দিয়া সেখানে রাখিয়া বিরাজমোহিনী দেবী ও কমলাপ্রসন্ন ভট্টাচার্যকে সঙ্গে লইয়া মা পুরী যাত্রা করিলেন।

নীলাচল ধামে পৌঁছিয়াই তাড়াতাড়ি সেই অশীতি বৎসরের বৃদ্ধ জরাজীর্ণ সাধুটির বাসস্থানে গিয়া মা উপস্থিত হইলেন। সাধুটির বাসস্থানের ঠিকানা যে মা কি করিয়া জানিলেন তাহা আমাদের মানববুদ্ধির অগোচর। ইহা যে মায়ের অলৌকিক

শক্তির পরিচয় দিতেছে তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। যিনি এক হাজার মাইল দূরের ডাক শুনিতে পারেন তাঁহার পক্ষে একটা ঠিকানা জ্ঞাত হওয়া বেশী বড় কথা নহে। শ্রীশ্যামদাস বাবাজী মহারাজ আশাতীতরূপে ভক্তবৎসলা শ্রীশ্রীমাকে এইভাবে হঠাৎ প্রাপ্ত হইয়া অতিশয় আনন্দে অভিভূত হইয়া পড়িলেন। তিনি স্বপ্নেও কখন কল্পনা করিতে পারেন নাই যে ঘরে বসিয়া এই রকমে এত শীঘ্র মায়ের দর্শনলাভ তাঁহার পক্ষে সম্ভবপর হইবে। তিনি তো মায়ের দর্শনের আশা সম্পূর্ণরূপে ছাড়িয়াই দিয়াছিলেন। যিনি কাহারও নিকট হইতে কোন সাহায্যের প্রত্যাশা করেন না বা রাখেন না তাঁহাকে সর্বাগ্রে শ্রীভগবান সহায়তা করিয়া থাকেন। তাই কবি শ্রীরজনীকান্ত সেন মরমীয়া ভাষায় গাহিয়াছেন—"যার কেহ নাই তুমি আছ তার। একি সব মিছে কথা ভাবিতে যে ব্যথা বড় লাগে প্রভু মরমে॥ কেন বঞ্চিত হ'ব চরণে॥" এই প্রকারে মা হঠাৎ সেই বৃদ্ধ বৈষ্ণব সাধুটিকে দর্শন দিয়াই পুনরায় সেখান হইতে কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করিয়াছিলেন। ইহাদ্বারা অতি সুস্পষ্টভাবেই অনুমান করা যায়—মহাত্মাকে দর্শন দিবার জন্যই শ্রীশ্রীমায়ের উত্তর প্রদেশ হইতে পুরীধামে উপস্থিতি। এই রকম যে কতই ঘটনা প্রতিদিন সংঘটিত হইতেছে তাহার কয়টারই বা আমরা সন্ধান রাখি। মা যে ভারতব্যাপী কেন ঘুরিয়া বেড়ান এবং ইহার পশ্চাতে যে কি উদ্দেশ্য, তা আমাদের এই স্থূল বুদ্ধির অবোধ্য। এইভাবে যে মা কত দর্শন-প্রার্থীদের দর্শন দিয়া তাঁহাদের বাসনা পূর্ণ এবং জীবন কৃতার্থ করিতেছেন তাহার কতটুকুই বা সংবাদ আমরা পাই। দুই চারিটি ঘটনা মা কথা প্রসঙ্গে দয়া করিয়া অকস্মাৎ বলিয়া ফেলেন বলিয়া আমরা কেহ কেহ জানিতে পারি।

শ্রীশ্রীমায়ের চরণে আন্তরিক প্রার্থনা নিবেদন করিলে মা যে তাহা যে কোন উপায়েই হউক পূর্ণ করিয়া থাকেন উপর্যুক্ত ঘটনা দুইটি দ্বারা তাহা বেশ হৃদয়ঙ্গম করা যায়। আকুল প্রাণে ব্যাকুল হইয়া ডাকিলে জননী সন্তানদের ডাকে সাড়া না দিয়া থাকিতে পারেন না। সন্তানদের সর্বপ্রকার কল্যাণ সাধনের

নিমিত্তই বিশ্বজননীর এই অপ্রাকৃত ভাবঘন শ্রীদেহ ধারণ। মা তো সর্বক্ষণই তাঁহার সন্তানদের প্রতি করুণা নয়নে চাহিয়া আছেন। আমাদের দৃষ্টি বহির্মুখী, সেইজন্য তাঁহার অসীম কৃপা অনুভব করিতে পারি না। কঠোপনিষদে এই বহির্মুখী বৃত্তি সম্বন্ধে একটি অতি সুন্দর মন্ত্র দেখিতে পাওয়া যায়—

পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভূ-
স্তস্মাৎ পরাঙ্ পশ্যতি নান্তরাত্মন্।
কশ্চিদ্ধীরঃ প্রত্যগাত্মানমৈক্ষদ্
আবৃত্তচক্ষুরমৃতত্বমিচ্ছন্॥২।১।১

স্বয়ম্ভু ভগবান্ ইন্দ্রিয়সমূহকে বহির্মুখ করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। বিবেকের অভাবে অধিকাংশ মানুষ এই কথা না জানিয়া এবং বিষয়ে আসক্ত হইবার দরুন উন্মত্তের ন্যায় আপাত-রমণীয় কিন্তু পরিণামে পরমেশ্বরের নিকট হইতে অতি দূর নরকের দ্বার-স্বরূপ অশুদ্ধ বিষয় ভোগেই লিপ্ত হইয়া থাকে। তাহারা অন্তর্যামী পরমাত্মাকে দেখেই না বা তাঁহার দিকে দৃষ্টিপাতই করে না। অতি অল্প সংখ্যক কোন কোন বিবেকী ও বুদ্ধিমান ব্যক্তিই সৎসঙ্গ ও শ্রীভগবানের অহৈতুকী কৃপায় অপবিত্র বিষয় ভোগের পরিণাম যে দুঃখ তাহা জানিয়া এবং অমৃতত্বের অভিলাষী হইয়া ইন্দ্রিয়-সংযমপূর্বক প্রত্যগাত্মাকে (প্রত্যেক জীবে অবস্থিত আত্মা) দর্শন করেন। শ্রীশ্রীমায়ের ভাগ্যবান্ সন্তানদের মধ্যে যাঁহাদের দৃষ্টি সর্বদাই মাতৃ-মুখী হইয়া আছে তাঁহারা অনুক্ষণ স্নেহময়ী মায়ের করুণার পবিত্র স্পর্শ পাইতেছেন।

এই জন্যই শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় শ্রীশ্রীভগবান্ অর্জুনকে লক্ষ্য করিয়া বিশ্ববাসীকে উপদেশ দিয়াছেন—

সমোঽহং সর্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ।
যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্॥ ৯।২৯

আমি সকল ভূতেই সমান ভাবে অবস্থিত আছি, আমার দ্বেষ্য বা প্রিয় কেহই নহে। তবুও যেসকল ব্যক্তি ভক্তিপূর্বক আমাকে ভজনা করে, তাহাদের আত্মাতে আমার সত্তা প্রকাশ পায় এবং তাহারাও আমাতে বিদ্যমান থাকে। যে কেহ মাকে শ্রদ্ধা ও প্রীতির

সহিত ভক্তিপূর্বক আপন ভাবিয়া ডাকে, স্নেহময়ী মা তাঁহার নিকট সত্বর প্রত্যক্ষীভূত হইয়া থাকেন। শ্রীভগবান্ আরও বলিয়াছেন—

অনন্যচেতাঃ সততং যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ।
তস্যাহং সুলভঃ পার্থ নিত্যযুক্তস্য যোগিনঃ॥ ৮।১৪

হে পার্থ! সর্বদা অনন্যচেতা হইয়া যিনি আমাকে স্মরণ করেন, সেই নিত্যযুক্ত যোগীর পক্ষে আমি সুলভ অর্থাৎ অনায়াসলভ্য হইয়া থাকি। অন্য কোন বিষয়ে যাহার চিত্ত যায় না এমন একনিষ্ঠ হইয়া যদি মাকে আপন ভাবিয়া আঁকড়াইয়া ধরা যায়, তাহা হইলে যে তিনি অচিরেই চিরকালের মত অতি আপন হইয়া ধরা দেন তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। আমার পঞ্চাশ বৎসরের অভিজ্ঞতার ফলে ইহা আমি দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারি।

আমায় পাগল ক'রে দে

তোর নামেতে আমায় মাগো, পাগল ক'রে দে।
সব ছাড়ায়ে তোর কাছেতে, মাগো আমায় টেনে নে॥
পাগল ছিল শুক সনাতন, পাগল ছিল ভোলা।
পাগল ছিল মুনি নারদ, নামে পাগল গোরা॥
কৃষ্ণপ্রেমে ছিল পাগল, ব্রজগোপিনীরা।
গিরিধারীর তরে পাগল, রাজপুতানার মীরা॥
মায়ের নামে পাগল প্রসাদ[১], আর এক পাগল গদা[২]।
পাগল ছিল কান্তকমল[৩], প্রেমে পাগল রাধা॥
পাগল ছিল মায়ের ছেলে, মাগো তারাপীঠের বামা[৪]।
পাগল সেদিন হ'য়েছিল, মাগো তোর তরেতে রমা[৫]॥
পাগল বিনা কে পেয়েছে, ধরতে মাগো তোরে।
তেমনি পাগল করগো আমায়, তোর চরণ পাবার তরে॥

---

১ শ্রীরামপ্রসাদ সেন। ২ গদাধর শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস। ৩ সাধক শ্রীকমলাকান্ত। ৪ শ্রীবামাক্ষেপা। ৫ শ্রীযুক্ত রমণীমোহন চক্রবর্তীর সহিত শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ীর লৌকিক দৃষ্টিতে বিবাহ হইয়াছিল। রমণীমোহন যখন তারাপীঠে মায়ের আদেশে শক্তিসাধনা করিতেন তখন নিজেকে "রমাপাগলা" বলিতেন। তারাপীঠে বহুদিনপূর্বে "বামাক্ষেপা" শক্তিসাধনা করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। সেই তারাপীঠেই রমণীমোহন সাধনা করিতেন। তাঁহার ছোটবেলার ডাকনাম ছিল "রমা"। রমণীর সংক্ষিপ্ত নাম "রমা"।

আমার প্রব্রজ্যা বা সন্ন্যাস গ্রহণের ক্ষুদ্র কাহিনী

শ্রীশ্রীসাবিত্রী মহাযজ্ঞের প্রারম্ভেই করুণাময়ী শ্রীশ্রীমা তাঁহার এই অধম সন্তানকে কৃপা করিয়া বলিয়াছিলেন, "তুমি যখন গায়ত্রী মন্ত্র পড়িয়া যজ্ঞকুণ্ডে প্রজ্বলিত অগ্নিতে আহুতি দিবে তখন প্রত্যেক আহুতির সময় মনে মনে চিন্তা করিবে—তোমার দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহংকার সব কিছু অর্থাৎ নিজেকে হোমাগ্নিতে আহুতি দিতেছ।" মায়ের এই বহুমূল্যবান আদেশটি যথাসাধ্য আমি সুদীর্ঘ তিন বৎসর যজ্ঞের সময় পালন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম। 'চেষ্টা করিয়াছিলাম' লেখাটা সম্পূর্ণ ভুল। মা দয়া করিয়া আমাদ্বারা তাঁহার আদেশ পালন করাইয়া লইয়াছিলেন।

এই অখণ্ড সাবিত্রী মহাযজ্ঞের পরিসমাপ্তির পর হইতে পরম স্নেহময়ী শ্রীশ্রীমা কেবলই আমাকে কোন দণ্ডী সন্ন্যাসীর নিকট হইতে সন্ন্যাস গ্রহণ করিবার জন্য বলিতেছেন। আমিও তাঁহার চরণে বারবারই নিবেদন করিয়াছি, "মা! তোমার নিকট হইতে যাহা আমি পাইয়াছি তাহাই আমার ন্যায় ক্ষুদ্র জীবের পক্ষে যথেষ্ট। আবার পৃথক্‌ভাবে সন্ন্যাস লইবার প্রয়োজন কি? মা! তুমি অহৈতুকী কৃপা করিয়া যাহা দিয়াছ তাহারই যেন সম্মান রক্ষা করিতে পারি এই আশীর্বাদ তুমি কর। ইহা হইতে অধিক আর কিছুর অভিলাষ আমার নাই। তুমি করুণা করিয়া যাহা আমাকে প্রদান করিয়াছ তাহাতেই আমি সন্তুষ্ট—পরিতুষ্ট।" ইহার উত্তরে মা বলিয়াছিলেন "তাহা তো তোমার আছেই। তপাপি লৌকিক বিধিমত বিরজা হোমাদি করিয়া সন্ন্যাস লও। জ্যোতিষ (ভাইজী) অলৌকিকভাবে সন্ন্যাস লইয়া ছিল। স্বামী অখণ্ডানন্দ লৌকিক-ভাবে বিধিপূর্বক সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিল। তোমার না হয় দুই ভাবেই হইল, তাতে ক্ষতি কি?"

প্রথমে মা 'শৃঙ্গেরীমঠ' হইতে দণ্ডগ্রহণের জন্য বলিয়াছিলেন।

তদনুসারে ঐদিকের এক দণ্ডীস্বামী শ্রীমৎ সচ্চিদানন্দ সরস্বতীর নিকট হইতে আবশ্যকীয় খোঁজখবরও সংগ্রহ করাইয়াছিলেন। পরে বলিলেন, "দেখ, কাশীতে কোন বৃদ্ধ ও ত্যাগী দণ্ডী সন্ন্যাসী আছেন কিনা, যাঁহার কাছ হইতে দণ্ডগ্রহণ করিতে পার। ভোলানাথেরও দণ্ড লইবার ইচ্ছা হইয়াছিল।" এইরকম সব কথা মা মাঝে মাঝেই আমাকে বলিতেন। আমার কিন্তু লৌকিকভাবে অনুষ্ঠানাদি করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণের আদৌ ইচ্ছা ছিল না। গৈরিক বস্ত্রকে চিরকালই আমি অতিশয় সম্মান করিতাম, কিন্তু স্বয়ং উহা ধারণ করিবার মত সাহস আমার ছিল না। মহাত্মা শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রভু বলিতেন, 'কাষায় বস্ত্র পরিধান করিবার যোগ্যতা অর্জন না করিয়া যদি উহা ধারণ করা যায় তাহা হইলে প্রত্যবায়ের ভাগী হইতে হয়'।

১৯৪২ খৃষ্টাব্দে যখন আমি দেহরাদুনের অন্তর্গত রায়পুরের মায়ের আশ্রমে বাস করিতাম তখন পরমারাধ্যা শ্রীশ্রীমা আমাকে শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা করিতে বলিয়াছিলেন। সেই সময় আমি দীক্ষিত ছিলাম না বলিয়া শক্তিপূজা করিতে সাহস করি নাই। শ্রীশ্রীমায়ের বাক্য অমোঘ। তাঁহার মুখকমল হইতে যাহা একবার নির্গত হয় তাহা আজ হউক, কি কাল হউক, কি দশদিন পরেই হউক, উহা ফলপ্রসূ অবশ্যই হইবে। এমনই মায়ের আমার অব্যর্থ বাণী। তিনি আমাকে যে দুর্গাপূজা করিতে নির্দেশ করিয়াছিলেন সেই আদেশ যে কোন প্রকারেই হউক না কেন পূর্ণ করিতেই হইবে। বহুকাল পূর্বে আমি একবার স্বপ্নে আদিষ্ট হইয়াছিলাম, শ্রীশ্রীমা দুর্গা আমাকে বলিতেছেন, "তুই আমার পূজা কর।" স্বপ্নেই আমি মা দুর্গাকে নিবেদন করিলাম, "মা! আমি গরীব মানুষ, কি করিয়া তোমার পূজা করিব? সেই শক্তি আমার কোথায়?" ইহার উত্তরে তিনি আমাকে পুনরায় বলিলেন, "যোগাড় কর সব ঠিক হইয়া যাইবে।"

দুর্গাপূজা করা চারিটিখানি কথা নহে। ইহাকে কলিযুগের রাজসূয় বা অশ্বমেধ যজ্ঞ বলা হইয়াছে। স্বপ্নের এই আদেশের উপর বিশ্বাস করিয়া আমি এতবড় দুর্গাপূজা করিতে স্পর্ধা বা

দুঃসাহস করি নাই। এতটা মানসিক বল আমার ছিল না।' এখন দেখিতেছি শ্রীশ্রীমা দুর্গা এবং আমাদের শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী কৃপা করিয়া তাঁহাদের আদেশ আমাকে দিয়া সম্পাদন বা কার্যে পরিণত করাইয়া লইতেছেন। আমার এই স্বপ্নের কথা মা তো জ্ঞাত ছিলেন না। আমিও তো কখন মাকে আমার স্বপ্নের কথা ঘুণাক্ষরেও জানাই নাই। তবে মা ইহা জানিলেন কি করিয়া? মহাশক্তিরূপিণী শ্রীশ্রীমা এবং শ্রীশ্রীদুর্গা যে অভিন্ন বা এক তাহাই কি এইভাবে চোখে আঙ্গুল দিয়া তাঁহারা আমাকে দেখাইতেছেন! এই সকল দেখিয়া শুনিয়াও আমাদের অবিশ্বাসী মন কিছুতেই প্রত্যয় করিতে চাহে না আমাদের এই মা-ই যে স্বয়ং পরাশক্তি শ্রীশ্রীমা দুর্গা। জগতের কল্যাণের নিমিত্ত সেই মহাশক্তিই আনন্দময়ী মাতৃ-মূর্তি ধারণ করিয়া আবির্ভূতা হইয়াছেন। বিরজাহোম ও আত্মশ্রাদ্ধাদি করণান্তর বিধিপূর্বক শিখাসূত্র ত্যাগকরতঃ প্রৈষমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে নাকি দেবদেবীর বাহ্যপূজা ও যজ্ঞাদি করিতে নাই। সেইজন্য এই বৎসর অর্থাৎ ১৯৫০ খৃষ্টাব্দের বসন্তকালীন শ্রীশ্রীবাসন্তী পূজার সময় আদ্যাশক্তিরূপিণী শ্রীশ্রীমা স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া তাঁহার এই অধম সন্তানের দ্বারা বসন্তকালীন শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা করাইয়াছিলেন। গত দুই বৎসর বাসন্তীপূজার সময় মা কাশীতে উপস্থিত ছিলেন না। আমাকে ধন্য করিবার জন্যই যেন তাঁহার এইবার বাসন্তীপূজায় বারাণসীতে অবস্থান। আমার পূজার্চনার বিষয়ে অভিজ্ঞতার কথা সর্বজ্ঞ-মায়ের অজানা নহে, সেইজন্য করুণাময়ী তাঁহার অনন্যভক্ত শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্যের দ্বারা মহামায়ার পূজায় তন্ত্রধারকের কার্য এবং আমাকে দিয়া পূজা করাইলেন। অবশেষে মায়ের কৃপায় এবং শ্রীমান্ বিশুর সুযোগ্য তন্ত্রধারকতায় শ্রীশ্রীদুর্গা-মাতার পূজা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হইল।

এই স্থানে একটি ছোট্ট ঘটনা উল্লেখ করিলে আশাকরি অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। সহৃদয় পাঠক ও পাঠিকাদের মধ্যে কাহারও হয় তো ইহা ভাল লাগিতে পারে এই ভরসায় ঘটনাটি এখানে সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিতে চেষ্টা করিতেছি।

তন্ত্রশাস্ত্রের অসাধারণ পণ্ডিত, সুবক্তা এবং উচ্চস্তরের মাতৃ-সাধক শ্রীশিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব মহাশয়ের নাম অনেকেই শুনিয়া থাকিবেন। তিনিই ছিলেন সুপ্রসিদ্ধ স্যার জন উড্‌রফ (Sir John Woodruff) সাহেবের গুরু। এই উড্‌রফ সাহেবের রচিত গ্রন্থই Serpent Power, Garlend of letters ইত্যাদি। বিদ্যার্ণব মহাশয়ের শিষ্য শ্রীতারাপ্রসন্ন চক্রবর্তী সেই সময় শ্রীশ্রীমায়ের কাশী আশ্রমে স্বতন্ত্রভাবে বাস করিতেন। তিনি তাঁহার গুরুর আদেশে দ্বাদশ বৎসর মৌনের সঙ্কল্প লইয়া কাশীতে গঙ্গার তটে অবস্থানকরতঃ সাধন ভজন করিতেছিলেন। তিনি লোকসমাগমের মধ্যে বড় বেশী যাইতেন না। যখন মায়ের আশ্রমে শ্রীশ্রীবাসন্তীদেবীর পূজা হইতেছিল তখন তিনি সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমী এই তিনদিনের মধ্যে একদিনও পূজার মণ্ডপে গিয়া দেবীকে দর্শন করেন নাই। যদিও তিনি পূজাস্থানের অতি নিকটেই বাস করিতেন তথাপি কি জানি কি কারণে তিনি পূজার মণ্ডপে গিয়া দুর্গাদেবীর প্রতিমা দর্শন করার আবশ্যকতা বোধ করেন নাই। দশমীর দিন পূজার পর ভোগান্তে যখন দর্পণে দেবী মহামায়ার বিসর্জন হইবে তাহার কিঞ্চিৎ পূর্বে তিনি অতি ক্ষিপ্রতার সহিত পূজাস্থানে আসিয়া দেবীকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণামকরতঃ পুনরায় তাড়াতাড়ি আপন বাসস্থানে চলিয়া গেলেন। তিনি পরে আমাকে শ্লেটে লিখিয়া জানাইয়াছিলেন, এই পূজাতে দেবী স্বয়ং শুভাগমন করিয়া পূজা গ্রহণ করিয়াছিলেন। কারণ দশমীর দিন যখন তিনি তাঁহার আসনে বসিয়া সাধন করিতেছিলেন সেই সময় শ্রীশ্রীদুর্গামাতা অতিশয় ক্রোধের সহিত বলিলেন, "এখানে আমি তিন দিন যাবৎ আছি। তুই একদিনও আমার নিকট আসিলি না। এতই তোর অভিমান। এখন তো আমার যাইবার সময় হইয়া আসিল।" ইহার পরই তারাপ্রসন্নবাবু অতি তাড়াতাড়ি জপ ত্যাগ করিয়া পূজার স্থানে আসিয়া দেবীকে ভূ-লুণ্ঠিত হইয়া প্রণাম করিয়াছিলেন।

শ্রীশ্রীবাসন্তীদেবী যে স্বয়ং উপস্থিত হইয়া কৃপাকরতঃ অধম সন্তানের পূজা গ্রহণ করিয়াছিলেন ইহাতে পূজকের কোনই কৃতিত্ব

ছিল না। কারণ এই অভাজন ভালভাবেই জানে যে তাহার শ্রদ্ধা, ভক্তি, কিংবা যোগ্যতা—কোন সম্বলই তাহার নাই। মা দুর্গা যে দয়া করিয়া শুভাগমন করিয়াছিলেন ইহা তাঁহার অহৈতুকী অসীম করুণারই পরিচয়। যে স্থানে স্বয়ং শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী উপস্থিত সেই স্থানে তো মহাশক্তিস্বরূপিণী মহামায়া বিশ্বজননী তাঁহার অপ্রাকৃত চিন্ময় শরীর পরিগ্রহ করিয়া বিদ্যমান আছেনই। শ্রীশ্রীমা যে স্বয়ং জগন্মাতা তাহার পরিচয় তো তিনি কতবার, কতরকমে, কতজনের কাছেই দিয়াছেন। এখানে তাহার পুনরায় উল্লেখ অনাবশ্যক।

বাসন্তীপূজার পর শ্রীশ্রীমায়ের সঙ্গে বিন্ধ্যাচল, বৃন্দাবন ও দেহরাদুন হইয়া চৈত্র সংক্রান্তিতে পূর্ণকুম্ভের সময় আমরা অনেকেই হরিদ্বার গিয়াছি। সোলনের রাজাসাহেব শ্রীদুর্গা সিংজী যাঁহাকে মায়ের ভক্তগণ 'যোগীভাই' বলিয়া ডাকেন, তিনি ব্রহ্মকুণ্ডের উপর মায়ের জন্য একদিনের নিমিত্ত পাঁচ শত টাকা ভাড়ায় ধর্মশালায় গঙ্গার ধারের একখানি ঘর ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীমায়ের সঙ্গে আমরা কেহ কেহ সেইস্থান হইতে সাধু-সন্ন্যাসীদের শোভাযাত্রা এবং তাঁহাদের স্নান দর্শন করিলাম। সেই বৎসর (১৯৫০ খৃঃ) পূর্ণকুম্ভের ব্রহ্মকুণ্ডে স্নানের বিশেষ যোগ ছিল রাত্রি ৮টা ২৭ মিনিট হইতে রাত্রি ৮টা ৪২ মিনিট পর্যন্ত। মাত্র পনের মিনিট সময়। শ্রীশ্রীমায়ের চরণে প্রণাম করিয়া যখন বিশেষ যোগে ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান করিতে যাইতেছিলাম তখন স্নেহময়ী মা আমাকে ডাকিয়া চুপিচুপি বলিলেন, "ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান করিয়া গঙ্গার জলে দাঁড়াইয়া মনে মনে সন্ন্যাসের ভাবটি গ্রহণ করিও"। পনের মিনিটকাল ব্রহ্মকুণ্ডে অবস্থানকরতঃ মায়ের আদেশমত সন্ন্যাসের ভাব গ্রহণ করিতে চেষ্টা করিলাম।

এই সংসারে আমার কেহ নাই, আমিও কাহারও নহি। এই জগৎটা মিথ্যা—একটা কল্পনা মাত্র। ইহার অস্তিত্ব তিন কালেই নাই। সত্য বস্তু একমাত্র ব্রহ্ম। ইঁহার অভাব কোন কালেই হয় না। অজ্ঞান বা মায়ার প্রভাবে সত্য বস্তু ব্রহ্মকে 'ব্রহ্ম' না দেখিয়া জগৎ বা সংসার-ভাবনা করা হইতেছে। অন্ধকারে রজ্জুকে 'রজ্জু' না

দেখিয়া যেমন সর্প প্রতীতি হয় তেমন। ইহলোকের এবং পরলোকের সর্বপ্রকার ভোগ-বাসনা সম্যক্‌রূপে পরিত্যাগকরতঃ ব্রহ্মভাবে আত্মস্থ বা আত্মসমাহিত হইয়া যাওয়াই সন্ন্যাসভাব। মায়াই মানবকে এই সংসারে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। আত্মীয় স্বজনের উপর যে কর্তব্যবুদ্ধি উহাও এক প্রকার মায়াই। মায়ার পাশ ছিন্ন করিতে না পারিলে চির শান্তি যে মোক্ষ তাহা পাওয়া সুদূরপরাহত। তৈলধারাবৎ ব্রহ্মাকারা বৃত্তি রাখিতে না পারিলে মানব জীবনের যে পরম ও চরম লক্ষ্য মুক্তি তাহা লাভ করা যায় না। ত্যাগ, বৈরাগ্য ও আত্মবিচার ভিন্ন প্রকৃত সন্ন্যাসের লক্ষ্যে পৌঁছান যায় না। এই পথের যাত্রী হইবার সঙ্কল্পই আমি মায়ের আদেশানুসারে ব্রহ্মকুণ্ডে দাঁড়াইয়া গ্রহণ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম। শ্রীভগবান্ শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতায় বলিতেছেন—

কাম্যানাং কর্মণাং ন্যাসং সন্ন্যাসং কবয়ো বিদুঃ।
সর্বকর্মফলত্যাগং প্রাহুস্ত্যাগং বিচক্ষণাঃ॥ ১৮।২

শ্রীভগবান্ কহিলেন, বিচক্ষণ পণ্ডিতগণ কাম্য কর্মের পরিত্যাগকে সন্ন্যাস বলিয়া বুঝিয়া থাকেন। সর্বপ্রকার কর্মফলের ত্যাগকেই 'ত্যাগ' বলিয়া তাঁহারা বর্ণনা করেন। মোট কথা হইল ; কর্মত্যাগই হউক কিংবা কর্মফলের ত্যাগই হউক দুইই সন্ন্যাস নামে অভিহিত হইবার যোগ্য। গীতাতে ভগবান্ ত্যাগের শিক্ষাই প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত দিয়াছেন। ত্যাগেই শান্তি, ত্যাগেই পরমসুখ।

পূর্ণকুম্ভে স্নান করিয়া তাড়াতাড়ি হরিদ্বার হইতে কাশী ফিরিয়া আসিলাম। কাশী আসিয়া দেখি শ্রীশ্রীমায়ের কৃপায় বারাণসীর পবিত্র গঙ্গাতটে সন্ন্যাস গ্রহণের সব আয়োজন প্রস্তুত। মা পূর্ব হইতেই সব ঠিক করাইয়া রাখিয়াছেন। কথা হইয়াছে ১৩৫৭ সনের ৭ই বৈশাখ (২০শে এপ্রিল ১৯৫০ খৃষ্টাব্দ) শুভ অক্ষয় তৃতীয়ার দিন বিশ্বজননী শ্রীশ্রীমায়ের পূত উপস্থিতিতে বিধিপূর্বক বিরজাহোমাদির পর আমাকে পরমহংস সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে হইবে। ঐ দিনই কাশী আশ্রমে দুইটি শিবলিঙ্গের প্রতিষ্ঠার দিনও ধার্য হইয়াছে। এইভাবে শনৈঃ শনৈঃ শ্রীশ্রীমায়ের খেয়াল পূর্ণ হইতে

চলিল। বিধাতা পুরুষ কাহার ভাগ্যে কি যে লিখিয়াছেন তাহা সাধারণ মানব পূর্বমুহূর্তে তার বিন্দু-বিসর্গও জানিতে পারে না।

একান্তে বসিয়া যখন নিজের জীবন পর্যালোচনা করিতাম তখন সূক্ষ্ম সংস্কারগুলি স্পষ্টভাবে দৃষ্টিপথে ভাসিয়া উঠিত। শিশু বয়স হইতে আমার তীব্র বাসনা ছিল—কাহারও নিকট হইতে কিছু গ্রহণ না করিয়া জীবনযাত্রা নির্বাহ করিব। মনে পড়ে শৈশবে যখন আমি আমার পিসীমার সঙ্গে কাহারও বাড়ীতে বেড়াইতে যাইতাম, তখন আদর করিয়া কেহ কিছু খাদ্যসামগ্রী হাতে দিলে কখনও তাহা হাত পাতিয়া লইতাম না। তাঁহাদের ভালবাসার যথোচিত মর্যাদা দিতে পারিতাম না। এমনই ছিল মজ্জাগত একটা তীব্র সংস্কার। এই কারণে কোন কোন আত্মীয় স্বজনকে জীবনে বহুবার মর্মান্তিক দুঃখ দিয়াছি। পরবর্তী জীবনেও এই মনোভাব কিছুমাত্র হ্রাস হয় নাই। এমন কি শ্রীশ্রীমাও যদি কখনও কোন বস্তু প্রসাদরূপে দিয়াছেন তাহাও যে অতি আনন্দের সহিত গ্রহণ করিতাম তাহা বলিতে পারিব না—লইতে না হইলেই অধিক খুশি হইতাম। মায়ের স্নেহাশিস্ উপেক্ষা করা উচিত নহে সেইজন্য ঔচিত্য বোধে উহা লইতাম। কাহার নিকট হস্ত প্রসারণ করিতে বড়ই লজ্জা হইত এবং অন্তরে ক্লেশ অনুভব করিতাম। স্বোপার্জিত যাহা কিছু সামান্য সংস্থান ছিল তাহাদ্বারা কোন প্রকারে জীবন অতি-বাহিত করিবার প্রবল বাসনাই মনে মনে পোষণ করিতাম। এই বদ্ধমূল সংস্কার কর্মজীবনে নানা উপায়ে উৎকোচাদি গ্রহণরূপ অপকর্ম হইতে আমাকে রক্ষাই করিয়াছে ; পাপে লিপ্ত হইতে দেয় নাই। আমি স্বীকার করি হয় তো ইহার পশ্চাতে আমার অবচেতন মনে অভিমান বা অহংকার লুক্কায়িত ছিল কিন্তু এই আত্মমর্যাদাবোধ আমাকে কখনও হীনকার্য করিতে উৎসাহিত করে নাই। করুণাময়ী জননী আমার, সন্তানের সেই বহুকালের মজ্জাগত অহমিকা ও সংস্কার ভঙ্গ করিতে চলিয়াছেন। দক্ষিণেশ্বরের সেই পাগলাঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সেই অমূল্য উপদেশটি কেবল মনে পড়িতেছে। তিনি সকলকে বাঁদরের ছানা না হইয়া বিড়ালের ছানা হইতে উপদেশ দিতেন। বাঁদরের বাচ্চা উহার মাকে ধরিয়া থাকে বলিয়া

কখন কখন কুক্ষি-চ্যুত হইবার আশঙ্কা থাকে। পরন্তু বিড়ালের বাচ্চাকে উহার মা দাঁত দিয়া ধারণ করে সেজন্য উহার ছাড়িয়া যাইবার উপায় নাই এবং কখন পড়িয়াও যায় না কারণ উহাকে যে উহার মা দন্তের দ্বারা শক্ত করিয়া ধরিয়া থাকে। মার্জারী কখন উহার ছানাকে উনুনের (চুলার) ছাইয়ের মধ্যে রাখে আবার কখন উহাকে খাট পালংয়ের উপর বিছানার মধ্যে শোয়াইয়া রাখে। যে স্থান বাচ্চার পক্ষে সুরক্ষিত বিবেচনা করে সেই স্থলেই উহাকে রাখিয়া থাকে। পরম কল্যাণময়ী শ্রীশ্রীমা যাহা করেন তাহাদ্বারা যে আমাদের অশেষ কল্যাণই হয় এই বিশ্বাস যেন তিনি আমার অবিচলিত রাখেন, ইহাই তাঁহার শ্রীচরণে আমার একান্ত প্রার্থনা।

সন্ন্যাসের কথা বলিতে বলিতে একটু প্রসঙ্গান্তরে চলিয়া গিয়াছি। দেখিতে দেখিতে সন্ন্যাস গ্রহণের সেই শুভ অক্ষয় তৃতীয়ার দিনটি প্রায় আসিয়া পড়িল। তিনটি জিনিস ছাড়িতে হইবে সেইজন্য কষ্ট অনুভব করিতেছি। প্রথম গায়ত্রী মন্ত্র, দ্বিতীয় যজ্ঞোপবীত এবং তৃতীয় স্মরণাতীতকালের শ্রীশ্রীনারায়ণ শিলা বা শালগ্রাম শিলা। উপনয়নের পর হইতে স্মরণ হয় না ইচ্ছাকৃত কখন বৈদিক সন্ধ্যা বা বৈদিক ব্রহ্মগায়ত্রী বাদ দিয়াছি। অবশ্য জাতক কি মৃত অশৌচে শাস্ত্রীয়বিধি অনুসারে বাধ্য হইয়া বৈদিক সন্ধ্যা বাদ পড়িয়াছে কিন্তু গায়ত্রী নহে। কারণ ব্রাহ্মণের উহা নিত্যকরণীয় কার্য। সেই প্রায় চল্লিশ বৎসরের উপাসিত অতি প্রিয় গায়ত্রী মন্ত্র ত্যাগ করিতে হইবে। প্রিয়কে ত্যাগ করিতে কষ্ট হইবারই কথা। জননাশৌচ ও মরণাশৌচে কেবল গায়ত্রী ও ইষ্টমন্ত্র জপ এবং মানস শিব ও ইষ্ট পূজা করিতে হয়। ইহাই শাস্ত্রীয় বিধি এবং প্রাচীন পণ্ডিতদের মত। পূর্বপুরুষের শালগ্রাম শিলাটিকে গৃহদেবতা হিসাবে অল্প বয়স হইতে অত্যন্ত ভালবাসি। আপন সাধ্যানুসারে তাঁহাকে নিত্য একটু গঙ্গাজল ও দুইটি সচন্দন তুলসীপত্র বহুদিন যাবৎ দিয়া আসিতেছি তাহাও নাকি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলে ত্যাগ হইয়া যাইবে। এইসব কারণে দুঃখ বোধ স্বাভাবিক। এই সকল আনুষ্ঠানিক কর্মের উপর হয় তো আমার অবচেতন মনের কোন লুক্কায়িত-স্থানে আসক্তি

রহিয়াছে, সেই কারণেই হয় তো মঙ্গলময়ী জননী আমার সেইটি দূর করিবার মানসে এই সন্ন্যাসের যুক্তি রচনা করিয়াছেন। অভিমান, আসক্তি ও সংস্কারের নিগড় সর্বপ্রকারে ভঙ্গকরা মানব-জীবনের পরম ও চরম লক্ষ্যে উপনীত হইবার জন্য অবশ্য কর্তব্য। এই তিনটিই মানুষকে বার বার সংসারে আকর্ষণ করিয়া লইয়া আসে।

সন্ন্যাস চারি প্রকারের যথা, কুটিচক, বহূদক, হংস ও পরমহংস। প্রথম তিন প্রকার সন্ন্যাসে শিখা-সূত্র থাকে, পরমহংস সন্ন্যাসে তাহা থাকে না। পরমহংস সন্ন্যাস দ্বিবিধ—বিদ্বৎসন্ন্যাস ও বিবিদিশাসন্ন্যাস। বিদ্বৎসন্ন্যাসে কোন আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াদি নাই। সংসার হইতে বৈরাগ্য এবং অপরোক্ষ ব্রহ্মজ্ঞান অর্থাৎ আমি শরীর নহি, ইন্দ্রিয় নহি, মন নহি, বুদ্ধি নহি চিত্ত নহি, অহংকার নহি, আমি নিত্য-শুদ্ধ বুদ্ধ-মুক্ত আত্মা বা ব্রহ্ম, এইরূপ বোধ বা জ্ঞান হইলেই সন্ন্যাস হইয়া গেল ; যেমন বামদেব, শুকদেব, অষ্টাবক্রাদি মহর্ষিদের হইয়াছিল। নারদ, সনক, সনাতন, সনন্দন ও সনৎকুমার এই শ্রেণীর মধ্যেই পড়েন। বিবিদিশা পরমহংস প্রব্রজ্যা গ্রহণে আবশ্যকীয় অনুষ্ঠানাদি শেষ করিতে চারিদিন সময় প্রয়োজন। যাঁহারা অত্যন্ত কষ্টসহিষ্ণু তাঁহারা তিনদিনেও সকল আনুষ্ঠানিক ক্রিয়া সমাপ্ত করিতে পারেন! প্রথম দিন নিরম্বু উপবাস, দ্বিতীয় দিন প্রায়শ্চিত্ত, তৃতীয় দিন অষ্টশ্রাদ্ধ, মুণ্ডন, বিরজাহোমের প্রারম্ভ, সারারাত্রি গায়ত্রীজপ এবং অন্তিম দিবসে শেষ তর্পণ, বিরজাহোমের পূর্ণাহুতি, শিখা-সূত্রত্যাগ ও সন্ন্যাস গ্রহণ। সন্ন্যাসের প্রধান অঙ্গ হইল শ্রীগুরুদেবের মুখকমল হইতে প্রৈষমন্ত্র ও মহাবাক্য শ্রবণ এবং তাঁহার দ্বারা দণ্ড, কমণ্ডলু, গৈরিক বস্ত্র ও কৌপীন প্রদান। সন্ন্যাসী গুরুর নিকট হইতে প্রৈষমন্ত্র ও আপন বেদোক্ত মহাবাক্য শ্রবণের পরই জাতরূপ (উলঙ্গ) হইয়া উত্তরাভিমুখে শরীরপাত হওয়া পর্যন্ত গমন করিতে হয়। বর্তমান সময়ে ইহা সকলের পক্ষে সম্ভব নহে সেইজন্য অপরোক্ষ ব্রহ্মানুভূতি না হওয়া পর্যন্ত অথবা শরীর ত্যাগ অবধি গুরুসকাশে কিংবা অনুকূল তীর্থস্থানে বা উত্তরাখণ্ডে অবস্থানপূর্বক অবশিষ্ট জীবন সাধনদ্বারা

অতিবাহিত করিবার যোগ্য-সাধন শ্রীগুরুদেব এই সময় শিষ্যকে দান করিয়া থাকেন যথা ... ... ।

সন্ন্যাস* গ্রহণের পূর্বদিন শ্রীশ্রীমাকে একটু একান্তে পাইয়া আমি অতিশয় সঙ্কোচের সহিত বিনীতভাবে নিবেদন করিলাম, "মা! পেনসন সম্বন্ধে কি করিব?" মা অতি স্পষ্টভাবে উত্তর দিলেন, "যদি এই শরীরের মত চাও, তাহা হইলে এই শরীর বলিবে উহা ত্যাগ করাই ভাল।" শ্রীশ্রীমায়ের নির্দেশমত তদ্রূপই করা হইল এবং যাহা কিছু সঞ্চিত ছিল তাহা শ্রীশ্রীনারায়ণের সেবা পূজার জন্য আশ্রমকোষে জমা করিয়া দেওয়া হইল। সেইদিন সন্ধ্যার পর শ্রীশ্রীমায়ের সম্মুখে যাহা কিছু সামান্য তৈজসপত্রাদি বা বাসন-কোসন এবং জীবনযাপনের উপকরণাদি ছিল সেই সকল উপস্থিত মাতৃ-সন্তানদের মধ্যে বণ্টন হইয়া গেল। এইভাবে করুণাময়ী মা তাঁহার অধম সন্তানকে একেবারে কপর্দকশূন্য করিলেন। নাই বলিতে একটি কাণা-কড়িও আর রহিল না। শয়নের জন্য একটি ছেঁড়া মাদুর পর্যন্ত নাই। তিন দিন পর্যন্ত ধরিত্রী মাতাই তাঁহার ক্রোড়ে অতি স্নেহের সহিত এই অকিঞ্চনকে স্থান দিয়াছিলেন। বিত্তত্যাগ সম্বন্ধে মহর্ষি অত্রি বলিয়াছেন—

> শেষ বিত্তং ত্যজেদ্বিপ্রো ধনধান্যাদিকং চ যৎ।
> অত্যাগাৎ সর্ববিত্তানাং সন্ন্যাসো নিষ্ফলো ভবেৎ॥
>
> 'যতিধর্ম সংগ্রহ॥'

ধন-ধান্য এবং বিত্তের শেষ কপর্দক পর্যন্ত ব্রাহ্মণ সন্ন্যাসের পূর্বে ত্যাগ করিবেন। সর্ববিত্ত অর্থাৎ ধন-সম্পত্তি ত্যাগ না করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে উহা নিষ্ফল বা ব্যর্থ হয়।

আমি বহুবার দেখিয়াছি মাকে সরলভাবে প্রকৃত জিজ্ঞাসুর আকুতি লইয়া প্রশ্ন করিলে যাহা শাস্ত্রীয় বিধি তাহাই তিনি বলেন এবং যাহাতে আমাদের যথার্থ কল্যাণ হয় তাহাই তিনি করেন।

---

* প্রব্রজ্যা বা সন্ন্যাস গ্রহণের সম্পূর্ণ নিয়ম ও আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াদি "নারদ-পরিব্রাজক উপনিষদ্" এবং শ্রীমৎ স্বামী বিশ্বেশ্বরানন্দ সরস্বতী কৃত "যতিধর্ম পদ্ধতি'তে পাওয়া যায়।

আমরা মূঢ় তাঁহাকে বুঝিবার মত আমাদের শক্তি বা জ্ঞান কোথায়?

যখন পিতৃকুল, মাতৃকুল, দেবতা, ঋষি, মনুষ্য, ভূত, পরমাত্মা ও নিজের শ্রাদ্ধ ও পিণ্ডদান করিতে যাইব সেই সময় করুণাময়ী শ্রীশ্রীমা স্বয়ংই সেইস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে ডাকিবার অপেক্ষা রাখেন নাই। এই অষ্ট শ্রাদ্ধ সম্বন্ধে ঋষি দত্তাত্রেয়ের নির্দেশ—

দৈবার্ষমানুষং ভূতং পিতৃমাতৃস্বয়ং ভুবম্।
শ্রাদ্ধং পরমাত্মনঃ কৃত্বা বৃদ্ধৌ চাপি চতুষ্টয়ম্॥
যতিধর্ম সংগ্রহ॥

শ্রাদ্ধ ও পিণ্ডদানের সব আয়োজন প্রস্তুত। আচার্যের কার্য করাইতেছিলেন কাশীর সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত এবং পৌরোহিত্য কর্মে অতিশয় দক্ষ শ্রীযুক্ত তারাচরণ সাহিত্যাচার্য মহাশয় এবং তাঁহাকে সাহায্য করিতেছিলেন শ্রীযুক্ত ঠাকুরদাস ভট্টাচার্য। কার্যে বসিবার অব্যবহিত পূর্বে মাকে প্রণাম করিয়া অনুজ্ঞা প্রার্থনার সময় পরমস্নেহময়ী শ্রীশ্রীমা খানিকক্ষণ স্নেহ ও আদর করিলেন। মায়ের আন্তরিক স্নেহ ও আদর করার ফলে গর্ভধারিণীর কথা মনে পড়াতে চোখে জল আসিয়া পড়িল এবং সাময়িকভাবে মনটা বিষাদযুক্ত হইল। কারণ মাতা ও পিতার কাশীলাভের পর হইতে এই সুদীর্ঘ ত্রিশ বৎসর যাবৎ তাঁহাদের মৃত্যু তিথিতে প্রতি বৎসর তাঁহাদের উদ্দেশ্যে আপন সাধ্যানুসারে শ্রাদ্ধ ও পিণ্ডদান করিতাম। অদ্যই তাঁহাদের শেষ শ্রাদ্ধ ও পিণ্ডদান, যেহেতু সন্ন্যাসগ্রহণের পর আর এই সকল পিতৃ-মাতৃ কার্য করিতে নাই। বাৎসল্যময়ী মায়ের কোলে একটু সময় মাথা গুঁজিয়া রহিলাম। আমি তো বাস্তবিকপক্ষে অনিত্যজ্ঞানে সংসার ত্যাগ করিতেছি না অথবা তীব্র বৈরাগ্যের নিমিত্ত প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিতেছি না, অতএব এই জাতীয় মানসিক দুর্বলতা আসা কিছু অস্বাভাবিক নহে। কি আশ্চর্যের বিষয় যে মুহূর্তে মা তাঁহার স্নেহমাখা পদ্মহস্তখানি আমার মাথায় ও বুকে বুলাইয়া

দিলেন সঙ্গে সঙ্গে সেই সময়োচিত দুর্বলতা কোথায় দূর হইয়া গেল এবং মনেও একটু বল আসিল। এইভাবে কোন্ বা কাহার মা তাঁহার সন্তানকে সন্ন্যাস গ্রহণের জন্য উৎসাহিত করেন এবং স্বয়ং সম্মুখে বসিয়া সকল কার্য সম্পন্ন করাইয়া থাকেন যেমনটি আমাদের করুণাময়ী শ্রীশ্রীমা আজ করিতেছেন। এই সকল কথা যখন স্মৃতি পথে উদিত হয় তখন সত্যই দেহ, মন ও প্রাণ বিপুল আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠে। মা যে আমাদের কত আপন, কত প্রিয় ও কত শ্রদ্ধা-ভক্তির আস্পদ তাহা ভাষায় লিখিয়া প্রকাশ করা যায় না।

অষ্টশ্রাদ্ধ ও পিণ্ডদানাদি সকল ক্রিয়াকর্ম সমাপনান্তে মাকে পুনরায় প্রণামকরতঃ তাঁহার আদেশ লইয়া মস্তক মুণ্ডনের জন্য যখন গমন করিব তখন তিনি আমার মাথার চুলগুলি লইয়া খানিক নাড়াচাড়া করিয়া মুণ্ডনের জন্য অনুমতি দিলেন। যজ্ঞের তিন বৎসর ক্ষৌর না করার দরুন সেই সময় আমার মাথায় একরাশ ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া কুঞ্চিত কেশ ছিল। মা বলিলেন, "মুণ্ডনের আগে নারায়ণকে লইয়া একখানা ছবি তুলিয়া রাখিও"। তাঁহার নির্দেশমত তদ্রূপ করা হইয়াছিল। সন্ন্যাসের পূর্বদিন সন্ধ্যার পর হইতে বিরজাহোম আরম্ভ হইল। চরুদ্বারা আহুতি প্রদানের পর সেই অগ্নির সম্মুখে সারারাত্রি বসিয়া গায়ত্রী জপ ও অগ্নি রক্ষা করিলাম, যাহাতে হোমাগ্নি নির্বাপিত হইয়া না যায়। মায়ের অপূর্ব স্নেহ! সে রাত্রিতে মা আর বিশ্রাম করিলেন না। তিন দিন উপবাস তার উপর রাত্রি জাগরণ করিয়া জপ—নিদ্রিত হইয়া পড়িবার খুবই ভয় ছিল। পাছে আমি ঘুমাইয়া পড়ি এই আশঙ্কায় করুণাময়ী মা, আমার আশে-পাশে ছাতের উপর সারারাত ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। গভীর নিঝুম রাত্রিতে গায়ত্রী জপের সময় যে দেবতা অতি প্রিয় এবং যাঁহার নাম প্রায় আট বৎসর পূর্বে মা এক অভিনব অনুষ্ঠানের সহিত কালীপূজার মহানিশায় রায়পুরে (দেহরাদুন) গ্রহণ করাইয়া ছিলেন তিনি কৃপা করিয়া চকিতের জন্য দর্শনদানে এই অধমকে কৃতার্থ করিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীমায়ের শয়ন মন্দিরের

সম্মুখেই নব নির্মিত অষ্টকোণ বিশিষ্ট মন্দিরে বিরজা হোমের স্থণ্ডিল করা হইয়াছিল। সেইস্থান মা গঙ্গা গ্রাস করিয়া লইয়াছেন। সেই মন্দিরের প্রতিচিত্র (Blue print) যত্ন সহকারে কাশীর শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী কন্যাপীঠের বারান্দায় বাঁধাইয়া রাখা হইয়াছে। এই অধমের প্রব্রজ্যা গ্রহণের পর ঐ স্থানে অপর কাহারও সন্ন্যাস আর হয় নাই। যে পাথরের উপর বিরজা হোম হইয়াছিল সেই শ্বেত পাথর খানা অদ্যাপি আশ্রমের আঙ্গিনায় বুড়ো শিবের পূর্বদিকে বিল্ববৃক্ষের তলায় ইষ্টক নির্মিত এক পাকা বেদীর উপর সুরক্ষিত আছে। এই বেদীরও ক্ষুদ্র ইতিবৃত্ত মা কাহার কাহার কাছে বর্ণন করিয়াছেন। দক্ষিণ ভারতের কোন সিদ্ধ মহাত্মার পূর্ণিমা তিথিতে মহামিলনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এই বেদী। মা যদি প্রকাশ করেন তবেই ইহা জনসাধারণের পক্ষে জানা সম্ভব হইবে নচেৎ ইহা চিরকালের জন্য অজ্ঞাতই থাকিবে।

বিরজা হোমের পূর্ণাহুতির পর যতক্ষণ পর্যন্ত সন্ন্যাসের আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকলাপ চলিতেছিল ততক্ষণ পর্যন্ত করুণাময়ী শ্রীশ্রীমা আমার পার্শ্বেই বসিয়া সব দেখিতেছিলেন। গৈরিকবস্ত্র ও কৌপীন প্রদানের সময় সন্ন্যাসের শ্রীশ্রীগুরুদেব স্বয়ং উহা আমাকে না দিয়া ব্রহ্ম-বিদ্যারূপিণী শ্রীশ্রীমায়ের দ্বারা উহা আমাকে প্রদান করাইলেন। এখানে কিন্তু একটু লক্ষ্য করিবার বিষয় রহিয়াছে। সাবিত্রী মহাযজ্ঞের তৃতীয় দিবসে উত্তরায়ণ সংক্রান্তির দিন যে মা দয়া করিয়া স্বহস্তে আমাকে কাষায়বস্ত্র দিয়াছিলেন এই কথা কিন্তু তিনি ঘুণাক্ষরেও অবগত ছিলেন না। জানি না কোন অচিন্তনীয় শক্তির প্রভাবেই হউক বা শ্রীশ্রীমায়ের প্রেরণায়ই হউক তিনি মায়ের হাত দিয়াই গেরুয়াবস্ত্র আমাকে দেওয়াইলেন। গৈরিকবস্ত্র কিন্তু এই সময় তাঁহারই প্রদান করিবার বিধি। কি আশ্চর্য! মাও কিন্তু কাষায়বস্ত্র দিতে কোন প্রকার আপত্তি করিলেন না অথবা গুরু-দেবকে উহা দিবার জন্য বলিলেন না। ইহার পর দণ্ড ও কমণ্ডলু তিনিই দিলেন এবং মায়ের সম্মতি লইয়া যোগপাট বা সন্ন্যাসনামও তিনিই রাখিলেন।

সন্ন্যাসের যাবতীয় অনুষ্ঠান মা স্বয়ং সম্মুখে বসিয়া করাইলেন।

এই রকম সন্ন্যাস গ্রহণের আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকলাপের সময় জ্ঞানরূপিণী মায়ের উপস্থিতি কয়জনের ভাগ্যে ঘটে? ইহা যে পরমারাধ্যা শ্রীশ্রীমায়ের একটি বিশেষ অহৈতুকী কৃপারই পরিচয় তাহা আমাকে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেই হইবে। সবই যেন তিনি কেমন খেলায় খেলায় করাইয়া লইলেন। জীবনের এমন একটা আমূল পরিবর্তন মা কিভাবে যে আমাকে দিয়া করাইলেন তাহা আমার এই ক্ষুদ্র বুদ্ধির দ্বারা বোধগম্য হওয়া অসম্ভব। শ্রীশ্রীমায়ের কি যে অমোঘ শক্তি তাহা চিন্তা করিলে আশ্চর্য হইতে হয়!

বিশ্বজননী শ্রীশ্রীমায়ের দয়া জীবের উপর সমভাবে সর্বদাই বর্ষিত হইতেছে। জননী আমার, পাত্রাপাত্র বিচার না করিয়া সকলকেই তাঁহার চরণছায়ায় আশ্রয় দিতেছেন। আমার মত অতি সাধারণ জীবও যখন তাঁহার করুণা কণায় বঞ্চিত হয় নাই তখন এইবার কেহই তাঁহার দয়া হইতে বঞ্চিত যে হইবে না ইহা আমি নিঃসংকোচে বলিতে পারি। ইহার পশ্চাতে রহিয়াছে আমার সুদীর্ঘ অর্ধশতাব্দীর অভিজ্ঞতা। মার অপরিসীম করুণা পাইতে কিছুরই অপেক্ষা রাখে না। একবার মনেপ্রাণে "মা" বলিয়া যিনিই তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে গিয়া শরণ লইয়াছেন তাহাকেই জননী সন্তান-জ্ঞানে স্বীয় স্নেহময় ক্রোড়ে স্থান দিয়াছেন। মায়ের সন্তান হইবার জন্য কোনই যোগ্যতার প্রয়োজন হয় না! চাই কেবল সরল প্রাণে "মা" বলিয়া শরণ লওয়া। তিনি তাঁহার ভাল, সচ্চরিত্র, বিদ্বান, ধার্মিক এবং ধনীকে যেমন আপন সন্তান মনে করিয়া কোলে টানিয়া লইতেছেন পক্ষান্তরে মন্দ, অসৎচরিত্র, মূর্খ, অধার্মিক ও দীন দরিদ্র পথের ভিখারীকেও তাঁহার বাৎসল্যরসে পরিপূর্ণ ক্রোড়-প্রদান করিতে কখনও কৃপণতা করেন না। বরং তাঁহার কাঙাল সন্তানকে অধিক স্নেহ, ভালবাসা ও আদর দিয়া তাঁহার জীবন ধন্য ও কৃতার্থ করিতেছেন।

পরমকল্যাণময়ী মা জগদ্ধাত্রী সন্তানদের দুর্গতি দেখিয়া তাঁহার দিব্যধামে অবস্থান করিতে না পারিয়া মাতৃরূপ ধারণকরতঃ স্বয়ং এই ধূলায় অবতীর্ণ হইয়াছেন। বর্তমান জড়বাদের যুগে পামর জীবকে কেবল মায়ের অসীম স্নেহ, ভালবাসা ও আদর দানে নিজের বিশাল

ও স্নেহময় কোলে আকর্ষণ করিয়া তাহার উদ্ধারের পথ সরল ও সুগম করিয়া দিতেছেন। কিভাবে যে তিনি মোহগ্রস্ত জীবকে ক্রমশঃ ক্রমশঃ তাঁহার দিকে টানিয়া লইতেছেন তাহা দেখিয়া আশ্চর্য হইতে হয়। সবই যেন তিনি খেলার ছলে করিয়া লইতেছেন। যেমন যেমন মানব তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইতেছে তেমন তেমন—অতি ধীরে ধীরে তাহার ভিতর এমন একটা পরিবর্তন আসিতেছে যাহা কেবল মৌখিক উপদেশ বা শাসনের দ্বারা কদাপি সম্ভব হইত না। যাহাদের মধ্যে এই অবস্থান্তর সংঘটিত হইতেছে তাহারা নিজেরাও উহা প্রথম প্রথম বুঝিতে পারিতেছে না। কিছুদিন পর তাহারা নিজেদের পরিবর্তন দেখিয়া নিজেরাই বিস্মিত ও মুগ্ধ হইয়া যাইতেছে, ইহা কি করিয়া সম্ভব হইল! তাহাদের চালচলন, হাবভাব, কথাবার্তা এমন কি দীর্ঘকালের অভ্যাস ও ব্যসন পর্যন্ত মায়ের সংস্পর্শে আসিয়া আমূল রূপান্তরিত হইতে দেখা যাইতেছে। পরশমণির ছোঁয়া পাইলে লোহার সোনা হইতে কি আর দেরী লাগে? আমার এক বন্ধুকে তাঁহার কোন পরিচিত ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "এত দিন হইতে তুমি যে আনন্দময়ী মায়ের কাছে যাইতেছ, তাহাতে তোমার কি হইয়াছে?" তিনি খুবই অল্প কথায় ইহার উত্তর দিয়াছিলেন, "মায়ের কাছে যাইবার পূর্বে পশু ছিলাম, এখন মানুষ হইতে চলিয়াছি।" আমার বন্ধুটির প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের প্রশংসা না করিয়া পরিলাম না। প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গে এমন যথাযথ উত্তর আমার মনে হয় খুব অল্প লোকই দিতে পারেন। শ্রীশ্রীমায়ের অসীম শক্তি ও কৃপার নিদর্শন এই সংক্ষিপ্ত উত্তরের মধ্যে নিহিত রহিয়াছে। আমার বন্ধুটি শ্রীশ্রীমায়ের একজন বিশেষ অনুগত সন্তান এবং তাঁহার কৃপার পাত্র।

সর্বত্র এক চৈতন্য-শক্তিই বিদ্যমান

যাঁহারা বিধিপূর্বক অর্থাৎ শাস্ত্রীয় নিয়মানুসারে বিরজাহোমাদি করিয়া পরমহংস সন্ন্যাস গ্রহণ করেন তাঁহারা শিখা-সূত্র ত্যাগান্তে জাতরূপ হইয়া অর্থাৎ পরিধেয় বস্ত্রাদি পরিত্যাগ করতঃ দুই হাত উর্ধ্বে তুলিয়া মহাভারতের নিম্নলিখিত শ্লোকটি পাঠ করিতে করিতে সর্বভূতকে অর্থাৎ প্রাণীমাত্রকে অভয় প্রদান করিয়া থাকেন—

অভয়ং সর্বভূতেভ্যো দত্ত্বা যশ্চরতে মুনিঃ।
ন তস্য সর্বভূতেভ্যো ভয়মুৎপদ্যতে ক্বচিৎ॥

তাঁহারা প্রতিজ্ঞা করেন—তাঁহাদের দ্বারা কোন প্রাণীরই কোন প্রকার শারীরিক কি মানসিক কষ্ট বা দুঃখ প্রাপ্তি হইবে না। কারণ সন্ন্যাসী দেখেন তাঁহার নিজের আত্মাই সর্বভূতে পরিব্যাপ্ত হইয়া আছে, 'সর্বভূতাত্ম-ভূতাত্মা'। শঙ্করাবতার পরমজ্ঞানবান্ জগদ্গুরু শ্রীমৎ শঙ্করাচার্যও ইহার ব্যাখ্যা করিতে গিয়া বলিয়াছেন, "সর্বেষাং ব্রহ্মাদীনাং স্তম্বপর্যন্তানাং ভূতানামাত্মভূতাত্মা প্রত্যক্-চেতনঃ।" অর্থাৎ যাঁহার অন্তরাত্মা ব্রহ্মা হইতে স্তম্ব বা তৃণ পর্যন্ত সম্পূর্ণ ভূতগণের আত্মা হইয়া গিয়াছে তিনিই প্রকৃত জ্ঞানী, তাঁহারই সর্বভূতে অর্থাৎ সর্বপ্রাণীতে ব্রহ্মদৃষ্টি হইয়াছে—তিনিই যথার্থ সন্ন্যাসী।

"সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম, অয়মাত্মা ব্রহ্ম, চৈতন্যমাত্রম্ অমৃতং সোঽহম-স্মীতি ভাবয়েৎ" ইত্যাদি—এই রকম কতই আত্মজ্ঞানের সুন্দর সুন্দর কথা অহরহ শাস্ত্রাদিতে আমরা পড়িয়া থাকি এবং কথাবার্তার মধ্যেও বলি। কিন্তু ব্যবহার ক্ষেত্রে আমরা ইহার যথোচিত মর্যাদা দেই না কারণ ইহা তো আমাদের অনুভবগম্য বস্তু নহে। ইহা হইল আমাদের শোনা কথা বা পড়া কথা। সন্ন্যাসীর কর্তব্য হইল তিনি কোন জীবকে কোন রকম মানসিক দুঃখ বা শারীরিক কষ্ট

দিবেন না। এমন কি তিনি গাছ কাটিবেন না, ডাল ভাঙ্গিবেন না, ফুল তুলিবেন না, গাছের পাতা ছিঁড়িবেন না। পোকা-মাকড় মারিবেন না, প্রাণী হিংসা করিবেন না ইত্যাদি। এই শাস্ত্রীয় নির্দেশের পশ্চাতে যে কত বড় সত্য নিহিত রহিয়াছে তাহা সাধারণতঃ আমরা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি না। সেইজন্য সর্বদা আমরা কতই যে ছারপোকা, মশা, মাছি, পিঁপড়া ইত্যাদি মারিতেছি তার আর ইয়ত্তা বা সীমা নাই। জ্ঞাতসারে কিংবা অজ্ঞাতসারে এই জাতীয় জীবহিংসা আমরা নিরন্তর করিয়া আসিতেছি। ইহা যে অন্যায় এই সম্বন্ধে কোন চিন্তাই আমাদের মনে উদয় হয় না। অভ্যাসের ফলে আমাদের হৃদয় এতই কঠোর বা নির্মম হইয়া গিয়াছে যে ঐদিকে আমাদের লক্ষ্যই যায় না। গাছের পুষ্প চয়ন করা, পাতা ছেঁড়া ও ডাল ভাঙ্গার তো কোন কথাই নাই। গাছ-পালার মধ্যেও যে অনুভবশক্তি বিদ্যমান রহিয়াছে তাহা আমরা একবারও চিন্তা করি না। আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতেছি, লজ্জাবতী লতার পাতাগুলি স্পর্শমাত্র সঙ্কুচিত হইয়া যায়। ইহা দ্বারা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে যে বৃক্ষ, লতা, গুল্মাদিরও অনুভব শক্তি আছে। সেইজন্যই মনে হয় শ্রীশ্রীমায়ের দিব্য শরীরটিকে নিমিত্ত করিয়া যখন সাধনার খেলা চলিয়াছিল তখন তিনি গাছের তলায় যে ফল ঝরিয়া পড়িত তাহাই খাইতেন আর কিছু ভক্ষণ করিতেন না। বৃক্ষ হইতে কোন ফল পাড়িতে বা ছিঁড়িতে দিতেন না। ভারতের সুপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক স্যার জগদীশচন্দ্র বসু বলিয়াছেন এবং পরীক্ষাদ্বারা (Experiment) প্রমাণ করিয়াছেন যে গাছপালা ও লতাপাতার মধ্যেও সেই একই চৈতন্যশক্তি বিদ্যমান, যে চৈতন্যশক্তি মানুষের মধ্যে বিরাজ করিতেছে। এই সম্বন্ধে তাঁহার নিজের উক্তি, "বিশ্ববৈচিত্র্যের মধ্যে এক অখণ্ড শাশ্বত সত্য নিহিত রহিয়াছে।" এই সম্বন্ধে পরম করুণাময়ী শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ীর কৃপায় এবং তাঁহার অব্যর্থ ইচ্ছাশক্তির ফলে বা খেয়ালে আমার নিজের জীবনে ইহার যে একটি ক্ষুদ্র প্রমাণ পাইয়াছি তাহা এইস্থলে উল্লেখ করিতে সাহস করিতেছি। ইহার মধ্যে যে আমার কোন কৃতিত্ব নাই ইহা আমি নিঃসঙ্কোচে ও দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারি।

১৯৫৯ খৃষ্টাব্দের গুরুপূর্ণিমার দিন হইতে পরমারাধ্যা শ্রীশ্রীমায়ের সম্মতিক্রমে তাঁহার দেহরাত্নের কিষণপুর আশ্রমে অবস্থানকরতঃ চাতুর্মাস্য ব্রত করিতেছি। ইহা সন্ন্যাসীদেরও অবশ্য করণীয় ব্রত। কিছুদিন পূর্বে শ্রীশ্রীমায়ের কিষণপুর আশ্রমের আঙ্গিনায় শিব মন্দিরের সম্মুখে আমগাছতলায় একখানা নূতন রান্নাঘর তৈয়ার হইয়াছে। উহার পশ্চাতে অর্থাৎ ঘরের দক্ষিণ দিকে মুখ-হাত ধুইবার জন্য একটি জলের কল আছে। জলের কলের নীচের স্থানটা ইট সিমেণ্ট দিয়া পাকা করিবার কাজ সেই সময় চলিতে-ছিল। গত ১৯৫৯ খৃষ্টাব্দের ২রা সেপ্টেম্বর বেলা দ্বিপ্রহরের সময় বেড়াইতে বেড়াইতে সেখানে গিয়া দেখি রাজমিস্ত্রী ও একজন সাধারণ মজুর কাজ করিতেছে।

ইষ্টকের দ্বারা যে স্থানটা বাঁধান হইতেছিল তাহার মাঝে একটা লিচুগাছ পড়িয়াছিল। লিচুগাছের একটি ডাল ঝুলিয়া গিয়া জলের কলের কাছে পড়িয়াছে। এই ঝোলা ডালটার জন্য রাজমিস্ত্রীর কাজ করিতে অসুবিধা হইতেছিল দেখিয়া আমি মজুরটিকে বলিলাম একগাছা দড়ি দিয়া ঐ ঝোলা ডালটাকে খুব কশিয়া টানিয়া গাছের সঙ্গে বাঁধিয়া দেও, তাহা হইলে আর মিস্ত্রীর কাজ করিতে অসুবিধা হইবে না। এবং ভবিষ্যতে কলে মুখ-হাত ধুইবার জন্য কেহ সেখানে গেলে তাহার চোখে-মুখেও ডালটা লাগিবার কোন আশঙ্কা থাকিবে না। কিছুদিন এই ভাবে কশিয়া টানিয়া বাঁধা থাকিলে গাছের ডালটির স্বাভাবিক গতি পরিবর্তিত হইয়া সোজা হইয়া যাইবে। আমার নির্দেশমত মজুরটি একগাছা নারিকেলের রজ্জু দোহারা করিয়া ঐ লিচুগাছের ঝুলিয়া পড়া ডালটাকে ধরিয়া বৃক্ষের প্রধান মোটা কাণ্ডের সঙ্গে খুব জোরে টানিয়া শক্ত করিয়া বাঁধিয়া দিল। লোকটি ঠিকভাবে বাঁধিতে পারিতেছিল না দেখিয়া আমি তাহাকে বাঁধিতে সাহায্য করিলাম। বৃক্ষের শাখাটিকে নির্মমভাবে জোর করিয়া টানিয়া বন্ধন করিবার সময় আমার কেবলই মনে হইতেছিল নিরপরাধ, মূক ও প্রতিরোধ করিতে অসমর্থ ডালটিকে এইরকম নিষ্ঠুরতার সঙ্গে জোর করিয়া উহার স্বাভাবিক গতিটাকে পরিবর্তিত করিয়া অন্যদিকে লইয়া

যাওয়াতে উহার অত্যন্ত কষ্ট হইতেছে। আমার অন্তরাত্মার এই নির্দেশ অমান্য করিয়া আমি ঐ অসহায় লিচুগাছের ডালটিকে খুব কশিয়া টানিয়া বাঁধিয়া চলিয়া আসিলাম। রাজমিস্ত্রীর কাজে সুবিধা হওয়ায় সে প্রসন্ন মনে কাজ করিতে লাগিল। কোন অন্যায় কার্য করিবার পূর্ব মুহূর্তে মানুষের হৃদয়ে অবস্থিত প্রত্যগাত্মা একবার সতর্ক করিয়া দেন। হে মানব! তুমি যে কার্য করিতে যাইতেছ ইহা তোমার করণীয় নহে। ইহাদ্বারা তোমার কোন ইষ্ট সধিত হইবে না। পরিণামে এই অনুচিত কর্মের ফল—দুঃখ তোমাকে ভোগ করিতে হইবে। আমরা মূঢ় মানব সেই চিরজাগ্রত, সর্বকর্মের দ্রষ্টা ও পরম কারুণিক অন্তর্যামী শ্রীভগবানের মঙ্গলময় উপদেশ উপেক্ষা করিয়া পদে পদে লাঞ্ছিত হইয়াও আমাদের চৈতন্য হইতেছে না। পামর জীবের পরম দুর্ভাগ্য যে সে বারংবার সংকটে পড়িয়াও স্বীয় ত্রুটি সংশোধন করে না।

পরদিন ৩রা সেপ্টেম্বর অতি প্রত্যূষে নিদ্রা হইতে উঠিয়া দেখি আমার ডান কাঁধের সন্ধিস্থানে এমন তীব্র ব্যথা হইয়াছে যে আমি আমার দক্ষিণ হস্তখানা উপরের দিকে তুলিতে পারিতেছিলাম না। এমন কি সামান্যভাবেও হাত নাড়াচাড়া করিতে কষ্ট হইতেছিল। রাত্রিতেও হাতের বেদনার দরুণ ভাল ঘুম হয় নাই। মাঝে মাঝে ব্যথার তীব্রতার কারণে নিদ্রা ভাঙ্গিয়া যাইতেছিল। আমি মনে মনে চিন্তা করিলাম হয় তো পাহাড়ের বর্ষার ঠাণ্ডা বাতাস লাগিয়া ব্যথা হইয়াছে। এই রকম অসহ্য বেদনা লইয়াই কোন প্রকারে দৈনন্দিন কাজকর্ম সব সারিলাম। সেইদিন রাত্রি হইতে অত্যন্ত জোরে বৃষ্টি হইবার কারণ মিস্ত্রী ও মজুর কেহই কাজ করিতে আসে নাই। প্রায় চব্বিশ ঘণ্টা পর বেলা অনুমান বারটার পর বৃষ্টি থামিলে আমি ঘরের বাহিরে আসিয়া উদ্দেশ্যহীনভাবে পায়চারি করিতে করিতে ঐ অসহায় লিচুগাছটার দিকে অকস্মাৎ দৃষ্টি পড়িতেই হঠাৎ মনে হইল—গতকাল ঐ বৃক্ষের শাখাটিকে ঐভাবে জোর করিয়া টানিয়া শক্ত করিয়া বাঁধাতে উহারও তো আমার ন্যায় কষ্ট হইতেছে। ডালটিও তো গাছের হাতের মতই। একই পরমেশ্বরের সৃষ্ট ঐ গাছটিও যেমন আমিও তেমন। একই পরমাত্মার চৈতন্যশক্তি

ঐ বৃক্ষের মধ্যে অবস্থান করিয়া যেমন সুখ-দুঃখ অনুভব করিতেছে আমার মধ্যেও সেই চৈতন্যশক্তিই সুখ-দুঃখ ভোগ করিতেছে। সর্বত্র সেই একই চৈতন্যশক্তি বিদ্যমান। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর হইতে প্রত্যেকটি ধূলিকণার মধ্যে সেই ব্রহ্মশক্তিই ওতপ্রোত হইয়া বিরাজ করিতেছে। শ্রীশ্রীচণ্ডীতে তো এই কথাই দেবতাগণ চৈতন্যরূপিণী মহামায়াকে স্তব করিতে গিয়া বলিয়াছেন, "যা দেবী সর্বভূতেষু চেতনেত্যভিধীয়তে। নমস্তস্যৈ, নমস্তস্যৈ, নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।" যে দেবী সর্বভূতে চেতনারূপে প্রসিদ্ধা তাঁহাকে নমস্কার। তাঁহাকে নমস্কার। তাঁহাকে নমস্কার, নমস্কার, নমস্কার। বৃক্ষের প্রত্যেকটি শাখায়, প্রশাখায়, এবং পাতায় পাতায় যে চৈতন্যশক্তি ক্রিয়া করিতেছে সেই একই চৈতন্যশক্তি তো আমারও সর্বশরীরে ক্রিয়া করিতেছে। অতএব গাছটির ঐ ডালটিকে অমন করিয়া বাঁধিয়া কষ্ট দেওয়াটা আমার পক্ষে কোন প্রকারেই উচিত হয় নাই। আমি বড় গর্হিত কাজ করিয়াছি। একজন সন্ন্যাসী-বেশধারী মানুষের পক্ষে ইহা অমার্জনীয় অপরাধ। আত্মগ্লানিতে আমার মন যৎপরো-নাস্তি অনুতপ্ত হইয়া উঠিল। আমার এই জাতীয় দুষ্কর্মের সমর্থনে কোন ন্যায় সঙ্গত যুক্তি ছিল না।

এই প্রকার বিচারের পর ক্ষণকালও বিলম্ব না করিয়া যেই আমি বৃক্ষটির নিকট গিয়া দড়ির গাঁটটা খুলিয়া ঢিলা করিয়া দিলাম সঙ্গে সঙ্গে আমার হাতের ব্যথাটা কম হইতে লাগিল। যেমন বন্ধনটি শিথিল হইতে ছিল তেমন তেমন আমার হাতের যন্ত্রণা হ্রাস হইতে লাগিল। দড়িটা খুলিয়া দূরে নিক্ষেপ করিবার সঙ্গে সঙ্গে আমার হাতের অসহনীয় বেদনা একেবারে সারিয়া গেল এবং আমি অনুভব করিতে লাগিলাম, গাছটি এবং আমার এই শরীরটা যেন অভিন্ন। যে চৈতন্যশক্তি লিচুগাছের মধ্যে সেই চৈতন্যশক্তিই আমার মধ্যে বিদ্যমান। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় শ্রীভগবান্ সেইজন্য অর্জুনকে বলিতেছেন—

আত্মৌপম্যেন সর্বত্র সমং পশ্যতি যোঽর্জুন।
সুখং বা যদি দুঃখং স যোগী পরমো মতঃ॥ ৬।৩২॥

সকল ভূতেই যিনি সমত্ব দর্শন করেন অর্থাৎ আমার যেমন সুখ অভিলষিত, সেই প্রকার সকল প্রাণীরই সুখ ঈপ্সিত এবং আমার যেমন দুঃখ অনিষ্টকর সুতরাং প্রতিকূল, সেই প্রকার সকল প্রাণীরই দুঃখ অনভিলষিত এবং প্রতিকূল। এই প্রকার সকল ভূতেই অনুকূল ও প্রতিকূল সুখ ও দুঃখকে সমভাবে যিনি দেখেন অর্থাৎ যাহা অপরের প্রতিকূল তাহা আমারও প্রতিকূল বলিয়া বোধ করেন এবং যাহা অপরের অনুকূল তাহা আমারও অনুকূল বলিয়া মনে করেন, হে অর্জুন! সেই যোগীই সকল যোগীর মধ্যে উৎকৃষ্ট বলিয়া পরিগণিত হইবার যোগ্য।

পরদিন রাজমিস্ত্রী কাজ করিতে আসিয়া দেখিল গাছের বাঁধনটা খোলা এবং দড়িগাছটি কাছে পড়িয়া আছে। সে পুনরায় গাছের ডালটিকে দড়ি দিয়া বাঁধিয়া কাজ করিতে শুরু করিল। দুপুরবেলা আমি যখন আবার সেখানে গেলাম তখন বৃক্ষের শাখাটিকে বন্ধনাবস্থায় দেখিয়া মিস্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলাম এই গাছের ডালটিকে আবার কে বাঁধিয়াছে? সে আমার প্রশ্নের উত্তরে বলিল, কাজ করিতে অসুবিধা হইতেছিল সেজন্য সে-ই ডালটিকে বাঁধিয়াছে। আমার গত দিনের অভিজ্ঞতার কথা শুনিয়া রাজমিস্ত্রী ভয়ে ভয়ে পুনরায় বৃক্ষের বন্ধন মুক্ত করিয়া দিল।

আমি সেখান হইতে চলিয়া আসার পর এই বৃত্তান্ত মিস্ত্রী আশ্রমের যুবক ব্রহ্মচারী শ্রীমান্ সদানন্দকে বলিল। সে এই ঘটনা শুনিয়া হাসিতে হাসিতে একটু বিদ্রূপের ভঙ্গীতে বলিয়াছিল, "এইসব কিছু নয়। ইহা হইল দুর্বলচিত্ত মানুষের একটা মানসিক দুর্বলতা। আমি বিকালবেলায় একটা দা আনিয়া গাছের ঐ ডালটা কাটিয়া দিব। দেখিব আমার কি হয়?" এই কথা বলিয়া সদানন্দ গরুর জন্য বিচালি (খড়) কাটিতে কল্যাণবনে* চলিয়া গেল। খড় কাটিতে কাটিতে গারাসা'র (খড় কাটিবার লোহার

---

* কিষণপুর আশ্রম হইতে অনুমান দুই ফার্লং উত্তরে রাজপুরের দিকে বড় রাস্তার ধারে সাধু-ব্রহ্মচারীদের বাসের উপযোগী শ্রীশ্রীমায়ের অপর একটি সুন্দর আশ্রম। ইহাকে 'কল্যাণবন' বলা হয়। সেখানে রামের ও শিবের মন্দির আছে।

ধারাল ভারী অস্ত্রবিশেষ) আঘাতে তাহার বাঁ হাতের তর্জনীর মূলটা এমন ভাবে কাটিয়া গেল যে আঙ্গুলের একেবারে হাড় বাহির হইয়া পড়িল। তাহার ক্ষতস্থান বাঁধিয়া দিবার জন্য ডেটল (Dettol) লইয়া সে আমার কাছে আসিল। আমি তাহার ক্ষতস্থান বাঁধিয়া দিলাম। তাহার ঐ ঘা সারিতে প্রায় দুই মাস সময় লাগিয়াছিল। শ্রীমান্ সদানন্দের আর লিচু গাছের ডাল কাটা হইল না।

ইহার পর ১৯৫৯ খৃষ্টাব্দের শারদীয়া শ্রীশ্রীদুর্গাপূজার সময় মা কাশী ফিরিয়া আসিলেন। মায়ের আদেশে আমিও সেই সময় চাতুর্মাস্যের পর দেহরাদুন হইতে কাশী প্রত্যাবর্তন করি। একদিন সুযোগ পাইয়া নির্জনে মাকে আমার ঐ অভিজ্ঞতার কথা নিবেদন করাতে মা আমাকে উহা সকলের নিকট পুনরায় বলিতে বলিলেন। একদিন বারাণসী আশ্রমের শ্রীশ্রীঅন্নপূর্ণামাতার মন্দিরের সম্মুখের বারান্দায় দুপুরবেলার সৎসঙ্গে বসিয়া নানাবিধ ধর্ম প্রসঙ্গের মধ্যে শ্রীশ্রীমা আমাকে দেহরাদুনের লিচুগাছের ঘটনাটি সভার মধ্যে সকলের নিকট বলিতে বলিলেন। মায়ের আদেশানুসারে আমি তখন পূর্বোক্ত ঘটনাটি উপস্থিত সকলের সর্ম্মুখে বিবৃত করিলাম। লিচুগাছের কাহিনীটি বর্ণনা করিবার পর মা সকলকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "এবার যখন নারায়ণকে কিষণপুর রাখিয়া চলিয়া যাওয়া হয় তখন এই শরীরের খেয়াল হইয়াছিল নারায়ণের একটু কিছু অনুভূতি হউক।" পরমস্নেহময়ী শ্রীশ্রীমা আমাকে বলিলেন, "নারায়ণ, এখন তুমি আর বলিতে পারিবে না যে এতদিন তপ, জপ করিয়া তোমার কিছুই হয় নাই।" মায়ের মুখ কমল হইতে এই কথা শুনিয়া সৎসঙ্গের সকলে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। আমি মাকে প্রণাম করিয়া অতি বিনীতভাবে হাতজোড় করিয়া বলিলাম, "মা! ইহা জপ তপের ফল নহে। ইহা তোমার অমোঘ খেয়ালের ফলে হইয়াছিল।"

আমি নিশ্চিতরূপে বুঝিতে পারিলাম যে আমার ঐ দিনকার অভিজ্ঞতা বা অনুভবটি (Auto-Suggestion) অবচেতন মনের ক্রিয়ার জন্য হয় নাই। ইহা পরমারাধ্যা স্নেহময়ী করুণাময়ী

শ্রীশ্রীমায়ের অমোঘ খেয়াল বা কৃপায়ই সম্ভব হইয়াছিল নচেৎ আমার এই অনুভবের মূলে অন্য কোন কারণ ছিল না। ইহা মহাশক্তিরই একটু স্পর্শমাত্র। মহামনীষী মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতপ্রবর শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ মহাশয় বলিতেন, "যোগিগণ যাহাকে ইচ্ছাশক্তিরূপে গ্রহণ করেন তাহা সাধারণ শক্তি নহে—তাহাই সৃষ্টির মূল শক্তি। কারণ সেই শক্তির প্রভাবেই সৃষ্টির প্রথম আবির্ভাব ঘটিয়াছে এবং এখনও ঘটিয়া থাকে। সাধারণ মনুষ্যে ইচ্ছাশক্তি তো দূরের কথা, কোন শক্তিরই বিকাশ নাই। ইচ্ছাশক্তি, জ্ঞানশক্তি, ক্রিয়াশক্তি, সবই সুপ্ত।" মায়ের খেয়াল বা ইচ্ছাশক্তি এবং সৃষ্টির মূলে যে ইচ্ছাশক্তি এই দুইটি পৃথক্ শক্তি নহে—একই শক্তি। মা "ইচ্ছা" শব্দ ব্যবহার না করিয়া ইহার স্থানে "খেয়াল" শব্দ ব্যবহার করেন।

অনুমান দুই বৎসর পর বিজয়নগরের রাজমাতা শ্রীযুক্তা ললিতা দেবী দেহরাদুন হইতে কাশী ফিরিয়া আমাকে জানাইলেন এখনও সেই লিচুগাছের ডালটি সেই রকমই ঝোলা অবস্থায় আছে। বৃদ্ধা ভদ্রমহিলা অতিশয় ভাল মানুষ এবং ধর্মপরায়ণা ছিলেন। শ্রীশ্রীমাকে তিনি ইষ্টদেবী জ্ঞানে পূজা করিতেন। তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন, তিনি ঐ বৃক্ষমূলে প্রণাম করিয়া আসিয়াছেন। কি জানি বৃক্ষরূপে কোন মহান্ আত্মা সেখানে বিরাজ করিতেছেন!

কিছুদিন পর আমার এক বিশেষ পরিচিত এবং আধুনিক শিক্ষিত বৈজ্ঞানিক ডাক্তার এই ঘটনাটি শ্রবণ করিয়া বলিয়াছিলেন, "ও সব কিছু নয়। হাতের ব্যথাটা হইয়াছিল Auto-Suggestion এর পরিণাম বা নিজের কল্পিত ভাবনারই ফল।" বৈজ্ঞানিকেরা যাহাই বলুন না কেন কিন্তু ঘটনাটি আমার হৃদয়ে এমন একটি অনুভব দিয়াছে যাহা কোন যুক্তিতর্কে কখনও মিটিবার নহে।

শ্রীশ্রীমায়ের মুখকমল হইতে নির্গত দুইটি আশার বাণী

পরমারাধ্যা শ্রীশ্রীমায়ের পবিত্র উপস্থিতিতে ১৩৬৫ সনে (১৯৫৮ খৃষ্টাব্দে) এলাহাবাদে শরৎকালীন শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা হইয়াছিল। স্নেহময়ী মায়ের অসীম কৃপায় সেই পূজায় যোগদান করিবার আমারও সৌভাগ্য ঘটিয়াছিল। পূজান্তে এলাহাবাদ হইতে কাশী প্রত্যাগমন করিয়া স্থির করিয়াছিলাম কাশী ছাড়িয়া বাহিরে আর কোথায় যাইব না। বয়স হইয়াছে এই অবস্থায় এখানে থাকিয়াই জীবনের অবশিষ্ট কয়টা দিন অতিবাহিত করিবার বাসনা। জীবনে সাধনভজন কিছুই তো করিতে পারি নাই তাই একমাত্র ভরসা কাশীখণ্ডের সেই অমূল্য মহাবাক্য "কাশ্যাং মরণাৎ মুক্তিঃ।" পরম-কারুণিক বাবা শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ জীবের মৃত্যু সময় কর্ণে তারকব্রহ্ম রাম-নাম শুনাইয়া এই দুঃখময় অপার ভবসাগর হইতে চিরতরে জীবকে মুক্ত করিয়া দেন ; এই আশায়ই মুক্তিক্ষেত্র বারাণসীতে পড়িয়া থাকা।

১৯৫৮ খৃষ্টাব্দের ১০ই নভেম্বর শ্রীশ্রীকালীপূজার দিন সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পূর্বে পরমকরুণাময়ী শ্রীশ্রীমা দয়া করিয়া আমাকে তাঁহার শয়নকক্ষে ডাকিয়া পাঠাইলেন। মায়ের আদেশ পাইয়া সব কাজকর্ম পরিত্যাগকরতঃ পরম আনন্দে মায়ের চরণপ্রান্তে ছুটিয়া গিয়া উপস্থিত হইলাম। মায়ের কাছে যাইতে এবং থাকিতে পারা হইতে আমার কাছে অধিক আনন্দের বিষয় অপর কিছু নাই। মাকে প্রণাম করিয়া বসিতেই স্নেহময়ী মা বলিলেন—

মা—দেখ নারায়ণ ! এই শরীরের সঙ্গে এই শরীরের মা গিরিজী আর তুমি যাইবে।

আমি—মা ! কোথায় যাইব তোমার সঙ্গে ?

মা—কানপুর সংযম সপ্তাহে।

আমি—মা! এবার পূজার পর এলাহাবাদ হইতে কাশী আসিয়া ঠিক করিয়া ফেলিয়াছি কাশী ছাড়িয়া কোথায়ও আরও যাইব না। কারণ বয়সও তো হইয়াছে। কখন কি হয় বলা তো কিছু যায় না। তাই কাশীতেই থাকার ইচ্ছা।

মা—এই শরীরের সঙ্গে যেখানে তুমি যাইবে সেইটাই তোমার পক্ষে কাশী।

শ্রীশ্রীমায়ের শ্রীমুখ হইতে এই কথা শুনিয়া আর কোন উত্তর দিতে পারিলাম না। আশা ও আনন্দে আমার হৃদয়খানা কাণায় কাণায় ভরিয়া গেল। মায়ের সঙ্গে কানপুর সংযম সপ্তাহে যাইব ইহা সহর্ষে স্বীকার করিয়া আসিলাম। মায়ের এই কথার উপর আর কি কেহ স্বীকার না করিয়া থাকিতে পারে? আমার মত সাধন ভজনহীন নিষ্কিঞ্চনের পক্ষে এটা যে কত বড় আশার বাণী তাহা আমি কখন স্বপ্নেও কল্পনা করিতে পারি না। শ্রীশ্রীমায়ের সম্মুখে যেখানেই আমার শরীর ত্যাগ হইবে তাহাই আমার পক্ষে কাশী-মৃত্যু তুল্য। ইহাই মায়ের কথার সারাংশ। অতএব মায়ের সঙ্গে সঙ্গে যাঁহারা সর্বদা নানাস্থানে ঘোরাঘুরি করেন তাঁহাদের তো হিন্দীভাষায় যাকে বলে "দোনোঁ হাথোঁ মেঁ লড্ডু হ্যায়।" মায়ের সঙ্গ করাও হইতেছে, সঙ্গে সঙ্গে কাশীবাসও হইতেছে—দেশ দেখা এবং সাধু সন্তদের দর্শনও তাঁহাদের উপদেশ শ্রবণ তো ফাওয়ে (অতিরিক্ত) পাওয়া যাইতেছে। এই আশার বাণী মা একজনকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন বটে কিন্তু ইহা সকলের পক্ষেই প্রযুজ্য। যেমন শ্রীভগবান্ শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতায় অর্জুনকে উপলক্ষ্য করিয়া যাহা উপদেশ দিয়াছেন তাহা সর্বদেশের, সর্বকালের ও সর্বনরনারীর পক্ষেই যে প্রযোজ্য তাহা আর কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না। যাঁহারা মায়ের সঙ্গে দেশে দেশে ভ্রমণ করিতেছেন তাঁহাদের যে কত সৌভাগ্য তাহা একমুখে বর্ণন করা যায় না। তাঁহাদের রথ দেখা ও কলা বেচা দুই-ই হইতেছে।

পরের দিন দুপুরবেলা শ্রীশ্রীঅন্নপূর্ণামাতার মন্দিরের সম্মুখের নাটমন্দিরে সৎসঙ্গে পুনরায় কথা উঠিল পূর্ণ জ্ঞান না হওয়া পর্যন্ত মুক্তি হইতে পারে না। অতএব মুমুক্ষুর জ্ঞানানুশীলন করা

অবশ্য কর্তব্য। এই সব বিষয় লইয়া যখন আলোচনা হইতেছিল তখন আমি হতাশার সহিত মাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলাম, "মা! আমার ন্যায় অল্প বুদ্ধি ও স্বল্প শক্তিসম্পন্ন লোকের পক্ষে পূর্ণ-তপস্যাও সম্ভব নয়, অতএব পূর্ণ চিত্তশুদ্ধিও হইবে না। পূর্ণ চিত্তশুদ্ধি না হওয়া পর্যন্ত পূর্ণজ্ঞানের কোনও আশা নাই। পূর্ণ ব্রহ্ম জ্ঞান না হওয়া পর্যন্ত মুক্তির আশা সুদূরপরাহত। কারণ শাস্ত্র বলিতেছেন 'জ্ঞানাৎ মুক্তিঃ'। জ্ঞান হইলেই মুক্তি। জ্ঞান ব্যতীত মুক্তি হইতে পারে না। জ্ঞান বলিতে এখানে ব্রহ্মজ্ঞানই ধরিতে হইবে। অতএব আমার মুক্তির কোন আশাই নাই।" আমার এই নৈরাশ্যযুক্ত কথার উপর করুণাময়ী শ্রীশ্রীমা বলিলেন, "তোমার সাধ্যমত তুমি তো কাজ করিয়া যাও—তারপর···।" মায়ের মুখের কথা শেষ না হইতেই আমি মাকে বলিলাম, "তারপর যতটা বাকী থাকিবে, মা! তুমি তাহা পূর্ণ করিয়া দিবে তো?" আমার কথার উপর অকস্মাৎ মায়ের শ্রীমুখ হইতে বাহির হইল, "হাঁ বাকীটা আমি····· মা পূর্ণ করিয়া দিবেন।"

শ্রীশ্রীমায়ের মুখকমল হইতে নির্গত এই আশার বাণী শ্রবণের সঙ্গে সঙ্গেই আমি তাঁহাকে প্রণাম করিয়া নিবেদন করিলাম, "মা! তুমি আজ বড়ই আশার বাণী শুনাইলে। তোমার এই অমৃত সন্দীপিত বাণী শ্রবণ করিয়া পূর্ণ ভরসা পাইলাম। আমার আর চিন্তা কি? কাশী স্থান, গঙ্গার পাড়, মা অন্নপূর্ণার সম্মুখে, শ্রীশ্রীমায়ের মুখের মহাবাক্য। ইহা সত্য না হইয়া যায় না।" কথার পৃষ্ঠে হঠাৎ কথাটা মা এত জোরের সহিত বলিয়াই বোধ হয় চিন্তা করিলেন—আপন স্বরূপের তো প্রকাশ এইভাবে হইয়া পড়িল! তাই একটু ঢোক গিলিয়া বলিলেন, "মা পূর্ণ করিয়া দিবেন"। মা তো সকল সময়ই নিজেকে প্রচ্ছন্ন বা গুপ্ত রাখেন। কখন কখনও অকস্মাৎ কথার পৃষ্ঠে মায়ের মুখ দিয়া এই রকম দুই একটা কথা বাহির হইয়া যায়। এমন আশার বাণী কে বলিতে পারে যে তোমার বাকী তপস্যা ও অপূর্ণ জ্ঞান আমি পূর্ণ করিয়া দিব। এক শ্রীভগবান্ ব্যতীত অপর কাহারও মুখ হইতে এই রকম ভরসার কথা নির্গত হওয়া কদাপি সম্ভব নহে।

অতএব শ্রীশ্রীমা যে কে ইহা কি আর কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে? তাঁহার আপন শ্রীমুখের বাণী হইতেই তাঁহার পরিচয় আজও পুনরায় পাওয়া গেল, যাহা একবার প্রায় ষাট বৎসর পূর্বে বাজিতপুর থাকাকালীন প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছিল। আজ সেই কথাই প্রকারান্তরে মায়ের মুখ হইতে আবার বাহির হইল। আমার ন্যায় সাধারণ মানবের পক্ষে ইহা কম ভরসার কথা নহে। করুণাময়ী শ্রীশ্রীমায়ের রাতুল চরণে সন্তানের বিনীত প্রার্থনা— এই আশার বাণীর উপর যেন জীবনের অন্তিম মুহূর্ত পর্যন্ত পূর্ণ বিশ্বাস রাখিতে পারি।

শ্রীশ্রীমায়ের অতুলনীয় স্নেহের দুইটি নিদর্শন

শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী সকলের কন্যা সাজিয়া যেমন স্নেহ, আদর ও ভালবাসা সকলের নিকট হইতে দাবি করেন পক্ষান্তরে তিনিও যে সকলকে সন্তানের ন্যায় স্নেহ ও আদর করেন না তাহা কিন্তু বলা যায় না। বিবাহিত স্ত্রী ও পুরুষদের তিনি ডাকেন 'মা' ও 'বাবা' বলিয়া এবং তাহাদের কাছে আবদার করেন স্নেহ, আদর ও ভালবাসা। অবিবাহিত ছেলে-মেয়েদের সম্বোধন করেন তিনি 'বন্ধু' বলিয়া এবং দান করেন তাঁহার স্নেহ ও আদর। মায়ের সন্তানদের যদি জিজ্ঞাসা করা যায় তাহা হইলে আমার তো বিশ্বাস অনেকেই আপন আপন জীবনে যে মায়ের নিকট হইতে অন্ততঃ দুই-চারিবার অপরিসীম স্নেহ ও আদর প্রাপ্ত হইয়াছেন তাহা অস্বীকার করিতে পারিবেন না। যাঁহারা মায়ের অতিশয় বুদ্ধিমান ও বুদ্ধিমতী ছেলে-মেয়ে তাঁহারা হয় তো সে সব গোপন রাখিয়া নিজেদের ভাবরাশি পুষ্ট করিতেছেন। বাস্তবিকপক্ষে এ জাতীয় হৃদয়ের গুপ্তধন লুকাইয়া রাখিবারই জিনিস এবং লুক্কায়িত রাখাই উচিত, ঢাক ঢোল বাজাইয়া সর্বসমক্ষে প্রকাশ করা যুক্তি-সঙ্গত নহে। তবে যে আমি উহা সর্বসাধারণের নিকট উপস্থিত করিতেছি তাহার কারণ আমি মায়ের বুদ্ধিমান ও বুদ্ধিমতী ছেলে-মেয়েদের মত অত গভীর জলের রোহিত মৃগেল নহি, আমি হইলাম অতি অল্প জলের ক্ষুদ্র চুনো-পুঁটি। জগতে অতিশয় সরল হওয়া যে বুদ্ধি-মানের লক্ষণ নহে বরং উহা যে অল্পবুদ্ধিরই পরিচায়ক তাহাও আমি বিশেষভাবে জানি। তথাপি যে এইসব বৃত্তান্ত লিখিতেছি তাহার কারণ আমি আমার কতিপয় বন্ধুর কাছে অনিচ্ছাসত্ত্বেও কোন সময় কথার পৃষ্ঠে বলিয়াছি যে আমার এই অকিঞ্চিৎকর অতিক্ষুদ্র জীবনে যে ভাবে শ্রীশ্রীমাকে আমি পাইয়াছি তাহা যতটা প্রকাশ করা যায় ততটা অকপটে ব্যক্ত করিতে চেষ্টা করিব। আমি আশাকরি

বিদগ্ধ পাঠকগণ আমাকে অনুকম্পা ও সহানুভূতির দৃষ্টিতেই দেখিবেন এবং সমালোচকের দৃষ্টিভঙ্গী দয়া করিয়া পরিহার করিবেন।

গত ১৪ই জানুয়ারী ১৯৫৮ খৃষ্টাব্দে শ্রীশ্রীমা তাঁহার গর্ভ-ধারিণীর অসুখের সংবাদ পাইয়া আনন্দকাশীতে মাত্র সাতদিন অবস্থান করিয়াই বারাণসী প্রত্যাবর্তন করিতেছেন। মায়ের আরও কিছুদিন আনন্দকাশীতে থাকিবার কথা ছিল। কারণ টিহিরী-গাঢ়ওয়ালের রাজমাতা শ্রীআনন্দপ্রিয়ার (প্রকৃত নাম শ্রীমতী কমলেন্দুমতী শাহ) একান্ত অনুরোধ ছিল যে মা সেখানে নির্জনে কিছু সময় বিশ্রাম করেন। সেই প্রস্তাব ব্যতিক্রম করিয়াই দিদিমাকে দেখিবার জন্য মায়ের কাশী আসা হইতেছে। আশ্রমের প্রধান কর্মসচিব শ্রীকমলাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য (বর্তমানে ব্রহ্মচারী শ্রীবিরজানন্দজী) শ্রীশ্রীমাকে বারাণসী স্টেশন হইতে আনিবার জন্য গাড়ী লইয়া স্টেশনে যাইতেছিলেন। আশ্রম হইতে রওয়ানা হইবার সময় হঠাৎ তাঁহার সঙ্গে আমার সেবালয়ের* কাছে দেখা হইল। কমলদা আমাকে বলিলেন, "মাকে আনিতে আমি স্টেশনে যাইতেছি। আপনি কি আমার সঙ্গে স্টেশনে যাইবেন?" আমি তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইয়া মাকে আনিতে সহর্ষে স্টেশনে চলিলাম।

শ্রীশ্রীমা যথাসময়ে বৈকাল অনুমান চারি ঘটিকার কিছু পূর্বেই দেহরাদুন এক্সপ্রেসে বারাণসী স্টেশনে আসিয়া পৌঁছিলেন। মায়ের গাড়ীর সম্মুখের সিটে বসিলেন তাঁহার একান্ত অনুগত ভক্ত ডাক্তার গোপাল দাসগুপ্ত এবং মায়ের পার্শ্বে গাড়ীর পিছনের সিটে আমি বসিলাম। গোপালবাবু গাড়ীতে বসিয়াই মায়ের সঙ্গে নানাবিধ কথাবার্তা জুড়িয়া দিলেন। গোপালবাবুর গল্প বলিবার শক্তি ছিল অসাধারণ। সে সকল কথা আমি অত্যন্ত মনোযোগের সহিত শ্রবণ করিতেছিলাম। কথা শুনিতে শুনিতে কখন যে আমার গায়ের গরম চাদরখানা খুলিয়া গিয়া আমার বুকটা উদলা (অনাবৃত) হইয়া গিয়াছিল তাহা আমি জানিতে পারি নাই কারণ আমার মনটা ডাক্তারবাবুর কথায় অত্যন্ত নিবিষ্ট হইয়াছিল। মা কিন্তু এত কথাবার্তার মধ্যেও ইহা লক্ষ্য করিয়াছিলেন। খোলা

* কাশী আশ্রমের অফিসকে বলা হয় 'সেবালয়'।

বুকে চলতি গাড়ীতে শীতের ঠাণ্ডা বাতাস লাগিয়া পাছে আমার অসুখ করে এই আশঙ্কায় গোপালবাবুর কথা শুনিতে শুনিতে তাড়াতাড়ি করিয়া যেমন ছোট ছেলেমেয়ের গা খালি হইয়া গেলে তাদের গর্ভধারিণী স্নেহের সহিত (সন্তানের) শরীরে কাপড় জড়াইয়া দিয়া থাকেন, ঠিক তেমনি করিয়া অতিশয় ক্ষিপ্রতার সহিত স্নেহময়ী মা আমার গায়ের কাপড়খানা ভাল করিয়া জড়াইয়া দিলেন। কেবল যে গরম কাপড়খানা শরীরে বেষ্টন করিয়াই তিনি ক্ষান্ত হইলেন তাহাই নহে, পুনরায় যাহাতে চাদরখানা খুলিয়া না যায় সেই জন্য চাদরের খুঁটখানা ঘুরাইয়া লইয়া আমার ঘাড়ের পশ্চাতের দিকে গুঁজিয়া দিলেন। এখানে বলিয়া দেওয়া প্রয়োজন, সাবিত্রীযজ্ঞের প্রারম্ভ হইতে আমি কোন প্রকার সেলাইকরা বস্ত্রাদি বহুদিন ব্যবহার করিতাম না। বর্তমান অসুখের পর হইতে ঐ সব গায়ে দিতেছি।

এই ক্ষুদ্র ঘটনাটি যদিও লোকদৃষ্টিতে অতিশয় তুচ্ছই, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই কিন্তু শ্রীশ্রীমায়ের দ্বারা এই গরম কাপড়খানা আমার শরীরে জড়াইয়া দিবার অকিঞ্চিৎকর কার্যটির মধ্যে যে কতখানি দরদ, আদর ও স্নেহ জড়িত ছিল তাহা আমি ভাষায় প্রকাশ করিতে নিতান্তই অক্ষম। আমার মনে হয় জগতে এমন কোন ভাষাতত্ত্ববিৎ আজ পর্যন্ত জন্মগ্রহণ করেন নাই যিনি যথাযথভাবে ইহা ভাষার মাধ্যমে প্রকাশ করিতে পারেন। ইহা কেবল হৃদয় দিয়া, মরমিয়ার মরম দিয়া অনুভব করিবারই বিষয়, ভাষায় ব্যক্ত করিবার বিষয় নহে। এই বৈশিষ্ট্যবিহীন অতি সাধারণ ঘটনাটি আমার হৃদয়ফলকে কাটিয়া দিয়াগিয়াছে এমন একটি দরদ ও স্নেহের গভীর রেখা যাহা ভাবিতে গেলে আমার সর্ব শরীর পুলকিত হইয়া উঠে এবং সম্পূর্ণ বুকখানা আনন্দে ভরিয়া যায়। একজন ষাট বৎসরের বৃদ্ধের প্রতি শিশু সন্তানের প্রাপ্য স্নেহের ব্যবহার কেবল আমাদের পরমস্নেহময়ী শ্রীশ্রীমায়ের পক্ষেই সম্ভব। সন্তানবৎসলা মায়ের ইহাই স্বাভাবিক আচরণ।

গত ১৩৬৩ সনের (১৯৫৬ খৃষ্টাব্দের) শারদীয়া শ্রীশ্রীদুর্গাপূজার কাছাকাছি কোন একসময় অনুরূপ একটি ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল।

যে সময়কার এই ঘটনা সেই সময় শ্রীশ্রীমা কলিকাতায় গমন করিলে বালিগঞ্জের একডালিয়া রোডের পুরাতন আশ্রমবাটীতে অবস্থান করিতেন কারণ তখনও মায়ের আগড়পাড়ার আশ্রমবাড়ী ক্রয় করা হয় নাই।

একদিন বেলা দশটার পর মাকে তাঁহার কোন মহিলা ভক্ত তাঁহার বালিগঞ্জের অন্তর্গত গড়িয়াহাটা রোডের বাড়ী লইয়া যান। সেদিন আমিও মায়ের সঙ্গে যাইবার সুযোগ লাভ করিয়াছিলাম, স্বীয় প্রাক্তন শুভকর্মের ফলে নহে, বরং উহা সংঘটিত হইয়াছিল শ্রীশ্রীমায়ের অহৈতুকী করুণায়। অজস্র লোকের ভিড়ের মধ্য হইতে মা-ই মোটরে উঠিবার সময় অপ্রত্যাশিতরূপে ইশারায় আমাকে ডাকিয়া লইয়াছেন। আমি কখন চিন্তাও করি নাই যে মা আমাকে তাঁহার সঙ্গে লইয়া যাইবেন। সেই জন্য আমি কোথায়ও যাইবার নিমিত্ত প্রস্তুত ছিলাম না। মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গী হইতে বিচার করিলে দেখা যায়, যাহা আশা করা যায় সেই বস্তু না পাইলে হয় দুঃখ, পাইলে হয় আনন্দ। যাহা কখন আশা করা যায় না তাহা প্রাপ্ত হইলে হইয়া থাকে অপরিসীম আহ্লাদ। স্নেহময়ী মায়ের সঙ্গে যাইতে পারায় আমার অসীম হর্ষ হইয়াছিল। মায়ের মোটরের সম্মুখের সিটে চালকের পার্শ্বে বসিয়া তাঁহার (মায়ের) কোন এক বিশেষ ভক্তের বাড়ী আমি চলিলাম। কোথায় এবং কাহার বাসস্থানে যাইতেছি তার কোনই সংবাদ তখনও আমি অবগত ছিলাম না। তাহা জানিবার জন্য আমার কোন ঔৎসুক্যও বড় ছিল না। মায়ের সঙ্গে যাইতে পারিতেছি ইহাতেই আমি নিজেকে কৃতকৃত্য মনে করিতেছিলাম। মায়ের পার্শ্বে ও পদপ্রান্তে বসিয়া চলিয়াছেন কয়েকটি কুমারী কন্যা—যাঁহাদের সৌভাগ্যের তুলনা হয় না। মা যেমন গন্তব্যস্থানে পৌঁছিয়া গাড়ী হইতে অবতরণ করিতেছিলেন—সঙ্গে সঙ্গে আমিও মায়ের আগে গাড়ী হইতে নামিতে গিয়া গাড়ীর দরজার উপরের অংশটা খট করিয়া আমার কপালে লাগিল। আঘাতের দরুন আমার কপালটা ফুলিয়া উঠিল। ব্যাপারটা আমি গোপন করিবার চেষ্টা করিলাম কিন্তু

শ্রীশ্রীমায়ের বিশ্বতঃ চক্ষুর দৃষ্টি সহসা তাঁহার এই সন্তানের উপর পড়িয়া গেল। ছোটখাট ঘটনাও যে মায়ের চক্ষু এড়ায় না তাহা ইহা হইতে প্রমাণিত হয়।

এদিকে শ্রীশ্রীমাকে যাঁহারা বিশেষ আগ্রহ করিয়া তাঁহাদের বাড়ী লইয়া গিয়াছিলেন তাঁহারা মায়ের গলায় রজনীগন্ধার মালা পরাইয়া ও মঙ্গল শঙ্খ বাজাইয়া মায়ের স্বাগত সাদর অভ্যর্থনা করিলেন। মাকে তাঁহারা অতিশয় সমাদরের সহিত তাঁহাদের বাগানে লইয়া গিয়া বসাইবার আয়োজন করিতে-ছিলেন। শ্রীশ্রীমায়ের সেদিকে কোন লক্ষ্যই নাই। তিনি ব্যস্ত হইয়া নিজের কাপড়ের অঞ্চলখানি সিক্ত করিবার জন্য তাঁহাদের কাছে জল চাহিতে লাগিলেন। আমি তো বুঝিতে পারিতে-ছিলাম না—মা আপন বস্ত্রাঞ্চলখানি আর্দ্র করিবার জন্য এত উৎসুক কেন? মা অতিশয় তাড়াতাড়ি আপনার পরিধানের কাপড়ের খুঁটখানি জলে ভিজাইয়া ক্ষিপ্রগতিতে আমার কাছে আসিয়া আমার কপালে গাড়ী হইতে নামিবার সময় যেখানে আঘাত লাগিয়াছিল সেখানটা স্বীয় আর্দ্রবস্ত্রের অঞ্চলখানি দিয়া চাপিয়া ধরিলেন। মায়ের এই স্নেহের পরশে আমার সম্পূর্ণ হৃদয় আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া গেল। আমার মন, প্রাণ ও হৃদয়ের প্রত্যেকটি তন্ত্রী অসীম আনন্দে ঝঙ্কার দিয়া উঠিল। স্নেহময়ী মায়ের এই মধুর স্নেহস্পর্শ যে কত সুকৃতির ফলে পাওয়া যায় মনে মনে তাহাই ভাবিতেছিলাম। কৈ এই জন্মে তো এমন কোন শুভকর্ম করি নাই যাহার ফলস্বরূপ মায়ের এই স্নেহ ও আদর পাইতে পারি? পুণ্যের ফলে স্বর্গাদি পাওয়া যায় কিন্তু এই জাতীয় বাৎসল্য স্নেহ জীবের ভাগ্যে প্রাপ্ত হওয়া অসম্ভব। ইহা কেবল মায়ের অপার অহৈতুকী কৃপাদ্বারাই পাওয়া সম্ভবপর, অন্য কোন উপায়ে নহে। মনে মনে ভাবিলাম যদি মায়ের নিকট হইতে এমন স্নেহ ও আদর পাওয়া যায় তাহা হইলে দিনের মধ্যে দুই চারিবার মাথায় কি কপালে এরূপ আঘাত পাওয়াটা কোন রকমেই অবাঞ্ছিত নয়। একজন বুড়ো মানুষের প্রতি এমন শিশুর প্রাপ্য ব্যবহার কেবল আমাদের স্নেহময়ী শ্রীশ্রীমা-তেই দেখিতে পাওয়া যায় অন্যত্র

কুত্রাপি এমনটি দৃষ্টিগোচর হয় না। মা যাহা করেন সবটাই যেন পরিপূর্ণ ও নিখুঁত—তাহাতে কোথাও কোন প্রকার একটু ন্যূনতা অন্বেষণ করিয়া পাওয়া যায় না। মা বাৎসল্য স্নেহে আজ যাহা করিলেন তাহাতে বিন্দুমাত্র ছিল না ত্রুটি, ভেজাল ও লোক দেখান ভাব। ইহা ছিল অত্যন্ত পবিত্র ও মধুর অপত্য স্নেহ।

পরে সুযোগ পাইয়া আমি মাকে বলিয়াছিলাম, "মা! এতগুলো লোকের মধ্যে আজ তুমি কি কাণ্ডটাই না করিলে? আমার তো এমন কিছু বেশী আঘাত লাগিয়াছিল না, যাহার দরুন তোমাকে তোমার পরিধেয় কাপড় ভিজাইয়া আমার আঘাতের স্থানে চাপিয়া ধরিবার প্রয়োজন হইয়াছিল।" আমার কথার উত্তরে মা আমাকে বলিলেন, "এই শরীর যাহা ভাল বুঝিবে তাহা সকলের সম্মুখেও করিবে আবার প্রয়োজন হইলে লোকচক্ষুর আড়ালেও করিবে। তাহাতে এই শরীরের কোনই সঙ্কোচ নাই।" এই রকম সোজা ও সরল উত্তর কেবল শ্রীশ্রীমাতা আনন্দময়ীর মুখেই শোনা সম্ভব।

মায়ের স্নেহের কথা স্মরণ করিলে হৃদয় আনন্দ ও কৃতজ্ঞতায় অভিভূত হইয়া পড়ে। মায়ের স্নেহ ও আদরের তুলনা জগতে আর কাহারও স্নেহ ও আদরের সহিত উপমা হইতে পারে না। মায়ের তুলনা কেবল মা-ই। গর্ভধারিণী আপন শিশু সন্তানকে যেমন স্নেহ ও আদর করেন, সেই ছেলে বড় হইলে মাতা আর তেমন ভাবে আদর করিতে পারেন না, সঙ্কোচ ও লজ্জা বাধা প্রদান করে। কিন্তু আমাদের পরম স্নেহময়ী মায়ের ব্যবহারে কখনও সেইরূপ কোন ব্যতিক্রম আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় না। তিনি জগতের প্রতিটি জীবকেই আপন আত্মা বা ব্রহ্মরূপে দর্শন করিয়া থাকেন বলিয়াই এইরূপ আচরণ সম্ভবপর হয়। তাঁহার মধ্যে কোন প্রকার ভেদ জ্ঞান নাই। ইহাই হইল জ্ঞানীর দৃষ্টি। বিবেকচূড়ামণিতে বলা হইয়াছে—

অন্তর্বহিঃ স্বং স্থিরজঙ্গমেষু
জ্ঞানাত্মনাধারতয়া বিলোক্য।
ত্যক্তাখিলোপাধিরখণ্ডরূপঃ
পূর্ণাত্মনা যঃ স্থিত এষ মুক্তঃ॥ ৩৩৯॥

যিনি সমস্ত স্থাবর-জঙ্গম বা চরাচর পদার্থের ভিতরে ও বাহিরে আপনাকে জ্ঞানস্বরূপ এবং উহার আধারভূত দেখিয়া সকল উপাধি-সমূহকে পরিত্যাগকরতঃ অখণ্ডপরিপূর্ণরূপে স্থিত থাকেন তিনিই মুক্ত। মুক্ত পুরুষ সর্বত্র আপনাকেই অবলোকন করেন। তাঁহার নিকট স্ত্রী-পুরুষ, শিশু-যুবক, ধনী-নির্ধন, বিদ্বান্-মূর্খ—প্রভৃতিতে কোনই ভেদ নাই। সর্বত্র তিনি ব্রহ্ম দর্শনই করিয়া থাকেন। তাঁহার দৃষ্টিতে উপাধির কোন মূল্য নাই। উহা সর্বদা ও সর্ব প্রকারে সত্ত্বাশূন্য বা মিথ্যা। অতএব ব্রহ্মজ্ঞপুরুষের ব্যবহারের মধ্যে কোন বিভিন্নতা দেখা যায় না। তাই তাঁহার মধ্যে কোন সঙ্কোচ বা লজ্জা বলিয়া কিছু নাই। লজ্জা, ঘৃণা, ভয়াদি হয় দুই হইতে বা অপরের নিকট হইতে। যাঁহার পর বা আপন বলিয়া কোন ভেদবুদ্ধি নাই তাঁহার নিকট এই সকলের স্থান কোথায় ?

সর্বাত্মনা বন্ধবিমুক্তিহেতুঃ
সর্বাত্মভাবান্ন পরোঽস্তি কশ্চিৎ।
দৃশ্যাগ্রহে সত্যুপপদ্যতেঽসৌ
সর্বাত্মভাবোঽস্য সদাত্মনিষ্ঠয়া ॥ ৩৪০ ॥

সংসার-বন্ধন হইতে সর্বপ্রকারে মুক্ত হইতে হইলে সর্বাত্মভাব অর্থাৎ সকলকে আপন আত্মারূপে দেখার ভাব হইতে আর কোন বড় উপায় নাই। নিরন্তর আত্মনিষ্ঠাতে বা ব্রহ্মভাবে স্থিত থাকিলে দৃশ্যের নিষেধ বা বাধ হইয়া গেলে সর্বাত্মভাবের প্রাপ্তি হইয়া থাকে। মুক্ত পুরুষ বা মুমুক্ষুর যখন এই অবস্থা তখন যিনি জ্ঞান, ভক্তি ও মুক্তি দান করিয়া থাকেন তাঁহার দৃষ্টিভঙ্গী যে কি তাহা আমাদের মত মানুষের বুদ্ধির অগোচর এবং ধারণার অতীত।

শ্রীশ্রীমায়ের চরণে অন্তিম প্রার্থনা

১

অধম বলিয়া পড়ে আছি দূরে,
তুমি মাগো মোরে দেখিয়ো।
জগৎ যখন ঘৃণায় করিবে গো হেলা,
তুমি আমায় ভালবাসিয়ো ॥

২

তোমার স্নেহের সরস ধারায়,
মাগো সিক্ত আমায় করিয়ো।
তোমার বক্ষের পীযূষদানে,
মোরে পুষ্ট তুমি রাখিয়ো॥

৩

অজপা যে দিন যাবে গো ফুরায়ে,
সকলের কথা আমায় ভুলায়ো।
তোমারি বারতা বারে বারে আমার
হৃদয় মাঝারে মাগো জাগায়ো॥

৪

কণ্ঠরুদ্ধ যখন হইয়া গো যাবে,
মা মা ব'লে মোরে ডাকায়ো।
ত্যাজ্য বলিয়া আমায় যখন ফেলিয়া গো দিবে,
স্নেহে বক্ষে মোরে তুমি ধরিয়ো॥

৫

নয়ন যখন কোন দেখিবে না দৃশ্য,
তোমার রূপটি আমায় দেখায়ো।
কর্ণ যখন কারো শুনিবে না বাণী,
তোমার নামটি কেবল মোরে শোনায়ো॥

৬

নাসিকা যখন কিছু করিবে না ঘ্রাণ,
তোমার অঙ্গগন্ধ আমায় শোঁকায়ো।
রসনা যখন কিছুর লইবে না স্বাদ,
তোমার নামামৃত পান করায়ো॥

৭

পরশ যখন দিবে না মা কেহ,
তোমার হাতখানি বুকে মোর বুলায়ো।
তোমার আদরের ছোঁয়া দিয়ে মাগো,
পুলকিত আমায় তুমি করিয়ো॥

৮

মন যখন কারো না করিবে চিন্তা,
তোমার ধ্যানটি মাগো মোরে ধরায়ো।
বুদ্ধি যখন কিছু না করিবে স্থির,
তোমার স্বরূপটি আমায় বুঝায়ো॥

৯

চিত্ত যখন কিছুর লইবে না ছাপ,
তোমার মূরতি অঙ্কিত তাহে করিয়ো।
অহংকার যখন না করিবে জ্ঞান
তোমাতে আমায় মাগো ডুবায়ো॥

১০

আত্মায় আত্মায় যখন হ'বে গো মিলন,
তখন থাকিবে না দুই আর।
তোমাতে মিলিয়া মাগো, আমি তুমি হ'বো,
এক ব্রহ্ম নিরাকার॥

শ্রীশ্রীমায়ের স্বাভাবিক যোগ-বিভূতি

শ্রীভগবান্ শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতায় অর্জুনকে নিমিত্ত করিয়া কর্ম-যোগ, ভক্তিযোগ, জ্ঞানযোগ, কর্মসন্ন্যাসযোগ, আত্মসমর্পণযোগ প্রভৃতি নানা প্রকার যোগের উপদেশ দিয়াছেন। মানব আপন আপন সংস্কার, ভাব ও রুচি অনুসারে যাহার যেটি ভাল লাগে সেই পথ গ্রহণ করিয়া থাকে। ভগবান্ ইহাও বলিতেছেন—

তপস্বিভ্যোঽধিকো যোগী জ্ঞানিভ্যোঽপি মতোঽধিকঃ।
কর্মিভ্যশ্চাধিকো যোগী তস্মাদ্ যোগী ভবার্জুন ॥ ৬।৪৬ ॥

যোগী তপস্বিগণ হইতেও শ্রেষ্ঠ, শাস্ত্রপঠিত জ্ঞানিগণ হইতেও যোগী শ্রেষ্ঠ, স্বকাম কর্মিগণ হইতেও যোগী শ্রেষ্ঠ, অতএব হে অর্জুন! তুমি যোগী হও। কর্মযোগী ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিয়া কর্ম করায় কর্ম বন্ধন হইতে মুক্ত হয়। ভক্তযোগী ভগবৎপ্রীত্যর্থে কর্মসম্পাদনকরতঃ কর্ম-বন্ধনে লিপ্ত হয় না। জ্ঞানযোগী স্বয়ং ব্রহ্মভাবনা করিতে করিতে স্বস্বরূপে অবস্থান করিয়া নিষ্ক্রিয় বা ক্রিয়াহীন হইয়া যান। যোগী সর্বদা পরমাত্মার সহিত যুক্ত থাকিয়া যাহা করেন তাহা পরমাত্মাই করিতেছেন সেইহেতু যোগী সর্বপ্রকারে কর্মমুক্ত থাকেন। সার কথা হইল গীতায় প্রথম হইতে শেষপর্যন্ত ভগবান্ অর্জুনকে যোগের কথাই নানাভাবে বলিয়াছেন। প্রতি অধ্যায়ের সমাপ্তিতে শ্রীকৃষ্ণার্জুন সংবাদকে ব্রহ্মবিদ্যারূপ যোগশাস্ত্র বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। যোগারূঢ় হইয়া কর্ম করিতে পারিলে কর্ম, ভক্তি, জ্ঞান ও যোগে কোনই ভেদ নাই। সকলেরই উদ্দেশ্য কর্মপাশ হইতে মুক্ত হইয়া সর্বক্ষণ পরমানন্দ লাভ। যোগ ও জ্ঞান সম্বন্ধে মর্যাদা পুরুষোত্তম ভগবান্ শ্রীরাঘবেন্দ্র আপনার অনুগত পরমভক্ত শ্রীহনুমান্‌কে শ্রীরামগীতায় বলিতেছেন—

যোগাৎ সংজায়তে জ্ঞানং জ্ঞানাদ্যোগঃ প্রজায়তে।
যোগজ্ঞানাভিযুক্তস্য নাবাপ্যং বিদ্যতে ক্বচিৎ ॥

যোগ হইতে জ্ঞান উৎপন্ন হয় এবং জ্ঞান হইতে যোগ। যিনি যোগ এবং জ্ঞান উভয়ের অধিকারী, তাঁহার কোথায়ও আর কিছু প্রাপ্তব্য নাই।

যদেব যোগিনো যান্তি সাংখ্যং তদভিগম্যতে।
একং সাংখ্যং চ যোগং চ যঃ পশ্যতি স তত্ত্ববিৎ॥

যোগী যে পদ প্রাপ্ত হন, সাংখ্যজ্ঞান দ্বারাও ঐ পদ প্রাপ্তি হয়। যিনি সাংখ্য এবং যোগ উভয়কে ফল-দৃষ্টিতে এক দর্শন করেন, তিনিই তত্ত্ববেত্তা, তিনিই ব্রহ্মবেত্তা। যোগী ও জ্ঞানীর চরম একই তাহাতে কিছু ভেদ নাই। যোগী চাহেন নির্বিকল্প সমাধিদ্বারা চিত্তবৃত্তি নিরোধ করিতে করিতে অবশেষে উহা সম্যক্ প্রকারে নাশকরতঃ নিরবচ্ছিন্ন তৈলধারাবৎ নিত্যকালের জন্য পরমাত্মার সহিত এক হইয়া যাওয়া, পক্ষান্তরে জ্ঞানীর লক্ষ্য আত্মবিচার বা ব্রহ্মবিচার দ্বারা সচ্চিদানন্দরূপ স্বস্বরূপে শাশ্বত অবস্থিতি। প্রকৃতপক্ষে এই দুইয়ের অর্থাৎ যোগী ও জ্ঞানীর চরম লক্ষ্যের মধ্যে কোন প্রকার বিরোধ নাই। লক্ষ্য যদিও একই কিন্তু ইহাদের উপায় বা সাধন প্রণালী ভিন্ন। যোগমার্গ ও জ্ঞানমার্গ এই দুই পন্থার সাধন পদ্ধতির মধ্যে পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও বিভূতির প্রকাশ একই রকম। যোগী ও জ্ঞানী উভয়েরই অষ্টসিদ্ধি অর্থাৎ অণিমা, মহিমা, গরিমা, লঘিমা, প্রাপ্তি, প্রাকাম্য, ঈশিত্ব ও বশিত্ব লাভ হইয়া থাকে। জ্ঞানী এই সকল ঐশ্বর্যের দিকে লক্ষ্য দেন না। না দিলেও কোন কোন সময় বিভূতি প্রকাশ হইয়াই পড়ে। অগ্নি যেমন কাপড়ে বাঁধিয়া লুক্কায়িত রাখা যায় না, কাপড় জ্বলিয়া প্রকাশ হইয়া পড়ে তেমনি মা তাঁহার স্বাভাবিক যোগজ বিভূতিসকল গোপন রাখিলেও কোন কোন ক্ষেত্রে এবং কাহার কাহারও নিকট ব্যক্ত হইয়া যায়। কর্ম, ভক্তি, জ্ঞান কি যোগ ইহার কোন একটার মধ্যে ফেলিয়া মাকে সীমাবদ্ধ করা যায় না। তিনি যখন যেটা আচরণ করেন সেটা পূর্ণভাবেই করিয়া থাকেন। মাকে যখন কেহ কর্ম করিতে দেখেন তখন তাঁহাকে একজন মহাকর্মযোগিনী বলিয়াই মনে হয়। আবার যখন যোগের বিবিধ স্তরের কথা অর্থাৎ সবিকল্প, নির্বিকল্প, ধর্মমেঘ

প্রভৃতির বিষয় কিংবা হঠযোগ, লয়যোগ, রাজযোগ ইত্যাদির কথা বলিতে আরম্ভ করেন তখন ঘণ্টার পর ঘণ্টা বলিয়া গেলেও শেষে বলেন কিছুই বলা হইল না। একদিন যোগ সম্বন্ধে বলিতে বলিতে কথার ছলে প্রকাশ করিয়াছিলেন পুস্তকাদিতে এবং যোগপন্থাবলম্বী সাধকদের মুখে মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপূরক, অনাহত, বিশুদ্ধ, আজ্ঞা ও সহস্রার এই সাতটি চক্রের নামই শোনা যায় কিন্তু এই সকল ছাড়া আরও যে কত অবান্তর চক্র শরীরের মধ্যে রহিয়াছে তাহার সন্ধান কয়জন জানে। মূল চক্রগুলির বহির্ভূত দেহান্তর্গত আরও অনেক চক্রের আকৃতি বা গঠন মা মাটির উপর কাঠি দিয়া আঁকিয়া দেখাইয়াছেন। এইসব দেখিয়া শুনিয়া অনেকে ধারণা করিয়া থাকেন মা একজন যোগমার্গী মহাযোগিনী। প্রসঙ্গক্রমে জ্ঞানের কথা উঠিলে তিনি এত সব তত্ত্ব বিশ্লেষণ করিয়া বলিতে থাকেন যে বড় বড় মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতদের পর্যন্ত মস্তিষ্ক গুলাইয়া যায়। সাধারণ লোকের কথা আর কি বলিবার আছে! জ্ঞানের সপ্তভূমিকা যথা শুভেচ্ছা, বিচারণা, তনুমানসা, সত্ত্বাপত্তি, অসংসক্তি, পদার্থভাবনী ও তুর্যগা যাহা আমরা বেদান্তের গ্রন্থাদিতে দেখিতে পাই তাহা মা এত সুন্দরভাবে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচারকরতঃ ব্যাখ্যা করেন যে বিস্মিত ও অভিভূত হইতে হয়। যদ্যপি মা জ্ঞানের সপ্তভূমিকার নামগুলি বলেন নাই সত্য কিন্তু অবস্থাগুলি ঠিক ঠিক বর্ণন করিয়াছেন। মার তো বইপড়া জ্ঞান নহে, মা তাঁহার অনুভূতি হইতে বলেন। যখন মায়ের মুখকমল হইতে জ্ঞানের কথা শুনি তখন মা যে সম্পূর্ণ জ্ঞানমার্গী তাহা আমাদের মনে বদ্ধমূল হইয়া যায়। এমন মাকে কোন মার্গের অন্তর্গত করিব, কর্মমার্গী, যোগমার্গী না জ্ঞানমার্গী। ইহার বিচারের ভার বিদগ্ধ পাঠক ও বিদগ্ধা পাঠিকাদের উপর রহিল। আমি এই গুরুতর কার্যের দায়িত্ব লইতে অক্ষম।

শ্রীশ্রীমায়ের পরম ভক্ত শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র রায় (ভাইজী) তাঁহার "মাতৃ-দর্শন" নামক পুস্তকে এবং মায়ের একান্ত অনুরক্তা প্রধান সেবিকা শ্রীগুরুপ্রিয়া দেবী তাঁহার "শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী" গ্রন্থে মায়ের বহু। বিভূতি ও অলৌকিক শক্তির বিবৃতি প্রদানে

মাতৃসন্তানগণের সন্তোষবিধান করিয়াছেন। অদ্যাপি মায়ের ভক্তগণ-মুখে মায়ের নিত্য নূতন নূতন নানাপ্রকার চিত্তা-কর্ষক ও লোকাতীত ঘটনার কথা শ্রবণ করিয়া আমরা পরিতৃপ্ত ও বিস্মিত হইতেছি। বিশ্বজননী শ্রীশ্রীমায়ের এই অপ্রাকৃত-ভাবঘন পবিত্র দেহটিকে আশ্রয় করিয়া যে সকল লীলা অহরহঃ প্রকটিত হইতেছে তাহার মধ্যে কিছু কিছু অলৌকিক ঘটনা বা বিভূতি যাহা আমি বিভিন্ন স্থানে নিজ চক্ষে দেখিয়াছি বা অনুভব করিয়াছি তাহা এখানে বর্ণন করিতে চেষ্টা করিব। আমি ভাবিয়াছিলাম শ্রীশ্রীমায়ের দিব্য জীবনের এই দিকটা লইয়া আমি কিছু আলোচনা করিব না। কারণ যোগিবর প্রবীণ সাধক পরম শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ লাহিড়ী মহাশয় বলিতেন 'সাধারণ মনুষ্যের অবিশ্বাসযোগ্য কোন ঘটনা যদি সত্যও হয় তথাপি তাহা সর্ব সাধারণের নিকট প্রকাশ করিতে নাই।' এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টিতে হস্তক্ষেপ করিতে গিয়া কেবলই ভয় হইতেছে পরমারাধ্যা শ্রীশ্রীমায়ের বিভূতির কথা লিখিতে গিয়া নিজের অসমর্থতা নিবন্ধন বিশ্বজননীর মহিমা ও মর্যাদার লাঘব না করিয়া ফেলি। শ্রীমদ্ভাগবতে এই বিষয়ের উপর একটি অতি সুন্দর শ্লোক দেখিতে পাওয়া যায়—

আয়ুঃ শ্রিয়ং যশো ধর্মং লোকানাশিষ এব চ।
হন্তি শ্রেয়াংসি সর্বাণি পুংসো মহদতিক্রমঃ॥ ১০।৪।৪৬

মহামুনি শ্রীশুকদেব মহারাজ পরীক্ষিতকে বলিতেছেন, মহতের মর্যাদা লঙ্ঘন করিলে মানবের আয়ুঃ, শ্রী, যশ, ধর্মাদিসাধ্য স্বর্গাদি-লোক এবং সকল সাধনের মূলীভূত কল্যাণ বিনষ্ট হইয়া যায়।

শ্রীশ্রীমায়ের কোন যোগৈশ্বর্য বা অলৌকিক শক্তির পরিচয় যে আমি আমার এই ক্ষুদ্র জীবনে পাই নাই তাহা বলিতে পারিব না। যে সব বিভূতি আমি স্বয়ং দেখি নাই বা অনুভব করি নাই সে সকল আমার আলোচ্য বিষয় নহে। কারণ কোন ঘটনা দেখা এবং শোনার মধ্যে পার্থক্য থাকে অনেক। যদিও চক্ষু ও কর্ণের মধ্যে দূরত্ব বা ব্যবধান মাত্র চারি আঙ্গুলের কিন্তু এই দুই ইন্দ্রিয়ের

উপলব্ধির মধ্যে প্রভেদ এত অধিক যাহা আমরা কল্পনাও করিতে পারি না। পক্ষান্তরে যাহারা একটু অধিক ভাবপ্রবণ তাহারা সাধারণ জিনিসটাকে তাহাদের ভাবদৃষ্টিতে অতিশয় বড় করিয়া দেখিয়া থাকেন। অযথা পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধির আশঙ্কায় এবং আমার উদ্দেশ্যের পুষ্টির সহায়ক নহে জানিয়া ইহার দৃষ্টান্ত এইখানে উল্লেখ করিতে বিরত রহিলাম। আমি স্বয়ং শ্রীশ্রীমায়ের যে সকল অলৌকিক ঘটনা ও লোকোত্তর বিভূতি দর্শন করিয়াছি তাহাই এখানে বিবৃত করিতে যত্নশীল হইতেছি। জানি না এই দুরূহ কার্যে কতদূর কৃত কার্য হইব। বিষয়টি কঠিন এবং আমার শক্তির বা যোগ্যতার প্রসার অত্যন্ত স্বল্প তাই এই ভয়।

(এক)

একবার শ্রীশ্রীমা কাশী আসিয়া শ্রীনির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বাড়ী উঠিয়াছেন। যে সময়কার কথা লিখিতে যাইতেছি সে সময় মা গৃহস্থ বাড়ীতে বাস করিতেন। একদিন মধ্যাহ্নের ভোগের পর একখানি ছোট ঘরে তক্তপোশের উপর তিনি বিশ্রাম করিতেছিলেন। ঘরখানির উত্তর দিকে একটি দরজা এবং দক্ষিণ দিকে একটি জানালা। জানালার দক্ষিণে খোলা বিস্তীর্ণ ফল ও ফুলের বাগান। উদ্যানের দিকে খিড়কির নিকটেই মা মাথা করিয়া শয়ন করিয়া আছেন। গরমের দিন, দুপুরবেলা বেশ রোদের ঝাঁজ। প্রচণ্ড রৌদ্রের তাপে শ্রীশ্রীমায়ের গরম লাগিতেছে মনে করিয়া একখানা তালপাতার হাতপাখা লইয়া আমি মাকে বাতাস করিতেছি। রাণী শ্রীবিদ্যাময়ী দেব্যার সত্রের নায়েব শ্রীহারাণচন্দ্র চক্রবর্তীর স্ত্রী ও শ্যালিকা মাকে দর্শন করিতে আসিয়া নীরবে ঘরের দরজার নিকট বসিয়া আছেন। আমি পশ্চিমদিকে মুখ করিয়া মাকে বাতাস করিতেছি এবং মায়ের সেই অনিন্দ্য সুন্দর সদ্য প্রস্ফুটিত শ্বেত পদ্মের মত শ্রীমুখকমলখানি অনিমেষ নেত্রে অবলোকন করিতেছি। মা আমার দিকে মুখ করিয়া অর্থাৎ পূর্বদিকে মুখ করিয়া ডান কাত হইয়া চক্ষু মুদ্রিত করিয়া শয়ন করিয়া আছেন। মা নিদ্রিত ছিলেন, না জাগ্রত তাহা আমি

বলিতে পারিব না। মায়ের নিকট নিদ্রা ও জাগরণ দুই-ই সমান। নিদ্রিতাবস্থায় আমরা চৈতন্য হারাইয়া ফেলি। মায়ের কিন্তু তাহা হয় না। মা সর্বদাই জাগ্রত বা জাগরূক আছেন। আমাদের দৃষ্টিতে মা যখন ঘোর নিদ্রায় নিমগ্ন তখন মনে মনে কিছু জানাইলেও মা যে তাহা জানিতে পারেন তাহার প্রমাণ যথাস্থানে উল্লেখ করিবার ইচ্ছা রহিল।

সেইসময় সধবা স্ত্রীলোকেরা শ্রীশ্রীমায়ের কপালে সিন্দুরের টিপ পরাইতে পরাইতে উহা পূর্বেকার একটি টাকার মত বড় হইয়া যাইত। আমি মাকে বাতাস করিতে করিতে দেখিতেছি তাঁহার ললাটের সিন্দুরের বড় ফোঁটার নীচে খুব উজ্জ্বল একটি অর্ধচন্দ্রাকৃতি সুন্দর রেখা, যেন শুক্লপক্ষের পঞ্চমীর চন্দ্রের মত '৺' দেখিতে। আমাদের সন্দিগ্ধ মন অলৌকিক বা অসাধারণ কিছু দেখিলে প্রথমে উহা কিছুতেই বিশ্বাস করিতে চাহে না। ভাবিলাম আমার চক্ষুর দোষেই বোধহয় শ্রীশ্রীমায়ের ভালে এই দীপ্ত চন্দ্ররেখা দেখিতেছি। শ্রীশ্রীমা যে আমার "শশীভালী" সে কথা সম্পূর্ণ বিস্মৃতই হইয়া গিয়াছিলাম। মনে করিলাম তন্দ্রার ঘোরে সম্ভবতঃ আমি ইহা দেখিতেছি, সেইজন্য আমার এই দুষ্ট সন্দিগ্ধ চোখ দুইটাকে দুই হাতে বেশ করিয়া রগড়াইয়া লইলাম, তথাপি দেখিতেছি ঠিক সেই প্রকার পূর্বের মত সিন্দুরের বড় বিন্দুর নিম্নে চকচকে দীপ্ত স্নিগ্ধ চন্দ্ররেখা। এখন তো আর কোন প্রকার সংশয় থাকিতে পারে না। প্রায় দুই-তিন মিনিট পর্যন্ত ঐ উজ্জ্বল রেখাটি স্থির থাকিয়া ক্রমশঃ ক্রমশঃ মহামহিমময়ী শ্রীশ্রীমায়ের শুভ্র ললাটে মিলাইয়া গেল। যে সময় এই অপূর্ব দৃশ্যটি আমার নয়নগোচর হইতেছিল সেই সময় মায়ের শ্রীমুখকমলখানি যেন অধিক ভাস্বর ও অতিশয় দীপ্তিশালী হইয়া উঠিয়াছিল।

পরে সুযোগ পাইয়া কোন সময় শ্রীশ্রীমাকে এই অভূতপূর্ব ও বিস্ময়কর দৃশ্যের কথা নিবেদন করাতে তিনি বলিয়াছিলেন, 'যাহা দেখিয়াছ তাহা কাহারও কাছে বলিও না"। যতটা আমার মনে পড়ে এই সুন্দর অনুপম দর্শনযোগ্য বস্তুটি ১৯২৯ কিংবা ১৯৩০ খৃষ্টাব্দের ভাদ্রমাসে দেখিয়াছিলাম। এত বৎসর যাবৎ ইহা সকলের

সদানন্দময়ী—শ্রীশ্রীমা

করুণাময়ী—শ্রীশ্রীমা
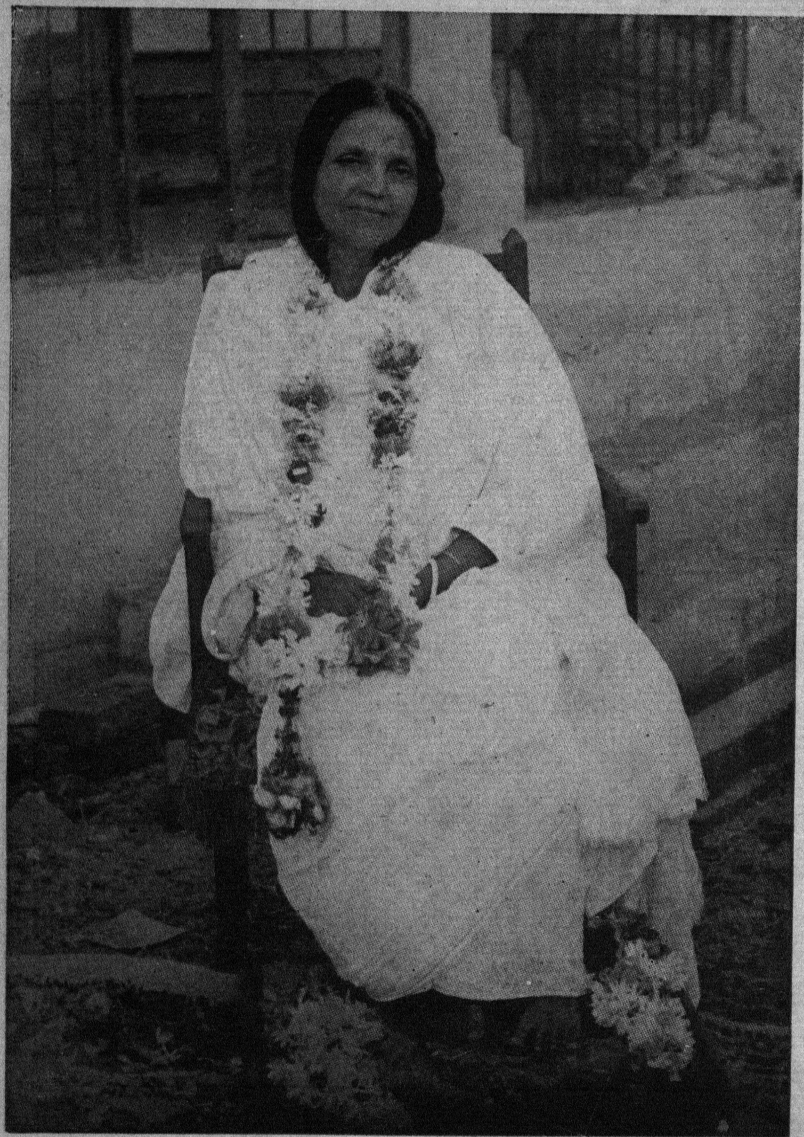
কাছে প্রকাশ করা হয় নাই। এখন বোধ হয় প্রকটনের সময় হইয়াছে তাই এইভাবে লেখা হইতেছে। ইহা প্রকাশ করাতে যদি কোন অপরাধ বা দোষ হইয়া থাকে তাহা হইলে সন্তানবৎসলা স্নেহময়ী শ্রীশ্রীমায়ের চরণে বিনীত প্রার্থনা করিতেছি তিনি যেন কৃপা করিয়া তাঁহার এই অবোধ ও অবাধ্য সন্তানকে তাহার কৃত অপরাধের জন্য নিজগুণে ক্ষমা করেন"। আমরা শ্রীদুর্গাসহস্রনাম স্তোত্রের মধ্যে মা দুর্গার "চন্দ্রশেখরা" ও "শশিশেখরা" এই দুইটি নাম পাইয়া থাকি। মা যে কে তাহা এইভাবে তাঁহার পরিচয় দিলেন কি ?

সুগন্ধা তারিণী তারা ভবানী বনবাসিনী।
লম্বোদরী মহাদীর্ঘা জটিনী চন্দ্রশেখরা ॥ ২২ ॥
স্বপ্নাবতী চিত্রলেখা অন্নপূর্ণা চতুষ্টয়া।
পুণ্যলভ্যা বরারোহা শ্যামাঙ্গী শশিশেখরা ॥ ৬৪ ॥

কনখলের নির্বাণমঠের মোহন্ত মহারাজ শ্রীশ্রীমাকে শাকম্ভরীরূপে দর্শন করিয়া একান্তে মায়ের বিশেষভাবে পূজা করিয়াছেন এবং ঢাকায় শ্রীপ্রমথনাথ বসু'র চাপরাসী মাকে ছিন্নমস্তারূপে দর্শন করিয়াছিলেন। শ্রীদুর্গাসহস্রনাম স্তোত্রের মধ্যে এই নাম দুইটিও দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীশ্রীমাকে বিভিন্ন সময়ে যে বিভিন্ন ব্যক্তি শ্রীশ্রীদুর্গার বিভিন্নরূপে দর্শন পাইয়াছেন ইহা দ্বারা কি অনুমান করা যায় না যে শ্রীশ্রীমা কে ?

একবীরা কুলানন্দা কালপুত্রী সদাশিবা।
শাকম্ভরী নীলবর্ণা মহিষাসুরমর্দিনী ॥ ৩৬ ॥
জয়ন্তী চন্দনা গৌরী গর্জিনী গগনোপমা।
ছিন্নমস্তা মহামত্তা রেণুকা বনশংকরী ॥ ১০৬ ॥

প্রায় অর্ধশতাব্দী পূর্বে শ্রীশ্রীমায়ের ঢাকার শাহবাগে অবস্থানকালে কালীপূজার মহানিশাতে শ্রীশ্রীমাকালীর পূজার সময় মূর্তির পার্শ্বে শ্রীশ্রীমাকে লোলজিহ্বা দিগম্বরীরূপে কেহ কেহ দর্শন করিয়া তাঁহাদের জন্ম যে সফল করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে কাহাকেও অন্বেষণ করিলে এখনও হয়তো পাওয়া যাইতে পারে।

(দুই)

আর একবার শ্রীশ্রীমা বারাণসী শুভাগমন করিয়া রামাপুরার অন্তর্গত নইবস্তিতে নির্মলবাবুর বাড়ীই উঠিয়াছেন। একদিন বৈকালবেলা রৌদ্র পড়িয়া গেলে বাড়ীর দক্ষিণ দিকের বাগানের ধারের টানা লম্বা বারান্দায় মা সকলকে লইয়া বসিয়াছেন। বহু দর্শনার্থী মাকে দর্শন করিতে আসিয়া নানা প্রকার আধ্যাত্মিক বিষয় লইয়া আলোচনা করিতেছেন এবং জীবনের সমস্যা সমাধানের জন্য মাকে প্রশ্ন করিতেছেন। মাও তাঁহার স্বভাব-সিদ্ধ সুন্দর ও সরল ভাষায় বিবিধ উদাহরণের দ্বারা তাঁহাদের প্রশ্নের মীমাংসা বা সমাধান করিয়া দিতেছেন। আমিও সেখানে বসিয়া মায়ের মুখ-নিঃসৃত বাণী অতিশয় মনোযোগের সহিত শ্রবণ করিতেছিলাম। দেখিতে দেখিতে সূর্যদেব অস্তাচলে গমন করিলেন। সায়ং-সন্ধ্যার সময় হইয়াছে দেখিয়া আমি মনে মনে চিন্তা করিলাম, এখন যদি আহ্নিক করিতে বাড়ী যাই তাহা হইলে উহা শেষ করিয়া এখানে ফিরিতে অনেক বিলম্ব হইয়া যাইবে কারণ ঐ স্থান হইতে আমার বাসস্থান ছিল প্রায় অর্ধ মাইল দূরে। এইসব ভাবিয়া চিন্তিয়া বাড়ীর ভিতরে গিয়া দেখিলাম সেখানে লোকজন বড় একটা কেহ নাই। বাড়ীর সকলেই শ্রীশ্রীমায়ের কাছে বসিয়া তাঁহার আধ্যাত্মিক বার্তালাপ ও সাধন ভজনের কথা শুনিতেছেন। স্থানটি একেবারে নির্জন পাইয়া সেই অবসরে ঠাকুর ঘর হইতে গঙ্গাজল লইয়া বাড়ীর মধ্যের দক্ষিণের দালানে বসিয়া সায়ংকৃত্য সমাপন করিলাম। আমি আহ্নিক সমাপ্ত করিয়া শ্রীশ্রীগায়ত্রী দেবীর উদ্দেশ্যে ভূমিতে মস্তক রাখিয়া প্রণাম করিয়া যেই মাথা উঠাইয়াছি সঙ্গে সঙ্গে দেখি আমার সম্মুখে আমাদের পরমারাধ্যা শ্রীশ্রী মা দাঁড়াইয়া আছেন। মাটিতে যেখানে আমি মাথা রাখিয়া প্রণাম করিয়াছিলাম সেই স্থানেই শ্রীশ্রীমায়ের দুইখানি রাঙ্গা চরণ। মায়ের পাদপদ্মের উপরই যেন আমি মস্তক রাখিয়া প্রণাম করিয়াছিলাম। আহ্নিকের পর অপ্রত্যাশিতভাবে ঐ একান্তস্থানে মাকে দেখিয়া আমি যেমন

হইলাম আশ্চর্য তেমনি আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিলাম। দেখিতে দেখিতে নিমেষের মধ্যে মা সেখানেই আমার চক্ষুর সম্মুখে অদৃশ্য হইয়া গেলেন। মা এখানে হঠাৎ আসিলেনই বা কেন এবং অকস্মাৎ চলিয়াই বা গেলেন কেন? ইহার যথার্থ মর্ম উদ্‌ঘাটন করিতে না পারিয়া আমি যেন কেমন ভ্যাবাচ্যাকা খাইয়া গেলাম। আমি তাড়াতাড়ি বাহিরে গিয়া দেখি মা যেমন কিছু পূর্বে লোক-জনের সঙ্গে আধ্যাত্মিক বিষয় লইয়া আলাপ আলোচনা করিতে-ছিলেন তখনও তদ্রূপই শাস্ত্রীয় কথাবার্তাই বলিতেছেন। আমি তো তাঁহাকে বাহিরে সকলের সঙ্গে কথোপকথন করিতে দেখিয়া বিস্ময়ে একেবারে হতভম্ব হইয়া কেবলই চিন্তা করিতে লাগিলাম ইহা কি করিয়া সম্ভব হইতে পারে?

একই সময় তিনি বাড়ীর ভিতরে আমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া এই অধম সন্তানের প্রণাম গ্রহণ করিলেন এবং সেই সময়ই বাহিরে বারান্দায় বসিয়া সমবেত ভক্তবৃন্দের সঙ্গে শাস্ত্রালোচনা করিতে-ছিলেন। ব্যাপারটা ঠিকঠিক বুঝিবার জন্য বাহিরে যাঁহারা মায়ের সঙ্গে বাক্যালাপ করিতেছিলেন তাঁহাদের মধ্যে কয়েকজনকেই আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "মা কি আপনাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলিতে বলিতে ইহার মধ্যে বাড়ীর ভিতরে গিয়াছিলেন?" তাঁহারা আমার প্রশ্নের যথার্থ মর্ম বুঝিতে না পারিয়া আমার মুখের দিকে অবাক্ হইয়া চাহিয়া বলিলেন "না, মা তো ইহার মধ্যে বাড়ীর ভিতরে যান নাই। সেই যে বৈকালে আসিয়া এখানে বসিয়াছেন আর তো একবারও তিনি উঠেন নাই"। আমি যে তাঁহাকে আহ্নিকের পর প্রণাম করিবার সময় বারান্দায় দেখিয়াছি তাহাতে আমার কোনই সন্দেহ নাই। তবে এইটা হইল কি? একই ব্যক্তি একই সময় দুই স্থানে কি করিয়া উপস্থিত থাকিতে পারেন? ইহা কি সাধারণ মানবের পক্ষে সম্ভব হইতে পারে? মাকে দেখিবার মধ্যে যে আমার কোন ভুল কি ভ্রান্তি ছিল তাহা আমি কোন প্রকারেই স্বীকার করিতে পারিব না।

শ্রীরামচন্দ্রের পরম ভক্ত মহাত্মা গোস্বামী শ্রীতুলসীদাস তাঁহার 'শ্রীরামচরিতমানসে' শ্রীরামের বাল্যলীলা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন,

একবার মাতা কৌশল্যা শিশু শ্রীরামকে স্নানের পর বসন-ভূষণাদির দ্বারা সুসজ্জিত করিয়া দোলনায় শয়ন করাইয়া স্বয়ং স্নানের পর ইষ্টদেবতা শ্রীভগবানের পূজায় বসিয়াছেন। আপন প্রিয়তম ইষ্ট-দেবকে নৈবেদ্য নিবেদন করিয়া পূজান্তে রন্ধনকার্য পর্যবেক্ষণ করিবার জন্য পাকশালায় গমন করেন। রন্ধনকার্য পরিদর্শন করিয়া পুনরায় যখন তিনি পূজাস্থানে আসিলেন তখন তিনি দেখিলেন তাঁহার শিশুপুত্র শ্রীরাম যাঁহাকে তিনি দোলনায় শয়ন করাইয়া আসিয়াছিলেন, তিনি ইষ্টদেবের উদ্দেশ্যে যে নৈবেদ্য অর্পণ করা হইয়াছিল তাহা ভোজন করিতেছেন। ইহা দর্শন করিয়া রামজননী কৌশল্যা ভীত হইয়া পুত্রের নিকট গিয়া দেখেন, যেভাবে তিনি শ্রীরামকে দোলনায় শয়ন করাইয়াছিলেন বালক সেই প্রকারেই দোলনায় শায়িত রহিয়াছে। আবার পূজাস্থানে গমন করিয়া দেখিলেন সেখানেও সেই রামই নিবেদিত নৈবেদ্য ভোজন করিতেছেন। "ইহাঁ উহাঁ দুই বালক দেখা। মতিভ্রম মোর কি আন বিশেখা।" তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন, এখানে এবং ঐখানে আমি দুইটি বালক দেখিতেছি। একই বালককে একই সময় দুইস্থানে কি করিয়া দেখা যাইতে পারে? ইহা কি আমার বুদ্ধির ভ্রম, না ইহার অন্য কোন বিশেষ কারণ আছে? রামায়ণে যাহা বর্ণিত হইয়াছে তাহা পরম করুণাময়ী শ্রীশ্রীমা তাঁহার এই সন্তানকে আজ করুণা করিয়া এই রূপে দেখাইলেন। তিনি দয়া করিয়া তাঁহার স্বরূপের পরিচয় না দিলে সাধ্য কি মানব তাঁহাকে চিনিতে পারে? তবে কি ভগবান্ শ্রীরাঘবেন্দ্রের সঙ্গে শ্রীশ্রীমায়ের কোন সম্বন্ধ আছে? দুইজনের মধ্যে স্বভাবের কিন্তু সাদৃশ্য বা মিল দেখিতে পাওয়া যায়! ইহা আমারই কথা নহে। এইরূপ আরও কেহ কেহ বলিয়াছেন।

অনেকদিন পূর্বে পরমহংস যোগানন্দজীর "Autobiography of a yogi" নামক পুস্তকে কোন এক যোগীর সম্বন্ধে পড়িয়াছিলাম, পূর্ণ ব্রহ্মজ্ঞান সম্পন্ন যোগী একই সময় বিভিন্ন স্থানে দুই বা ততো-ধিক শরীরে আবির্ভূত হইতে পারেন। পুস্তকাদিতে যাহা লিখিত আছে তাহাই আজ স্বচক্ষে দর্শন করিয়া নিজেকে কৃতার্থ মনে

করিতেছি। ইহাও কিন্তু শ্রীশ্রীমায়ের কৃপারই পরিচয় বলিতে হইবে।

শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধে অনুরূপ একটি আখ্যায়িকা দেখিতে পাওয়া যায়। যোগীশ্বর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ মিথিলাধিপতি বহুলাশ্ব ও ব্রাহ্মণ শ্রুতদেবকে প্রসন্ন করিবার জন্য একই সময় পৃথক্ পৃথক্ রূপে উভয়ের গৃহে দর্শন দিয়াছিলেন।

স্বানুগ্রহায় সম্প্রাপ্তং মন্বানৌ তং জগদ্গুরুম্।
মৈথিলঃ শ্রুতদেবশ্চ পাদয়োঃ পেততুঃ প্রভোঃ ॥ ২৪ ॥
ন্যমন্ত্রয়েতাং দাশার্হমাতিথ্যেন সহ দ্বিজৈঃ।
মৈথিলঃ শ্রুতদেবশ্চ যুগপৎ সংহতাঞ্জলী ॥ ২৫ ॥
ভগবাংস্তদভিপ্রেত্য দ্বয়োঃ প্রিয়চিকীর্ষয়া।
উভয়োরাবিশদ্ গেহমুভাভ্যাং তদলক্ষিতঃ ॥ ২৬ ॥

(ভাগবত, ১০।৮৬। ২৪-২৬)

মিথিলানরেশ বহুলাশ্ব এবং শ্রুতদেব বুঝিতে পারিলেন যে জগদ্গুরু ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আমাদের উপর অনুগ্রহ করিবার জন্যই এখানে পদার্পণ করিয়াছেন। তাহারা উভয়ে ভগবানের চরণে পতিত হইয়া প্রণাম করিলেন। বহুলাশ্ব ও শ্রুতদেব উভয়েই একসঙ্গে কৃতাঞ্জলি হইয়া মুনিমণ্ডলীর সহিত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে আতিথ্য গ্রহণ করিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিলেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ দুইজনেরই প্রার্থনা স্বীকার করিয়া উভয়কে প্রসন্ন করিবার জন্য একই সময় পৃথক্ পৃথক্ রূপে তাহাদের গৃহে গমন করিলেন। এই কথা তাহারা অনুধাবন করিতে পারিলেন না যে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আমার গৃহ ব্যতীত অন্য আর কোথায়ও যাইতেছেন।

যাঁহার পূর্ণ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইয়াছে তিনি তো ব্রহ্মই। তাই উপনিষদের ঋষি বলিয়াছেন, "ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি।" এত দেখিয়া শুনিয়াও মা যে কে তাহা যথাযথরূপে ধারণা করিতে পারিতেছি কই? জীব-স্বভাবই হইল এই। দেখিয়া শুনিয়া বিচার করিয়া এই একটা সিদ্ধান্ত স্থির করা হইল, তাহার পরের

মুহূর্তেই কোথা হইতে প্রতিকূল বিচারের বায়ু আসিয়া পূর্ব-সিদ্ধান্ত কোথায় উড়াইয়া দিয়া একেবারে বিপরীত মীমাংসা করিয়া ফেলিল। অবিদ্যার গ্রন্থিসকল সম্যক্ প্রকারে ছিন্ন না হওয়া পর্যন্ত এইরূপ দ্বন্দ্ব বা বিরোধ আসাই জীবের স্বভাব। সেই জন্য মুণ্ডকোপনিষদে শ্রুতি ভগবতী বলিতেছেন—

> ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্বসংশয়াঃ।
> ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে॥ ২।২।৮॥

সেই পরমাত্মা দৃষ্ট হইলে উক্ত সাক্ষাৎকারীর হৃদয়ের গ্রন্থি বিনষ্ট হয়, সকল সংশয় ছিন্ন হয় এবং কর্মসমূহ ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। যতক্ষণ তাহা না হয়, ততক্ষণ এইরূপ সংশয় ও অবিশ্বাস হওয়া স্বাভাবিক।

(তিন)

১৯৪৪ খৃষ্টাব্দের শেষের দিকে শ্রীশ্রীমায়ের আশ্রমের জন্য কাশীর পবিত্র গঙ্গার তটে একখণ্ড জমি ক্রয় করা হইয়াছে। স্থানটিতে কোন বাড়ী-ঘর ছিল না, একেবারে খোলা মাঠ ছিল। স্থির হইল আগামী চৈত্র মাসে শ্রীশ্রীমায়ের পুণ্য উপস্থিতিতে প্রথম ঐস্থানে শ্রীশ্রীবাসন্তী দেবীর পূজা হইবে, তাহার পর সেখানে আশ্রমের জন্য বাড়ী-ঘর নির্মাণের কাজ আরম্ভ হইবে। এখন যেখানে আশ্রমের "শ্রীশ্রীচণ্ডীমণ্ডপ" সেই স্থানে টিনের চালা নির্মাণ করিয়া দেবীর প্রতিমা বসান হইয়াছে। বসন্তকালীন এই শ্রীশ্রীদুর্গাপূজায় যোগদান করিবার মানসে বিভিন্ন স্থান হইতে মায়ের অনেক সন্তান-সন্ততি আসিয়াছেন। তাঁহাদের বাসস্থানের জন্য আশ্রমভূমির নিকটবর্তী কয়েকখানি বাড়ী সংগ্রহ করা হইয়াছে। মা থাকেন জৈন মন্দিরের ধর্মশালায়। জমির অগ্নি (পূর্ব দক্ষিণ) কোণে টিনের চালার নীচে দেবীর ভোগ রান্নার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। বাসন্তী দেবীর সম্মুখে সামিয়ানার তলায় বসিয়া উপস্থিত ভক্তবৃন্দ আনন্দে মহামায়ার পূজা দেখিতেছেন। এইভাবে ক্রমান্বয়ে তিন দিন অর্থাৎ সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমী পূজা ভালরূপেই সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। আজও দশমীতে পূজা, ভোগ,

আরতি এবং দর্পণে দেবীর বিসর্জনও মঙ্গল মত হইয়া গেল। এখন অবশিষ্ট রহিয়াছে ভক্তগণের বাসন্তী দেবীর প্রসাদ গ্রহণ।

বেলা দ্বিপ্রহরের সময় মা দুর্গার সম্মুখে সামিয়ানার নীচে সকলে প্রসাদ পাইতে বসিয়াছেন। শ্রীশ্রীমা স্বয়ং আপন হাতে সকলকে বাসন্তী দেবীর শীতল পান্তা (দধি, নারিকেল-কোরা, লবণ ও নেবু দিয়া মাখা জলে ভিজান ঠাণ্ডা ভাত) প্রসাদ পরিবেশন করিতেছেন। চৈত্র মাস, বেলা অনুমান বারটা কি একটা। সবেমাত্র সকলে প্রসাদ মুখে দিয়াছেন। এমন সময় অকস্মাৎ কোথা হইতে আকাশে দেখা দিল ভীষণ ঘনঘটা। এই রকম মেঘে বৃষ্টি না হইয়া যায় না। এই প্রাকৃতিক দুর্যোগ দেখিয়া আমরা সকলে মহা চিন্তিত হইয়া পড়িলাম। এখন যদি এই অবস্থায় বৃষ্টি পড়িতে আরম্ভ করে তাহা হইলে এতগুলি লোকের খাওয়া তো নষ্ট হইবেই, উপরন্তু ইহাদের একটু দাঁড়াইবার পর্যন্ত স্থান নাই। এই পরিস্থিতি দেখিয়া মায়ের পুরাতন ভক্তদের মধ্যে কেহ কেহ তাঁহার চরণে বৃষ্টি না হইবার জন্য বিনীতভাবে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। সেই সময় আমি শ্রীশ্রীমায়ের পিছনেই ছিলাম। মা শীতল পান্তা পরিবেশন করিতে করিতে পশ্চাতে মুখ ফিরাইয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি বৃষ্টি হইবে নাকি?" আমি জানিতাম এইরূপ ক্ষেত্রে মা অনেক সময় অপরের মুখ হইতে যাহা বাহির করান তাহাই ফলে। সেইজন্য আমি মায়ের প্রশ্নের উত্তরে বলিলাম, "মা! তুমি যখন স্বয়ং এখানে উপস্থিত তখন এইরূপ অবস্থায় বৃষ্টি কিছুতেই আসিতে পারে না, পারে না, পারে না।" মা সঙ্গে সঙ্গে বলিয়া উঠিলেন, "দেখ, দেখ, ও কি কয়! ও যখন কইতে আছে, তখন 'ভগা' বৃষ্টি নাও করিতে পারে।" বাস্তবিক পক্ষে হইলও কিন্তু তাহাই। সামান্য একটু বাতাস উঠিয়া ঐ ঘন ভীষণ মেঘ কোথায় যেন উড়াইয়া লইয়া গেল। মাতৃ-সন্তানগণ পরম উল্লাসে শ্রীশ্রীআনন্দময়ী মায়ের জয়ধ্বনি দিতে দিতে মহানন্দে শ্রীশ্রীবাসন্তী দেবীর প্রসাদ পাইতে লাগিলেন। এই ঘটনাটির দ্বারা কি অনুমান করা যায় না যে প্রকৃতির উপরও শ্রীশ্রীমায়ের কতখানি অধিকার! যাঁহার ভয়ে অগ্নি তাপ প্রদান করেন, যাঁহার

ভয়ে সূর্য কিরণ বিকিরণ করেন, যাঁহার ভয়ে ইন্দ্র, বায়ু এবং পঞ্চম· স্থানীয় মৃত্যুও স্ব স্ব কর্মে প্রবৃত্ত থাকেন, তাঁহার পক্ষে এই সাধারণ মেঘ অপসারিত করা কি আর বড় কথা? এই কথাই ভগবতী শ্রুতি কঠোপনিষদে ঘোষণা করিতেছেন—

ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াত্তপতি সূর্যঃ।
ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ॥ ২।৩।৩॥

(চারি)

সংস্কৃত ভাষায় একটি অতি সুন্দর প্রসিদ্ধ শ্লোক আছে—

মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্।
যৎ কৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দমাধবম্॥

পরমানন্দস্বরূপ ভগবান্ শ্রীমাধব কৃপা করিলে মূক অর্থাৎ বোবাও কথা বলিতে পারে, পঙ্গু বা চলচ্ছক্তিহীন ব্যক্তিও পর্বত অতিক্রম করিতে পারে। ইহা যে অতিশয়োক্তি নহে, ইহা যে অতি সত্য কথা তাহাই এখন বলিতে যাইতেছি।

বহুদিনের অতি পুরাতন ঘটনা। সেই সময়কার তুই চারিজন সাক্ষী দেবার মত লোক এখনও বর্তমান আছেন। তখন বাবা শ্রীভোলানাথ এবং ভাইজী শ্রীজ্যোতিষ চন্দ্র রায় উভয়েই সশরীরে ছিলেন। তৎকালীন এই নিয়ম ছিল,—বাবা ভোলানাথ প্রায় প্রত্যেক বৎসরই শীতের সময়, অগ্রহায়ণ কি পৌষ মাসে, শ্রীশ্রীমাকে লইয়া বীরভূম জিলার অন্তর্গত "তারাপীঠ" নামক সিদ্ধস্থানে যাইতেন। এই তারাপীঠেই বিরাজিত রহিয়াছেন বশিষ্ঠারাধিতা শিলাময়ী শ্রীশ্রীতারা মায়ের অপূর্ব মূর্তি ও সিদ্ধপীঠ। স্থানটি শক্তি সাধনার পক্ষে অতিশয় প্রশস্ত ও অনুকূল। এই স্থানেই মহাসাধক ও শ্রীশ্রীতারা মায়ের প্রিয় সন্তান শ্রীবামাচরণ চট্টোপাধ্যায় যিনি "বামাক্ষেপা" নামে জগতে প্রসিদ্ধ, সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। অন্যান্য বারের ন্যায় এবারও বাবা ভোলানাথ মাকে সঙ্গে লইয়া তারাপীঠে গিয়াছেন। তাঁহাদের সঙ্গে আছেন দিদিমা (মায়ের গর্ভধারিণী), শ্রীশশাঙ্কমোহন মুখোপাধ্যায় (পরে শ্রীমৎ স্বামী

অখণ্ডানন্দ গিরি), জ্যোতিষবাবু (যিনি পরে "ভাইজী" নামে পরিচিত হইয়াছিলেন), শ্রীমৎ স্বামী শঙ্করানন্দ সরস্বতী, নিশিবাবু, ভ্রমর ঘোষ, শ্রীমতী আদরিণী দেবী (বর্তমানে শ্রীগুরুপ্রিয়া দেবী), শিশিরকুমার গুহ প্রভৃতি মায়ের বহু সন্তান ও সন্ততিগণ। সেইবার শ্রীশ্রীমায়ের সঙ্গে আমারও তারাপীঠে যাইবার সৌভাগ্য হইয়াছিল। এই সিদ্ধপীঠেই বাবা ভোলানাথ কিছু সময় শক্তিসাধনা করিয়াছিলেন। কাহারও কাহারও মুখে শুনিতে পাওয়া যায় এই সময় তিনি দেবীর সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া কৃতকৃত্য হইয়াছিলেন। তিনি যে তারাপীঠে সাধনার সময় বাহ্যজ্ঞানশূন্য ও নিবিষ্ট হইয়া যাইতেন তাহা আমরা মায়ের মুখেও কতবার শুনিয়াছি।

বীরভূমের শীত পশ্চিমের শীত অপেক্ষা কোন প্রকারেই কম নহে। মা কোনও গৃহস্থের বাড়ী বাস করেন না, সেইজন্য বাধ্য হইয়া তাঁহাকে শ্রীশ্রীসিদ্ধাশ্রমের ভাঙ্গা ঘরেই রাখা হইয়াছে কারণ সেখানে তখন ধর্মশালাদি কিছুই ছিল না। বাবা ভোলানাথ তারা মায়ের বারান্দায় আপন বাসস্থান করিয়া লইয়াছেন। সেখানে অপর কোন বাসযোগ্য স্থান না থাকায় আমরাও সকলে গত্যন্তর না দেখিয়া মায়ের ঘরে ও বারান্দায় কোন রকমে রাত অতিবাহিত করিতাম। দিনের বেলায় কেহ তারা মায়ের মন্দিরে, কেহ শ্মশানে, কেহ গাছতলায়, কেহ বা পুকুরপাড়ে কোন প্রকারে কাটাইতাম।

শীতের নিঝুম রাত্রি। আমরা যে যাহার বিছানায় কম্বল মুড়ি দিয়া অঘোরে নিদ্রায় মগ্ন আছি। কেহ বা শুইয়া জপ করিতেছেন। রাত্রি অনুমান তিনটার সময় দারুণ শীতের মধ্যে মা তাঁহার অপরিসর শয্যাটি ত্যাগ করিয়া সোজা খোলা মাঠের দিকে হাঁটিতে শুরু করিলেন। এই সংবাদ পাইয়া দিদিমা খুকুনীদিদি (শ্রীগুরুপ্রিয়া দেবী), শশাঙ্কবাবু, জ্যোতিষবাবু, স্বামী শঙ্করানন্দজী, আমি এবং আরও হয়তো দুই একজন মায়ের পশ্চাতে পশ্চাতে চলিতে লাগিলাম। এই পৌষমাসের অসহ্য ভীষণ শীতের মধ্যে মা যে কোথায় যাইতেছেন তাহা আমাদের মধ্যে কেহই জানেন না। মা কাহার সঙ্গে কোন কথাবার্তা না বলিয়া আপন খেয়াল-

মত সোজা উন্মুক্ত প্রান্তরের মাঝ দিয়া চলিতেছেন। খানিকটা পথ এইভাবে অতিক্রম করিয়া শেষে চলিতে লাগিলেন—কাহারও বাড়ীর উঠানের উপর দিয়া, কাহারও ঘরের পিছন দিয়া এবং কাহারও রান্নাঘরের সম্মুখ দিয়া। অবশেষে একজনের বাড়ীর আঙ্গিনায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অত্যন্ত শীতের মধ্যে ঐ বাড়ীর প্রাঙ্গণের হিমশীতল মাটির উপরই মা বসিয়া হরিবোল, হরিবোল বলিয়া অতি সুমধুর স্বরে নাম ধরিলেন। আমরাও যে যেমন পারি মায়ের সঙ্গে সঙ্গে হরিনাম করিতে লাগিলাম। হিমের নীরব নিবিড় শেষরাত্রির ঘন অন্ধকারের মধ্যে সারা জগৎ যখন সুষুপ্তির কোলে বিশ্রাম করিতেছে, সেই সময় সন্তানবৎসলা স্নেহময়ী বিশ্ব-জননীর সুললিত মৃদু-মধুর-কণ্ঠে ভুবন মঙ্গল হরিনাম যে কি অপূর্ব মধুর লাগিতেছিল তাহা আমার ন্যায় রসহীন ব্যক্তির পক্ষে ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব, কারণ সেই শক্তি হইতে মা আমাকে চিরদিনই বঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছেন।

কয়েক মিনিট পর দেখা গেল উঠানের দক্ষিণদিকের একখানি খড়ের বড় ঘর হইতে একজন পুরুষ একটি কেরোসিন তেলের টিনের বাতি জ্বালিয়া বাহিরে আসিলেন। আঙ্গিনায় শ্রীশ্রীমাকে কীর্তন করিতে দেখিয়া সেই লোকটি কাহারও সঙ্গে কোন কথাবার্তা না বলিয়া পুনরায় গৃহ মধ্যে চলিয়া গেলেন। দুই তিন মিনিট পর দুইজন বেশ বলিষ্ঠ লোক একজন মোটা কাল উলঙ্গ ব্যক্তিকে উত্তোলন করিয়া মায়ের সম্মুখে ঠাণ্ডা মাটির উপর বসাইয়া দিলেন। শেষ রাত্রির ঘোর অন্ধকারে লোকটির বয়স অনুমান করিবার উপায় ছিল না। তবে খুব যে বৃদ্ধ নয় তাহা তাহার আকৃতিতে ধরা পড়িতেছিল। লোকটি বয়সে প্রৌঢ়—হয় তো বয়স চল্লিশ, পঁয়তাল্লিশ, কি খুব জোর পঞ্চাশ হইতে পারে। যাঁহারা লোকটিকে চেঙ্দোলা করিয়া লইয়া আসিয়াছিলেন তাঁহাদের মুখে শুনিলাম কয়েক বৎসর যাবৎ এই ব্যক্তি বাতব্যাধি (Paralysis) রোগে পঙ্গু হইয়া গিয়াছেন। কথা বলিতে পারেন না এমন কি একটু হাত-পাও নাড়িতে পারেন না, একেবারেই চলচ্ছক্তি-রহিত।

মায়ের সম্মুখে লোকটি একটু বসিয়াই হঠাৎ মা, মা, মা বলিয়া

তিনবার ডাকিলেন। তারপর মায়ের সঙ্গে সঙ্গে হরিবোল, হরি-বোল বলিতে লাগিলেন। এইভাবে একটু সময় নাম করিবার পর মায়ের নির্দেশমত উহাকে ঘরে নিয়া যাওয়া হইল। কি আশ্চর্য! যে ব্যক্তিকে কয়েক মিনিট পূর্বে দুইজন বলিষ্ঠ পুরুষ ধরাধরি করিয়া তুলিয়া আনিয়াছিলেন, তিনি না জানি, কোন অব্যক্ত ও অলৌকিক শক্তির প্রভাবে সঙ্গীয় লোক দুইটির অল্প সাহায্যে হাঁটিয়া ঘরে চলিয়া গেলেন।

যিনি কয়েক বৎসর যাবৎ কথা বলিতে, কি চলিতে পারেন না, তাহার মুখ দিয়া মা মা ডাকান, হরিবোল হরিবোল বলান এবং তাহাকে হাঁটান—একি কম শক্তি বা বিভূতির কথা! এই অচিন্তনীয় ও বিস্ময়কর ঘটনা অবলোকন করিয়া উহারা এবং আমরা সকলে, যাহারা সেখানে উপস্থিত ছিলাম—অত্যন্ত আশ্চর্য ও স্তম্ভিত হইয়া গেলাম। যিনি বোবাকে দিয়া কথা বলাইতে পারেন ও পঙ্গুকে দিয়া পর্বত লঙ্ঘন করাইতে পারেন, তিনি সবই করিতে পারেন। তাঁহার অসাধ্য কর্ম জগতে কিছুই নাই।

(পাঁচ)

বাল্যাবস্থা হইতে আমি বেগুন খাইতে পারিতাম না। যদি কোনদিন অসাবধানবশতঃ দৈবাৎ কোন প্রকারে একটুও বেগুনের কণা আমার উদরস্থ হইত তৎক্ষণাৎ উহা বমি হইয়া উঠিয়া যাইত। কোন রকম চেষ্টা বা প্রতিকার করিয়াও উহা নিবারণ করা আমার পক্ষে সম্ভব হইত না। বমনের ভয়ে উহা কখনও আমি খাইতাম না। কি ভাজা, কি পোড়া, এমন কি বেগুন যদি কোন তরকারিতে দেওয়া হইত এবং সেই বেগুন বাছিয়া ফেলিয়াও যদি সেই ব্যঞ্জন আমি ভোজন করিতাম তাহা পর্যন্ত বমি হইয়া যাইত। এমন বমন হইত যে পেটে এক কণা অন্নও অবশিষ্ট থাকিত না। বমির পর শরীরটা কিছু সময়ের জন্য অত্যন্ত অবসন্ন হইয়া পড়িত। এই বমির ভয়ে কখন আমি বেগুন পাতেও লইতাম না। এইরকম ছিল আমার বেগুন-আতঙ্ক। এই রোগের কোন চিকিৎসা ছিল না।

ইংরাজী ১৯৩১ খৃষ্টাব্দের শ্রীশ্রীদুর্গাপূজার কিছুদিন পূর্বে কর্মস্থান হইতে দুই মাসের বিদায় লইয়া শ্রীশ্রীমায়ের কাছে ঢাকায় গিয়াছি। একদিন মধ্যাহ্নে শ্রীশ্রীমা ও বাবা ভোলানাথ দুই জনে আশ্রমের উত্তরদিকে টিনের ঘরে পাশাপাশি ভোজন করিতে বসিয়াছেন। আমরা কয়েকজন (নীতীশ গুহ, নবতরু হালদার, জ্ঞানরঞ্জন ব্রহ্মচারী প্রভৃতি) ঘরের বারান্দায় দাঁড়াইয়া তাঁহাদের ভোগগ্রহণ দেখিতেছি। যে সময়কার ঘটনা লিখিতে যাইতেছি সেই সময় মায়ের ভোগের সময় সকলেই উপস্থিত থাকিতে পারিত, কাহারও তাহাতে কোনপ্রকার বাধা বা আপত্তি ছিল না। এখনও যে বেশী আপত্তি আছে তাহা নহে, তবে মায়ের ভোজনের সময় অধিক লোকজন না থাকাই বাঞ্ছনীয়। মা আহার করিতে করিতে হঠাৎ তাঁহার কি খেয়াল হইল তিনি আমাকে তাঁহাদের কাছে বসিয়া খাইতে আদেশ করিলেন। মাতৃ-লীলার মধ্যে এই রকম ঘটনা বড় একটা আমরা পাই না। ইহাকে মায়ের করুণাই বলিতে হইবে। আমাদের মধ্যে অপর কাহাকেও তাঁহার নিকটে বসিয়া ভোজন করিতে না বলায় আমি একটু লজ্জিত হইয়া মাকে নিবেদন করিলাম, "মা! তোমাদের ভোগ হইয়া গেলে আমরা সকলে এক সঙ্গে বসিয়া প্রসাদ পাইব।" আমার এই কথা যেন তিনি শুনিতেই পাইলেন না, এই রকম ভাব দেখাইয়া তাঁহাদের পার্শ্বে আমার জন্য খাইবার জায়গা করাইয়া মটরী পিসীমাকে (বাবা ভোলানাথের ছোট ভগিনী) আমার জন্য ভাতের থালা আনিতে বলিলেন। আমি কি আর করি! অনিচ্ছাসত্ত্বেও মায়ের আদেশ রক্ষার নিমিত্ত আমাকে তাঁহাদের পাশেই খাইতে বসিতে হইল। মায়ের নির্দেশানুসারে মটরীপিসীমা থালায় অন্ন বাড়িয়া উহার পার্শ্বে বড় বড় দুইখানা বেগুন ভাজা রাখিয়া থালাখানা আমার সম্মুখে রাখিতেই আমি তাঁহাকে বলিলাম, "আপনি বেগুন ভাজা দুই খানা তুলিয়া লইয়া যান। আমি বেগুন খাই না।" আমার এই কথা শুনিয়া মা আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি বাইগন খাও না কেন?" আমি উত্তর দিলাম, "মা! বেগুন খাইলে আমার বমি হয়, তাই বেগুন খাই না। ইহা ছাড়া বেগুন

না খাওয়ার অন্য কারণ নাই।” আমার এই কথা বলা সত্ত্বেও মা বলিলেন, “আচ্ছা খাও না।”

আমি খাইতে শুরু করিয়া সব জিনিসই খাইতেছি, কিন্তু বেগুন ভাজা দুইখানি যেমনকার তেমন আমার পাতে পড়িয়া রহিয়াছে। ইহার কারণ, আমি নিশ্চিত জানিতাম উহা খাইলেই আমার বমি হইয়া যাইবে; সেইজন্য উহা আমি মুখে দিতেছি না। খানিক-ক্ষণ পর মায়ের যখন আমার থালার দিকে পুনরায় দৃষ্টি পড়িল তখন তিনি আবার বলিলেন, “কৈ! তুমি বাইগন খাইলা না?” শ্রীশ্রীমায়ের চরণে আমি অতিশয় বিনীতভাবে নিবেদন করিলাম, “না মা! আমি বেগুন খাই নাই, কারণ আমি নিশ্চিতরূপে জানি উহা খাইলেই বমি হইয়া যাইবে। হয় তো এমনও হইতে পারে খাইতে খাইতে পাতেই বমন হইয়া তোমাদের দুইজনের ভোজন নষ্ট হইয়া যাইতে পারে”। আমার মুখে একই কথা বারবার শুনিয়াও কিন্তু তিনি আমাকে বেগুন খাইবার জন্য পুনঃপুনঃ আদেশ করিতে লাগিলেন। এই সামান্য বেগুন খাওয়ার জন্য মা কেন যে আমাকে পীড়াপীড়ি করিতেছেন এবং ইহার মধ্যে কি যে রহস্য থাকিতে পারে তাহা না বুঝিয়া, নিরুপায় হইয়া, মা বারংবার বলায়, কেবল তাঁহার আদেশ পালন করিবার নিমিত্ত সামান্য একটু বেগুন ভাঙ্গিয়া খাইলাম। আবার খানিকক্ষণ পর তিনি যখন দেখিলেন যে তাঁহার এত বলা সত্ত্বেও আমি সবটা বেগুন খাই নাই তখন পুনরায় তিনি বলিলেন, “কৈ, তুমি এখনও বাইগনভাজা খাইলা না?” আমি উত্তর দিলাম, “হাঁ মা! এই যে তোমার আজ্ঞা পালনের জন্য একটু ভাঙ্গিয়া খাইয়াছি।” এইবার মা বেশ একটু জোরের সঙ্গে নির্দেশ করিলেন, “ঐটুকু খাইলে হইবে না, সম্পুর্ণ বাইগন দুইখানা খাইতে হইবে।” আমার বেগুন খাওয়ার জন্য মা যেন পিছু লাগিয়া গেলেন। আমি মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম আজ মায়ের কাছে খাইতে বসিয়া কি অন্যায়টাই না করিয়াছি। এখন বেগুন ভোজন করিলে যদি বমি হয় তাহা হইলে মা ও পিতাজী দুইজনেরই আহার নষ্ট হইয়া যাইবে। একটা কিনা কেলেঙ্কারির সৃষ্টি হইবে! কি আর করি? কোন উপায়ান্তর না দেখিয়া খাওয়া শেষ করিয়া

তাড়াতাড়ি কোন রকমে বেগুন দুইখানা গলাধঃকরণ করতঃ উঠিয়া পড়িলাম। আঁচাইয়া, যাহাতে বমি না হয়, সেইজন্য কতগুলো লবঙ্গ মুখে পূরিয়া চিবাইতে লাগিলাম। আমি নিশ্চিতরূপে জানিতাম বমি আমার হইবেই, কারণ এমন দিন কখনও জীবনে যায় নাই যেদিন বেগুন খাওয়ার পর বমন করি নাই। এমন কি যদি আমার অজ্ঞাতসারেও বেগুনের একটি বীচি তরকারির সঙ্গে খাওয়া হইত তাহাও বমি হইয়া উঠিয়া যাইত। সেইজন্য ব্যঞ্জনাদি ভোজনের পূর্বে আমি সর্বদা জানিয়া লইতাম উহাতে বেগুন পড়িয়াছে কিনা? এমনই সাঙ্ঘাতিক ছিল আমার বেগুন Allergy—শুনিয়াছি এই রোগ নাকি কখন আরোগ্য হয় না। এইজন্য আমার গর্ভধারিণী দুঃখ করিতেন, আমার জন্য তাঁহারা তরকারিতে বেগুন দিতে পারেন না। কি আশ্চর্যের কথা! অতবড় দুইখানা বেগুন ভাজা খাইয়াও কিন্তু সেইদিন আমার বমি হয় নাই। ইহা আমার জীবনে একটি অভূত-পূর্ব ঘটনা। বেগুন খাইয়াছি অথচ বমি হয় নাই ইহা কল্পনা করিতে পারি না।

আমার নিয়ম ছিল যতদিন ঢাকায় শ্রীশ্রীমায়ের আশ্রমে ছিলাম আমি মায়ের ঘরের বারান্দায় রাত্রিতে শয়ন করিতাম। অন্য দিনের মত সেইদিনও আমি মায়ের শয়ন-কুটিরের অলিন্দেই শয়ন করিয়াছি। রাত্রি অনুমান দশটা কি এগারটার সময় মা তাঁহার কুটিরের ভিতর হইতে আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজ কি বাইগন খাইয়া তোমার বমি হইয়াছিল?" আমি বারান্দা হইতেই উত্তর দিলাম, "না মা! আজ বেগুন খাইয়া আমার বমি হয় নাই! আমার জীবনে এই আজ প্রথম দিন যে বেগুন খাইয়াছি অথচ বমি হয় নাই।" মা পুনরায় বলিলেন, "তবে যে খাইতে বসিয়া তুমি বারবারই কহিতেছিলা তোমার নাকি বাইগন খাইলে বমি হইয়া যায়।" আমি মাকে নিবেদন করিলাম, "মা! ইহা তোমারই কৃপা। নচেৎ বেগুন খাইয়া বমি হয় নাই, ইহা আজ আমার জীবনে প্রথম ঘটিয়াছে।"

সেই যে সেদিন হইতে বেগুন খাইবার পর বমি হওয়া বন্ধ হইয়াছে আর কখনও বেগুন খাইবার পর বমি হয় নাই। এইভাবে

অযাচিতরূপে শ্রীশ্রীমায়ের অহৈতুকী কৃপায় আমার সুদীর্ঘ পঁয়ত্রিশ বৎসরের জন্মগত ব্যারাম এক মুহূর্তে আরোগ্য হইয়া গেল। তাহাও এক অভিনব উপায়ে—যাহা আহার করিলে ব্যাধির উৎপত্তি হয় তাহাই ভোজন করাইয়া রোগ উপশম করিলেন। এখন বেশ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেছি সেইদিন মা কেন অনুকম্পা করিয়া তাঁহার এই দীন, হীন, অবাধ্য সন্তানকে তাঁহার নিকট বসাইয়া খাওয়াইয়াছিলেন। আমার এই রোগের কথা কখনও তো আমি তাঁহাকে সামান্য আভাস-ইঙ্গিতেও নিবেদন করি নাই। তবে মা ইহা জানিলেন কি করিয়া? আমার এই ব্যাধির বিষয় জানা এবং এইরূপে আমাকে নিরাময় করা দুইটাই কি শ্রীশ্রীমায়ের বিভূতি ও অলৌকিক শক্তির পরিচয় নহে?

(ছয়)

শ্রীশ্রীমা বারাণসী আসিয়া শ্রীযুক্ত নির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বাড়ী উঠিয়াছেন। একদিন মাকে দর্শন করিয়া বাড়ী ফিরিতে অনেক রাত্রি হইয়া গিয়াছিল। অত রাত্রিতে বাড়ী আসিতেই আমার পঁচাত্তর বৎসরের বৃদ্ধা পিসীমা অতিশয় উৎকণ্ঠার সহিত আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—আজ বাড়ী আসিতে তোর এত রাত্রি হইল কেন? তুই কোথায় গিয়াছিলি?

আমি—আনন্দময়ী মাকে দর্শন করিতে নির্মলবাবুর বাড়ী গিয়াছিলাম। তিনি আজই এখানে আসিয়াছেন।

পিসীমা—আমাকে একবার আনন্দময়ী মায়ের দর্শন করাইয়া আন না। আজকাল অনেকের মুখেই তাঁহার সুখ্যাতি শুনিতেছি। তিনি নাকি স্বয়ং মা কালী। জগদম্বা। জগতের কল্যাণের জন্য আসিয়াছেন। এমন মাকে দেখিব না?

আমি—তাঁহাকে দর্শন করিতে তুমি কি করিয়া যাইবে? তুমি তো মোটেই হাঁটিতে পার না! তিনি তো থাকেন এখান হইতে অনেক দূরে। রামাপুরার নইবস্তিতে। তুমি কি অত দূর হাঁটিয়া যাইতে পারিবে?

পিসীমা—আমি হাঁটিতে পারি না, তাহাতে কি হইয়াছে? আমাকে একখানা ডুলি করিয়া লইয়া যাইবি।

তখন কাশীতে মেয়েদের ডুলি কি পাল্কিতে যাতায়াতের প্রচলন ছিল। আজকাল ঐ সকল চোখেও দেখিতে পাওয়া যায় না। বৃদ্ধা পিসীমার মাকে দর্শন করিবার তীব্র আগ্রহ দেখিয়া পরদিন দুপুরবেলা আহারাদির পর একখানা ডুলিতে করিয়া তাঁহাকে শ্রীনির্মলবাবুর বাড়ী লইয়া গেলাম। সেখানে গিয়া দেখি মা ভোগে বসিয়াছেন। এই অবসরে পিসীমাকে মায়ের থাকিবার ঘরে বসাইয়া দিলাম। মধ্যাহ্ন সময় সেইজন্য লোকজনের ভিড় ছিল না। মা ভোজনান্তে বিশ্রামের জন্য তাঁহার নির্দিষ্ট ঘরে চৌকির উপর বিছানায় বসিলে আমার পিসীমা মাকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন। মা আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ মা-টি কে?" আমি বলিলাম, "ইনি আমার পিসীমা, বয়স অনুমান পঁচাত্তর বৎসর। খুবই অল্প বয়সে বিধবা হইয়াছেন। বহুকাল যাবৎ কাশীবাস করিতেছেন। এই বয়সে এখনও নিজের হাতে রান্না করিয়া খান। অপর কাহারও হাতের রান্না খান না। গঙ্গাজলে রান্না করিয়া নারায়ণের ভোগ দেন সেই প্রসাদই গ্রহণ করেন। বেশী সময় পূজা ও জপ লইয়া থাকেন। পূর্বে প্রত্যহ সকালে গঙ্গাস্নান করিতেন। এখন আর গঙ্গায় গিয়া স্নান করিতে পারেন না। তোমাকে দর্শন করিবার অত্যন্ত আগ্রহ দেখিয়া ডুলিতে করিয়া আনিয়াছি। পিসীমার সন্তানাদি কিছু হয় নাই। ইনিই আমাকে লালন-পালন করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীমা আহারান্তে বিশ্রামের জন্য তক্তপোশের উপর শয্যায় শয়ন করিলেন। আমার বৃদ্ধা পিতৃস্বসা মায়ের চৌকির সম্মুখে মাটিতে বসিয়া মায়ের ঐ পবিত্র অনিন্দ্য সুন্দর সদ্য প্রস্ফুটিত শ্বেত কমলের ন্যায় মুখখানির অনুপম লাবণ্য অপলক দৃষ্টিতে অবলোকন করিতেছিলেন। ঘরে মা, পিসীমা ও আমি ব্যতীত অপর চতুর্থ কোন ব্যক্তি ছিল না। মা শয়নাবস্থাতেই পিসীমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "মা! তোমার এই ছোট্ট মাইয়াটাকে লইয়া শোওনা এই বিছানায়।"

পিসীমা—মা! তোমাকে লইয়া আমি কি করিয়া শুইব তোমার বিছানায়। তুমি যে দেবী। স্বয়ং ভগবতী।

মা—কেন, ছোট্ট মাইয়াটাকে লইয়া মা বুঝি এক বিছানায় শোয় না? শোও না মা, তোমার এই মাইয়াটারে লইয়া।

মায়ের বিছানায় উঠিতে পিসীমা প্রথমে বিশেষ সঙ্কোচ বোধ করিতেছিলেন। ইহা করাই তো মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক। আমি বলিলাম, "মা যখন নিজে তোমাকে তাঁহাকে লইয়া শুইতে বলিতেছেন, তাহাতে তোমার আপত্তি করিবার কি আছে?" আমার এই কথায় তিনি অতি সরলভাবে নিঃসঙ্কোচে মায়ের বিছানায় উঠিয়া শয়ন করিলেন। শ্রীশ্রীমা পিসীমার বুকের মধ্যে ছোট্ট শিশুটির মত একেবারে গুটিশুটি মারিয়া রহিলেন। আমার বৃদ্ধা পিসীমা মায়ের এই অকৃত্রিম শিশুভাবে আবিষ্ট হইয়া অকুণ্ঠিত-রূপে মাকে স্বীয় শিশুসন্তানের ন্যায় আপন বক্ষে ধারণ করিয়া বলিলেন, "মা! তোমার গায়ে এমন সুন্দর চন্দনের গন্ধ আসিতেছে কোথা হইতে? মানুষের শরীরে তো এইরূপ সুগন্ধ হয় না। তুমি যে দেবী, স্বয়ং ভগবতী এই মধুর গন্ধই তাহার পরিচয় দিতেছে।" এই কথার উত্তরে মা বলিলেন, "তোমার এই মাইয়াটা রোজ স্নান করে না, সবদিন কাপড় পর্যন্ত ছাড়ে না, তুমি তাহার গায়ে চন্দনের গন্ধ পাইলা কোথা হইতে।" যতক্ষণ পর্যন্ত তিনি শ্রীশ্রীমাকে বুকে লইয়া শয়ন করিয়াছিলেন ততক্ষণ তিনি মায়ের অপ্রাকৃত চিন্ময় পবিত্র শরীরে অপূর্ব চন্দনের সুগন্ধ পাইতেছিলেন। এখানে একটা কথা বলা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না—আমি এই পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে কখনও কাহাকে মায়ের শয্যায় শয়ন করিতে দেখি নাই এবং মাকেও অপর কাহারও বিছানায় শুইতে দেখিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না। মাতৃ-লীলায় ইহা যে একটি অভিনব দৃশ্য তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। ইহার কারণ একমাত্র মা-ই বলিতে পারেন। এই পঁচাত্তর বৎসরের বৃদ্ধার মধ্যে কি এমন বিশেষত্ব ছিল যাহার জন্য মাকে তাঁহার কন্যা সাজিতে হইয়াছিল। সাধারণ দৃষ্টিতে বিচার করিলে মনে হয় বৃদ্ধার অবচেতন মনের মধ্যে হয় তো অপত্য স্নেহ লুক্কায়িত ছিল সেইজন্য মা এইভাবে দয়া করিয়া তাহা

পূর্ণ করিলেন। শ্রীশ্রীমায়ের দিব্য, পূত ও অনৈসর্গিক শ্রীদেহ হইতে আমিও চন্দনের সুবাস যেরূপে পাইয়াছিলাম তাহা লিখিতেছি।

১৯২৯ কিংবা ১৯৩০ খৃষ্টাব্দের বর্ষার সময় শ্রীশ্রীমা বিন্ধ্যাচলের উপর তাহার সুন্দর আশ্রমটিতে বাস করিতেছেন। তখনও আশ্রমের দোতলা নির্মাণ সম্পন্ন হয় নাই। নীচে মাত্র একখানা বড় ঘর এবং উহার চারিদিকে চারিটি দরজা। ঘরের চতুর্দিকে লোহার মোটা ছড় দিয়া ঘেরা বারান্দা। বর্তমানে যেখানে দ্বিতলে উঠিবার সিঁড়ি সেস্থানে ছিল ছোট একখানা রাঁধিবার ঘর। রাত্রিতে মা উত্তর দিকের দরজার কাছে দক্ষিণ দিকে মস্তক দিয়া শুইয়া আছেন। ঘরের ভিতর খুকুনীদিদি (তখনও 'গুরুপ্রিয়া' নাম হয় নাই) প্রভৃতি মেয়েরা সকলে মায়ের আশেপাশে শয়ন করিয়া আছেন। ঘরের চারিধারের ঘেরা বারান্দায় পুরুষরা যে যাহার শুইবার স্থান করিয়া লইয়াছেন। মায়ের পায়ের নীচে উত্তর দিক্‌কার অলিন্দে আমি শুইয়াছি। বর্ষার দিন বারান্দায় জলের ছাঁট আসে সেইজন্য ঐ বারান্দায় সেদিন কেহ শয়ন করে নাই। মায়ের চরণতলে শুইবার লোভ সম্বরণ করিতে না পারিয়া বৃষ্টির জলে ভিজিয়াও সেইদিন আমি উত্তর দিকের অলিন্দেই শয়ন করিয়াছি। শ্রীশ্রীমায়ের চরণ এবং আমার মাথার মাঝে ব্যবধান হইবে বেশী হইলেও হাত দুই। বারান্দা ঘর হইতে অনুমান এক হাত নিম্নে। অকস্মাৎ নীরব গভীর রাত্রিতে অতিশয় সুন্দর চন্দনের মিষ্টি গন্ধে আমার নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল। মাথা তুলিয়া দেখি ঐ নিঝুম রজনীতে সকলে যখন অঘোর নিদ্রায় নিমগ্ন তখন জননী আমার রাঙ্গা টুকটুকে সুন্দর চরণকমল দুইখানি আমার মাথার দিকে প্রসারিত করিয়া আপন ভাবে বসিয়া আছেন। এবং তাঁহার ঐ অলোকসুন্দর রাতুল পদ্মসদৃশ চরণযুগল হইতে ভাসিয়া আসিতেছে মনোমুগ্ধকর দিব্য চন্দনের সুবাস। আমি যে বারান্দায় শয়ন করিয়াছিলাম সেই স্থানটা চন্দনের গন্ধে আমোদিত হইয়াছিল। আমার দেখায় শ্রীশ্রীমায়ের যদি কোন প্রকার অসুবিধা বা বিঘ্ন উৎপাদন করে এই আশঙ্কায় অবিলম্বে আমি পুনরায় শুইয়া পড়িলাম। যতক্ষণ আমি জাগিয়াছিলাম ততক্ষণ

পর্যন্ত ঐ চন্দনের সুগন্ধ পাইতেছিলাম, আমার মনে হইতেছিল কেহ যেন চন্দনের সুগন্ধ আতর মায়ের চরণে ঢালিয়া দিয়াছে। মানুষের দেহ হইতে সাধারণতঃ এই রকম সুগন্ধ নির্গত হইতে বড় দেখা যায় না অথচ মা সেই সময় কোন প্রকার সুগন্ধ আতর কিংবা এসেন্স (Essence) ব্যবহার করিতেন না। আমরা শুনিয়াছি প্রত্যেক দেবতারই শরীরে পৃথক্ পৃথক্ গন্ধ আছে। যাঁহারা সেই সকল গন্ধের সহিত পরিচিত আছেন তাঁহারা গন্ধ হইতে বলিতে পারেন কোন দেবতার কোন গন্ধ। চন্দন, কেশর, কর্পূর ও কস্তুরী এক সঙ্গে মিলিত করিলে যে অপূর্ব সুবাস হয় উহা নাকি শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গগন্ধ এবং শ্রীমতী রাধারাণীর অঙ্গগন্ধ নাকি ছিল পদ্মের গন্ধের ন্যায়। চন্দনের এই সুগন্ধটিও কিন্তু শ্রীশ্রীমায়ের বিভূতিরই পরিচয় দিতেছে। মায়ের পরিধানের বস্ত্র, জামা ও সায়াতেও এক রকম সুগন্ধ পাওয়া যায়, যাহা কি ধৌত করিলেও সহজে যায় না। সূক্ষ্মে কোন দেবতার আবির্ভাব হইলে গন্ধ দ্বারা তাহা নির্ণয় করা যাইতে পারে।

(সাত)

এই বিন্ধ্যাচল আশ্রমের উত্তরদিকের বারান্দায় একখানা সাধারণ দড়ির খাটে বসিয়া গরমের রাত্রিতে মাণিক (শ্রীসুধীর কুমার ঘোষ) ও আমি কথাবার্তা বলিতেছি। সহসা মা আমাদের কাছে আসিতেই আমরা দুইজনে উঠিয়া দাঁড়াইলাম। মা আমাদের জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই খাটে কে শোয় ?" আমরা উত্তর দিলাম, "পূর্বে এই খাটে বাবা ভোলানাথ শয়ন করিতেন। বৃষ্টির জলের ছাঁট আসে বলিয়া তিনি এখন আর এখানে শুইতেছেন না।"

মা—তবে এই শরীর (নিজেকে লক্ষ্য করিয়া) এখানে শুক।
আমরা—বেশ তো, তুমি এখানে শোও না।

মা তাঁহার গায়ের চাদরখানাদ্বারা পা হইতে মাথা পর্যন্ত ঢাকিয়া খাটের উপর শুইয়া পড়িলেন। আমরা দুইজনে মায়ের সম্মুখে মাটিতে বসিয়া রহিলাম। বেশ কিছুক্ষণ ঐ ভাবে চাদর মুড়ি দিয়া থাকিবার পর হঠাৎ মা তাঁহার পায়ের দুই বুড়ো আঙ্গুলের

ডগা ও মাথার উপর ভর দিয়া ধনুকের (Arch) মতন হইয়া রহিলেন। যদি ঐ অবস্থায় মা খাট হইতে নীচে পড়িয়া যান এই ভয়ে আমরা তাড়াতাড়ি খুকুনী দিদিকে ডাকিলাম। রাত্রি অনেক হইয়াছিল সেইজন্য সকলেই আপন আপন স্থানে গিয়া শয়ন করিয়াছিলেন। অগত্যা আমরা তিনজনেই কোনরকমে তুলিয়া তাঁহাকে ঘরে বিছানায় শোওয়াইয়া দিলাম। আমরাও তিনজন মায়ের নিকট বসিয়া রহিলাম। অকস্মাৎ মা তাঁহার শয্যার উপর উঠিয়া বসিলেন এবং বিনা চেষ্টায়, নিজে নিজে, একের পর এক নানা প্রকার অসাধারণ আসন সব হইতে লাগিল। কোন কোন আসনের সঙ্গে আবার ত্রাটকও হইতেছিল। এমন কঠিন আসন সব হইতে লাগিল যেসকল কি সাধারণ মনুষ্যশরীরে হওয়া সম্ভব নহে। ঐ সকল আসন দেখিয়া আমাদের মনে হইতেছিল মায়ের দেহে বুঝি হাড়গোড় নাই। এইভাবে ঘণ্টাখানেক আসন হইবার পর শ্রীশ্রীমায়ের মুখকমল হইতে অস্পষ্ট ও অতি মৃদুস্বরে নির্গত হইল "গৌরীর অষ্টাঙ্গ যোগ।" মায়ের কথায় আমরা বুঝিলাম শিব-সোহাগিনী সতীর দেহত্যাগের পর যখন তিনি হিমালয়ের গৃহে গৌরীরূপে পুনরায় আবির্ভূত হইয়া দেবাদিদেব মহাদেবকে পতিরূপে প্রাপ্ত হইবার জন্য অতি কঠোর তপশ্চর্যা ও সাধন করিয়াছিলেন, সেইসময়কার এই সকল আসন ও ত্রাটক। শ্রীশ্রীমা যে স্বরূপতঃ কে সেইদিন কি এই ভাবে বিন্ধ্যাচলে গভীর মহানিশায় আমাদের নিকট তাহার পরিচয় দিয়াছিলেন ?

পাতঞ্জল যোগদর্শনে অষ্টাঙ্গ যোগের কথা আমরা পাইয়া থাকি যথা, নিয়ম, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি। এই সকল আসন ও ক্রিয়া যখন মহাযোগেশ্বরী শ্রীশ্রীমায়ের অপ্রাকৃত দিব্য শরীরকে আশ্রয় করিয়া স্বাভাবিকভাবে হইতেছিল সেই গভীর রাত্রিতে শ্রীমৎ স্বামী শঙ্করানন্দ সরস্বতী, শ্রীশশাঙ্কমোহন মুখোপাধ্যায় ও শ্রীকুঞ্জমোহন মুখোপাধ্যায় মহাশয়দের নিদ্রা হইতে জাগাইয়া ইহা দেখান হইয়াছিল। ইহা যে পরমারাধ্যা বিশ্বজননী শ্রীশ্রীমায়ের একটি বিশেষ বিভূতির প্রকাশ তাহা বলাই বাহুল্য। একসঙ্গে এত রকম আসন ও ত্রাটক মায়ের এই দিব্য শরীরের দ্বারা

ইহার পূর্বে কি পশ্চাতে আর কখনও হইয়াছে বলিয়া অন্ততঃ আমি শুনি নাই।

(আট)

একদা শ্রীশ্রীমা শীতের সময় পৌষ মাসে বিন্ধ্যাচলে অবস্থান করিতেছিলেন। এই সংবাদ পাইয়া শ্রীনির্মলবাবু কাশী হইতে সপরিবারে মাতৃ-দর্শনে বিন্ধ্যাচল গিয়াছেন। শীতের দিন তাই তিনি দুইখানা গরম চাদর মা ও বাবা ভোলানাথের জন্য লইয়া যান। নির্মলবাবুর স্ত্রী শ্রীযুক্তা সরোজিনী দেবী একদিন মাকে এক বড় পরাতে দশসের দুধের পায়েস (পরমান্ন) ভোগ দিলেন। মা বহুদিন যাবৎ নিজের হাতে ভোজন করেন না সেইজন্য সরোজিনী দেবীই অতি সুস্বাদু পরমান্ন মাকে খাওয়াইয়া দিতেছেন। সঙ্গে সঙ্গে মাও সরোজিনী দেবীকে সেই পরাত হইতেই পরমান্ন তাঁহার মুখে দেওয়ায় সেখানে আনন্দের ধুম পড়িয়া গেল। ইহাও শ্রীশ্রীমায়েরই এক অপূর্বলীলা। এমনতর ঘটনা যে ইহার পূর্বে কি পরে কখনও সংঘটিত হয় নাই তাহা বলা যায় না তবে এ জাতীয় লীলামায়ের খুবই বিরল। ইহা বলা নিষ্প্রয়োজন যে এই লীলা আজকাল দৃষ্টিগোচর হয় না বলিলেই হয়। বাবা ভোলানাথকেও পৃথক্‌ভাবে ভোগ দেওয়া হইয়াছে, তিনিও বেশ আনন্দের সহিত পায়স ভোজন করিতেছেন। ভোজন করাইবার পর সরোজিনী দেবী মাকে ও ভোলানাথকে গরম আলোয়ান দুইখানা দিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন। চাদর দুইখানা ঠিক একই রকমের—এক রংয়ের এবং একই মূল্যের। যখন কাশীতে জহরলাল পান্নালালের দোকান হইতে উহা ক্রয় করা হইয়াছিল তখন নির্মলবাবুর সঙ্গে আমিও ছিলাম এবং আমিই চাদরের রং নির্বাচন করিয়া দেই।

শ্রীশ্রীমা গরম আলোয়ানখানা গায়ে দিয়া হাসিতে হাসিতে ভোলানাথকে রাগাইবার জন্য কৌতুক করিয়া বলিতে লাগিলেন, "তোমার গায়ের চাদরখানা এই শরীরের গায়ের চাদরখানা হইতে ছোট। তোমার খানা ছোট এই শরীরের খানা বড়।"

এই কথা বলিয়া শিশুর মত হাততালি দিতে দিতে সেখানে আনন্দের হাট বসাইয়া দিলেন। মায়ের এই কথা শুনিয়া ভোলানাথ উত্তর দিলেন, "ইহা হইতেই পারে না। একরকম দুইখানা চাদরের মধ্যে একখানা ছোট আর একখানা বড় ইহা কি কখন হইতে পারে?" নির্মলবাবু নিকটেই দাঁড়াইয়াছিলেন, তিনি ভোলানাথকে সমর্থন করিবার জন্য বলিলেন, "এক দোকান হইতে, একই সময়, একই রংয়ের, একই দামের এবং একই রকমের দুইখানা চাদর ক্রয় করা হইয়াছে! তাহার মধ্যে একখানা ছোট অপরখানা বড়, ইহা কি কখন হইতে পারে? দুইখানা আলোয়ানই মাপে সমান।" মা যতই বলিতেছেন, "দুইখানা আলোয়ান কিছুতেই সমান নয়। ভোলানাথের খানা ছোট আর এই শরীরের খানা বড়।" বাবা ভোলানাথ কিছুতেই মায়ের কথা মানিতে রাজী নহেন। যখন এই প্রসঙ্গ লইয়া তাঁহাদের মধ্যে কথা কাটা-কাটি চলিতেছিল তখন আমিও সেখানে উপস্থিত থাকিয়া তাঁহাদের এই লীলা দর্শন করিতেছিলাম। আমি হঠাৎ বলিয়া ফেলিলাম, "সাক্ষাৎ পুত্র বাপ আটকুঁড়ো, এ আবার কেমন কথা। দুইখানা আলোয়ানই যখন এইখানে রহিয়াছে তখন মাপিয়া দেখিলেই তো ঝগড়া মিটিয়া যায়।" এই কথার সঙ্গে সঙ্গে মা ও বাবার শরীর হইতে চাদর দুইখানা খুলিয়া মাপিয়া দেখা গেল, সত্য সত্যই মায়ের চাদরখানা বাবা ভোলানাথের চাদর অপেক্ষা চারি আঙ্গুল বড়। এই ক্ষুদ্র ব্যাপারটিকে নিমিত্ত করিয়া অনেকক্ষণ খুব হাসাহসি ও কৌতুক চলিল।

কি আশ্চর্য! একরকম দুইখানা আলোয়ান, তাহার মধ্যে একখানা বড় আর একখানা ছোট কি করিয়া হয়? স্বীকার করিলাম দুইখানা চাদরের মধ্যে একটু ছোট বড় হইতে পারে। মায়ের খানাই যে বড় তাহা মা জানিলেন কি করিয়া? মা যে সব জানিতে পারেন, ইহা কেমন খেলায় খেলায় প্রমাণ করিয়া দিলেন। তবু আমাদের দৃষ্টি খোলে না। এমনই জড় বুদ্ধি। আমাদের বুদ্ধির এই জড়ত্ব কবে যে ঘুচিবে তাহা মা-ই জানেন! এই ঘটনাটি লোকদৃষ্টিতে যে অতীব সাধারণ তাহাতে কিছুমাত্র

সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহার মধ্যে যে কতখানি অলৌকিকত্ব বর্তমান রহিয়াছে তাহা কি একবার বিচার করিয়া দেখা উচিত নয়!

(নয়)

অনেকদিনের পূর্বেকার কথা বলিতে যাইতেছি। বাবা বিশ্বনাথের পবিত্র কাশীধামে, মা গঙ্গার তটে, শ্রীশ্রীমা তাঁহার আশ্রমে দয়া করিয়া একখানা ঘর দিয়াছেন। ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাস হইতে সেই ঘরেই বাস করিতেছি। এই বৃদ্ধ বয়সে বারাণসী ছাড়িয়া যাইব-ই বা আর কোথায়? যাহার কোথাও স্থান নাই তাহার স্থান বারাণসীতে। বাবা বিশ্বনাথ কাহাকেও ত্যাগ করেন না, তিনি সকলকেই তাঁহার নগরে স্থান দিয়া থাকেন। কাশী স্থান, পতিতপাবনী গঙ্গার তীর, তাই শেষ দিনের অপেক্ষায় বাবা বিশ্বনাথের চরণতলে পড়িয়া আছি। যদি কৃপা করিয়া তিনি তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে একটু স্থান দেন এই ভরসায়ই এখানে পড়িয়া থাকা। আমি বিশ্বাস করি যদি কাশীতে দেহত্যাগ হয় তাহা হইলে পুনরায় মাতৃগর্ভে আসিতে হয় না।

একদিন আমার খুব জ্বর হয়। জ্বরের তাপ অনুমান ১০৩° ডিগ্রী তো হইবেই, বেশীও হইতে পারে। শরীরে, পায়ে, কোমরে এবং মাথায় ভীষণ বেদনা। শুইয়া নিজকৃত প্রারব্ধ কর্মের ফল ভোগ করিতেছি। দিদি গুরুপ্রিয়া দেবী সম্ভবতঃ কাহারও নিকট হইতে আমার জ্বরের সংবাদ পাইয়া রাত্রি নয়টার পর আমাকে দেখিবার জন্য ডাক্তার গোপাল প্রসাদ দাসগুপ্তকে পাঠাইয়া দেন। ডাক্তার গোপাল প্রসাদ শ্রীশ্রীমায়ের একজন বিশিষ্ট ভক্ত ছিলেন। তিনি মাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা-ভক্তি করিতেন পক্ষান্তরে মাও তাঁহাকে স্নেহ ও কৃপা কম করিতেন না। মা কাশী অবস্থান করিলে তিনি মাতৃদর্শনের জন্য প্রায় প্রত্যহই সন্ধ্যার পর আশ্রমে আসিতেন এবং মায়ের সঙ্গে নানা প্রকার কথাবার্তা বলিয়া রাত্রি নয়টায় বাড়ী ফিরিতেন। ইহা ছিল তাঁহার নিত্যকর্ম। ডাক্তার গোপাল প্রসাদের সঙ্গে আমার ১৯২২ খৃষ্টাব্দ হইতে পরিচয় এবং আমিই প্রথম তাঁহাকে মায়ের কাছে নিয়ে আসি।

আমার বেশী জ্বর দেখিয়া ডাঃ দাসগুপ্ত কাগজ-কলম লইয়া ব্যবস্থাপত্র লিখিতে লাগিলেন। আমি তাঁহাকে বলিলাম, "ডাক্তারবাবু! আপনি কষ্ট করিয়া আর প্রেস্‌ক্রিপশন লিখিবেন না কারণ বহুদিন যাবৎ আমি কোন ঔষধ খাইনা।* আমার এই অযৌক্তিক কথায় তিনি একটু রুষ্ট হইয়াই বলিলেন, "যদি ঔষধই আপনি খাইবেন না, তবে আমাকে ডাকা কেন? অসুখও করিবে আর ঔষধও খাইবেন না, ইহার মধ্যে যে কি যুক্তি থাকিতে পারে তাহা আমি বুঝি না।" আমি লজ্জিত হইয়া অতিশয় মোলায়েম করিয়া বলিলাম, "ডাক্তারবাবু! আমি আপনাকে এত রাত্রিতে কষ্ট করিয়া আসিবার জন্য ডাকাইয়া পাঠাই নাই। দিদি হয় তো কাহারও নিকট হইতে আমার জ্বরের কথা শুনিয়া আপনাকে অযথা কষ্ট দিয়াছেন। আমি ইহার জন্য অত্যন্ত লজ্জিত ও দুঃখিত। আপনি আমাকে ক্ষমা করিবেন।" আমার এই কথায় তিনি একটু অসন্তুষ্ট হইয়া চলিয়া গেলেন। ইহাতে তাঁহার অসন্তুষ্ট হইবার সঙ্গত কারণ ছিল। যখন তাঁহার ব্যবস্থামত ঔষধ সেবন করিব না, তখন তাঁহাকে কষ্ট দিয়া এত রাত্রিতে ডাকিবার প্রয়োজন ছিল কি? তিনি চলিয়া যাইবার পর আমি পুনরায় কম্বল মুড়ি দিয়া শয়ন করিয়া শরীরের কষ্টে ও মাথার যন্ত্রনায় ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিলাম। এমন অবস্থায় পীড়া সহ্য করা ছাড়া আর উপায়ই বা কি ছিল?

একটু অধিক রাত্রিতে অকস্মাৎ করুণাময়ী শ্রীশ্রীমা কৃপা করিয়া আমাকে দেখিতে আসিলেন। আমার মনে হয় ডাক্তারবাবুই হয় তো আমার অসুখের কথা বলিয়া থাকিবেন মাকে। নচেৎ মার জানিবার কোন হেতু ছিল না। তিনি ঘরে প্রবেশ করিতেই কেহ

* শ্রীশ্রীমায়ের কাশী আশ্রমে ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯৫০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত শ্রীশ্রীসাবিত্রী মহাযজ্ঞ হইয়াছিল। গায়ত্রীমন্ত্রদ্বারা এক কোটি আহুতির সংকল্প করিয়া এই যজ্ঞ আরম্ভ হয়। মা তাঁহার এই অযোগ্য ও অধম সন্তানকে এই মহাযজ্ঞের যজমান নিযুক্ত করিয়াছিলেন। সেই সময় হইতে ১৯৬৪ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রায় ১৬ বৎসর আমি কোন ঔষধ সেবন করি নাই।

আমাকে বলিলেন, "আপনাকে দেখিতে মা আসিয়াছেন।" এই কথা আমার কানে যাইতেই আমি চকিতের মধ্যে বিছানা ত্যাগ করিয়া খালি গায়ে উঠিয়া দাঁড়াইলাম। বিদ্যুতের আলোর বোতাম (Switch) টিপিয়া দিতেই বাতি জ্বলিয়া উঠিল। সেই আলোকে দেখিলাম স্নেহময়ী মা দয়া করিয়া আমার শিয়রের নিকট দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। মাকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া উঠিতেই তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "শুনিলাম, তোমার নাকি খুব জ্বর হইয়াছে?" আমি উত্তর দিলাম, "হাঁ মা! খুব জ্বর হইয়াছে। সমস্ত শরীরে বেদনা। মাথাও বড় ধরিয়াছে। কোমর ও হাঁটু দুইটা যেন ফাটিয়া যাইতেছে।" আমার কথা শেষ হইতে না হইতেই মা তাঁহার বাঁ হাতের কড়ে আঙ্গুলের ডগাটি দিয়া আমার বুকের মাঝখানটা স্পর্শ করিয়া স্নেহের সহিত বলিলেন, "তাই তো, জ্বর তো বেশীই। শুয়ে পড়ো, শুয়ে পড়ো।" এই কথা বলিয়াই মা ঘর হইতে তাড়াতাড়ি চলিয়া গেলেন। আমিও আর দেরী না করিয়া অবিলম্বে বাতিটা নিভাইয়া কম্বল চাপা দিয়া শুইয়া পড়িলাম।

রাত্রি অনুমান দুইটা কি আড়াইটার সময় ঘাম দিয়া ঐ প্রচণ্ড জ্বর ছাড়িয়া গেল, কোন প্রকার ঔষধ সেবন করিতে হইল না। আমি আমার নিয়মমত রাত্রি চারিটার সময় উঠিয়া গঙ্গাস্নান করিয়া আপন নিত্যকর্মে বসিয়া পড়িলাম। আর জ্বর আসিল না। এই-ভাবে মায়ের পবিত্র স্পর্শে এত অধিক জ্বর ও মাথার ব্যথা যেন কোথায় চলিয়া গেল। পরদিন প্রাতে দেখি আমার শরীর বেশ সুস্থ ও চাঙ্গা। এই ভীষণ জ্বর মায়ের স্পর্শমাত্র বিরাম হইয়া যাওয়া কি সাধারণ কথা, না কম শক্তির পরিচয়? মায়ের স্পর্শ জাদুমন্ত্রের ন্যায় কাজ করিল। ডাক্তার, কবিরাজ কি ঔষধ, পথ্য কিছুরই রোগ সারাইতে প্রয়োজন হয় না—মা একটু খেয়াল করিলে বহু দুরা-রোগ্য ব্যাধি মুহূর্তের মধ্যে দূর করিয়া দিতে পারেন। চাই একটু মায়ের খেয়াল। প্রতিদিন এই রকম ছোটখাট ঘটনার মধ্য দিয়া যে মা কত অলৌকিক বিভূতির পরিচয় দিতেছেন তাহা কি আমরা একটুও লক্ষ্য করি? মা তো সর্বদাই নিজেকে লুক্কায়িত করিয়া

রাখিতে চাহেন কিন্তু ঘটনাচক্রে উহা প্রকাশ হইয়া পড়ে। লীলাময়ী শ্রীশ্রীমায়ের ইচ্ছায়ই হইয়া থাকে আবরণ তাঁহার খেয়ালেই হয় আবরণভঙ্গ। এইভাবে মা নিজেকে লইয়া নিজে কতরূপে খেলা করিতেছেন! মা আমার আজব খেলোয়াড়!

১

আমি কেমন খেলোয়াড়!
আমি দিনে খেলি, রাতে খেলি, আমি খেলি অনিবার,
খেলতে আমার কেউ লাগেনা আর॥
আমি কেমন খেলোয়াড়!

২

খেলি আমি নিজের সাথে, খেলি আমি আপন মনে,
খেলি আমি সঙ্গোপনে।
খেলতে আমার কেউ লাগেনা আর॥
আমি কেমন খেলোয়াড়!

৩

খেলায় হারি আমি, খেলায় জিতি আমি
আমি খেলি চিরকাল।
খেলতে আমার কেউ লাগেনা আর॥
আমি কেমন খেলোয়াড়!

৪

খেলি আমি খেলার তরে, আমার খেলার বিচার কেবা করে,
দেখ, খেলা আমার কেমন চমৎকার।
খেলতে আমার কেউ লাগেনা আর॥
আমি কেমন খেলোয়াড়।

৫

খেলা আমি, খেলি আমি, খেলার দ্রব্য আমি, ভূমি আমি,
খেলার সময় আমি, খেলার সাথী আমি তার।
খেলতে আমার কেউ লাগেনা আর॥
আমি কেমন খেলোয়াড়!

৬

সদা খেলি আমি নূতন খেলা, খেলা আমার হয় না সারা,
আমার খেলা ভরা সারাটা সংসার।
খেলতে আমার কেউ লাগেনা আর ॥
দেখ, আমি কেমন খেলোয়াড় !

৭

তোরা দেখবি যদি আমার খেলা, ছুটে আয়না থাকতে বেলা,
খেলা দেখে সবে তোরা হবি চমৎকার।
খেলতে আমার কেউ লাগেনা আর ॥
আমি আজব খেলোয়াড় !

(দশ)

মাহাযাগিনী পরমেশ্বরী শ্রীশ্রীমায়ের যে অলৌকিক যোগৈশ্বর্যের বা বিভূতির কথা এখন লিখিতে যাইতেছি সেটি আমি নিজে দেখি নাই সত্য, কিন্তু ইহা আমি স্বয়ং মায়ের মুখকমল হইতে শুনিয়াছি বলিয়াই এখানে উল্লেখ করিতে সাহস করিতেছি, নতুবা ইহা সর্বসাধারণের নিকট প্রকাশ করিবার বিষয় নহে। মানবের অবিশ্বাসযোগ্য ঘটনা সত্য হইলেও উহা জনসাধারণের নিকট প্রকাশ করিতে নাই। কারণ উহার প্রকৃত মর্যাদা সকলে দিতে পারে না। তবে যে এখানে লিপিবদ্ধ করিতেছি তাহার কারণ আমি যদি ঘটনাটি না প্রকাশ করি তাহা হইলে এমন সুন্দর বিষয়টি চিরকালের জন্য লোপ হইয়া যাইবে। কারণ ইহা আমি ব্যতীত অপর কেহ জানে বলিয়া মনে হয় না। অকস্মাৎ মায়ের শ্রীমুখ হইতে ইহা নিঃসৃত হইয়াছিল, সেই জন্য আমি ইহা অবগত হইবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলাম। নচেৎ ইহা মা কখনও কাহার নিকট বলিতেন কিনা সেই বিষয় যথেষ্ট সন্দেহের হেতু রহিয়াছে।

গত ১৯৫৮ খৃষ্টাব্দের শুভ জন্মোৎসবের পর পরমারাধ্যা বিশ্ব-জননী শ্রীশ্রীমা গরমের সময় সোলন গিয়াছেন। বলা বাহুল্য বাঘাট-নরেশ শ্রীদুর্গা সিংজীর বিশেষ আগ্রহেই মায়ের সোলন

যাওয়া হইয়াছে। মায়ের অবস্থানের জন্য পাকাপাকি সুব্যবস্থা রাজা শ্রীদুর্গা সিংজী তাঁহার বাসস্থানের নিকটই করিয়া রাখিয়াছেন। তিনি অতিশয় আস্তিক ও ধর্মপরায়ণ এবং মায়ের একজন অতি পুরাতন ভক্ত। তিনি মাকে তাঁহার ইষ্টদেবীর ন্যায় সম্মান ও পূজা করিয়া থাকেন। ইহা বলা নিষ্প্রয়োজন মায়ের সর্বপ্রকার ব্যবস্থা রাজাসাহেবই করেন। মায়ের সঙ্গে আমরা অনেকেই গ্রীষ্মকালে শৈলাবাসে গিয়াছি। পরম স্নেহময়ী মা রাজাসাহেবকে আদর করিয়া নাম দিয়াছেন "যোগিরাজ" কারণ তাঁহার পূর্বপুরুষের মধ্যে কেহ একজন অতি উচ্চস্তরের যোগী ছিলেন। তিনিই শ্রীদুর্গা সিং হইয়া পুনরায় জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। মায়ের সন্তানগণ প্রায় সকলেই তাঁহাকে অতি আদর ও সম্মানের সহিত "যোগীভাই" ডাকিতেন।

শ্রীশ্রীমা মধ্যাহ্নের ভোগের পর তাঁহার নির্দিষ্ট ঘরখানিতে পালঙ্কের উপর বিশ্রাম করিতেছেন। সাধারণতঃ তাঁহার বিশ্রামের সময় কেহই তাঁহার ঘরে থাকে না। বৈকাল অনুমান পাঁচটা কি সাড়ে পাঁচটার সময় মা তাঁহার ঘরের পূর্বদিকের প্রশস্ত লম্বা বারান্দায় পায়চারি করিতেছেন। মায়ের ঘরের পাশেই আমি থাকিতাম। মা একা একা হাঁটিতেছেন দেখিয়া আমিও পার্শ্বের ঘর হইতে বাহির হইয়া তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিতেছি। তিনি কথায় কথায় আপন খেয়ালে দয়া করিয়া সহসা বলিয়া ফেলিলেন, "আজ যদি বেলা তিনটা ও চারিটার মধ্যে এই শরীর (নিজেকে লক্ষ্য করিয়া) যে ঘরে থাকে সেই ঘরে তোমরা কেহ যাইতে তাহা হইলে এই শরীরটাকে সেখানে পাইতে না। এমন কি এই শরীর যে খাটে শুইয়াছিল সেই খাট, বিছানা, বালিশ কিছুই দেখিতে না।" আমি মায়ের মুখে এই কথা শুনিয়া মাকে প্রশ্ন করিয়া জানিলাম, শ্রীশ্রীমা তাঁহার এই স্থূল শরীরটি লইয়া কোনও স্থানে চলিয়া গিয়াছিলেন। সাধারণতঃ দেখা যায় মা আপন অলৌকিক শক্তির পরিচয় কখনও কাহার কাছে ব্যক্ত করেন না বরং উহা গোপনই রাখেন। আজ কি জানি কেন যেন ইহা এইভাবে প্রকাশ করিয়া ফেলিলেন। আমার মনে হয় আমার সৌভাগ্যই আজ শ্রীশ্রীমায়ের

মুখকমল হইতে ইহা অকস্মাৎ বাহির করিয়াছে নচেৎ এই অলৌকিক ঘটনা কখনও জগতে প্রকাশিত হইত না।

যোগেশ্বরী শ্রীশ্রীমা তো সূক্ষ্মে এমন কত জায়গাই গমন করিয়া থাকেন তাহাতে আশ্চর্য হইবার এমন কিছু নাই, কিন্তু এই রক্ত মাংসের স্থূলদেহ কোথায়ও এইরূপে সকলের চোখের অন্তরালে চলিয়া যাইবার সংবাদ আজ আমি মায়ের মুখে প্রথম শুনিলাম। মায়ের অসংখ্য ভক্তদের মধ্যে কেহ এই জাতীয় মায়ের স্থূলশরীর লইয়া লোকান্তরে গমনাগমনের কথা শুনিয়াছেন কিনা বলিতে পারি না। অন্ততঃপক্ষে এই সংবাদ আমি কাহারও নিকট হইতে শ্রবণ করি নাই।

আমি—আচ্ছা মা! তুমি না হয় তোমার এই অপ্রকৃত চিন্ময় দেহ লইয়া লোক লোকান্তরে গমনাগমন করিতে পার স্বীকার করিলাম! কিন্তু এই জড় পদার্থ খাট, বিছানা, বালিশ ইত্যাদি কেমন করিয়া অন্যত্র গেল? ইহা তো বুদ্ধিতে আসে না।

মা—তোমাদের কি যে বুদ্ধি! এইটুকুও বুঝিতে পার না। এই শরীরের সঙ্গে যখন পরার কাপড়খানা, গায়ের জামাটা কি চাদরখানা চলিয়া যাইতে পারে, তখন খাট, বিছানা, বালিশ যাইতে আপত্তি কি? এই শরীরের (নিজেকে লক্ষ্য করিয়া) সঙ্গে যখন একসের ওজনের জিনিস যাইতে পারে তখন এক মণ কি দশ মণ ওজনের জিনিষ যাইতেই বা বাধা কি? এই শরীরের সংস্পর্শে যাহা ছিল সবই চলিয়া গিয়াছিল।

উচ্চ-স্তরের যোগীদের সম্বন্ধে এমন অনেক কথাই শোনা যায় যে তাঁহারা স্থূলদেহ লইয়া যত্র তত্র আকাশমার্গে যাতায়াত করেন কিংবা গমন না করিয়াও অন্যত্র আবির্ভূত হইতে পারেন। কিন্তু এই রকম খাট, বিছানা, বালিশ জড়পদার্থ লইয়া যাওয়া-আসার কথা শ্রীশ্রীমায়ের মুখ হইতে অদ্য আমি প্রথম শ্রবণ করিলাম।*

* পরম শ্রদ্ধেয় মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতপ্রবর শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ মহাশয়ের নিকট শুনিয়াছি Madam Blavasky র সহিত দেখা করিতে কোন এক মহাযোগী তাঁহার আশ্রম সঙ্গে নিয়া আসিতেন। জ্ঞানেশ্বর মহারাজের জীবনীতে পড়িয়াছি তিনি এক প্রাচীরের উপর বসিয়া সেই প্রাচীরসহ যোগী চাঁগনাথের সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছিলেন। যোগীরা না পারে এমন কার্য নাই।

আমাকে একটু আশ্চর্যান্বিত হইতে দেখিয়া মা বলিলেন, "ইহাতে আশ্চর্য হইবার কি আছে ? শ্রীমদ্ভাগবতে এই রকম একটি ঘটনা তোমরা পাও না ?" ইহা মায়ের মুখ হইতে শ্রবণ করিবার সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে পড়িল। মহাযোগীশ্বর শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র অনিরুদ্ধকে বাণ রাজার কন্যা উষা স্বপ্নে দর্শন করিয়া তাঁহাকে পতিরূপে বরণ করেন। তাঁহার প্রিয় সখী চিত্রলেখা পরম যোগিনী ছিলেন। তিনি আকাশপথে দ্বারকায় গমন করিয়া দেখিতে পাইলেন অনিরুদ্ধ সুরক্ষিত রাজপ্রাসাদে সুন্দর পর্যঙ্কোপরি সুখে শয়ন করিয়া আছেন। যোগিনী চিত্রলেখা স্বীয় যোগসিদ্ধির দ্বারা অনিরুদ্ধকে পালঙ্কসমেত দ্বারকা হইতে শোণিতপুরে শূন্য-মার্গে আনয়ন করিয়া আপন প্রিয় সখী উষাকে তাঁহার প্রিয়তমের দর্শন করাইয়াছিলেন।

তত্র সুপ্তং সুপর্যঙ্কে প্রাদ্যুম্নিং যোগমাস্থিতা।
গৃহীত্বা শোণিতপুরং সখ্যৈ প্রিয়মদর্শয়ৎ ॥ ১০।৬২।২৩

যোগসিদ্ধ ব্যক্তিই যখন অপর একজনকে এক স্থান হইতে অন্যস্থানে স্থূলে জড়বস্তু পর্যঙ্ক সহিত লইয়া যাইতে পারেন তখন মহাযোগেশ্বরী শ্রীশ্রীমাতা আনন্দময়ী স্বয়ং স্থূলে জড়পদার্থসমূহ (পালঙ্ক, শয্যা, উপাধানাদি) সঙ্গে করিয়া যে গমনাগমন করিতে পারেন বা করেন ইহা বিশ্বাস না করিবার হেতু কি ? যোগসিদ্ধ ব্যক্তির অসীম শক্তি। পরমযোগী ও ঈশ্বরে কোন পার্থক্য নাই। লৌহপিণ্ড অগ্নির মধ্যে রাখিলে উহাতে যেমন অনলের সমস্ত গুণ বর্তায় তদ্রূপ যোগী ঈশ্বরের সহিত নিত্যযুক্ত থাকিবার নিমিত্ত ঈশ্বরের সকল গুণ বা ঐশ্বর্য তাঁহাতে অর্থাৎ যোগীতে অর্সায়। ঈশ্বর যেমন সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় করিতে পারেন যোগীও সেই রকম সব করিতে সক্ষম। ঈশ্বর সম্বন্ধে ভগবান্ মহর্ষি পতঞ্জলি তাঁহার যোগদর্শনের সমাধিপাদে বলিতেছেন—

ক্লেশকর্মবিপাকাশয়ৈরপরামৃষ্টঃ পুরুষবিশেষ ঈশ্বরঃ ॥

ক্লেশ অর্থাৎ অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ, কর্ম অর্থাৎ ধর্ম ও অধর্ম, বিপাক অর্থাৎ জন্ম, আয়ু ও ভোগ এবং আশয়

অর্থাৎ অনুকূল বা প্রতিকূল বাসনা হইতে নিত্যমুক্ত বিশেষ পুরুষই ঈশ্বর। অপরোক্ষ পরম জ্ঞানীর পক্ষেও এই কথা প্রযুজ্য। এই জন্যই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতায় প্রিয় সখা ও শিষ্য অর্জুনকে বলিতেছেন, "তস্মাদ্যোগী ভবার্জুন"। হে অর্জুন! তুমি যোগী হও। যোগীর এতই মহিমা। যোগীর পক্ষে কিছুই অসম্ভব নহে।

শ্রীশ্রীমায়ের দয়ায় পরম কারুণিক শ্রীবুদ্ধদেবের বুদ্ধগয়ায় অবস্থিতির প্রত্যক্ষ প্রমাণ

শ্রীবিনয়ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীশ্রীমায়ের অতি পুরাতন ভক্ত। মা যখন ঢাকায় থাকিতেন তখন হইতেই তিনি নিয়মিতভাবে মায়ের কাছে যাতায়াত করিতেন এবং তাঁহার প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হইয়া পড়েন। মাও বিনয়বাবুকে যথেষ্ট স্নেহ ও কৃপা করিয়া থাকেন। তিনি নিতান্তই ভাল মানুষ এবং মায়ের করুণা পাইবার উপযুক্ত পাত্র। তিনি বহুকাল যাবৎ অতিশয় নিষ্ঠার সহিত সাধন-ভজন করিয়া আসিতেছেন। তিনি প্রকৃতই একজন আদর্শ গৃহস্থ ও ধর্ম ভীরু আস্তিক ব্রাহ্মণ।

একবার যখন মায়েব কাশী আশ্রমে "ভাগবত-সপ্তাহ" পারায়ণ হইতে ছিল তখন তিনি তাহাতে একজন ব্রতী ছিলেন। এই সাত্ত্বিক সুন্দর অনুষ্ঠানটি বিনয়বাবুর অত্যন্ত ভাল লাগিয়াছিল। তিনি মায়ের চরণে নিবেদন জানাইলেন, মায়ের উপস্থিতিতে তিনি তাঁহার গর্ভধারিণীকে এইভাবে শ্রীমদ্ভাগবত শুনাইতে ইচ্ছা করেন। এ জাতীয় শুভ ধর্মকার্যে মায়ের সমর্থন ও উৎসাহের কখনও অভাব দেখা যায় না। বিনয়বাবু নিবেদন করিলেন—১৯৫৬ খৃষ্টাব্দের শারদীয়া শ্রীশ্রীদুর্গাপূজার সময় তাঁহার কলিকাতার বাড়ীতে "ভাগবত সপ্তাহ" পারায়ণ হইবে এবং সেই সময় মাকে সেখানে দয়া করিয়া উপস্থিত থাকিয়া যাহাতে কার্যটি সুসম্পন্ন হয় মায়ের চরণে আশীর্বাদ প্রার্থনা করিলেন। করুণাময়ী শ্রীশ্রীমা কৃপা করিয়া তাঁহার নিমন্ত্রণ সহর্ষে স্বীকার করায় তিনি কৃতকৃত্য হইলেন। বিনয়বাবুর "রথ দেখা ও কলা বেচা" দুই-ই এক সঙ্গে হইয়া গেল—ভাগবত-সপ্তাহ ও দুর্গাপূজা দুই অনুষ্ঠানেই মায়ের ঐ বাড়ী থাকা হইবে। প্রকৃত ভক্তের আন্তরিক প্রার্থনা কি ভগবান্ মঞ্জুর না করিয়া থাকিতে পারেন! মা যে আমাদের ভক্ত-বাঞ্ছা-কল্পতরু।

পরামর্শ হইয়াছিল কাশী আশ্রম হইতে পূর্বে মায়ের সঙ্গী অধিকাংশ লোক বিনয়বাবুর বাড়ী যাইবেন। পরে মা অল্প কয়েকজনকে সঙ্গে লইয়া কলিকাতা যাত্রা করিবেন। কিন্তু ঘটনাচক্রে সকলেরই এক সঙ্গে রওয়ানার ব্যবস্থা হইল। ইহা মায়ের খেয়ালে হয় নাই, ইহা হইয়াছিল কর্মকর্তাদের ইচ্ছা মত। তাঁহাদের বাসনা সকলেই মায়ের সঙ্গে যায়। মার সঙ্গে যাইতে কাহার না অভিলাষ হয়! অমৃতে কি কাহারও কখন অরুচি হয়! মা যে আমাদের অমৃতময়ী, মধুময়ী!

শ্রীশ্রীমা বারাণসী হইতে আশ্বিন মাসের কৃষ্ণা ত্রয়োদশীর দিন বৈকাল চারি ঘটিকার সময় দেহরাডুন এক্সপ্রেসে ব্যবস্থাপকদের ব্যবস্থা মত সকলের সঙ্গে কলিকাতা চলিলেন। গাড়ীতে উঠিয়াও যতটা আমার মনে পড়ে মা একবার বলিয়াছিলেন তাঁহার খেয়াল ছিল মাত্র অল্প কয়েকজন তাঁহার সঙ্গে যায়। এত লোক সঙ্গে লইয়া যাবার মোটেই মায়ের ইচ্ছা বা খেয়াল ছিল না। মায়ের গাড়ী যখন ডেহরী-অন-সোন (Dehari-on-Sone) কিংবা সোন-ইষ্ট-ব্যাঙ্ক (Sone-East-Bank) স্টেশনে আসিয়া পৌঁছিল তখন হঠাৎ দেখা গেল মায়ের কামরার সম্মুখ দিয়া হন হন করিয়া বেগে তিনুবাবু যাইতেছেন। এই তিনুবাবু হইলেন মায়ের অতি পুরাতন ভক্ত রায় বাহাদুর শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের কনিষ্ঠ সহোদর ৺উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র। মাকে হঠাৎ দেখিতে পাইয়া তিনি মায়ের কামরায় উঠিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া দাঁড়াইতেই মা তিনুবাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন—তুমি যে এখানে? তুমি কোথায় থাক!

তিনুবাবু—মা! আমি গয়ায় থাকি। রেলে চাকুরী করি, তাই প্রত্যহ এখানে আসিতে হয়। কাজকর্ম সারিয়া রোজ এই সময় গয়ায় বাড়ী ফিরিয়া যাই।

মা—তুমি এখন কি গয়ায় যাইতেছ?

তিনুবাবু—হাঁ মা! আমি এই গাড়ীতেই গয়ায় যাইতেছি।

মা—এই গাড়ী গয়া স্টেশনে কখন পৌঁছিবে?

তিনুবাবু—রাত্রি সাড়ে আটটায়।

মা—তোমার বাড়ীতে কি কোন খোলা জায়গা আছে ?

তিন্নুবাবু—হাঁ মা ! রেলওয়ের খুব বড় কোয়ার্টার (Quarters)। সঙ্গে বাগান ও খোলা জায়গাও অনেক আছে।

মা—এই শরীরকে (নিজেকে লক্ষ্য করিয়া) তোমার বাড়ী লইয়া যাইবে কি ?

তিন্নুবাবু—খুব আনন্দের সহিত তোমাকে আমার বাড়ী লইযা যাইব। তোমার পায়ের ধূলা আমার বাড়ীতে পড়িলে আমি কৃতার্থ হইয়া যাইব। আমার বাড়ী পবিত্র হইবে। আমার কোয়ার্টার স্টেশনের কাছেই। চল না মা, আমার বাড়ী। এই সব কথাবার্তা বলিতে বলিতেই গাড়ী ছাড়িয়া দিল। তিন্নুবাবু মায়ের কামরাতেই রহিয়া গেলেন। নামিতে পারিলেন না।

শ্রীশ্রীমায়ের সঙ্গে দিদিমা (মায়ের গর্ভধারিণী), বুনি, উদাস, বিমলাদি, শোভাদি, সতী, মামু (যতুনাথ ভট্টাচার্য, মায়ের কনিষ্ঠ সহোদর), বিভু, দাস্থু প্রভৃতি আশ্রমবাসী অনেক ভ্রাতা-ভগ্নীরা কলিকাতা চলিয়াছেন। কাশী হইতে মনোমোহনদা'র (শ্রীমনোমোহন ঘোষ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত স্থাপত্য পরিদর্শক বা ইঞ্জিনিয়ার) স্ত্রী মায়ের জন্য নিজের হাতে মালপোয়া তৈয়ার করিয়া দিয়াছিলেন, তাহাই সন্ধ্যার পূর্বে মাকে একটু খাওয়াইয়া দেওয়া হইল। তিন্নুবাবু মায়ের প্রসাদ পাইলেন। আমিও মায়ের কামরায় ছিলাম। মা বলিলেন, "তোমরা সকলে এই গাড়ীতেই সোজা কলিকাতা চলিয়া যাও। এই শরীর তিন্নুর সঙ্গে গয়া নামিযা যাইবে। নারায়ণ, উদাস, সতী ও দাস্থু এই শরীরের সঙ্গে থাকিবে। তোমরা কলিকাতা গিয়া সকলকে বলিও, "মা এই গাড়ীতেই আসিতেছিলেন হঠাৎ গয়ায় নামিয়া পড়িয়াছেন, পরে আসিবেন।" এই প্রস্তাব মাযের মুখে শ্রবণ করিয়া উপস্থিত প্রায় সকলেরই মুখ ম্লান হইয়া গেল। শোভাদি কিছুতেই মাকে ছাড়িয়া কলিকাতা যাইবেন না। মায়ের মুখে এই কথা শুনিয়া তিনি তো কাঁদিয়া কাটিয়া অস্থির। তিনি এখান হইতেই কাশী ফিরিয়া যাইবেন তাহাও স্বীকার তথাপি তিনি মাকে ছাড়িয়া কদাপি কলিকাতা যাইবেন না। এই কথা বলিয়া তিনি একদম বাঁকিয়া বসিলেন,

কলিকাতা যাইবেন না। ইহাদের শ্রীশ্রীমায়ের প্রতি আকর্ষণ দেখিয়া বাস্তবিকই আশ্চর্য হইতে হয়। ধন্য ইহাদের জীবন! মাকে দেখিয়া এবং তাঁহার সঙ্গ করিয়া ইহাদের আশা যেন আর মেটে না! মা শোভাদিকে অনেক করিয়া বুঝাইয়া সুঝাইয়া রাজী করিতেই দেহরাদুন এক্সপ্রেস রাত্রি সাড়ে আটটায় গয়া স্টেশনে আসিয়া পৌঁছিল। মা অতিশয় ক্ষিপ্রতার সহিত আমাদের চারিজনকে সঙ্গে লইয়া তিনুবাবুর সহিত গাড়ী হইতে নামিয়া পড়িলেন। লক্ষ্য করিবার বিষয়, কেমন যোগাযোগ সংঘটিত হইয়া মায়ের খেয়াল এইরূপে পূর্ণ হইয়া গেল! তাঁহার কথার ব্যতিক্রম হইতে বড় দেখা যায় না! পরমেশ্বরের ইচ্ছাশক্তির সহিত আপন ইচ্ছা সংযোগ করিয়া দিতে পারিলে তাহা পূর্ণ না হইয়া যায় না। পরমেশ্বরের সহিত যুক্ত হইয়া যে ইচ্ছা তাহা পরমেশ্বরের ইচ্ছাই জানিতে হইবে—তাহা অমোঘ অর্থাৎ অব্যর্থ, ফলপ্রসূ হইবেই। তিনুবাবু আমাদের টিকিট লইয়া স্টেশন মাষ্টারের সঙ্গে দেখা করিয়া আমরা যে এখানে যাত্রাবিরতি করিলাম তাহা লিখাইয়া লইয়া আসিলেন। মাকে লইয়া আমরা চারিজন স্টেশনের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলাম। তিনি মোটর লইয়া আসা পর্যন্ত আমরা সকলে অপেক্ষা করিতে লাগিলাম।

মা—এখনও তো রাত বেশী হয় নাই। এত তাড়াতাড়ি তিনুর বাড়ী গিয়া কি হইবে?

আমি—তাহা হইলে এখন কোথায় যাইবে?

মা—তুমিই বল না কোথায় যাইবে?

আমি—বেশ তো, চল না মা, আমরা বুদ্ধগয়া দেখিয়া আসি। সেখানে বুদ্ধদেব কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন। বুদ্ধগয়া একটি ঐতিহাসিক স্থান। পৃথিবীর বহু লোক এইস্থান দেখিতে আসে। এই প্রসিদ্ধ স্থানটি আমরা কেহই দর্শন করি নাই।

মা—বেশ, সেখানেই চল।

এই সব কথা বলিতে বলিতেই তিনুবাবু একখানি ট্যাক্সি লইয়া আসিলেন। পাঞ্জাবী ট্যাক্সি-চালকটি তিনুবাবুর পরিচিত, খুব ভাল মানুষ ও অতি ভদ্র। আমাদের বুদ্ধগয়া দেখাইয়া আনিবার জন্য

তাহাকে বলা হইল। সর্দারজীর গাড়ী আমাদের লইয়া বুদ্ধগয়ায় ছুটিল। এইখানেই ত্যাগের প্রতিমূর্তি, পরম কারুণিক, কঠোর তপস্বী, রাজার পুত্র সিদ্ধার্থ, বোধিবৃক্ষের তলায়, "মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পতন" এই প্রতিজ্ঞা বা সঙ্কল্প করিয়া সাধনায় বসিয়াছিলেন। সাধনার দ্বারা যে কত উচ্চস্তরে মানব উঠিতে পারে তাহা জগৎকে দেখাইয়া গিয়াছেন ভগবান্ শ্রীগৌতম বুদ্ধ। তিনি ঘোষণা করিয়াছিলেন, "জগতে একটি জীবও অমুক্ত থাকিতে আমি পরিনির্বাণ বা মোক্ষ গ্রহণ করিব না।" সংসারের দুঃখ, বেদনা দেখিয়া তথাগতের হৃদয় দ্রবীভূত হইয়াছিল। তিনি তত্ত্বালোচনা ও বিচার হইতে তপস্যা ও সাধনার উপর বিশেষ আস্থাবান্ ছিলেন।

রাত্রি প্রায় নয় ঘটিকায় শ্রীশ্রীমায়ের সঙ্গে আমরা সেই শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষের পরম পবিত্র সাধনক্ষেত্র দর্শন করিতে চলিয়াছি। অতি সুন্দর, চমৎকার রাস্তা। সারা পথটি বিদ্যুতের আলোতে আলোকিত, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও রাত্রি বলিয়া জন-মানব শূন্য। গাড়ীর চলাচলও তখন বন্ধ হইয়া গিয়াছে। অতি শান্তভাবে আমরা পরমারাধ্যা শ্রীশ্রীবিশ্বজননীর সঙ্গে পৃথিবীর একজন মহামনীষীর তপস্যার স্থান দেখিতে চলিয়াছি। শ্রীশ্রীমাকে বলিতে শুনিয়াছি, "তীর্থস্থান, দেবতার বিগ্রহ ও সাধু-মহাত্মাদের দর্শন করিতে যাইতে হয় শ্রদ্ধা ও শুদ্ধভাব লইয়া, তাহা হইলেই তাঁহাদের প্রভাব হৃদয়ঙ্গম করা যায়। নচেৎ যাতায়াতের পরিশ্রমই সার হয়।"

রাত্রি অনুমান দশটার সময় আমরা শাক্যসিংহ সিদ্ধার্থের সাধনার স্থান বুদ্ধগয়ায় উপনীত হইলাম। সেই ইতিহাস প্রসিদ্ধ বটবৃক্ষের তলা, যেখানে বসিয়া তিনি বুদ্ধত্ব বা সম্যক্প্রকারে উদ্বোধিত হইয়াছিলেন। প্রায় আড়াই হাজার বৎসর পূর্বে, গৌতমবুদ্ধ এখানেই করিয়াছিলেন সিদ্ধিলাভ। পরদুঃখে কাতর হইয়া বিশ্বের সর্বজীবের কল্যাণের জন্য তিনি কঠোর সাধনা করিয়াছেন, তাঁহার ত্যাগ, তপস্যা, বৈরাগ্য ও পরদুঃখকাতরতাই তাঁহাকে সংসারে অমর করিয়া রাখিয়াছে। তাঁহার সেই সাধনার ক্ষেত্রে, ধ্যানের স্থানটিতে, যেখানে উপবেশন করিয়া তিনি সিদ্ধিলাভ

করিয়াছিলেঁন, সেইখানে একটি সুন্দর মন্দির নির্মাণ করিয়া তাঁহার স্মৃতি রক্ষা করা হইয়াছে। এখানে আসিলেই, ইহা প্রকৃত সাধকদের স্মরণ করাইয়া দেয়, কি ভাবে শুদ্ধ সঙ্কল্প লইয়া হিমালয় পর্বতের ন্যায় অচল অটল হইয়া সাধনায় বসিতে হয়। গৌতমবুদ্ধ সাধনায় বসিবার পূর্বে প্রতিজ্ঞা করিলেন, "ইহাসনে শুষ্যতু মে শরীরং, ত্বগস্থি মাংসং প্রলয়ং মে যাতু।" বুদ্ধের মহাবাণী —"সকল প্রাণী সুখী হউক, শত্রুহীন হউক, অহিংসা পরায়ণ হউক, সুখী আত্মা হইয়া কাল হরণ করুক। সকল প্রাণী আপন যথালব্ধ সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত না হউক।"

মা যেমন একটি মাত্র পুত্রকে নিজের আয়ু দিয়া রক্ষা করেন, সমস্ত প্রাণীতে সেই প্রকার অপরিমিত ভালবাসা পোষণ করিবে।" "সব্বে সত্তা সুখিতা হোন্তু, অব্যাপজ্‌ঝা হোন্তু, সুখী অত্তানং পরিহরন্তু, সব্বে সত্তা মা যথানদ্ধ সম্পত্তিতো বিগচ্ছন্তু।" "মাতা যথা নিযং পুত্তং আয়ুসা একপুত্তমনুরক্‌খে, এবংপি সব্বভূতেষু মানসং ভাবয়ে অপরিমাণং।"

পরম স্নেহময়ী মহাশক্তিরূপিণী শ্রীশ্রীমায়ের সঙ্গে সেই অতি পবিত্র স্থানে কিছুক্ষণ আমরা শান্তভাবে মৌন হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। অত রাত্রিতে ধারে কাছে সে সময় কোন লোকজন ছিল না। অকস্মাৎ অতিশয় মনোহর এক সুন্দর মৃদু গন্ধ আমরা সকলেই পাইলাম। গন্ধটি কিন্তু সাধারণ গোলাপচাঁপা, যুঁই বেলা, চামেলী বকুল, হেনা, গন্ধরাজ, মালতী, শেফালী কি রজনী-গন্ধার মত কোন পরিচিত সুবাস নহে। ইহা ছিল এক অপূর্ব দিব্য গন্ধ। এই গন্ধের সহিত আমাদের জানা কোন গন্ধের তুলনা হয় না। সন্ধান করিয়া দেখা গেল নিকটে কোন ফুলের বাগানও নাই। তবে এখানে এমন মনোমুগ্ধকর সুবাস আসিল কোথা হইতে? আমরা ইহার কোন কারণ নির্ণয় বা আবিষ্কার করিতে না পারিয়া অবশেষে মাকেই জিজ্ঞাসা করিলাম, "মা! এই রকম সুন্দর গন্ধ কোথা হইতে আসিতেছে? এই গন্ধ কিসের?" আমাদের জিজ্ঞাসার উত্তরে মা বলিলেন, "যাঁহার স্থানে আসিয়াছ তিনিই দয়া করিয়া তাঁহার উপস্থিতি এইভাবে জানাইয়া দিলেন।"

যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা সেখানে ছিলাম ততক্ষণ পর্যন্ত তো সেই গন্ধ পাইলামই, এমন কি সেই স্থান হইতে ট্যাক্সিতে ফিরিয়া আসিবার পথেও প্রায় মাইলখানেক রাস্তা পর্যন্ত সেই গন্ধ পাওয়া গিয়াছিল। এইরূপ গন্ধ কি সকলেই এখানে আসিলে পায়? আমরাও যদি মায়ের সঙ্গে না আসিয়া স্বতন্ত্রভাবে এখানে আসিতাম, তাহা হইলেও কি এই মনোহর সুবাস আমরা পাইতাম? আমার তো মনে হয় ইহা আমাদের মহাশক্তিরূপিণী শ্রীশ্রীমায়েরই মহিমা। তাঁহারই কৃপায় ইহা সম্ভব হইয়াছে।

সেখান হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া যখন আমরা তিনুবাবুর কোয়ার্টারের দিকে আসিতেছিলাম তখন মা সহসা জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখান হইতে শ্রীবিষ্ণুপাদপদ্মের মন্দির কত দূর?"

তিনুবাবু—এখান হইতে মন্দির খুব বেশী দূর নয়? তবে আমরা একটু আগাইয়া আসিয়াছি। মন্দিরে যাইবে নাকি?

মা—বেশ তো চল না।

ট্যাক্সি-চালক সর্দারজীকে বলাতে সে গাড়ী ফিরাইয়া একটু পরেই আমাদের মন্দিরের নিকট নামাইয়া দিল। মায়েয় সঙ্গে যখন আমরা মন্দিরে পৌঁছিলাম তখন রাত্রি হইবে অনুমান এগারটা। একজন পাণ্ডা আমাদের মন্দিরের ভিতর লইয়া গেল। অত রাত্রিতে মন্দিরে লোকজনের ভিড় মোটেই ছিল না। মায়ের সঙ্গে আমরা পাঁচজন এবং পাণ্ডাদের মধ্যে দুই চারিজন আরও হইবে। মন্দিরের মাঝখানটা চাঁদির রেলিং দিয়া ঘেরা গহ্বর। এই গহ্বরের মধ্যেই ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর দুইখানি শ্রীপাদপদ্ম। ইহাই শ্রীগদাধরের শ্রীপাদপদ্ম বলিয়া বিখ্যাত। এই চরণপদ্মের উপরই শ্রদ্ধাবান্ সনাতনধর্মাবলম্বিগণ পিতৃপুরুষের সদ্গতির জন্য ভক্তি ও বিশ্বাসের সহিত পিণ্ডদান করিয়া থাকেন। শ্রীশ্রীভগবানের চরণ দুইখানি চন্দন ও গোলাপ ফুলের পাঁপড়ি দিয়া অতি পরিপাটির সহিত সুন্দর করিয়া সাজান হইতেছিল। এই শ্রীপাদপদ্মের চারিদিকের সম্পুর্ণ কুণ্ডটি সবুজ তাজা তুলসীদলে পুরু করিয়া বিন্যস্ত ছিল। সবুজ পশ্চাদ্ভূমির উপর গোলাপের পাঁপড়ি দিয়া অতিশয় নিপুণতার সহিত সুসজ্জিত চরণ দুইখানি যে কি সুন্দর লাগিতেছিল তাহা না

দেখিলে কেহ ধারণা করিতে পারিবেন না। গদাধরের পাদপদ্মের উপর রাখা হইয়াছিল রৌপ্য নির্মিত একটি বড় অনন্তনাগ। তিনি তাঁহার অনন্তফণা বিস্তার করিয়া ছায়া করিয়াছিলেন চরণ দুই-খানিকে। সে যে কি মনোমুগ্ধকর অপূর্ব দৃশ্য তাহা কেবল অনুভব করিবারই বিষয়, ভাষায় ব্যক্ত করিবার নহে! গভীর নিশুতি মহানিশায় বিশ্বজননী শ্রীশ্রীমায়ের সঙ্গে এই চিত্তাকর্ষক পরিবেশের মধ্যে চঞ্চল মনটা যেন স্বতঃই স্থির ও শান্ত হইয়া আসিতেছিল।

পাণ্ডা ও মোটর-চালকের তাগিদ না থাকিলে আরও কিছু সময় সেখানে অবস্থান করা যাইতে পারিত। আমার তো সেই সময় কেবলই মনে হইতেছিল আমাদের উপর কৃপা করিবার জন্যই করুণাময়ী শ্রীশ্রীমা দয়া করিয়া এমনভাবে অকস্মাৎ গয়ায় নামিয়া পড়িয়াছেন। তাহা না হইলে এই সব দেখিবার এবং অনুভব করিবার সুযোগ ও সৌভাগ্য জীবনে আমরা কখনও প্রাপ্ত হইতাম কিনা সন্দেহ। মায়ের এই অসীম অনুকম্পার জন্য আমি তাঁহার শ্রীচরণে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি এবং পুনঃ পুনঃ প্রণাম জানাইতেছি।

এই সেই প্রখ্যাত শ্রীবিষ্ণুপাদপদ্ম যেখানে আগমন করিয়া আমাদের ভাবের ঠাকুর শ্রীগৌরাঙ্গদেব শ্রীকৃষ্ণবিরহের ভাবোন্মাদে বিভোর হইয়া পড়িয়াছিলেন। আমরা সকলেই সেইসময় লক্ষ্য করিয়াছিলাম মহাভাবময়ী শ্রীশ্রীমায়ের ঐ সুন্দর আঁখি দুইটি না জানি কোন অব্যক্ত দিব্যভাবে যেন ঢুলুঢুলু হইয়া বুজিয়া আসিতেছিল। মায়ের ভক্তদের মধ্যে আশাকরি অনেকেই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন, মা বিষ্ণুক্ষেত্রে, যথা শ্রীক্ষেত্র জগন্নাথধাম, কি বৃন্দাবনধাম, কি গয়াধামে গেলেই যেন কেমন হইয়া পড়েন। এই সকল অতি পবিত্র ও ভগবৎলীলাস্থলের সঙ্গে যে তাঁহার বিশেষ সম্বন্ধ আছে ইহা কাহারও দৃষ্টি এড়ায় না!

এই গয়াধামে আসিয়াই কামারপুকুরের নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ শ্রীক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায় স্বপ্নে দেখিয়াছিলেন, স্বয়ং শ্রীগদাধর জগতের লোকদের এই দুঃখ ও দৈন্যময় সংসারে শান্তির পথ প্রদর্শন করিতে তাঁহার পুত্ররূপে অবতীর্ণ হইবেন। যাহার ফলে আমরা

পাইলাম যুগাবতাররূপ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে। তিনি জগতকে চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া গিয়াছেন জগন্মাতাকে পাইতে হইলে কোন তন্ত্র মন্ত্র, বিদ্যা বুদ্ধি ও পাণ্ডিত্যের প্রয়োজন হয় না। চাই কেবল মায়ের জন্য অভাব বোধ, ব্যাকুলতা ও প্রাণের আকুল ডাক। শিশুর মত সরল প্রাণে মা, মা, বলিয়া ডাকিলেই জগদম্বা দেখা দেন, কাছে আসেন, কথা কহেন এবং প্রাণের কথা শোনেন। ইহাই মাকে পাইবার পক্ষে যথেষ্ট উপায় বা সাধনা।

মন্দির হইতে তিনুবাবুর কোয়ার্টারে আসিতে আমাদের রাত্রি বারোটা বাজিয়া গেল। ট্যাক্সিচালককে পরদিন ভোর ছয়টায় আসিতে তিনুবাবু বলিয়া দিলেন কারণ সাতটার গাড়ীতে আমাদের কলিকাতা যাত্রা করিতে হইবে। সতী বাড়ীর ভিতর মেয়েদের কাছে শুইতে গেল। গাড়ীবারান্দার নীচে মা শয়ন করিলেন কারণ তিনি গৃহস্থ বাড়ীর ভিতরে যান না। উদাস মায়ের নিকট লম্বা সিঁড়ির উপর শুইল। দাসু ও আমি মায়ের কাছাকাছিই বাগানে উন্মুক্ত আকাশের নীচে শুইলাম। এইভাবে গয়ায় মায়ের সঙ্গে আমাদের রাত্রিবাস হইল। পরদিন প্রত্যূষে উঠিয়া আমরা স্নানাদি সারিয়া লইতেই সর্দারজী মোটর লইয়া হাজির হইলেন। উদাস অতি তাড়াতাড়ি করিয়া মায়ের মুখ ধোয়াইয়া দিল। সঙ্গে সঙ্গে তিনুবাবুর স্ত্রী ও শাশুড়ী মায়ের জন্য গরুর তাজা দুধ গরম করিয়া আনিলেন। মা গাড়ীতে বসিয়াই উহা একটু পান করিলেন। সেখান হইতে রওয়ানা হইবার সময় মা তিনুবাবুর ছোট্ট সুন্দর শিশুটিকে বন্ধু বলিয়া আদর করিয়া আসিলেন।

সকাল সাতটার সময় পাঠানকোট এক্সপ্রেসে শ্রীশ্রীমায়ের সঙ্গে আমরা চারিজন চতুর্দশীর দিন গয়া হইতে কলিকাতাভিমুখে যাত্রা করিলাম। পথে বর্ধমান স্টেশনে একজন রেলকর্মচারী মাকে দেখিয়া প্রণাম করিতে তাঁহার কামরায় উঠিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন, তিনি কলিকাতা থাকেন প্রত্যহ কার্যোপলক্ষে বর্ধমান আসেন। কাজকর্ম শেষ করিয়া সন্ধ্যার সময় আবার কলিকাতা ফিরিয়া যান। এই লোকটি ছাড়া পরিচিত অপর কোন লোকের সঙ্গে রাস্তায় মায়ের দেখা হয় নাই। মনে হয় মায়েরও অনেকটা

এই রকমই খেয়াল ছিল, যাহাতে পথে জানাশোনা কোন লোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ না হয়। কার্যতঃ ও শেষ পর্যন্ত তাহাই হইয়াছিল।

সেইবার বন্যায় বঙ্গদেশ বন্যায় ভাসিয়া গিয়াছিল। তখনও বন্যার জল কমে নাই, সেই জন্য রেললাইনের দুইধারে জল থইথই করিতেছিল। উহারই মাঝে যেখানে একটু ডাঙা বা উচ্চ জমি পাইয়াছে সেইখানেই বন্যাপীড়িত গ্রামবাসী ও বাস্তুহারারা তাঁহাদের সন্তান সন্ততি লইয়া যে কি কষ্টে কালাতিপাত করিতেছিল তাহা বর্ণনাতীত। সেই সকল মর্মান্তিক দৃশ্য দেখাইয়া বঙ্গভূমির উপর করুণাময়ী শ্রীশ্রীমায়ের একটু কৃপাদৃষ্টির জন্য প্রার্থনা নিবেদন করিলাম। সূর্য যখন প্রায় ডোবে ডোবে সেই সময় আমাদের গাড়ী শিয়ালদহ স্টেশনে আসিয়া পৌঁছিল। গাড়ী হইতে অবতরণ করিয়া যাহা চোখে পড়িল তাহা বর্ণনার অযোগ্য। প্ল্যাটফর্মের উপর পূর্ববঙ্গের সব বাস্তুহারার দল যে কি নিদারুণ দুঃখে দিন কাটাইতেছিল তাহা কল্পনা করা যায় না। তাহাদের পেটে অন্ন নাই, পরিধানে বস্ত্র নাই এবং মাথা গুঁজিবার একটু স্থান নাই। এই পরিস্থিতির মধ্যে সন্তান-সন্ততি লইয়া স্ত্রী পুরুষ প্ল্যাটফর্মের উপর পড়িয়া আছে। পা ফেলিবার জায়গা নাই। তাহাদের মধ্য দিয়াই অতি সন্তর্পণে মাকে নিয়া আমরা কোন প্রকারে স্টেশনের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলাম।

ইহার একটু পূর্বেই অত্যন্ত জোরে বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে, সেইজন্য মোটরের চাহিদা অধিক থাকায় একখানা ট্যাক্সিও পাওয়া গেল না। মাকে ফুটপাথের উপর দাঁড় করাইয়া দাসু ও আমি ট্যাক্সির অন্বেষণে গেলাম। শ্রীশ্রীমায়ের কলিকাতা আমনের সংবাদ পাইলে তাঁহার ভক্তবৃন্দ আপন আপন মোটর লইয়া মায়ের স্টেশনে পৌঁছিবার বহু পূর্ব হইতে গিয়া সেখানে উপস্থিত থাকেন। যাঁহার গাড়ীতে মাকে উঠান হয়, বা যাঁহার গাড়ীতে মা দয়া করিয়া স্বয়ং পদার্পণ করেন তিনি নিজেকে অতিশয় ভাগ্যবান্ ও কৃতার্থ মনে করেন। সেই মায়ের জন্য আজ একখানা ভাড়াটিয়া ট্যাক্সি সংগ্রহ করিতে না পারায় মাকে সাধারণ মানুষের মত প্রায় আধ ঘণ্টা কাল

খোলা ফুটপাতের উপর দাঁড়াইয়া থাকিতে হইল। সবই লীলাময়ী মায়ের লীলা! ইহাতেও মায়ের মধ্যে কোনই ভাবান্তর লক্ষিত হইল না! সর্বাবস্থাতেই আনন্দময়ী মায়ের সমান আনন্দ! আমাদের আনন্দ আপেক্ষিক কিন্তু মায়ের তো আর তাহা নহে। মায়ের হইল স্বভাবসিদ্ধ আনন্দ, সেই আনন্দের কোন হেতু নাই। আমাদের নিকট ভাল মন্দ, সুখ দুঃখ, মান অপমান আর মায়ের কাছে এ সবই সমান। মা যে আমার এইসব দ্বন্দ্বের অতীত। দুই নিয়াই দুনিয়া—মা এই দুইয়ের বহু উর্ধ্বে। মা যেখানে অবস্থিত সেখানে এক ব্যতীত দুইয়ের কোন অস্তিত্বই নাই। একমেবাদ্বিতীয়ং—সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম।

কি আশ্চর্যের বিষয়! এই আধ ঘণ্টার মধ্যে শিয়ালদহ স্টেশনের বাহিরে খোলা জায়গায় মা দাঁড়াইয়া থাকা সত্ত্বেও কোন পরিচিত লোকের সঙ্গে তাঁহার কিংবা আমাদের মধ্যে কাহারও দেখা হইল না। আমি অনুমান করি মায়ের বোধ হয় খেয়াল ছিল সকলের অলক্ষিতে গন্তব্যস্থানে হঠাৎ গিয়া উপস্থিত হইবেন, সেইজন্য এইসব যোগাযোগ মা-ই সংঘটিত করিতেছেন। অতি কষ্টে ও চেষ্টায় একখানা ট্যাক্সি সংগ্রহ করা হইল। মা গাড়ীতে থাকিতেই বলিয়াছিলেন, কলিকাতায় গিয়া কাহাকেও কোন সংবাদ দেওয়া নয়। দমদম বিমান ঘাটির নিকটেই শ্রীআপতাপ মিত্রের বাগান বাড়ীতে মায়ের জন্য পৃথক্ ঘর করা আছে। মা সেখানে গিয়া উঠিবেন। রাস্তার বৃষ্টির জল অতিক্রম করিয়া আমাদের নির্দিষ্ট স্থানে গিয়া পৌঁছিতে রাত্রি অনুমান আটটা বাজিয়াছিল। আমাদের চারিজনের মধ্যে কেহই আপতাপবাবুর বাড়ী পূর্বে কখনও যাই নাই। সেইজন্য ঐ দিককার রাস্তা আমাদের কাহারও জানা ছিল না। তাই কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশীর অতি ঘোর অন্ধকারে শ্রীশ্রীমা-ই আমাদের পথ দেখাইয়া যথাস্থানে লইয়া আসিলেন। মা ছাড়া আর পথ দেখাইবে কে? মা-ই তো একমাত্র পথ প্রদর্শক! সর্বাবস্থায় মায়ের উপর নির্ভর করিতে পারিলে আর চিন্তা কি? তিনিই গন্তব্যস্থানে পৌঁছাইয়া দিবেন, যেখানে গেলে পুনরায় ফিরিয়া আসিতে হয় না!

আপতাপবাবুর বাগানের ফটকে আসিয়া দেখিলাম ভিতর হইতে দরজায় তালা দেওয়া। অনেক ডাকাডাকি ও হাঁকাহাঁকির পর একজন উৎকলবাসী মালী, একজন মুসলমান কারিগর ও একটা বড় কুকুর ঘেউ ঘেউ করিতে করিতে বাহির হইয়া আসিল। মা ইহার পূর্বে এখানে আসিয়াছিলেন সেই কারণে বাগানের মালী মাকে চিনিতে পারিয়া সংবাদ জানাইল—আপতাপবাবু কয়েক দিন হয় সস্ত্রীক তাঁহার মশা গ্রামের পৈতৃক বাড়ীতে শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা করিবার জন্য গিয়াছেন। তাঁহার কন্যা ও জামাতা গিয়াছেন কলিকাতায় বেলা দুইটার সময় পূজার বাজার করিতে। কখন যে তাঁহারা বাজার করিয়া ফিরিবেন তাহা কিছু বলিয়া যান নাই। মালীর ভাবগতিক দেখিয়া মনে হইতেছিল দরজা খুলিয়া দিবার তাহার ইচ্ছা ছিল না কারণ এইসব কথাবার্তা যখন হইতেছিল তখন আমরা ছিলাম বাগানের বাহিরে এবং তাহারা ছিল বাগানের ভিতরে। মা দ্বার খুলিয়া দিতে বলায় অগত্যা মালী গেটের তালা খুলিয়া দিয়া তাহার বদান্যতা প্রদর্শন করিল। দরজা খুলিয়া না দিবার জন্য তাহার যে খুব বেশী অপরাধ ছিল তাহা বলা যায় না, কারণ মালিকদের অনুপস্থিতিতে সে কি করিয়া এতগুলি লোককে অন্ধকার রাত্রিতে বাড়ীর দ্বার খুলিয়া দেয়।

মা আমাদের সকলকে লইয়া তাঁহার জন্য যে থাকার পৃথক্ ঘর আছে সেখানে গেলেন। সেখানে গিয়াও দেখা গেল সেই ঘরও তালাবন্ধ। জিনিসপত্র ও শ্রীশ্রীমাকে লইয়া আমরা বাড়ীর সম্মুখের রোয়াকে গিয়া উঠিলাম। কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশীর ঘোর অন্ধকার রাত্রিতে খদ্যোতের আলোতে কোন রকমে আমরা একজন আরেকজনকে মাঝে মাঝে একটু দেখিতে পাইতেছিলাম। মালীকে বাতির জন্য বলাতে সে কোথা হইতে একটা কেরোসিন তেলের ছোট্ট কুপী বা বাতি সংগ্রহ করিয়া আনিল। উহার আলোক এত ক্ষীণ যে বাগানের জমাট-বাঁধা ঘোর অন্ধকার ঐ ক্ষীণালোক দূর করিতে সমর্থ না হইলেও কিঞ্চিৎ প্রকাশ যে হইল তাহাতে সন্দেহ নাই। উহাতেই দেখিতে পাইলাম মায়ের বাড়ীর ঈশান কোণে একটি বড় বিল্ববৃক্ষ রহিয়াছে। উহার নিকটে একটি জলের কলও ছিল।

সারাদিন আমাদের কাহারও কিছুই খাওয়া হয় নাই। জননীর অবস্থাও তাহাই। মায়ের কথা না হয় ছাড়িয়াই দিলাম কারণ তিনি দিনের পর দিন, কি মাসের পর মাস, কিছুই আহার না করিয়া থাকিতে পারেন, তাহাতে তাঁহার কিছুই যায় আসে না। কারণ তিনি অহর্নিশ পান করিতেছেন সহস্রার হইতে ক্ষরিত অমৃত। আমাদের তো আর সেই অবস্থা নয়। আমাদের হইল অন্নগত প্রাণ। আমরা জানি "অন্নং ব্রহ্মেতি ব্যজানৎ "

দাসুকে সুজি, চিনি ও দুধ আনিবার জন্য বাজারে পাঠান হইল। আমাদের সঙ্গে মায়ের ব্যবহারের জন্য গাওয়া ঘি ছিল। ইতোমধ্যে আমরা স্নান করিয়া বেলগাছের তলায় বসিয়া যে যাহার সন্ধ্যাহ্নিক ও জপ সমাপন করিলাম। বিল্ববৃক্ষের তলায় খোলা বারান্দায় মায়ের বিশ্রামের জন্য বিছানা পাতিয়া দেওয়া হইল। মনে মনে ভাবিলাম আজ কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশীর মহানিশায় জননী শিবানীর স্থান বিল্বমূলেই তো হওয়া উচিত। সাতদিন পর এই বিল্বমূলেই তো মহাদেবীর বোধন হইবে। আমি বলিলাম, "বাড়ীর মালিকেরা যদি আজ নাই আসেন তাহা হইলে আজ রাত্রিতে বিশ্বজননী শ্রীশ্রীমাকে লইয়া আমরা এই বেলগাছ-তলাতেই বাস করিব। হাজার অসুবিধা হইলেও অন্য কোথায়ও যাওয়া হইবে না।" মায়ের অভিধানে 'অসুবিধা' বলিয়া কোন শব্দ নাই। সর্বাবস্থাতেই মায়ের আমার সমান আনন্দ। আমরা লক্ষ্য করিয়াছি নানা প্রকার অসুবিধার মধ্যেই মা ভাল থাকেন।

দাসু বাজার হইতে সুজি ও চিনি আনিয়া জানাইল বাজারে দুধ পাওয়া গেল না। সুজি, চিনি তো সংগ্রহ হইল এখন সমস্যা দাঁড়াইল হালুয়া তৈয়ার হইবে কি দিয়া? আমাদের মধ্যে এমন একজন লোক আছেন যিনি কলের জল পান করেন না। বাগানের পুকুরে গিয়া দেখিলাম জল অতিশয় অপরিষ্কার। পুকুর ভরা গেঁড়ি বা ছোট শামুক এবং পুকুরের জলে ভিজান রহিয়াছে এঁটো বাসন। এই অপবিত্র ও নোংরা জলের দ্বারা প্রস্তুত হালুয়া মাকে ভোগ দেওয়া যায় না। হঠাৎ আমার মাথায় মা এক বুদ্ধি যোগাইয়া দিলেন। দাসুকে বলিলাম বাজারে ডাব পাওয়া গেলে চার পাঁচটা

ডাব যেন একেবারে কাটাইয়া লইয়া আসে। ডাবের জল দিয়াই হালুয়া প্রস্তুত হইবে এবং ডাবের জলই পান করা যাইবে। ছেলে-মানুষ দাস্থ ডাব আনিতে আবার ছুটিল। দাস্থও বাজার হইতে ডাব লইয়া ফিরিয়াছে সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল একটি মোটরের হেড লাইট এইদিকে ঘুরিল। রাত্রি প্রায় দশটার সময় আপতাপবাবুর জামাতা, কন্যা ও দুইটি নাতনী কলিকাতা হইতে পূজার বাজার করিয়া প্রত্যাবর্তন করিলেন। শ্রীশ্রীমায়ের আকস্মিকভাবে আগমনের সংবাদ পাইয়া তাঁহারা আসিয়া মায়ের চরণে প্রণামান্তে নিবেদন করিলেন "মা! আমরা বাড়ী ছিলাম না সেইজন্য আপনার বড়ই কষ্ট হইয়াছে।" এই বলিয়া অতিশয় দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা তাড়াতাড়ি মায়ের নির্দিষ্ট ঘর খুলিয়া সব ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। উদাস আলুভাজা ও ডাবের জলে প্রস্তুত হালুয়া মাকে একটু খাওয়াইয়া দিবার পর আমরা সকলে মায়ের প্রসাদ পাইয়া রাত্রি বারটার সময় যে যাহার বিছানা পাতিয়া শুইয়া পড়িলাম।

মায়ের খেয়াল ছিল তার পরদিনও সকাল বেলা কাহাকেও তাঁহার কলিকাতা আগমনের সংবাদ না দেওয়ার। মা ঠিক করিলেন পরদিন প্রাতে আটটার সময় এখান হইতে চেৎলা শ্রীমান্ মনীন্দ্র দে'র বাড়ী যাইবেন। তাহাদের বাড়ীর উঠানের ধারে একখানা ঘর আছে তাহাতে কোন লোক বাস করে না। মা সেই ঘরেই গিয়া থাকিবেন। সেই ঘরে প্রবেশ করিতে বাড়ীর ভিতরে যাইবার প্রয়োজন হয় না। খোলা রওয়াকের উপর দিয়াই ঘরে যাওয়া যায়। প্রস্তাবিত কথামত পরদিন যথাসময়ে আপতাপবাবুর জামাতা তাঁহার নিজের মোটরে মাকে স্বয়ং চেৎলা মনীন্দ্র দে'র বাড়ী পৌঁছাইয়া দিলেন। মা তাঁহাকে বলিয়া দিলেন যদি কেহ মায়ের খোঁজ করেন তাহা হইলে তিনি যেন বলেন, মা তাঁহার ওখানে গতকাল রাত্রিতে আসিয়াছিলেন, আজ সকালে কলিকাতা চলিয়া গিয়াছেন। ইহার মধ্যে বিন্দুমাত্রও অসত্য নাই। যাহা প্রকৃত ঘটনা তাহাই তাঁহাকে বলিতে বলিয়া দিয়াছিলেন। মা কখনও মিথ্যার প্রশ্রয় দেন না এবং কাহাকেও দিতে বলেন না। সর্বদা

সত্য কথা বলিতে মা সকলকে উপদেশ দিয়া থাকেন। সত্যই ধর্ম, সত্যই একমাত্র আশ্রয় এবং সত্যই পরমাত্মার রূপ।

অপ্রত্যাশিতভাবে আজ মহালয়ার শুভদিনে বিশ্বজননী শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ীকে হঠাৎ প্রাপ্ত হইয়া মনীন্দ্র দে'র বাড়ীর স্ত্রীপুরুষ, ছেলে-মেয়ে সকলে মহাখুশি। তাহারা স্বপ্নেও কখন ভাবে নাই যে মা এইরূপে তাহাদের বাড়ী স্বীয় চরণধূলার দ্বারা পবিত্র করিবেন। তাহারা মহাসমাদরে শ্রীশ্রীমাকে বাড়ীব ভিতর লইয়া গিয়া উন্মুক্ত গগনের নীচে পাকা চাতালের উপর বসাইল। এই অবসরে বাহিরের ব্যবহার না করা ঘরখানা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও ভাল করিয়া জলদ্বারা ধৌতকরতঃ গঙ্গাজল ছিটাইয়া সেখানে মায়ের বিশ্রামের স্থান করিয়া দিল। মা একাকী ঐ ঘরে একান্তে বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। উদাস মায়ের জন্য রন্ধন করিতে গেল। মনীন্দ্রের দিদি মনু পরম উৎসাহে রন্ধনের সব যোগান দিতে তৎপর রহিল। বাড়ীর সকলকে নিষেধ করিয়া দেওয়া হইল তাহারা যেন কেহ মায়ের আগমনবার্তা বাহিরে প্রচার না করে। যথা সময়ে মায়ের ভোগের পর আমরা সকলে প্রসাদ পাইলাম। মা বিশ্রাম করিয়া বৈকাল চারিটার সময় উঠিলেন। ইহার পূর্বেই কি জানি কেমন করিয়া সংবাদ পাইয়া পাড়ার অনেকে মাতৃ-দর্শন অভিলাষে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। মায়ের নির্দেশমত বাড়ীর কেহই কাহাকেও মায়ের আসার খবর দেয় নাই। তবে মা যখন মোটর হইতে অবতরণ করিতেছিলেন তখন রাস্তায় কেহ কেহ মাকে দেখিয়া চিনিয়াছিলেন। তাহারাই মায়ের আহারাদির পর বিশ্রামান্তে তাঁহার দর্শনের জন্য আসিয়া অপেক্ষা করিতেছিলেন। মা বিশ্রাম হইতে উঠিয়াই আমাকে বলিলেন, "গাড়ী ডাক। সন্ধ্যার সময় বালীগঞ্জের আশ্রমে চল।" তখনও আগড়পাড়া আশ্রম হয় নাই। একডালিয়া রোডের ছোট্ট একখানি বাড়ীতে আশ্রম ছিল। মায়ের আদেশমত মনীন্দ্র গাড়ীর ব্যবস্থা করিল। সন্ধ্যার প্রাক্কালে মা চেৎলা হইতে যাত্রা করিয়া ঠিক সন্ধ্যায় গিয়া অকস্মাৎ বালীগঞ্জের একডালিয়া আশ্রমে উপনীত হইলেন। শ্রীশ্রীমায়ের পুরাতন ভক্ত ও আশ্রমের ব্যবস্থাপক শ্রীঅবনীমোহন শর্মা আশাতীতরূপে মহা-

লয়ার প্রদোষে মহামায়াকে এইভাবে হঠাৎ প্রাপ্ত হইয়া মহানন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন। তিনি মাকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণামকরতঃ অতি আদরের সহিত বিশ্বজননীকে মন্দিরে লইয়া গিয়া আরতি করিলেন এবং ভোগ দিলেন। মা অতি স্বল্প সময় আশ্রমে অবস্থান করিযা রাত্রি অনুমান আট ঘটিকায় ইণ্টালীর আনন্দ পালিত রোডে শ্রীবিনয়ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বাড়ী সহসা উপস্থিত হইয়া সকলকে চমৎকৃত ও স্তম্ভিত করিয়া দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে মঙ্গলশঙ্খ বাজিয়া উঠিল, "শঙ্খে শঙ্খে মঙ্গল গাও জননী এসেছে দ্বারে।"

পূর্বজন্মে আমরা কে কোথায় জন্মিয়াছিলাম সবই মা জানেন

গত ১৯৫৯ খৃষ্টাব্দে মণ্ডীর রাণী শ্রীমতী কুসুমকুমারী বারাণসী আশ্রমে পরমারাধ্যা বিশ্বজননী শ্রীশ্রীমায়ের পুণ্য উপস্থিতিতে মহাসমারোহে রাজোচিত উপচারে শারদীয়া শ্রীশ্রীতুর্গাপূজা করেন। এই পূজার পর হইতেই শোনা গেল আগামী বৎসর মায়ের আগড়পাড়ার আশ্রমে প্রচুর জাঁকজমকে শ্রীশ্রীতুর্গাদেবীর মহাপূজা হইবে। যদিও হালিশহরের প্রসিদ্ধ মাতৃ-সাধক শ্রীরাম-প্রসাদ সেন মায়ের পূজা অতি গোপনে করিবারই পক্ষপাতী ছিলেন। সেইজন্য তিনি তাঁহার একটি শ্যামাসঙ্গীতে বলিয়াছেন—

জাঁকজমকে করলে পূজা অহংকার হয় মনে মনে।
লুকিয়ে মাকে করবি পূজা জানবে নাকো জগজ্জনে॥

এই মহাপূজার বিরাট আয়োজন এক বৎসর পূর্ব হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। ইহাকে সর্বতোভাবে সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্য মায়ের কলিকাতা নিবাসী কতিপয় ভক্ত-সন্তান আপ্রাণ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ইহার জন্য তাঁহারা বাস্তবিকই প্রশংসার যোগ্য এবং সকলের ধন্যবাদার্হ।

গত ১৯৬০ খৃষ্টাব্দের ২৭শে সেপ্টেম্বর হইতে 'শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী আশ্রম', আগড়পাড়ায় বিশ্ববরেণ্যা শ্রীশ্রীমায়ের পবিত্র সান্নিধ্যে খুব ধুমধামের সহিত শারদীয়া শ্রীশ্রীতুর্গোৎসব আরম্ভ হয়। যেমন তুর্গাপ্রতিমা, তেমন পূজার উপচার, তেমন মণ্ডপ, সর্বোপরি মায়ের ভক্তদের শ্রদ্ধা, ভক্তি এবং কর্মতৎপরতা, সবই অতুলনীয় এবং অত্যন্ত সুখ্যাতির যোগ্য। যদি কোথায়ও কিছু একটু ত্রুটি বা ন্যূনতা থাকিয়া থাকে সেইটুকুও মায়ের শুভ ও দিব্য বিদ্যমানতা পরিপূর্ণ করিয়া দিয়াছিল। পূজাপদ্ধতিতে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে "অজ্ঞানাদ্ যদি বা মোহাৎ প্রচ্যবেতাধ্বরেষু যৎ। স্মরণাদেব তদ্

বিষ্ণোঃ সম্পূর্ণং স্যাদিতি শ্রুতিঃ ॥" অজ্ঞানবশতঃ অথবা মোহবশতঃ যজ্ঞে বা পূজাদিকার্যে যাহা কিছু স্খলিত হয় বা ত্রুটি ঘটে, তাহা বিষ্ণুর স্মরণে পূর্ণ হইয়া থাকে, ইহা সর্বশাস্ত্রের সার শ্রুতি বলিতেছেন। যাহা বিষ্ণুস্মরণেই পরিপূর্ণ হয়, সেই স্থানে যদি স্বয়ং যজ্ঞেশ্বর "পূর্ণব্রহ্ম-নারায়ণ" বর্তমান বা উপস্থিত থাকেন সেখানে আর কথা কি ? দোষ কিংবা ত্রুটির কোন কথাই সেস্থানে উঠিতে পারে না !

বারাণসী হইতে আগড়পাড়ায় শ্রীশ্রীদুর্গোৎসব উপলক্ষে যাইবার সময়, করুণাময়ী শ্রীশ্রীমা করুণা করিয়া তাঁহার এই অতি দীন-হীন-কাঙ্গাল সন্তানটীকেও সঙ্গে নিয়াছিলেন। একে এই বৃদ্ধ বয়স, তাতে অপটু শরীর ও ভগ্ন স্বাস্থ্য লইয়া কাশী ছাড়িয়া কোথায়ও যাইবার বাসনা না থাকিলেও শ্রীশ্রীমায়ের সঙ্গে যাইবার লোভ সম্বরণ করিতে না পারিয়া তাঁহার নির্দেশ অতিশয় আনন্দের সহিত শিরোধার্য করিয়াছিলাম। মায়ের এইরূপ স্নেহের ডাক কয়জনের ভাগ্যে ঘটে ! পূর্বজন্মের সুকৃতি ও স্নেহবৎসলা মায়ের অহৈতুকী কৃপা ব্যতীত এইপ্রকার মায়ের আহ্বান পাওয়া অতীব দুর্লভ ! সেইজন্য মায়ের চরণে প্রণাম, প্রণাম, প্রণাম।

পরম মঙ্গলময়ী শ্রীশ্রীজননী দেবীর তত্ত্বাবধানে মঙ্গলমত ও সুষ্ঠুভাবে সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী ও দশমী চারি দিনই মহাদেবীর মহতী পূজা, ভোগ, আরতি, হোম ও বিসর্জনাদি সকল কার্যই সুসম্পন্ন হইয়া যাওয়ার পর দশমীর দিন সন্ধ্যার পর শ্রীশ্রীমাতৃ-মন্দিরের বারান্দায় মা আসিয়া বসিয়াছেন। মাকে বিজয়ার প্রণাম করিবার মানসে বহুলোক শান্তভাবে বিরাট হলে উপবেশন করিয়া আছেন। মায়ের সন্তানগণ একে একে শৃঙ্খলার সহিত আসিয়া তাঁহার চরণে প্রণাম করিতেছেন এবং তাঁহার হাত হইতে মিষ্টি গ্রহণকরতঃ হাসিতে হাসিতে পরমানন্দে যে যাহার নির্দিষ্টস্থানে গিয়া বসিতেছেন। হঠাৎ দেখা গেল একটি বারো কি তের বছরের কুচ্‌কুচে কাল মেয়ে আসিয়া মাকে প্রণাম করিতেই মা তাহার হাতে সন্দেশ দিয়া অত লোকজনের ভিড়ের মধ্যে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুই না সেদিন মালা চাহিয়া ছিলি"? মেয়েটি

নিঃসঙ্কোচে উত্তর দিল, "হাঁ, সেইদিন আমিই আপনার কাছে মালা চাহিয়াছিলাম।" মা সেই মেয়েটিকে মায়ের বসিবার চৌকির নিকট বসিতে বলায় সে নির্ভয়ে অতি পরিচিত লোকের মত সোজা বারান্দায় উঠিয়া একেবারে মায়ের কাছে গিয়া বসিয়া পড়িল। এই ক্ষুদ্র ঘটনাটিতে ঐ কালো মেয়েটির উপর উপস্থিত প্রায় সকলেরই দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। তাহার বেশভূষা, হাবভাব ও সাদাসিধা চালচলন দেখিয়া মনে হইতেছিল বালিকাটি হয় তো কোন গরীবের ঘরের মেয়ে হইবে। বিজয়াদশমীর দিন বলিয়া যে ভাল কাপড়-চোপড় কি পোষাক শাড়ী পরা তাহার তাহা কিছুই ছিল না। বালিকার পরিধানে ছিল সাধারণ একখানা আট পৌরে রঙ্গিন শাড়ী ও গায়ে একটি নীল রঙের জামা বা ব্লাউজ এবং হাতে কয়েকগাছা বেলোয়ারী চুড়ি। মনে হইল আধুনিক শিক্ষার বা সভ্যতার বাতাসও তাহার গায়ে লাগে নাই। মেয়েটি যে অতিশয় ভাগ্যবতী তাহাতে আর কোন প্রকার সন্দেহের অবকাশ ছিল না। কারণ বড় বড় গণ্যমান্য লোকেরা পর্যন্ত মায়ের একটু হাসি, কি চোখের একটু মিষ্টি করুণাপূর্ণ দৃষ্টি, কি মুখের একটি কথা পাইলে নিজেকে ধন্য ও পরম সৌভাগ্যশালী বলিয়া মনে করেন। তাহাতে মা স্বয়ং মেয়েটির সঙ্গে যাচিয়া কথা বলিয়াছেন, কেবল কথা বলাই নহে, জগন্মাতা তাহাকে ডাকিয়া কাছে বসাইয়াছেন! ইহা কি কম ভাগ্যের কথা! তথাপি লোকে বৃথাই বলে, মা আনন্দময়ী বড় লোকের মা, গরীবের দিকে একবার মুখ তুলিয়াও চাহেন না। বর্তমান স্বাধীন ভারতের সর্বপ্রধান ব্যক্তি এবং সর্বোচ্চপদধারী মনুষ্য পর্যন্ত শ্রীশ্রীমায়ের পদপ্রান্তে একটু বসিতে পারিলে আপনাকে কৃতার্থ বলিয়া মনে করেন। এই ক্ষেত্রে বালিকার সৌভাগ্যের প্রশংসা না করিয়া কি থাকা যায়? মেয়েটির সম্বন্ধে কিছু জানিবার স্বাভাবিক কৌতূহল উপস্থিত অনেকের মুখেই ফুটিয়া উঠিতে দেখা গেল।

শ্রীশ্রীমায়ের পশ্চাতে দাঁড়াইয়া জনৈক ভক্ত তালপাতার হাতপাখা দিয়া বাতাস করিতেছিলেন। মা তাহাকে উদাসের নিকট হইতে মালা আনিতে বলিলেন। আমি ভাবিলাম মেয়েটি হয় তো

মায়ের কাছে জপের মালার জন্য প্রার্থনা করিয়াছে তাই মা এখন বালিকাটিকে জপের মালা দিবেন। মায়ের নির্দেশ পাইয়া উদাস তাড়াতাড়ি আসিয়া একছড়া অতি সুন্দর ও মূল্যবান মুক্তার মালা আনিয়া মায়ের হাতে দিল। জগদম্বা নিজের হাতে ঐ মুক্তার মালা মেয়েটিকে দিলেন। মুক্তার মালা পাইয়া তাহার সরল পবিত্র মুখখানিতে ফুটিয়া উঠিল আনন্দের এক ঝলক বিমল হাসি এবং তাহার মূর্তিখানি উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল এক অজ্ঞাত কৃতজ্ঞতার স্বর্গীয় সুষমায়। আমি সেই সময় মায়ের অতি নিকটেই অবস্থান করিতেছিলাম। আমি মাকে ভাগ্যবতী মেয়েটির সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করায় মা বলিলেন, "অষ্টমী-পূজার দিন যোগীভাইয়ের (সোলনের রাজা সাহেব শ্রীদুর্গা সিংজীকে আশ্রমবাসী মায়ের ভক্তবৃন্দ "যোগীভাই" ডাকিতেন) এক আত্মীয়া (অজয়গড়ের রাজকন্যা ও হিমাচল প্রদেশের গভর্ণরের স্ত্রী ভদ্রীর রাণীসাহেবা) এই শরীরটাকে একছড়া মুক্তার মালা দিয়াছিল। সেই সময় এই মেয়েটি কি জানি কেমন করিয়া সেইখানে গিয়া উপস্থিত হয় এবং কাছে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া সব দেখে। এই শরীরের হাতে ঐ সুন্দর মুক্তার মালাছড়া দেখিয়া এই মেয়েটি ভিড়ের মধ্যে উহা চাহিয়াছিল। অনেক সময় দেখা যায় কেহ কেহ এই শরীরের হাতে মালা স্পর্শ করাইয়া তাহারা আবার ফেরত লইয়া যায় এবং (প্রসাদীরূপে) উহা ব্যবহার করে। মালা যে দিয়াছিল সে উহা ফেরত লইবে কিনা উহা না জানিয়া কি করিয়া মেয়েটিকে ঐ মালা দেওয়া যায়? তাছাড়া অত লোকজনের মধ্যে উহাকে খুঁজিয়াও পাওয়া গেল না। সেইজন্য মালাছড়া উহাকে আর দেওয়া হয় নাই। সেই সময় এই শরীরের খেয়াল হইয়াছিল বিজয়দশমীর দিন যখন মিষ্টি বিতরণ করা হইবে তখন মেয়েটি আসিলে এই মালা উহাকে দেওয়া যাইবে।" মায়ের খেয়াল অনুসারে মেয়েটি মায়ের হাত হইতে বিজয়ার দিন মিষ্টি লইবার জন্য যথাসময়ে মায়ের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হয়। তাহার জ্বর হইয়াছিল সেইজন্য নবমী ও দশমীর পূজার সময় সে আশ্রমে আসিতে পারে নাই। আজ দশমীর দিন প্রতিমা বিসর্জনের পর সে তাহার গর্ভধারিণীর সঙ্গে শ্রীশ্রীমাকে বিজয়ার প্রণাম করিতে

আসিয়াছে। এইসব কথা বালিকাটি মার নিকট বসিয়া বসিয়া বলিয়াছিল। আমি মায়ের পার্শ্বেই বসিয়া ছিলাম সেইজন্য উহা আমার শুনিবার সুযোগ হয়। মেয়েটি যখন মায়ের কাছে এই সব কথা বলিতেছিল তখন তাহার কথাবলার ভঙ্গিতে মনে হইতেছিল মা যেন তাহার কতই পরিচিত ও আপন জন।

এই অসংখ্য লোকজনের এত ভিড়ের মধ্যেও যে মা তাঁহার প্রত্যেকটি সন্তানের প্রার্থনা শ্রবণ করেন এবং তাহা পূর্ণ করিয়া থাকেন তাহার একটি উদাহরণ এইভাবে আজ পাওয়া গেল! অনেক সময় মনে হয় মা বুঝি আমাদের ন্যায় সাধারণ মানুষের কাতর প্রার্থনায় কানও দেন না। সেই ভ্রম আজ আমার এই কাল মেয়েটির প্রসঙ্গে দূর হইল। সকল বিষয়ে সংশয় করা সাধারণ জীবের একটা স্বভাব। কোন কিছু সে সহজে বিশ্বাস করিতে চাহে না।

সৌভাগ্যবতী মেয়েটি বিশ্বজননীর করকমল হইতে সুন্দর মুক্তার মালা পাইয়া আনন্দের প্রাবল্যে মাকে কোন প্রকার কৃতজ্ঞতাসূচক বাক্য বলা তো অতি দূরের কথা, মাকে একটি ক্ষুদ্র প্রণাম পর্যন্ত না করিয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া গিয়া মুহূর্তের মধ্যে গলায় মালা পরিয়া পুনরায় মায়ের নিকট আসিয়া গলার কাপড় অপসারিত করতঃ গলা দেখাইয়া হাসিতে হাসিতে মাকে বলিল, "দেখুন, আপনার দেওয়া মালা পরিয়াছি।" শ্রীশ্রীআনন্দময়ীর সদা প্রফুল্ল মুখকমলখানি বিশুদ্ধ মধুর আনন্দে আরও অধিক প্রসন্ন হইয়া উঠিল। মায়ের সদ্যপ্রস্ফুটিত শতদলের ন্যায় শুভ্র মুখখানির নির্মল আনন্দের হাসির প্রতিবিম্ব ভাসিয়া উঠিল কাল মেয়ের কচি পবিত্র মুখখানিতে। মায়ের মৃদু হাসি এবং মেয়ের তৃপ্তির হাসি মিলিয়া সৃষ্টি করিল এক অভিনব আনন্দের হাসির লহর যাহা বেতার-সঙ্গীতের তরঙ্গের মত বিশ্বের এক প্রান্ত হইতে অপর সীমা পর্যন্ত অণু পরমাণুতে ছড়াইয়া পড়িল। সঙ্গে সঙ্গে ঢং ঢং করিয়া বাজিয়া উঠিল আশ্রমের পৌনে নয়টার মৌনের ঘণ্টা। নিভাইয়া দেওয়া হইল যত সব বাহিরের কৃত্রিম প্রচণ্ড চোখ ঝলসান বৈদ্যুতিক আলোগুলি। উপস্থিত সকল মাতৃসন্তানগণ

স্থিরভাবে উপবেশন করিয়া চক্ষুমুদ্রিতকরতঃ বিশ্বজননীর নিবিড় ধ্যানে নিমগ্ন হইলেন। আমি শ্রীশ্রীমায়ের পিছনে বসিয়া অন্ধকারে ভাবিতে লাগিলাম সেই ধ্যেয় কাল মেয়েকে—

"কালী কালী বল যাঁরে মন, সে তো আমার কাল নয়।
যাঁর রূপেতে ভুবন আলো, তাঁকে পাগলেরা সব কাল কয়॥
যিনি সূর্যে যোগান প্রভার রাশি, চন্দ্রে করেন সুধাময়।
এমন রূপের খনি যে মা, তাঁকে কেন সবে কাল কয়॥
যাঁহার রূপের কণায় বিশ্বভুবন, হইতেছে শোভাময়।
সেই রূপেতে ভোলা ভুলে, মায়ের পদতলে পড়ে রয়॥

মৌন ভঙ্গের ঘণ্টা বাজার সঙ্গে সঙ্গে মা বলিয়া উঠিলেন, "ইহার চাইতে বুঝি আর কাল হয় না। সঙ্গে সঙ্গে আমার মুখ দিয়া বাহির হইল, "মা! মেয়ে তো নয় যেন শ্যামা ঠাকরুন। মা, এই কাল মেয়েটি কে, যে তোমার কাছে মালা চাহিয়াছিল।"

মা—এই শরীর যখন অষ্টগ্রামে থাকিত তখন এমনি একটি কালো চণ্ডালের মেয়ে আসিয়া গোয়ালঘর হইতে গোবর লইয়া যাইত এবং ঘরখানি পরিষ্কার করিত। এই শরীরের কাছাকাছি ঘোরাফেরা করিত এবং শরীরের মুখের দিকে এক দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিত। তখন এই শরীরের শুধু হরিনাম। সে আসিত, তাকাইয়া থাকিত, যা চাহিত, দেওয়া হইত।

আমি—মা! সে তো অনুমান চল্লিশ বৎসরের পূর্বের কথা। এই মেয়েটির বয়স তো হইবে এখন বারো কি তের বৎসর।

মা—চল্লিশ বৎসর কেন, তারও বেশী হইতে পারে।

আমি—তবে এই মেয়েটি, সেই মেয়েটি কি করিয়া হইল?

মা—সেও তো আবার আসিতে পারে।

মা মেয়েটিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোর নাম কি?

মেয়েটি—রেণুকা।

মা—তোর বাবার নাম কি?

মেয়েটি—দুর্গাচরণ দেব।

মা—তুই থাকিস কোথায় ?

মেয়েটি—রায়দের বাড়ীর বাগানের পিছনে।

গভীর রাত্রিতে মা যখন তাঁহার শয়ন কক্ষের বারান্দায় বিশ্রাম করিতেছিলেন তখন আবার কি জানি কেমন করিয়া সেই মেয়েটি মায়ের নিকট আসিয়া দুর্গাপূজার নিবেদিত এক শিশি আলতা মায়ের কাছে চাহিল, পায়ে পরিবে বলিয়া। মা সেই মেয়েটিকে বুঝাইয়া আদরের সহিত বলিলেন, দুর্গাপূজার নিবেদিত আলতা পায়ে পরিতে নাই। তুই একখানা চিরুণী নিয়ে যা, মাথার চুল আঁচড়াবি।

মেয়েটি—আচ্ছা, তাই দিন।

শ্রীশ্রীমায়ের নির্দেশ মত একখানি প্রসাদী চিরুণী পাইয়া কালমেয়ে রেণুকা মুখভরা হাসি আর বুকজোড়া আনন্দ লইয়া চলিয়া গেল। তারপর দিনই আমরা আগড়পাড়া পরিত্যাগ করিয়া সুদূর বারাণসী চলিয়া আসিলাম। সুযোগ পাইয়া আমি মাকে পরে ঐ মেয়েটির সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিয়াছিলেন "পূর্বজন্মে চাঁড়ালের ঘরে জন্মে ছিল। এবার তাহা হইতে একটু উঁচুঘরে জন্মিয়াছে।" শ্রীশ্রীমা যে আমাদের পূর্বজন্মের কথা জানেন তাহা এই ঘটনা হইতে অনুমান করিবার যথেষ্ট যুক্তি রহিয়াছে।

বিভিন্ন সময়ে আরও কয়েকজনের পূর্বজন্মের বৃত্তান্ত মায়ের মুখ হইতে যাহা শুনিয়াছি তাহা এইরূপ :-

(১) বাবা শ্রীভোলানাথ (শ্রীরমণী মোহন চক্রবর্তী) পূর্বজন্মে দশনামী বনসম্প্রদায়ের একজন উচ্চাবস্থার সন্ন্যাসী ছিলেন। তাঁহার সাধনার স্থানেই নির্মিত হইয়াছিল শ্রীশ্রীমায়ের সিদ্ধেশ্বরীর প্রথম আশ্রম। এই আশ্রমেই প্রথম শ্রীশ্রীবাসন্তীপূজা হইয়াছিল। তাঁহার সমাধি স্থান ছিল ঢাকার রমনার মাঠের শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী আশ্রমের শ্রীশ্রীঅন্নপূর্ণা মন্দিরের নীচে।

(২) দিদি শ্রীগুরুপ্রিয়া দেবী পূর্বজন্মে শ্রীশ্রীমায়ের বড় ভগিনী ছিলেন। তিনি অতি অল্প বয়সে শরীর ত্যাগ করেন। এই কন্যাই ছিলেন আমাদের দাদা মহাশয় শ্রীবিপিন বিহারী ভট্টাচার্য মহাশয়ের প্রথমা কন্যা।

(৩) শ্রীমৎ স্বামী পরমানন্দজী মহারাজ পূর্বজন্মে একজন যোগী ছিলেন। তিনি কাশী আশ্রমের কন্যাপীঠের একেবারে নীচের গুহায় থাকিয়া সাধন, ভজন ও যোগাভ্যাস করিতেন। তিনি যোগের প্রক্রিয়ার দ্বারা সুবর্ণ প্রস্তুত করিতে পারিতেন। লোকে তাঁহাকে সোনা তৈয়ার করিয়া দিবার জন্য বড়ই পীড়াপীড়ি করিত। সেই উৎপীড়নে তিনি গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়া তাহাদের হাত হইতে আত্মরক্ষা করেন।

(৪) শ্রীঅভয় ভট্টাচার্য পূর্বজন্মে ছিলেন নর্মদাতটের এক নাগা সন্ন্যাসী। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত শ্রীশিব মন্দির এখনও সেখানে বিদ্যমান রহিয়াছে। শ্রীঅভয়জী সেই স্থান শ্রীশ্রীমায়ের সঙ্গে গিয়া মন্দিরটি দেখিয়া আসিয়াছেন।

(৫) শ্রীনির্মল চন্দ্র ঘোষের (রণর) সুযোগ্য পুত্র শ্রীমান্ রামলাল পূর্বজন্মে ছিল শ্রীশচীকান্ত ঘোষ, বাঙ্গলার ভূতপূর্ব অ্যাসিস্টেণ্ট ইনকামট্যাক্স কমিশনার। কর্মস্থল হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া তিনি মায়ের চরণে শরণ লইয়াছিলেন। তাঁহার এবং তাঁহার ভাগিনী মনোরমা বসুর স্মৃতি চিহ্ন মায়ের দেহরাদুন কল্যাণবনে আছে।

(৬) শ্রীশ্রীমায়ের এক ছোট ভাই খুব অল্প বয়সে মারা যায়। তাহার একটি হাত ভাঙ্গা ছিল। সে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে। বর্তমান জন্মেও তাহার একটি হাত একটু বাঁকা। শ্রীশ্রীমা তাহাকে দেখিয়াই চিনিতে পারিয়াছেন।

শ্রীশ্রীমা নিদ্রায়ও আমাদের ডাক ও প্রার্থনা শোনেন

বর্তমান সময় হইতে অনুমান পাঁচ হাজার ছয়শত বৎসর পূর্বে, শ্রীহরিপাদপদ্ম হইতে প্রাদুর্ভূতা পতিতোদ্ধারিণী মাতা ভাগীরথী গঙ্গার পবিত্র আনন্দতটে, শুকতালের টিলার উপর, সুবৃহৎ বটবৃক্ষের ছায়ায় উপবেশন করিয়া পাণ্ডুকুলোদ্ভব মহারাজ পরীক্ষিত, পরম ত্যাগ মূর্তি ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যাসনন্দন মহামুনি শ্রীশুকদেবের মুখকমল হইতে সাত দিনের মধ্যে সম্পূর্ণ শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণ নামক পরমহংস সংহিতা শ্রবণ করতঃ দেহত্যাগের পূর্বেই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া পরমশান্তিরূপ মুক্তির অধিকারী হইয়াছিলেন। সেই অতি পুরাতন ও পূত স্থানেই এবার (১৯৬১ খৃঃ) পরমারাধ্যা স্নেহময়ী শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ীর চরণপ্রান্তে বসিয়া তাঁহার সন্তানবৃন্দ দ্বাদশ সংযম সপ্তাহ মহাব্রত নামক পবিত্র অনুষ্ঠানের উদ্‌যাপন করেন। এই উপলক্ষ্যে শ্রীশ্রীমায়ের তীব্র আকর্ষণে সুদূর বম্বে হইতে শ্রীমদ্ভাগবতের মর্মজ্ঞ, সুরসিক বক্তা ও অখিল ভারতবর্ষীয় সাধু-সমাজের সভাপতি অনন্তশ্রীবিভূষিত স্বামী অখণ্ডানন্দ সরস্বতী, মহামণ্ডলেশ্বর শ্রীমৎ স্বামী মহেশ্বরানন্দ গিরি, শ্রীধাম বৃন্দাবনের ত্যাগমূর্তি শ্রীকৃষ্ণানন্দজী অবধূত এবং শ্রীরামানুজ সম্প্রদায়ের আচার্য সুপণ্ডিত শ্রীচক্রপাণিজী মহারাজ, বারাণসীর অপ্রতিদ্বন্দ্বী মহাপণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ এম, এ, ; ডি, লিট, মহোদয়, কলিকাতা হইতে গ্রাম্য যোগাশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা পণ্ডিত শ্রীযোগেশচন্দ্র ব্রহ্মচারী এম, এ, তথা ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে মায়ের বহু গণ্যমান্য সন্তান-সন্ততি ও ভক্তগণ শুকতালে শুভাগমন করিয়াছিলেন।

৯ই নভেম্বর, (১৯৬১)—শুভ ও পবিত্র ব্রাহ্মমুহূর্তে জাগরণের ঘণ্টা বাজিবার সঙ্গে সঙ্গে ব্রতিগণ শয্যাত্যাগ করিয়া সভামণ্ডপে উষা-কীর্তনে গিয়া মিলিত হইতেন। তারপর বেলা আটটা হইতে

নয়টা পর্যন্ত স্নেহময়ী শ্রীশ্রীমায়ের আকর্ষণীয় ভাব-ঘন-দিব্যমূর্তির উপস্থিতিতে এবং ধূপধূনাচন্দনাদিদ্বারা পরিশোধিত ও সুবাসিত বাতাবরণের মধ্যে সকলে আপন আপন সাধনার আসনে ইষ্টের ধ্যান ও জপে বসিয়া যাইতেন। এইভাবে এক ঘণ্টাকাল ধ্যান ও জপের পর আশ্রমের নিত্য সমবেতস্বরে পাঠ চলিত শ্রীমদ্ভগবদগীতা, চণ্ডী ও উপনিষদ। পাঠ সমাপ্তির পর উপস্থিত মহাত্মাগণ কোন ধর্ম বিষয়ের উপর বক্তৃতা দিতেন। প্রাতের ন্যায় পুনরায় অপরাহ্ণ তিনটা হইতে চারিটা পর্যন্ত পবিত্র পরিবেশের মধ্যে এবং মায়ের করুণাদৃষ্টির সম্মুখে সকলে আবার নিবিষ্ট হইতেন জপধ্যানের মাঝে আপন আপন ইষ্টচিন্তায়। তদনন্তর সন্ধ্যা ছয়টা পর্যন্ত চলিত পুরাণপাঠ ও উপস্থিত সাধু, সন্ত ও সন্ন্যাসীদের ধর্মচর্চা। ইহার পর যে যাহার দৈনন্দিন আহ্নিকাদি সমাপন করিয়া আশ্রমের সান্ধ্য কীর্তনে গিয়া যোগদান করিতেন।

কীর্তনের অব্যবহিত পরেই রাত্রি সাত ঘটিকা হইতে প্রারম্ভ হইত মহামণ্ডলেশ্বর শ্রীমৎ স্বামী মহেশ্বরানন্দজীর অদ্বৈত বেদান্তের কোন গভীর বিষয়ের উপর পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভাষণ।

পূজ্যপাদ মহামণ্ডলেশ্বরের ভাষণ সমাপ্ত হইবার সঙ্গে সঙ্গে বৃন্দাবনের ভাব-রসিক অসাধারণ বক্তা শ্রীমৎ স্বামী অখণ্ডানন্দজী মহারাজের স্বভাব-সুন্দর, সরল ও মনোমুগ্ধকর ভাষায় আরম্ভ হইত ব্রজগোপিকাদের প্রাণধন ও নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণের নানাবিধ অপূর্ব লীলা ব্যাখ্যা। তিনি কোন দিন বলিতেন যশোদাজীবন শ্রীকৃষ্ণের বাল্য-লীলা, কোন দিন মাখনচুরি, কোনদিন চীরহরণ, কোন দিন কালিয়দমন, কোন দিন রাসলীলা, কোনদিন গোবর্ধন-ধারণ, কোনদিন বা শ্রীমতী যশোমতীর বাৎসল্য প্রেম।

এই সকল সুন্দর সুন্দর বিষয় লইয়া যখন তিনি লীলা-পুরুষোত্তম শ্রীভগবানের চিন্ময় দিব্যলীলা প্রসঙ্গ বর্ণনা করিতেন তখন শ্রোতাগণ আপন আপন সত্তা ও সময়ের পরিমাপ ভুলিয়া যাইতেন। আলোচনার বিষয় অবলম্বন করিয়া শ্রোতৃমণ্ডলী গিয়া যেন উপস্থিত হইতেন ব্রজসুন্দর শ্রীশ্যামসুন্দরের লীলাভূমি শ্রীবৃন্দাবনে। মনে হইত আমাদের সম্মুখেই যেন শ্রীমতী রাধারাণীর

জীবনসর্বস্ব শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার মধুর লীলা করিতেছেন। এমনই ছিল স্বামীজীর লীলা বর্ণনার অপূর্ব শৈলীও ও মাধুর্য। তিনি ও ব্যাখ্যা করিতে এমন তন্ময় হইয়া যাইতেন যে মনে হইত তিনি যেন স্বচক্ষে সেই লীলা দর্শন করিতেছেন। স্বয়ং লীলায় না মজিলে কি অন্যকে মজান যায়! ইহারই মধ্যে বাজিয়া উঠিত আশ্রমের মৌনের পৌনে নয়টার ঘণ্টা এবং নিভাইয়া দেওয়া হইত যত সব উজ্জ্বল বৈদ্যুতিক আলো। সকলে শান্তভাবে শ্রীশ্রীমায়ের সম্মুখে চক্ষু মুদিয়া নিমগ্ন হইতেন ভগবৎ স্মরণে। ব্রজলীলা শ্রবণের সঙ্গে সঙ্গে চলিত মননক্রিয়া।

পনের মিনিট মৌনের পর অর্ধ ঘণ্টাকাল অতিবাহিত হইত মাতৃ-সৎসঙ্গে। এই সময়টুকু কেবল নির্ধারিত ছিল শ্রীশ্রীমায়ের সঙ্গে ঘরোয়া বা অতি ঘনিষ্ঠ ভাবে আলাপ আলোচনার জন্য। ব্রতীরা তাঁহাদের সাধন, ভজন ও আধ্যাত্মিক জীবনের বিকাশ সম্বন্ধে মাকে নিঃসঙ্কোচে প্রশ্ন করিতেন। এই অতি অল্প সময়-টুকুর মধ্যেই মা তাঁহার স্বভাব সুলভ অতি সরল ও মধুর ভাষায় নানাবিধ উদাহরণের দ্বারা তাঁহাদের সমস্যার সমাধান করিয়া দিতেন। এই স্বল্প সময়টুকু বাস্তবিক পক্ষে বড়ই উপভোগ্য ছিল। ইহার জন্য মাতৃ সন্তানগণ সকলেই সারাটি দিন উদ্‌গ্রীব হইয়া থাকিতেন। যদি এই সময়টুকু কোন দিন মা অন্য কোন বক্তাকে দান করিতেন সেইদিন মনে হইত এই অমূল্য সময় যেন নষ্ট হওয়ায় আমরা মহা ক্ষতিগ্রস্ত হইলাম। এইরূপে সংযম মহাব্রতের সপ্তাহকাল সময় একটানা প্রতিদিনের নির্ণীত কার্যধারার মধ্যে মহানন্দে কাটিয়া গিয়াছিল।

কঠোর সংযমের সাতটি দিন, ১৫ই নভেম্বর সমাপ্ত হইল। সেই দিন হইতেই আরম্ভ হইল শ্রীমদ্ভাগবত সপ্তাহের আনুষ্ঠানিক পূজা, মাহাত্ম্য ও মূলপাঠ এবং হিন্দী ব্যাখ্যা। এলাহাবাদের সুপ্রসিদ্ধ ব্যবহারজীবী এবং স্বাধীন ভারতের ভূতপূর্ব সহকারী রাষ্ট্রপতি মহামাননীয় শ্রীযুক্ত গোপালস্বরূপ পাঠকের সুযোগ্যা কনিষ্ঠা কন্যা ত্যাগ ও বৈরাগ্যে পরম নিষ্ঠাবতী কুমারী শান্তা পাঠক এই মহাপুণ্য তীর্থে ভাগবত সপ্তাহ পারায়ণ করান। ইনি

এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অতি উচ্চশিক্ষিতা ও স্নাতকোত্তর (Post-graduate) পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণা ছাত্রী। তিনি এই মায়াময় সংসারের অনিত্যতা উপলব্ধি করিয়া অল্প বয়সেই জগতের যাবতীয় সুখভোগ পরিত্যাগ করতঃ শ্রীভগবানের উপাসনায় জীবন অতিবাহিত করিবার অভিপ্রায়ে মায়ের চরণে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। সর্বপ্রকার সুখ-সচ্ছলতার মধ্যে লালিত পালিত ও আধুনিক পরিবেশে শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াও এই বয়সে ত্যাগের পথ গ্রহণ করা বাস্তবিকই প্রশংসার বিষয়। অবশ্য ইহার মূলে রহিয়াছে শ্রীশ্রীমায়ের অসীম কৃপা, স্নেহ ও তীব্র আকর্ষণ নচেৎ ইহা এত সহজ হইত কিনা সন্দেহ।

প্রাতে মূল সংস্কৃত শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিতেন কাশীর প্রসিদ্ধ বেদজ্ঞ পণ্ডিত শ্রীঅগ্নিদত্তা শাস্ত্রী (বাটুদা), এবং হিন্দী ভাষায় সকালে ও বৈকালে দুইবেলাই ব্যাখ্যা করিতেন দণ্ডীস্বামী শ্রীমৎ বিষ্ণু আশ্রমজী। যদিও পূর্বে কথা হইয়াছিল ভাগবত ব্যাখ্যা করিবেন শ্রীমৎ স্বামী অখণ্ডানন্দ সরস্বতী মহারাজ। কিন্তু তাঁহার স্বাস্থ্য ঠিক না থাকিবার কারণ তিনি এত পরিশ্রম করিতে পারিবেন না বিধায় শেষ পর্যন্ত স্থির হইল, এই কার্যটি করিবেন স্বামী বিষ্ণু আশ্রমজী। সকাল সাড়ে এগারটা এবং বৈকাল আড়াইটা হইতে সাড়ে পাঁচটা পর্যন্ত ব্যাখ্যা চলিত। রাত্রে স্বামী অখণ্ডানন্দ মহারাজ শ্রীকৃষ্ণলীলার উপর নূতন নূতন আলোকপাত করিতেন।

প্রথমে আমি ভাবিয়াছিলাম মূল সংস্কৃত শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত সম্পূর্ণটা অভুক্ত থাকিয়া প্রত্যহ শ্রবণ করিব। পরে যখন শুনিলাম মূল-সংস্কৃত-পাঠ সকাল সাতটা হইতে আরম্ভ হইবে তখন আমার এই সঙ্কল্প বাধ্য হইয়া ত্যাগ করিতে হইয়াছিল যেহেতু অত প্রাতে আমার নিত্যকর্ম সমাপ্ত করিয়া পাঠে গিয়া বসা সম্ভবপর হইবে না। যদিও আমি অতি প্রত্যুষেই শয্যা ত্যাগ করি তথাপি ইহা আমার পক্ষে সম্ভব হইবে না জানিয়া অগত্যা স্থির করিলাম দুইবেলা অর্থাৎ পূর্বাহ্ণ ও অপরাহ্ণে সন্ন্যাসীর মুখে সম্পূর্ণ ভাগবত ব্যাখ্যা শুনিব। মহারাজ পরীক্ষিতও অবধূত

সন্ন্যাসী মহামুনি শ্রীশুকদেবের মুখেই সাতদিনে সম্পূর্ণ শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করিয়াছিলেন।

শ্রীভগবানের অসীম কৃপায় ও শ্রীশ্রীমায়ের অপার করুণায় প্রথম চারিদিন যথা সময়ে ব্যাখ্যা শুনিতে বসিতাম এবং বিনা বাধায় শেষ পর্যন্ত শুনিতাম। পঞ্চম দিন বৈকালবেলা ব্যাখ্যার সময়, একজন এতদ্দেশীয় পণ্ডিত, বয়স অনুমান ষাট পঁয়ষট্টি হইবে, একটি যুবককে সঙ্গে লইয়া মঞ্চের নীচে সকল শ্রোতাদের মাঝে আসিয়া বসিলেন. তাঁহাকে সর্বসাধারণের সঙ্গে বসিতে দেখিয়া ভাগবত ব্যাখ্যাতা স্বামী বিষ্ণু আশ্রমজী মহারাজ ব্যাখ্যা করিতে করিতে তাঁহাকে মঞ্চের উপর উঠিতে সংকেত করিলেন। পণ্ডিতজীও স্বামীজীর ইঙ্গিত মত মঞ্চের উপর ব্যাখ্যাতার পার্শ্বে নীচে পৃথক্ আসন পাতা ছিল তাহাতে উপবেশন করিলেন। ইহাতে আমরা বুঝিলাম এই আগন্তুক ভদ্রলোকটি বিষ্ণু আশ্রমজীর পরিচিত এবং কোন বিশিষ্ট ব্যক্তি হইবেন। সেই সময় ভাগবতের দশম স্কন্ধের শ্রীকৃষ্ণলীলা বর্ণন করা হইতেছিল। রাজা কংসের আবাহনে খুল্লতাত অক্রুরের সহিত শ্রীকৃষ্ণবলরাম মথুরায় আগমন করিয়া চাণূর ও মুষ্টিকের সঙ্গে যথাক্রমে মল্লযুদ্ধ করিতে মল্লভূমিতে (আখাড়ায়) নামিয়াছেন। এই সময় স্বামীজী ব্যাখ্যা অল্প সময়ের জন্য স্থগিত রাখিয়া ভগবন্নাম কীর্তন করিতে বলিলেন। এই রকম করিয়া তিনি ব্যাখ্যার মাঝে মাঝে দুই চারি মিনিটের জন্য একটু বিশ্রাম করিয়া নেন। এই অবসরে তিনি আমাকে ডাকিয়া ঐ পণ্ডিতটিকে দেখাইয়া বলিলেন ইনি খুর্জার (উত্তর প্রদেশের অন্তর্গত আলিগড় জিলার এক মহকুমা বা সাব-ডিভিসন) একজন সংস্কৃতের বড় পণ্ডিত ও অধ্যাপক এবং তাঁহার বিশেষ পরিচিত ব্যক্তি। ইনি শ্রীশ্রীমায়ের দর্শনের জন্য খুর্জা হইতে শুকতালে আসিয়াছেন। মাকে দর্শন করিয়া এখনই আবার সেখানে ফিরিয়া যাইবেন। আমি যদি তাঁহাকে মায়ের দর্শন করাইয়া দিতে পারি তাহা হইলে খুবই ভাল হয়।

স্বামীজীর এই কথায় আমি বড়ই সঙ্কটে পড়িয়া গেলাম। আমি ভাবিয়াছিলাম আদ্যোপান্ত সম্পূর্ণ ভাগবত ব্যাখ্যা সন্ন্যাসীর

মুখে শ্রবণ করিব। এখন যদি এই ভদ্রলোকটিকে সঙ্গে লইয়া মায়ের কাছে যাই তাহা হইলে আমার আর পূর্ণ ভাগবত ব্যাখ্যা শোনা হইবে না—পাঠ-শ্রবণ খণ্ডিত হইয়া যাইবে। আর যদি পণ্ডিতজীকে লইয়া মাতৃ-দর্শনে না যাই তাহা হইলে অভদ্রতা করা হইবে এবং স্বামী বিষ্ণু আশ্রমকে অমান্য করা হইবে। নিকটে এমন কোন পরিচিত বা আশ্রমের লোককেও তখন দেখিতে পাইলাম না যাহার সঙ্গে ঐ পণ্ডিতজীকে মায়ের দর্শনের জন্য পাঠাইতে পারি। আমি মহা বিপদে পড়িয়া গেলাম। অগত্যা বিষণ্ণ মনে এবং অনিচ্ছা সত্ত্বে শ্রীকৃষ্ণলীলার সুমধুর ব্যাখ্যা ত্যাগ করিয়া ভদ্রতার খাতিরে বা অনুরোধে পণ্ডিতজীকে সঙ্গে লইয়া মায়ের দর্শনের অভিলাষে মণ্ডপ ছাড়িয়া চলিলাম। পণ্ডিতজীর সঙ্গে তাঁহার একজন শিষ্য বা ছাত্রও ছিল। তিনিও শ্রীশ্রীমাকে দর্শন করিবার জন্য আমাদের সঙ্গে চলিলেন।

আমরা তিনজন মায়ের বাসস্থানের দিকে উদ্‌গ্রীব হইয়া ক্ষিপ্র গতিতে যাইতেছিলাম, এমন সময় পথে সিঁড়ির নিকট মায়ের সেবিকাদের মধ্যে একজনের সহিত আমাদের সাক্ষাৎকার হইল। আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "মা কোথায় আছেন এবং তাঁহার সঙ্গে এখন দেখা হইবে কিনা?" তিনি আমাকে উত্তর দিলেন, "মা হাত পা এলাইয়া অঘোরে নিদ্রা যাইতেছেন।" অন্য কোন লোক হইলে হয় তো তিনি আমাকে উপরে যাইতে বারণ করিতেন কিন্তু দয়া করিয়া তিনি আমাকে উপরে যাইতে নিষেধ করিলেন না। সিঁড়ি অতিক্রম করিয়া উপরে দোতালায় মায়ের ঘরের কাছে যাইতেই দেখা হইল অপর একটি মেয়ের সঙ্গে। মায়ের সঙ্গে দেখা হইবার কোন সম্ভাবনা আছে কিনা জিজ্ঞাসা করায় পাছে মায়ের বিশ্রামের ব্যাঘাত হয় তাই তিনি অতি চুপি চুপি আমাকে জানাইলেন, "মা হাত পা ছড়াইয়া অঘোরে পড়িয়া আছেন। শীঘ্র উঠিবার কোন লক্ষণ দেখা যাইতেছে না।" আমি দরজা সামান্য একটু ফাঁক করিয়া দেখিলাম মা একখানি কম্বল গায়ে দিয়া শয়ন করিয়া আছেন। মায়ের শয়নের ধরন দেখিয়া সত্যই মনে হইতেছিল, মা ঘোর নিদ্রায় নিমগ্ন।

এই অবস্থা দেখিয়া আমি একেবারে হতাশ হইয়া কেবলই ভাবিতেছি মা কখন শয়ন হইতে উঠিবেন। মা না উঠিলে কি করিয়া আমি পণ্ডিতজীকে মায়ের দর্শন করাইব? তাঁহাকে মায়ের দর্শন না করাইয়া আমি ভাগবত শুনিতেও মণ্ডপে যাইতে পারিতেছিনা। এই রকম বিপদে পড়িয়া মায়ের উঠিবার জন্য বারবার প্রার্থনা করিতেছি এবং কান পাতিয়া শুনিতেছি মণ্ডপে "শ্রীকৃষ্ণ গোবিন্দ হরে মুরারে, হে নাথ নারায়ণ বাসুদেব" নামকীর্তন চলিতেছে। কীর্তন শেষ হইলেই স্বামীজী পুনরায় ব্যাখ্যা শুরু করিবেন। সঙ্গে সঙ্গে শ্রীভগবানকে মনে মনে বলিলাম, "হে ভগবান! এইভাবে একটা কারণ সৃষ্টি করিয়া তোমার মধুর লীলা-শ্রবণ হইতে আমাকে বঞ্চিত করিলে। ঠাকুর! তুমি কি আমার আন্তরিক ইচ্ছা জান না?" আমার ভাগবত-কথা-শ্রবণ এই রকম করিয়া খণ্ডিত হইতে চলিল বলিয়া অত্যন্ত মনস্তাপ ভোগ করিতে লাগিলাম।

এই প্রকার মানসিক পরিস্থিতির মধ্যে পড়িয়া মাকে ডাকা ব্যতীত আর অন্য উপায়ই বা কি আছে। মনে হয় অধম সন্তানের আকুল প্রার্থনা মায়ের কাছে পৌঁছিয়াছে! একটু পরেই দেখি অন্তর্যামিনী করুণাময়ী জননী আমার শয়ন হইতে উঠিয়াই একেবারে বাহিরে ছাতের উপর আমাদের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার চক্ষু দুইটি তখনও লাল ও ঢুলুঢুলু—যেন কাঁচা ঘুম হইতে উঠিয়া আসিয়াছেন। মাকে প্রণামান্তর নিবেদন করিলাম, "মা! স্বামী শ্রীবিষ্ণু আশ্রমজী তাঁহার পরিচিত এই ভদ্রলোকটিকে তোমার দর্শনের জন্য পাঠাইয়াছেন। ইনি খুর্জার একজন সংস্কৃতের বড় পণ্ডিত ও অধ্যাপক।"

পণ্ডিতজী মাকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করতঃ অতিশয় বিনীতভাবে নিবেদন করিলেন, অনেকদিন যাবৎই তিনি সোলনের জ্যোতিষী পণ্ডিত শ্রীহরিদত্ত শাস্ত্রীর নিকট মায়ের কথা শুনিয়া আসিতেছেন এবং সেখান হইতে প্রকাশিত হিন্দী পঞ্জিকাতে মায়ের ছবিও তিনি দেখিয়াছেন কিন্তু এতদিন পর্যন্ত সাক্ষাৎরূপে তাঁহার দর্শন লাভের সৌভাগ্য হয় নাই। আজ মায়ের শ্রীচরণ দর্শন করিয়া তিনি

নিজেকে ধন্য মনে করিতেছেন। পণ্ডিতজীর বক্তব্য শেষ হইতেই কোন কথাবার্তা না বলিয়াই মা হঠাৎ তাঁহার ঘরের মধ্যে গিয়া নিজে হাতে করিয়া আনিয়া পণ্ডিতজীকে একখানি গীতা এবং তাঁহার সঙ্গীয় লোকটিকে একখানি গীতা ও বিষ্ণুসহস্রনাম সম্বলিত পুস্তক দিলেন। পণ্ডিতজী মাকে প্রণাম করিয়া কৃতজ্ঞতার সহিত বলিলেন, মা! আপনি শক্তিরূপিণী মহামায়া! আপনি শক্তি প্রদান করুন যেন গীতার প্রদর্শিত পথে চলিতে পারি।

আমি মাকে নিবেদন করিলাম, "মা! আমি কেবলই ভাবিতে-ছিলাম কখন তুমি উঠিবে। তুমি না উঠিলে, পণ্ডিতজীকে তোমার সঙ্গে দেখা না করাইয়া আমি পাঠে যাইতে পারি না। কারণ স্বামী বিষ্ণু আশ্রমজী তোমার দর্শনের জন্য এই পণ্ডিতজীকে পাঠাইয়াছেন। তাঁহাকে তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎকার না করাইয়া পাঠে গেলে তিনিই বা কি মনে করিবেন? আমি ভাবিয়াছিলাম সন্ন্যাসীর মুখে সম্পূর্ণ ভাগবত ব্যাখ্যা শুনিব। কিন্তু মাঝে এই একটি কারণ উপস্থিত হইয়া তাহা আর হইল না। শ্রীভগবান্ দয়া না করিলে তাঁহার লীলাকথা শ্রবণ করা যায় না।" আমার এই কথা শুনিয়া মা বলিলেন, "এই শরীরটা বিছানার উপর পড়িয়াছিল। হঠাৎ খেয়াল হইল তাই একেবারে বাহিরে চলিয়া আসিয়াছে। নচেৎ এখন বাহিরে আসিবার কোন কারণ ছিল না।"

আমরাই নিদ্রার সময় তমোগুণের প্রাবল্যে অচেতন হইয়া পড়ি। মা তো আর ঘুমের সময় চৈতন্য হারাইয়া ফেলেন না। আমাদের চলিত ভাষায় ইহাকে ঘুম বা নিদ্রা বলা হয়। বাস্তবিক পক্ষে ইহা নিদ্রা নহে। ইহাকে শাস্ত্রে যোগনিদ্রা বলা হইয়াছে অর্থাৎ স্বরূপে অবস্থানপূর্বক সুপ্ত থাকা। এই অবস্থায় সম্পূর্ণ চৈতন্য বিদ্যমান থাকে। শ্রীশ্রীমায়ের পক্ষে জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি, তুরীয় ও তুরীয়াতীত বলিয়া কোন কথা নাই। এইগুলি এক একটা অবস্থা জীবের মধ্যেই দেখিতে পাওয়া যায়। মা তো আর জীব নহেন যে তাঁহার এই সব অবস্থা থাকিবে। মা ঘুমাইয়া ঘুমাইয়াও যে আমাদের ডাক বা প্রার্থনা শোনেন আজ এই ঘটনার দ্বারা তাহা প্রমাণ হইয়া গেল।

কথা প্রসঙ্গে মা বহুবার প্রকাশ করিয়াছেন, "শরীরটা তোমরা দেখ ঘুমের ঘোরে বিছানার উপর পড়িয়া আছে কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে উহা তোমাদের মত ঘুম নহে। জাগ্রতাবস্থায় যেমন শরীরটা দেখে, শোনে, কথা কয়, ঐ সময়ও তেমনই করে।" বাহ্যদৃষ্টিতে নিদ্রা ও সমাধির মধ্যে যে কি পার্থক্য তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। তমোগুণের প্রবলতার দরুন নিদ্রিত অবস্থায় চৈতন্য লুপ্তপ্রায় থাকে এবং দেহ ও ইন্দ্রিয়াদি অসাড় বা অনুভূতি শূন্যাবস্থায় অবস্থান করে। সমাধিকালে সত্ত্বগুণের আধিক্য হেতু চৈতন্য পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও দেহ ও ইন্দ্রিয়াদি অসাড়াবস্থায় পড়িয়া থাকে। সমাধিতে চৈতন্য পূর্ণভাবে থাকে, নিদ্রাতে উহা লোপ হইয়া যায়।

মনে মনে মায়ের চরণে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিয়া আমি অত্যন্ত তাড়াতাড়ি সভামণ্ডপে পাঠের স্থানে আসিয়া দেখিলাম তখনও "শ্রীকৃষ্ণ গোবিন্দ হরে মুরারে, হে নাথ নারায়ণ বাসুদেব" নাম কীর্তন চলিতেছে এবং স্বামীজী ব্যাসাসনে স্থির হইয়া বসিয়া আছেন। মাইক (Microphone) কাজ করিতেছে না, বৈদ্যুতিক প্রবাহ (Electric current) বন্ধ হইয়া গিয়াছে! আশ্চর্যের বিষয়! শ্রীভগবানের অপার মহিমা! আমি ব্যাখ্যানের স্থানে গিয়া বসিতেই বৈদ্যুতিক প্রবাহ আসিতে লাগিল, মাইক চালু হইল এবং সঙ্গে সঙ্গে স্বামীজীও তাঁহার ভাগবত ব্যাখ্যা পুনরায় আরম্ভ করিলেন। যে পর্যন্ত শ্রীকৃষ্ণলীলা আমি শ্রবণ করিয়াছিলাম তারপর হইতে তিনি ব্যাখ্যা করিতে শুরু করিলেন। ইহা কি কম আশ্চর্যের কথা! ভগবানের কৃপা ও মায়ের করুণা ব্যতীত ইহা কখন সম্ভব হয় না। আমার ভাগবত শ্রবণ খণ্ডিত হইল না।

একটু চিন্তা করিবার বিষয়। ঐ দিকে করুণাময়ী শ্রীশ্রীমাও অসময়ে শয়ন হইতে উঠিয়া পড়িলেন এবং এদিকে বিদ্যুৎপ্রবাহ বন্ধ হইয়া যাওয়ায় মাইক চালু না হইবার কারণে ভাগবত ব্যাখ্যাও থামিয়া গিয়াছিল। এই দুইটি ঘটনা যুগপৎ সংঘটিত না হইলে কিন্তু আমার সম্পূর্ণ ভাগবত ব্যাখ্যা শ্রবণের অভিলাষ পূর্ণ হয় না। শ্রীমদ্ভাগবত হইলেন শ্রীভগবানের বাঙ্‌ময়ী মূর্তি। ভগবান

এবং ভাগবত অভিন্ন। ভগবান, ভাগবত ও মায়ের নিকট প্রার্থনা পৃথক্ পৃথক্‌ভাবে জানাইলেও ফল কিন্তু আসিল একস্থান হইতেই। শ্রীশ্রীমা, শ্রীশ্রীভগবান্ এবং শ্রীশ্রীভাগবত একই। তাই পরম ভাগবত শ্রীনাভাজী মহারাজ এই পরম সত্যটি বা তত্ত্বটি অতি সুন্দর ভাবে একটি হিন্দী শ্লোকে বর্ণন করিয়াছেন—

ভক্তি ভক্ত ভগবন্ত গুরু চতুর্নাম বপু এক।
ইন্‌কে চরণ বন্দন সে নাশে বিঘন অনেক॥

ভক্তি, ভক্ত, ভগবান্ ও গুরু এই চারিটি নাম পৃথক্ পৃথক্ হইলেও তত্ত্বদৃষ্টিতে এই চারিটি একই বস্তু। ইহাদের চরণ বন্দনা করিলে বহু বিঘ্ননাশ হইয়া যায়।

সাধনার সুবিধার জন্য মায়ের বিভিন্ন স্থানে আশ্রম নির্মাণ এবং তাঁহার ছয়টি সাধারণ উপদেশ

সন্তানবৎসলা পরমস্নেহময়ী করুণাময়ী শ্রীশ্রীমা যাঁহাকে কৃপা করেন, তিনি ভাল কি মন্দ, পাপী কি পুণ্যাত্মা, মূর্খ কি বিদ্বান্, গরীব কি ধনী, ইহার কিছুই বিচার তিনি করেন না। প্রকৃত অহৈতুকী কৃপার তাৎপর্যই হইল ইহা। অযোগ্যের প্রতি যে দয়া তাহাকেই বলে অহৈতুকী কৃপা। নিম্নলিখিত শ্লোকে ইহা পরিস্ফুট হইয়াছে।

* * * পুণ্যবস্তং
স তরতি নিজপুণ্যৈস্তত্র কিস্তে মহত্ত্বম্।
যদি চ গতিবিহীনং তারয়েঃ পাপিনং মাং
তদিহ তব মহত্ত্বং তন্মহত্ত্বং মহত্ত্বম্॥

পুণ্যবান্ তো নিজের পুণ্যবলেই উদ্ধার পায়, তাহাতে তোমার মহত্ত্ব কি ? যদি এই অগতি মহাপাপী আমাকে উদ্ধার করিতে পার, তবেই এই জগতে তোমার মহত্ত্ব প্রকাশ পাইবে ; এবং সেই মহত্ত্বই প্রকৃত মহত্ত্ব। তবেই মা তোমার পতিতপাবনী নামের যথার্থ সফলতা। এক দৃষ্টিতে দেখিলে শ্রীশ্রীমায়ের করুণা তো সমভাবে সকলের উপরই সদা বর্ষাকালের শ্রাবণের জলধারার ন্যায় বর্ষিত হইতেছে তাহাতে কিছু মাত্র সন্দেহের অবকাশ নাই। তথাপি দেখিতে পাই যাঁহারা তাঁহার নিকট যাতায়াত করেন তাঁহাদের ধর্মপথে চলিবার জন্য বা ভগবন্মুখী হইবার জন্য সর্বদাই তিনি নানাভাবে উপদেশ দিয়া থাকেন। শ্রীভগবানকে বাদ দিয়া যে মানুষ বাস্তবিক সুখ-শান্তি লাভ করিতে পারে না, তাহা মা পুনঃ পুনঃ সকলকে বলিয়া আসিতেছেন। মানব মাত্রকেই ভগবানের দিকে পরিচালিত করিবার জন্যই যেন তাঁহার এই ভাবঘন দিব্য লীলাদেহ ধারণ। ভগবন্-বিমুখ কলির জীবের দুর্দশা দেখিয়াই যেন তিনি তাঁহার নিত্য চিন্ময়ধামে থাকিতে না পারিয়া আমাদের মত

পতিত ও সম্বলহীনদের পরিত্রাণ করিবার জন্য এই কল্মষপূর্ণ ধূলার ধরায় দয়া করিয়া করুণাময়ী মাতৃরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন।

যদি কেহ ঘুণাক্ষরেও সদ্ভাবে জীবন যাপন করতঃ ভগবদ্‌ভজনের অভিলাষ শ্রীশ্রীমায়ের রাতুল চরণে জ্ঞাপন করেন, তিনি তাহাকে তাহার জন্য সর্বতোভাবে সাহায্য ও উৎসাহ প্রদান করিয়া থাকেন। ধর্ম সংক্রান্ত কোন বিষয়ে সাহায্য করিতে কেহ কখনও তাঁহাকে পরাঙ্মুখ হইতে দেখে নাই। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে তিনি প্রত্যেককে আপন আপন সংস্কার, ভাব ও রুচি অনুযায়ী সাধন ভজন, জপ ধ্যান, যোগ আরাধনা ও আত্মবিচারদ্বারা মানব-জীবন সার্থক করিবার উপদেশ দান করিয়া বিশ্বের অশেষ কল্যাণ সাধন করিতেছেন। ইহা আমি সুদীর্ঘ অর্ধশতাব্দী যাবৎ লক্ষ্য করিতেছি। পরমস্নেহময়ী শ্রীশ্রীমাকে উপলক্ষ্য করিয়া যে এত আশ্রমাদি প্রতিষ্ঠা আমার তো মনে হয় ইহারও একটা সার্থকতা আছে। যাহার যেস্থান সাধন ভজনের অনুকূল বলিয়া মনে হয় তিনি সেইখানে গিয়া আপন আপন সংস্কার, ভাব ও রুচি অনুসারে সাধনায় আত্মনিয়োগ করিতে পারেন। স্থান ও পরিবেশ সাধনার সহায়ক হইলে মন সহজেই একাগ্র হয়। কেহ যদি উত্তরাখণ্ডের তপোভূমি হিমালয়ের নির্জন স্থানে বাস করিয়া তপস্যা করিতে ইচ্ছা করেন তাহার জন্য ধবলচীনা, আলমোড়া, উত্তরকাশী, দেহরাদুন প্রভৃতি জন কোলাহল-শূন্য পার্বত্য প্রদেশে আশ্রম বিদ্যমান রহিয়াছে। কেহ যদি দিগন্তব্যাপী সমুদ্রের তীরে থাকিয়া সাধন-ভজনের পক্ষে সুবিধাজনক মনে করেন, তাহার জন্য রহিয়াছে মায়ের পুরীর আশ্রম। কেহ যদি নর্মদাতটে যোগাভ্যাসের নিমিত্ত অনুকূল একান্ত স্থান অনুসন্ধান করেন, তাহার জন্য মা করিয়া রাখিয়াছেন তাঁহার ভীমপুরার অতি সুন্দর ও মনোরম আশ্রমখানি। কেহ হয় তো ধ্যানী বুদ্ধের গভীর ভাব লইয়া গৌতমবুদ্ধের কোন সাধনক্ষেত্রে ধ্যানে ডুবিয়া থাকিতে অভিলাষী, তাহার জন্য নির্মিত হইয়াছে রাজগৃহের গৃধ্রকুট পর্বতের পাদদেশে অবস্থিত রাজগিরের স্বাস্থ্যকর স্থানে সুন্দর আশ্রম। কেহ হয়তো শেষ জীবনে কোন তীর্থস্থানে বাস করিয়া সাধন ভজনে কালাতিপাত করিতে বাসনা করেন, তাহার নিমিত্ত রহিয়াছে

হরিদ্বার (কনখল), বিন্ধ্যাচল, বৃন্দাবন ও বারাণসীর পতিতপাবনী উত্তর- বাহিনী গঙ্গাতীরে অতি মনোমুগ্ধকর ও বসবাসের সুব্যবস্থা-সমন্বিত আশ্রম। এইভাবে যে যেখানে অবস্থান করিয়া সদ্ভাবে জীবন যাপন করতঃ শ্রীভগবানের দিকে অগ্রসর হইবার বাসনা করেন, তাহাদের জন্য সর্বপ্রকার সুব্যবস্থাই দয়াময়ী শ্রীশ্রীমা দয়া করিয়া রাখিয়াছেন। পুণা, দিল্লী, কলিকাতা প্রভৃতি মহানগরীতেও মায়ের আশ্রমের অভাব নাই। এই সকল আশ্রমে বর্তমান সময়োপযোগী সকল প্রকার সুখ ও সুবিধার ব্যবস্থার কোন রকম ত্রুটি নাই। যাহাতে সকলে আরামে ধ্যান ধারণা, জপ তপ ও সাধন ভজন করিতে পারে সে দিকেও মায়ের পূর্ণ দৃষ্টি রহিয়াছে। বিভিন্ন ভাব, সংস্কার ও রুচি অনুযায়ী সাধনের ব্যবস্থা কেবল মায়ের আশ্রম সমূহেই প্রাপ্ত হওয়া যায়। অন্যত্র এইরূপ সুবিধা কোথায়ও বড় পাওয়া যায় না। বিদেশীদের রুচি ও সুবিধামত সাধনভজনের ব্যবস্থা মায়ের কনখল আশ্রমে গড়িয়া উঠিতেছে।

অনেকেই প্রশ্ন করেন ; মা দেশে দেশে এত ঘুরিয়া বেড়ান কেন? মানুষের সকল জিজ্ঞাসার উত্তর দেওয়া কঠিন। যদি মা কোথায়ও না গিয়া এক জায়গায়ই বাস করিতেন তাহা হইলেও তো কেহ প্রশ্ন করিতে পারিতেন, মা কোথায়ও না গিয়া এক স্থানেই থাকেন কেন ? মনুষ্যের এই কেন'র আর শেষ নাই। শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী কেন যে ভারতের সর্বত্র এত ভ্রমণ করেন এবং ইহার প্রকৃত উদ্দেশ্য যে কি তাহা তিনিই জানেন। তবে ইহার দ্বারা যে লোকের কল্যাণই হইতেছে ইহা মনে করা যাইতে পারে। তিনি যদি তাঁহার কোন একটি বিশেষ আশ্রমেই নিবদ্ধ থাকিতেন তাহা হইলে জনসাধারণের তাঁহার সংস্পর্শে আসিবার সুযোগ হইত না। হয়তো কতিপয় ধনী ব্যক্তিই শ্রীশ্রীমায়ের সমীপে গমন করিবার সৌভাগ্য প্রাপ্ত হইতেন এবং তাঁহার দেবদুর্লভ তথা পরমানন্দদায়ক দর্শনের যে অমোঘ ফল তাহা লাভে সমর্থ হইতেন। কিন্তু ধনহীনেরা অর্থব্যয় করিয়া তাঁহার নিকট যাইতে পারিতেন না, ফলে তাঁহার দিব্য দর্শন হইতে বঞ্চিত থাকিতেন। মা এইভাবে ভারতব্যাপী পর্যটন করিবার দরুন জনসাধারণ, বিশেষ করিয়া

যাহারা নির্ধন, যাহারা অর্থব্যয় করিয়া দূর দেশে গিয়া তাঁহার শ্রীচরণ দর্শনে অসমর্থ, তাহারা স্নেহময়ী মাকে অনায়াসে ঘরে বসিয়া পাইবার সুযোগে কৃতার্থ হইতেছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য যেমন সংসারদুঃখে জর্জরিত কলির জীবের দ্বারে দ্বারে গিয়া যাচিয়া যাচিয়া নাম বিলাইয়া ছিলেন, তেমনি আমাদের এই সন্তানবৎসলা শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে ব্যাপকভাবে ভ্রমণ করিয়া জাতি-বর্ণ-ধর্মনির্বিশেষে মানবমাত্রকে শান্তির অমিয়সাগরের সন্ধান দিয়া তাহাদের জীবন ধন্য করিতেছেন। কিসের জন্য যে তিনি কি করেন তাহা আমাদের মত সাধারণ মানুষের বুদ্ধির অগোচর। তবে তাঁহার এই পর্যটনের দ্বারা যে মানব-সমাজের অশেষ কল্যাণ হইতেছে তাহা নিঃসঙ্কোচে বলা যাইতে পারে।

কোন জাতি, কি বর্ণ, কি ধর্ম বিচার না করিয়া বিশ্বের মানব-মাত্রকেই বিশ্বজননী মা তাঁহার স্বভাব-সুলভ সহজ ও সরল ভাষায় উপদেশ দিয়া থাকেন। যাহাদ্বারা তাহারা পরম কল্যাণের অধিকারী হইয়া আপন আপন অমূল্য জীবন সার্থক করিতে পারেন। সেই উপদেশসমূহের মধ্যে নিম্নলিখিত ছয়টি মূল্যবান উপদেশ শ্রীশ্রীমায়ের মুখকমল হইতে একবার বৃন্দাবনে একটি যুবককে দান করিতে শুনিবার আমার সৌভাগ্য হইয়াছিল। অনেকদিনের পুরাতন কথা বলিতে যাইতেছি। শীতের সময় একবার মা বৃন্দাবনে ছিলেন। আমরাও অনেকেই তাঁহার সঙ্গে ছিলাম। আশ্রমবাসী কেহ একজন বিকালবেলা মাকে গিয়া সংবাদ দিলেন, প্রায় পঞ্চাশজন মার্কিন-দেশীয় পর্যটক তাঁহাকে দর্শন করিতে আসিয়াছেন। সংবাদদাতাকে মা বলিলেন, "এই ঘরে তো এত লোকের বসিবার স্থান হইবে না। উহাদের হলে (Hall) বসাও। এই শরীর হলে যাইতেছে।" মা হলে আসিয়া বসিলে দর্শনার্থীদের মধ্যে কেহ কেহ আসন, প্রাণায়াম ও যোগ সম্বন্ধে মাকে প্রশ্ন করিলেন। দোভাষীর মাধ্যমে মা তাহাদের প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিলেন। তাহারা মায়ের উত্তরে প্রসন্নতা প্রকাশ করিয়া চলিয়া গেলে একটি এতদ্দেশীয় (উত্তর ভারতের অধিবাসী) শিক্ষিত যুবক দাঁড়াইয়া বলিল, "আমি ধর্ম

ও ঈশ্বর মানি না। আমাকে এমন কিছু উপদেশ প্রদান করুন যাহাদ্বারা আমি জীবনে উন্নতি ও সর্বপ্রকার দুঃখ হইতে মুক্ত হইতে পারি।" মা যুবকটিকে অতি স্নেহের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবা! তুমি ধর্ম মান না। ঈশ্বর মান না। নীতি তো মান?" সে উত্তরে বলিল, "সমাজহিতকর নীতি আমি স্বীকার করি।" মা তাহাকে নিম্ন লিখিত ছয়টি উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। এই উপদেশগুলি বলিতে মাকে ক্ষণিকের জন্যও চিন্তা করিতে হয় নাই অথচ মা কোন পুস্তকাদিও পড়েন না এবং ভাষণাদিও প্রদান করেন না। আরও আশ্চর্যের বিষয়, ছয়টি উপদেশই "স" দিয়া আরম্ভ। মা বলিলেন এই উপদেশগুলি জীবনে ঠিক ঠিক ভাবে প্রতিপালন করিলে সর্বপ্রকার দুঃখের কবল হইতে মুক্ত হওয়া যায়। সবগুলি পালন করিতে পারিলে খুবই ভাল, নচেৎ প্রথমটি পালন করিতে সর্বতোভাবে চেষ্টা করা অবশ্য কর্তব্য। প্রথমটি যথাযথ পালন করিতে গেলে অন্যগুলিও ক্রমশঃ ক্রমশঃ স্বয়ং আসিয়া পড়িবে। তাহার জন্য পৃথক্ প্রযত্ন করিবার প্রয়োজন হইবে না। ইহার মহিমা একবাক্যে সর্বত্র ঘোষিত হইয়াছে।

(১) **সত্য**—সত্য হইল শ্রীভগবানের পরাৎপর ব্রহ্মের স্বরূপ। ব্রহ্মের স্বরূপ যে সত্য ইহা উপনিষদে পুনঃপুনঃ বর্ণিত হইয়াছে, যথা 'সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম', 'সত্যমেব জয়তে নানৃতম্', 'সত্যং শিবং আনন্দং ব্রহ্ম', অস্তীতি সত্যম্', 'হিরন্ময়েন পাত্রেন সত্যস্যাপিহিতং মুখম্', 'তৎ সত্যমিত্যাচক্ষতে' ইত্যাদি।

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীভগবানকে 'সত্য' বলা হইয়াছে যথা "সদা নিরস্তকুহকং সত্যং পরং ধীমহি"—সর্বদা মায়া হইতে মুক্ত এমন যে পরম সত্য তাঁহাকে আমি ধ্যান করি। এই শ্লোকে বলা হয় নাই, কৃষ্ণকে ধ্যান করি, কি রামকে ধ্যান করি, কি শিবকে ধ্যান করি, কি কালীকে ধ্যান করি, কি দুর্গাকে ধ্যান করি, কি গণেশকে ধ্যান করি, কি সূর্যকে ধ্যান করি। বলা হইয়াছে পরম সত্যকে ধ্যান করি। শাস্ত্রে সত্যের এতই মহিমা। যে সব ঘটনা দেখা হইয়াছে, যে সকল বাক্য বলা হইয়াছে কিংবা শ্রবণ করা হইয়াছে অথবা যে সব কার্য সম্পাদন করা হইয়াছে, সেই সকল যথাযথরূপে, না বাড়াইয়া বা না

কমাইয়া বলা, সত্য বলা। কিন্তু প্রকৃত সত্য হইল, "পরহিতার্থং বাঙ্‌মনসয়োর্যথার্থত্বং সত্যম্।" পরহিতার্থ বাক্য ও মনের যে যথার্থত্ব তাহাই সত্য। ইহাদ্বারা সূচিত হইতেছে যাহাতে পরের হিত হয়, বাক্য ও মনের দ্বারা তদ্রূপ আচরণই সত্য। যথাদৃষ্ট ঘটনাবলী বিবৃত করিবার নামও সত্য বটে কিন্তু তাহা আংশিক সত্য, পূর্ণ সত্য নহে।

সত্যরক্ষার জন্য মহারাজ শ্রীহরিশ্চন্দ্র নিজেকে চণ্ডালের হস্তে বিক্রয় করিয়া শ্মশানে শবদাহের কড়ি আদায় করিতেন। এমন কি তাঁহার সহধর্মিণী মহারাণী শৈব্যাকে পর্যন্ত সত্যরক্ষার নিমিত্ত, ব্রাহ্মণের নিকট বিক্রয় করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। শৈব্যা যখন তাঁহার একমাত্র পুত্র রোহিতাশ্বকে দাহ করিতে শ্মশানে লইয়া আসেন, তাঁহার নিকট হইতেও শবদাহের কর গ্রহণ না করিয়া আপন পুত্রকে দাহ করিতে অনুমতি প্রদান করেন নাই। ইহাকে বলে সত্যরক্ষা বা সত্যপালন। সত্যরক্ষা হইতে বড় কোন ধর্ম নাই।

অযোধ্যাধিপতি মহারাজ দশরথের সুযোগ্য পুত্র মর্যাদা-পুরুষোত্তম পরাৎপর সাকার বা সবিশেষ ব্রহ্ম ভগবান্ শ্রীরাম, পিতার সত্যরক্ষার নিমিত্ত, চৌদ্দ বৎসরের জন্য রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া বনে কতই না কষ্ট সহ্য করিয়াছিলেন। এই প্রকার সত্য-পালনের বহু উদাহরণ পুরাণাদি শাস্ত্রে বর্ণিত আছে। সত্যকে কায়মনোবাক্যে আশ্রয় করা এবং মিথ্যাকে সর্বতোভাবে বর্জন করা মানবজীবনের আদর্শ হওয়া উচিত। কাহাকেও কোন কথা দিলে উহা যথা সময়ে পালন করিতে মা সব সময়ই সকলকে বলিয়া থাকেন। সত্যের প্রশংসা করিতে গিয়া ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির মহাভারতে বলিয়াছেন—

অশ্বমেধসহস্রঞ্চ সত্যঞ্চ তুলয়াধৃতম্।
অশ্বমেধসহস্রাচ্চ সত্যমেকং বিশিষ্যতে ॥

যদি সহস্র অশ্বমেধযজ্ঞ এবং সত্যকে ওজন বা তৌল করা যায় তাহা হইলে দেখা যাইবে সহস্র অশ্বমেধ হইতেও সত্য শ্রেষ্ঠ। স্বদেশ-প্রেমিক মহারাণা প্রতাপ সিংহ বলিতেন, "সত্য এবং নির্ভীক

হৃদয়ের কখনও মৃত্যু হয় না।" সত্য সম্বন্ধে কথা উঠিলে আমাদের শ্রীশ্রীমা অনেক সময়ই নিম্নলিখিত কাহিনীটি বলেন।

এক রাজা তাঁহার রাজ্যের মধ্যে নূতন এক বাজার বসাইয়া ঘোষণা করিলেন, বাজারে যে জিনিস বিক্রয় হইবে না সেই পদার্থ তিনি ক্রয় করিবেন। একদিন এক কুম্ভকার (কুমোর) এক অলক্ষ্মীর মূর্তি তৈয়ার করিয়া বাজারে বিক্রয়ের জন্য আনিল। পয়সা দিয়া কে অলক্ষ্মীকে আপন ঘরে লইয়া যাইবে? এমন মূর্খ জগতে কে আছে?

সন্ধ্যার প্রাক্কালে কুম্ভকার তাহার অলক্ষ্মীর মূর্তি লইয়া রাজার কাছে গিয়া নিবেদন করিল, 'মহারাজ! আমার এই মূর্তি বাজারে কেহ আজ ক্রয় করে নাই। আপনি ঘোষণা করিয়া ছিলেন যাহা বাজারে কেহ ক্রয় করিবে না তাহা আপনি ন্যায্য মূল্য দিয়া কিনিয়া লইবেন। অতএব মূর্তির উচিত দাম দিয়া আপনি ইহা গ্রহণ করুন'। সত্যবাদী রাজা মূর্তির ন্যায়সঙ্গত মূল্য কুম্ভকারকে প্রদান করিয়া মূর্তি রাজ অন্তঃপুরে লইয়া গেলেন। রাজবাড়ীতে অলক্ষ্মীর প্রবেশ হইবার সঙ্গে সঙ্গে শ্রীলক্ষ্মী দেবী রাজ্য ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন। গমনকালে লক্ষ্মীদেবী রাজাকে বলিলেন, "রাজন! তুমি অলক্ষ্মীকে ঘরে আনিয়াছ সেইজন্য আমি লক্ষ্মী, তোমাকে ত্যাগ করিয়া যাইতেছি। অলক্ষ্মীর সঙ্গে আমি কি করিয়া বাস করিব?" রাজা উত্তর দিলেন, "মালক্ষ্মী! আমি সত্যানুরাগী ব্যক্তি। আমি সব ত্যাগ করিতে পারি কিন্তু সত্যকে ত্যাগ করিতে পারি না।" লক্ষ্মীর সঙ্গে সঙ্গে নারায়ণও গেলেন। যেখানে লক্ষ্মী, নাই সেখানে নারায়ণ কি করিয়া থাকিবেন? নারায়ণ চলিয়া গেলে সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য সকল দেব দেবীও একে একে রাজাকে পরিত্যাগ করিয়া গমন করিলেন। রাজার দুর্দশার আর সীমা নাই। রাজা এখন সর্বস্বান্ত হইয়া ভিখারী হইয়াছেন। সর্বশেষে একদিন যখন সত্যও গমন করিতে উদ্যত হইলেন তখন রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কে?" তিনি উত্তর দিলেন, "আমি সত্য"। রাজা পুনরায় প্রশ্ন করিলেন, "আপনার যাইবার কারণ"? তিনি বলিলেন, "যেখানে নারায়ণ নাই, লক্ষ্মী নাই, অন্যান্য দেব দেবী নাই সেখানে আমি কি করিয়া

থাকিব ?" রাজা বলিলেন, "আপনি কোন মতেই আমাকে ত্যাগ করিয়া যাইতে পারিবেন না। আপনার জন্যই আমার আজ এই অবস্থা। সত্যপালনের জন্য আমি লক্ষ্মী নারায়ণ ও অন্যান্য সকল দেব দেবীকে হারাইয়াছি। ভাগ্য, ভূমি, ঐশ্বর্যাদি হইতে বঞ্চিত হইয়া আজ আমি পথের ভিক্ষুক। অতএব আপনি কোন রকমেই আমাকে পরিত্যাগ করিয়া যাইতে পারিবেন না। আপনার সাধ্য কি যে আপনি আমাকে ত্যাগ করিয়া এক পাও গমন করেন ?" সত্য যখন যাইতে পারিলেন না তখন সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম, নারায়ণ, লক্ষ্মী, অন্যান্য দেব দেবী, ভাগ্য, ভূমি, ঐশ্বর্যাদি সকলেই একে একে রাজার নিকট পুনরায় প্রত্যাবর্তন করিলেন। সত্যরক্ষার প্রভাবে রাজার পূর্বাপেক্ষা অধিক ধন, সম্পত্তি ও শ্রীবৃদ্ধি হইল। সত্যের এমনই মহিমা। সত্যের জয় সর্বত্র হইয়া থাকে। মুণ্ডকোপনিষদে তাই বলা হইয়াছে "সত্যমেব জয়তে নানৃতম্"।

(২) **সরলতা**—লোকের সহিত ব্যবহারে কোন প্রকার ভাব গোপন না করিয়া নির্ভয়ে মন মুখ এক করিয়া সহজ আচরণের নাম সরলতা। শ্রীশ্রীমা এই সরল ব্যবহারের বড়ই পক্ষপাতী। শাস্ত্রও স্পষ্ট নির্দেশ করিতেছেন—

মনস্যেকং বচস্যেকং কর্মণ্যেকং মহাত্মনাং।
মনস্যন্যৎ বচস্যন্যৎ কর্মণ্যন্যৎ দুরাত্মনাম্॥

যাঁহার মন, বাক্য ও কর্ম একরূপ তিনি মহাত্মা এবং যাহার মন এক রকম, বাক্য অন্য রকম এবং কর্ম আরেক প্রকার তাহাকে দুরাত্মা কহে। ধর্মজীবন যাপন করিতে হইলে সরলতার বিশেষ প্রয়োজন। সত্যের সহিত সরলতার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। যে সত্যানুরাগী সে কখনও অসরল বা কুটিল হইতে পারে না। যে সরল সে কখনও মিথ্যাচরণ বা মিথ্যাকথা বলে না, কারণ একটা মিথ্যা লুকাইতে অনেক মিথ্যার আশ্রয় লইতে হয়। ইহা সরল ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব নয়। ভক্তপ্রবর শ্রীতুলসীদাস গোস্বামী তাঁহার প্রসিদ্ধ 'শ্রীরাম-চরিত মানসে' কপটতা পরিত্যাগপূর্বক সরল হইবার জন্য বারংবার নির্দেশ করিয়াছেন। ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র বলিতেছেন, যাহার মন

নির্মল, এমন যে মনুষ্য সে আমাকে প্রাপ্ত হয়। আমি কপটতা ও ছল ভালবাসি না।

নির্মল মন জন সো মোহি পাবা।
মোহি কপট ছল ছিদ্র ন ভাবা॥

শ্রীরঘুনাথ কোথায় বাস করিবেন জিজ্ঞাসা করায় দণ্ডকারণ্য নিবাসী তপস্বী মহাত্মারা শ্রীরাঘবেন্দ্রকে বলিতেছেন, হে রঘুনাথ! যাঁহার মনে কোন প্রকার কপটতা, দম্ভ ও মায়া নাই, তুমি তাঁহার হৃদয়ে গিয়া বাস কর।

জিন্হকে কপট দম্ভ নহিঁ মায়া।
তিন্হকে হৃদয় বসহু রঘুরায়া॥

কোশলেন্দ্র ভগবান্ শ্রীরাম পুনরায় বলিতেছেন—

তজি মদ মোহ কপট ছল নানা।
করউঁ সদ্য তেহি সাধু সমানা॥

যিনি মদ, মোহ এবং নানা প্রকার ছল ও কপটতা ত্যাগ করিয়া সরল হয়েন তাঁহাকে আমি তৎক্ষণাৎ সাধু করিয়া দেই। রামায়ণে বহু স্থানে এইভাবে ছল ও কপটতা ত্যাগ করিয়া সরল হইবার জন্য বলা হইয়াছে। বহু জন্মের সুকৃতির ফলে মানুষ সরল হয়। সরল হইলে শ্রীভগবানকে পাওয়ার পথ অনেক সুগম হইয়া যায়।

(৩) **সংযম**—সংযম বলিতে সাধারণতঃ বুঝায় ইন্দ্রিয়-সংযম বা ইন্দ্রিয়-নিয়ন্ত্রণ। পঞ্চকর্মেন্দ্রিয়, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় ও মন এই এগারটির দ্বারা বিষয় ভোগ না করিয়া, উহাদের শ্রীভগবানের সেবায় নিয়োগ করাকে বা উহাদের বিষয় হইতে মোড় ফিরাইয়া অন্তর্মুখী করিবার নাম সংযম। মহারাজ শ্রীমনু ধর্মের দশ লক্ষণের মধ্যেও মনের এবং ইন্দ্রিয়ের সংযমের কথা বলিয়াছেন—

ধৃতিঃ ক্ষমা দমোঽস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
ধীর্বিদ্যা সত্যমক্রোধো দশকং ধর্মলক্ষণম্॥

ধৈর্য, ক্ষমা, মনের সংযম, পরের দ্রব্য হরণ না করা, শৌচ, ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ, বুদ্ধি, বিদ্যা, সত্য ও অক্রোধ এই দশটি ধর্মের লক্ষণ। মহর্ষি পতঞ্জলি তাঁহার যোগদর্শনে যম ও নিয়মকে সংযম বলিয়াছেন। অহিংসাসত্যাস্তেয়ব্রহ্মচর্যাপরিগ্রহা যমঃ। শৌচসন্তোষতপঃসাধ্যে-শ্বরপ্রণিধানানি নিয়মঃ। সকল প্রাণীর প্রতি সর্বদা বিদ্বেষভাবকে ত্যাগ করার নাম অহিংসা। বাক্য ও মনের ঐকতানই সত্য। যে সত্যদ্বারা কাহারও অনিষ্ট হয়, জীবের হিংসা হয় তাহা যথার্থ সত্য নহে। পরের দ্রব্য চুরি না করাকে এবং লোভহীনতাকে অস্তেয় কহে। গুপ্ত ইন্দ্রিয়ের সংযম ব্রহ্মচর্য। প্রয়োজনের অতিরিক্ত কোন দ্রব্য সংগ্রহ না করা বা দান গ্রহণে অস্বীকার করা অপরিগ্রহ। এই পাঁচটি হইল যম। শৌচ দুই প্রকার, যথা বাহ্য ও আভ্যন্তরিক। মৃত্তিকা ও জলাদির দ্বারা মার্জন ও পবিত্র সাত্ত্বিক আহার গ্রহণ বাহ্য শৌচ। চিত্তমল দূর করাকে আভ্যন্তরিক বা আন্তর শৌচ কহে। প্রাণায়ামাদিদ্বারা এবং ইষ্টমন্ত্র জপ করিতে করিতে চিত্তের শুদ্ধি হইয়া থাকে। চিত্তে ভোগ বাসনা না জাগিলে এবং ভগবৎপ্রেম উদয় হইলে বুঝিতে হইবে চিত্তমল দূর হইয়াছে। প্রাপ্ত বস্তুর অতিরিক্ত বস্তুর প্রাপ্তির ইচ্ছাশূন্যতাকে সন্তোষ বলে। 'আমার যাহা আছে তাহাতেই আমি তৃপ্ত। আমি আর কিছু চাহি না'—মনের এই অবস্থা বহু জন্মের সুকৃতির ফলে মানুষ পায়। শীত উষ্ণ, ভাল মন্দ, সুখ দুঃখ, মান অপমান দ্বন্দ্ব সহ্য করাকে তপস্যা, মোক্ষশাস্ত্র পাঠ ও প্রণব জপ বা ইষ্টমন্ত্র জপকে স্বাধ্যায় এবং ঈশ্বরের ধ্যান ও সর্বকর্ম তাঁহাকে অর্পণ করাকে ঈশ্বরপ্রণিধান কহে। এই পাঁচটি হইল নিয়ম। যম এবং নিয়ম উভয় মিলিয়া সংযম। সংযত জীবন যাপন করিতে না পারিলে মানুষ ও পশুতে পার্থক্য কি? ইন্দ্রিয়-তর্পণই মনুষ্যজন্মের উদ্দেশ্য নহে। ইহা তো পশুও করিয়া থাকে। মানবের বিশেষত্ব কিসে—তাহা নিম্নলিখিত শ্লোকে বলা হইয়াছে—

'আহার-নিদ্রা-ভয়-মৈথুনঞ্চ সামান্যমেতৎ পশুভির্নরাণাম্।
জ্ঞানং নরাণামধিকং বিশেষো জ্ঞানেন হীনাঃ পশুভিঃ সমানাঃ॥

আহার, নিদ্রা, ভয়, প্রজাসৃষ্টি প্রভৃতি কতকগুলি ক্রিয়া যেমন মনুষ্যে তেমনই পশুতেও বিদ্যমান। পশু হইতে যে মানব শ্রেষ্ঠ তাহার মূলে

রহিয়াছে ইন্দ্রিয় সংযম এবং বিবেক বা জ্ঞান। বিবেক শব্দের দ্বারা বুঝায় ভাল মন্দ, ন্যায়-অন্যায়, হিত-অহিত, সদসদ্, ধর্মাধর্ম, কর্তব্যা-কর্তব্য ইত্যাদি বিচারের জন্য মানুষের অন্তর্নিহিত শক্তি বা জ্ঞান। এই জ্ঞানের জন্যই পশু হইতে মনুষ্য শ্রেষ্ঠ। এই বিবেক মানবে আছে, পশুতে নাই। শ্রীমদ্ভগবদগীতায় শ্রীভগবান্ আত্মসংযমযোগে বলিয়াছেন—

যুক্তাহারবিহারস্য যুক্তচেষ্টস্য কর্মসু।
যুক্তস্বপ্নাববোধস্য যোগো ভবতি দুঃখহা ॥ ৬।১৭ ॥

যাহার আহার ও ভ্রমণ নিয়ত-পরিমাণ, যাহার বিহিত কর্মে চেষ্টা নিয়ত-পরিমাণ এবং যাহার নিদ্রা ও জাগরণ নিয়তকালে হয় সেই যোগীর যোগই দুঃখনাশক হইয়া থাকে। সংযমী পুরুষের সংসারের সর্বপ্রকার দুঃখ সংযমের দ্বারা ক্ষয় বা নাশ হয়। আচার্যচরণ ভগবান্ শ্রীশঙ্কর তাঁহার বিবেকচূড়ামণিতে বলিয়াছেন—

বিষয়েভ্যঃ পরাবর্ত্য স্থাপনং স্বস্বগোলকে।
উভয়েষামিন্দ্রিয়াণাং স দমঃ পরিকীর্তিতঃ ॥ ২৩ ॥

কর্মেন্দ্রিয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয় উভয়কে আপন আপন বিষয়সমূহ হইতে আকর্ষণ করিয়া নিজ নিজ স্থানে স্থির করাকে 'দম' বা ইন্দ্রিয়-সংযম কহে। সকল ধর্মশাস্ত্রেই সংযমের ভূয়সী প্রশংসা দেখিতে পাওয়া যায়। ইন্দ্রিয়-সংযমের সহিত আহার, নিদ্রা ও বাক্-সংযম করিতেও শ্রীশ্রীমা সকলকে বলিয়া থাকেন। বাক্‌সংযম বা মৌনের ভূয়োভূয়ঃ প্রশংসা তাঁহার মুখ হইতে শোনা যায়।

(৪) সেবা—ভগবৎ-বুদ্ধিতে অর্থাৎ সকলকে ভগবান্ মনে করিয়া, কোন প্রকার প্রত্যুপকারের কি যশের আকাঙ্ক্ষা না রাখিয়া নিষ্কামভাবে জীবমাত্রেরই পরিচর্যা করিতে শ্রীশ্রীমা সকলকে উপদেশ দিয়া থাকেন। 'পিতা সাক্ষাৎ ভগবান্ ও মাতা সাক্ষাৎ ভগবতী' এই জ্ঞানে পিতামাতার সেবা করা কর্তব্য। এই সম্বন্ধে উপনিষদের নির্দেশ, "মাতৃদেবো ভব। পিতৃদেবো ভব। আচার্যদেবো ভব। অতিথিদেবো ভব"। তুমি মাতা, পিতা, আচার্য এবং অতিথিতে দেববুদ্ধি করিয়া

সর্বদা শ্রদ্ধা ও ভক্তিপূর্বক ইহাঁদের আজ্ঞাপালন, প্রণাম ও সেবা করিবে। গৃহস্থ মেয়েদের মা সব সময়ই বলেন পতিকে পরমপতি জ্ঞানে, ছেলে মেয়েকে বালগোপাল ও কুমারীকে দেবী মনে করিয়া সর্বদা সেবা ও লালন-পালন করিতে চেষ্টা করিবে। পক্ষান্তরে পুরুষদেরও বলেন স্ত্রীকে "গৃহ-লক্ষ্মী" ভাবিয়া সেবা-যত্ন করা প্রত্যেক পতির কর্তব্য। মাকে প্রায়ই বলিতে শোনা যায়, "যত্র জীবঃ তত্র শিবঃ, যত্র নারী তত্র গৌরী।" সংসারের যত পুরুষ সবই শিব তুল্য এবং যত নারী সকলেই মহামায়া-স্বরূপিণী পরাশক্তি ভগবতী গৌরী। এই বিষয়ের উপর শ্রীমদ্ভাগবতের একটি সুন্দর শ্লোকের উপর দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। শ্লোকটি যথার্থই প্রণিধানের যোগ্য।

আচার্যো ব্রহ্মণো মূর্তিঃ পিতা মূর্তিঃ প্রজাপতেঃ।
ভ্রাতা মরুৎপতে র্মূর্তির্মাতা সাক্ষাৎ ক্ষিতেস্তনুঃ॥
দয়ায়া ভগিনী মূর্তির্ধর্মস্যাত্মাতিথিঃ স্বয়ম্।
অগ্নেরভ্যাগতো মূর্তিঃ সর্বভূতানি চাত্মনঃ॥

দেবতাগণ বিশ্বরূপকে বলিতেছেন, বৎস! আচার্য বেদের, পিতা ব্রহ্মার, ভ্রাতা ইন্দ্রের এবং মাতা সাক্ষাৎ পৃথিবীর মূর্তি। এই প্রকার ভগিনী দয়ার, অতিথি ধর্মের, অভ্যাগত অর্থাৎ নিমন্ত্রিত ব্যক্তি অগ্নির এবং জগতের সকল প্রাণী আপনার আত্মারই মূর্তি জানিবে। আত্মাই ব্রহ্ম, অতএব জগতের সর্বপ্রাণীই পরমাত্মা বা পরব্রহ্ম মনে করিয়া শ্রদ্ধার সহিত সেবাকরা কর্তব্য।

(৫) **সৎসঙ্গ**—ঈশ্বর-বিশ্বাসী, ভগবদ্ভক্ত, সৎলোক ও সাধু মহাত্মার সঙ্গ করিতে শ্রীশ্রীমা সর্বদাই সকলকে বলিয়া থাকেন। সৎসঙ্গের দ্বারা মানবের বহু জন্মের কুসংস্কার এবং অশুভকর্মের ফল বিনষ্ট হয়। সৎসঙ্গের ফল অব্যর্থ অর্থাৎ উহা ফল প্রদান না করিয়া ছাড়েনা। আচার্য ভগবান্ শ্রীআদি শঙ্কর বলিয়াছেন,

"ক্ষণমপি সজ্জনসঙ্গতিরেকা, ভবতি ভবার্ণবতরণে নৌকা।"

রামভক্ত গোস্বামী শ্রীতুলসীদাস তাঁহার শ্রীরামচরিতমানসে সৎসঙ্গের মহিমা বর্ণন করিতে গিয়া বলিয়াছেন,

"বিনু সৎসঙ্গ বিবেক ন হোই।
রাম কৃপা বিনু সুলভন সোই"।

সজ্জন বা সাধুদিগের সঙ্গ বিনা বিবেক, বৈরাগ্য ও তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয় না। এই সাধুসঙ্গ ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের কৃপা ভিন্ন সহজে প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

সৎসঙ্গের কথা উঠিলেই পরম কল্যাণময়ী শ্রীশ্রীমা বৃক্ষতলে বাস করিতে বলেন। গাছের তলায় বসিলে যেমন পাওয়া যায় শীতল ছায়া তেমনি দয়া করিয়া বৃক্ষ প্রদান করেন উহার সুমিষ্ট ফল। তদ্রূপ সৎসঙ্গের দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায় শান্তিরূপ শীতল আশ্রয় এবং ভগবৎ প্রাপ্তিরূপ সুস্বাদু মধুর ফল। শ্রীভগবান্‌কে পাওয়া বা নিজের প্রকৃত স্বরূপকে জানাই হইল। মানবজীবনের পরম সার্থকতা। এই বর্তমান জীবনেই যদি ভগবান্‌কে পাওয়া যায় অথবা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়, তবেই কৃত-কৃত্যতা, নচেৎ "মহতী বিনষ্টিঃ" অর্থাৎ মহান্ বিনাশ বা দীর্ঘকালব্যাপী সংসারগতি লাভ। মায়ের ভাষায় বলিতে হয় "রিটার্ন টিকিট"। মৃত্যুর পর পুনরায় জন্ম-মরণশীল সংসারে আসিবার জন্য টিকিট কাটিয়া রাখা। এই সংসারে তিনটি বস্তু অতীব দুর্লভ যথা "মনুষ্যত্বং মুমুক্ষুত্বং মহাপুরুষসংশ্রয়ঃ।"

(৬) **স্বাধ্যায়**—স্বাধ্যায় শব্দের যথার্থ অর্থ হইল বেদপাঠ। ইহা নিত্য কর্তব্য। যাহাদের বেদ পাঠের অধিকার নাই তাহারা আপন আপন ধর্মগ্রন্থ যেমন হিন্দুদের গীতা, চণ্ডী, ভাগবত, রামায়ণ, মহাভারতাদি; মুসলমানদের কোরাণ সরিফ; ক্রিশ্চানদের পবিত্র বাইবেল; শিখদের গ্রন্থ সাহেব ও সুখমণি; পারশীদের গাথা; বৌদ্ধদের ত্রিপিটক (সুত্ত, অভিধম্ম ও বিনয়, এই তিনভাবে বিভক্ত বৌদ্ধ শাস্ত্রগ্রন্থ) ও জাতক; জৈনদের আগম—এই সকল ধর্মপুস্তক হইতে নিয়মিত রূপে প্রত্যহ কিছু অংশ পাঠ করিতে শ্রীশ্রীমা সকলকে বলিয়া থাকেন। মায়ের বিভিন্ন আশ্রমে এই স্বাধ্যায়টি আশ্রমবাসী সকল নরনারী সমবেতভাবে অথবা পৃথক্ পৃথক্‌ভাবে, যে রূপেই হউক না কেন, নিয়মপূর্বক নিত্যই করেন। ইহা আশ্রমবাসীদের সাধনার একটি অঙ্গ বলিয়া পরিগণিত হয়। তৈত্তিরীয়োপনিষদে বেদ অধ্যাপনান্তে আচার্য শিষ্যকে উপদেশ করিতেছেন, "সত্যং বদ। ধর্মং চর। স্বাধ্যায়ান্মা প্রমদঃ। স্বাধ্যায়-প্রবচনাভ্যাং ন প্রমদিতব্যম্।" সত্য বলিবে, ধর্মানুষ্ঠান করিবে।

অধ্যয়নে প্রমাদ করিবে না। স্বাধ্যায় ও অধ্যাপনা বিষয়ে প্রমাদ-গ্রস্ত (অনবধানগ্রস্ত) হইও না।

উপর্যুক্ত মায়ের এই ছয়টি উপদেশ সাধারণ মানবধর্ম বলিয়া পরিগণিত হইবার যোগ্য। ইহা সর্বদেশের, সর্বকালের এবং সর্ব-ধর্মের লোকের দ্বারাই অনুষ্ঠিত হইতে পারে। ইহাতে কাহারও কোন প্রকার আপত্তি বা বাধা থাকিবার হেতু নাই। ইহা ব্যতীত জপ, ধ্যান, পূজা, যোগাভ্যাস, কীর্তন ও আত্মবিচার করিবার জন্যও মা সর্বদাই প্রত্যেক মনুষ্যকে উপদেশ ও উৎসাহ দিয়া থাকেন। এই সকলের মধ্যে যেঁইটি যাহার ভাব, সংস্কার ও রুচির অনুকূল হয়, মা তাহাকে আত্মকল্যাণের জন্য সেইটিই করিতে বলেন। মা বলেন, "কিছু কর। আলস্য করিয়া বসিয়া থাকিও না। আয়ু নদীর প্রবাহের ন্যায় বহিয়া যাইতেছে। যে দিন যায় সেদিন আর ফিরিয়া আসিবে না। জীবন বৃথা চলিয়া গেলে শেষে পরিতাপ করিলে লাভ কি হইবে?" মায়ের দয়ার সীমা নাই। প্রয়োজন বুঝিলে তিনি স্বয়ং কৃপা করিয়া ডাকিয়া ডাকিয়া, কি ভাবে কি করিতে হয় বলিয়া দেন এবং স্থল বিশেষে নিজে করিয়া দেখাইয়া পর্যন্ত দিয়া থাকেন, তাহাতে করুণাময়ী শ্রীশ্রীমায়ের দিক হইতে কোন প্রকার কৃপণতা বা উদাসীনতা দেখা যায় না।

আমার ব্যক্তিগত বিশ্বাস, মায়ের প্রত্যেকটি সন্তান তাঁহার নিকট হইতে অজস্র করুণা অবিশ্রান্তভাবে নিরন্তর প্রাপ্ত হইয়া আপন আপন জীবন সার্থক করিতেছেন। সেই সকল মহান্ ভাগ্যবান্ ও মহতী ভাগ্যবতীরা তো আর শ্রীশ্রীমায়ের নিকট হইতে প্রাপ্ত কৃপার প্রসঙ্গ সাধারণের কাছে সরলভাবে ব্যক্ত করিবেন না, সেইজন্য সে সকল ঘটনা আমাদের জানিবার উপায় নাই। তাহারা সব অতি গভীর সাগর জলের তিমিঙ্গিল। তাহারা ভাবসমুদ্রের অগাধ সলিলে বাস করেন এবং সাধারণ লোকের চক্ষুর অন্তরালে থাকিতেই তাহারা অভ্যস্ত। আপন ভাব পুষ্ট করিতে হইলে ঐ সকল হৃদয়ানুভূতি গোপন রাখাই উচিত, নচেৎ ভাবের দানা বাঁধে না। তবে তাহারা না জানাইলে জগৎবাসী মায়ের মহিমা জানিবে কি করিয়া?

স্নেহ, ক্ষমা ও করুণার প্রতিমূর্তি শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী

যা দেবী সর্বভূতেষু ক্ষান্তিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥
যা দেবী সর্বভূতেষু দয়ারূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥
যা দেবী সর্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥

গত ১৩৭৬ সনের (১৯৬৯ খৃষ্টাব্দের) আশ্বিন মাসের শারদীয়া শ্রীশ্রীদুর্গা পূজায় শ্রীশ্রীমা কাশী থাকিবেন এই সুসংবাদ বহুপূর্বেই লোকের মুখে মুখে বাতাসের ন্যায় সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। কল্যাণময়ী মা যথাসময়ে বারাণসী শুভাগমন করিয়াছেন। শ্রীশ্রীমায়ের অনন্যভক্ত ও সাত্ত্বিক প্রকৃতির আদর্শ গৃহস্থ শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়, স্বীয়কর্মস্থল হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া কাশীবাস করিবার মানসে, বারাণসীতে নূতন সুন্দর একখানি বাড়ী নির্মাণ করিয়াছেন। নব নির্মিত বাড়ীতে চিন্ময়ী শ্রীশ্রীমা ও তাঁহার মৃন্ময়ীমূর্তি শ্রীশ্রীদুর্গামাকে লইয়া হরিশবাবু সহর্ষে সপরিবারে গৃহপ্রবেশের পূর্ণ উদ্যমে প্রস্তুত হইতেছেন। গৃহপ্রবেশের কয়েকদিন পূর্বে তিনি মায়ের চরণে সবিনয় প্রার্থনা করিলেন, মা যদি একদিন ঐ বাড়ী দয়া করিয়া গিয়া কোথায় কি করিলে কাজের সুবিধা হইবে একটু দেখাইয়া দিয়া আসেন, তাহা হইলে তিনি সেই মত ব্যবস্থা করিবেন। প্রথমে মা সেখানে যাইতে স্বীকার হইলেন না। হরিশবাবুদের পছন্দ মতই সব ব্যবস্থা করিতে বলিলেন। এই প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া আমি মাকে নিবেদন করিলাম, "মা! তুমি যদি একটু কষ্ট করিয়া কোথায় কি করিলে কাজের সুবিধা হইবে সে সম্বন্ধে

একটু নির্দেশ দেও তাহা হইলে তিনি নিশ্চিন্ত হইতে পারেন। তোমাকে তাঁহার বাড়ী লইয়া যাইবেন, মা দুর্গা কৃপা করিয়া আসিবেন, কত চিন্তার কথা। মা তুমি গিয়া পূজার স্থান, নৈবেদ্যের ঘর, ভাড়ার ঘর এবং ভোগ রান্নার স্থান, কোথায় কি হইবে সেই সব অনুগ্রহ করিয়া দেখাইয়া দিলে, তিনি সেইভাবে ব্যবস্থা করিবেন।" আমার এই কথার উপর মা দয়া করিয়া বলিলেন, "তাহা হইলে সময় ঠিক করিয়া একদিন এই শরীরটাকে লইয়া যাইও"। শ্রীশ্রীমায়ের মুখ হইতে এই কথা শ্রবণ করিয়া হরিশবাবু যেন হাতে আকাশের চাঁদ পাইলেন। তিনি কখনও স্বপ্নেও কল্পনা করিতে পারেন নাই যে মা একবার যাইতে অস্বীকার করিয়া পুনরায় যাইতে রাজী হইবেন। তিনি এতই নিরীহ প্রকৃতির ভাল মানুষ যে মায়ের কথার উপর পুনর্বার তাঁহাকে যাইবার জন্য অনুরোধ করা তাঁহার স্বভাবের বিপরীত। যাহা হউক একদিন সময় নির্দিষ্ট করিয়া তিনি শ্রীশ্রীমাকে তাঁহার নব নির্মিত বাড়ী লইয়া গেলেন। করুণাময়ী মা কৃপা করিয়া গিয়া সব দেখাইয়া দিলেন। তাঁহার নির্দেশানুযায়ী সব ব্যবস্থা করার ফলে পূজা সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছিল। কোন প্রকার অসুবিধা বা গণ্ডগোল হয় নাই। মায়ের সবই অপূর্ব !

শ্রীশ্রীদুর্গাষষ্ঠীর দিন সকালবেলা শ্রীশ্রীমা আশ্রমের সব সাধু, সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী ও ব্রহ্মচারিণী সন্তানদের লইয়া হরিশবাবুর বাড়ী যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন। শ্রীগোপালজীর মন্দিরে মাকে ঘিরিয়া আমরা সকলে আনন্দ করিতেছি। মা আনন্দময়ীর সঙ্গে সঙ্গেই আনন্দের হাট চলে। মা আমাকে হরিশবাবুর বাড়ী যাইবার জন্য বলিলেন। আমি মাকে নিবেদন করিলাম, "মা! গতকাল রাত্রিতে হরিশবাবু এবং তাঁহার মধ্যম পুত্র শ্রীমান্ রঞ্জু আমাকে তাঁহাদের বাড়ী গৃহপ্রবেশের সময় যাইবার জন্য বলিয়াছিলেন। আমি তাঁহাদের বুঝাইয়া বলিয়াছি, গৃহস্থের কোন শুভকার্যে সন্ন্যাসীর যোগদান করিতে নাই। শাস্ত্রে নিষেধ আছে। আমি পরে গিয়া একদিন প্রতিমা দর্শন করিয়া আসিব। তাঁহারা পিতা-পুত্র উভয়েই আমার এই কথা মানিয়া লইয়াছেন।"

লোকের অত্যন্ত ভিড়ের দরুনই হউক কিংবা যে কোন কারণেই হউক, আমার এই কথা অনুমান করি মায়ের কান পর্যন্ত পৌঁছিল না। তিনি পুনরায় আমাকে তাঁহার সঙ্গে যাইবার জন্য বলিলেন, এবং আমার কাছে হাত জোড় করিতে লাগিলেন। মায়ের হাত জোড় করাতে আমার মনে অতিশয় দুঃখ হইল। আমি মনে মনে চিন্তা করিলাম, মা বারবার বলা সত্ত্বেও আমি তাঁহার সঙ্গে যাইতেছি না, আমার এই উদ্ধত ও অবাধ্যতার জন্য মা নিশ্চয়ই দুঃখিত হইয়াছেন এবং সেই কারণেই তিনি আমার নিকট হাত জোড় করিতেছেন। সন্ন্যাসীর আদর্শ রক্ষার জন্যই যে আমি যাইতেছি না সেদিকটা মা আদৌ খেয়াল করিতেছেন না। মায়ের কথা না শুনিবার নিমিত্ত আমি দুঃখই অনুভব করিতে ছিলাম, কেবল সন্ন্যাসীর নিয়ম পালন করিবার হেতুই আমার সেখানে না যাইবার মুখ্য কারণ। মায়ের সঙ্গে না যাইবার আরও একটি যে গৌণ হেতু না ছিল তাহা আমি অস্বীকার করিতে পারিব না। সেই কারণ হইল সেখানকার স্থানাভাব। আমার এমন উদ্ভট কতগুলি নিয়ম আছে যাহা কাহারও বাড়ী যাইবার অন্তরায় সৃষ্টি করে। আমার জন্য কাহাকেও অসুবিধায় পড়িতে হয়, ইহা আমি সহ্য করিতে পারি না। ইহা আমার একটা জন্মগত স্বভাব বা মানসিক দুর্বলতা, নচেৎ মায়ের সঙ্গে কোথায়ও যাইতে আপত্তি কি থাকিতে পারে? বিশেষ করিয়া যেখানে আহারাদির ব্যবস্থা থাকে সেখানে যাইতেই এই সৃষ্টিছাড়া নিয়ম বাধা সৃষ্টি করে। এই সময় দেখি পূজা-বাড়ী যাইবার জন্য মা মোটরে গিয়া বসিলেন।

মর্মান্তিক দুঃখ এবং ভারাক্রান্ত হৃদয় লইয়া মায়ের গাড়ীর কাছে গিয়া আমি নিবেদন করিলাম, "মা! তুমি আমাদের কাছে হাত জোড় করিলে আমাদের অকল্যাণ হয়, ক্ষতি হয় এবং আমাদের ইহা অত্যন্ত দুঃখ দেয়। অতএব যাহাতে ভবিষ্যতে তোমার হাত জোড় আর দেখিতে না হয় তাহার ব্যবস্থা আমি শীঘ্রই করিব। তুমি এখন হরিশবাবুর বাড়ী শুভকার্যে যাইতেছ, যাও। তুমি সেখান হইতে ফিরিয়া আসিলে এই বিষয় লইয়া তোমার সঙ্গে কথা বলিব।" গাড়ীতে শ্রীশ্রীমায়ের পার্শ্বে বসিয়াছিলেন দিদি

শ্রীগুরুপ্রিয়া দেবী। তিনি কি বুঝিলেন বলিতে পারি না, তবে মনে হয় নিশ্চয়ই এমন গুরুতর কিছু তিনি ভাবেন নাই। তিনি বলিলেন, "পরে কেন এখনই বলিয়া ফেলুন।" মাও দিদির কথাটা ধরিয়া বসিলেন। তিনিও দিদির কথাটাই পুনরাবৃত্তি করিয়া কহিলেন, "পরে কেন? এখনই বলিয়া ফেল।" মায়ের ও আমার মধ্যে কথা হইতেছিল, ইহার মধ্যে দিদি কোন কথা না বলিলেই পারিতেন। আমাদের কথার মধ্যে তাঁহার কোন কথা না বলাই উচিত ছিল। তাহা হইলে হয় তো ব্যাপারটা এত দূর গড়াইত না। অল্পেই মিটিয়া যাইত। সুখ দুঃখ কেহই কাহাকে দিতে পারে না। জীব আপন আপন কর্মানুসারে সুখ দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে।

> সুখস্য দুঃখস্য ন কোঽপি দাতা পরো দদাতীতি কুবুদ্ধিরেষা।
> অহংকরোমীতি বৃথাভিমানঃ স্বকর্মসূত্রগ্রথিতো হি লোকঃ॥

শ্রীশ্রীমাকে এই কথা বলিয়াই আমার মনে হইল এই প্রকার কঠোর ও অপ্রীতিকর বাক্য প্রয়োগ না করিলেই ভাল হইত। পরে চিন্তা করিলাম, মা তো চারিদিন পর আশ্রমে প্রত্যাবর্তন করিবেন, ইহার মধ্যে হয় তো আমার মনের গ্লানি কিছু লাঘব বা উপশম হইয়া যাইবে। এমনও হইতে পারে এই বিষয় লইয়া মায়ের সঙ্গে আলোচনা করিবার প্রয়োজনই তখন হইবে না। বিধির বিধান কাহারও খণ্ডাইবার শক্তি নাই। আমি বিষয়টি এড়াইবার চেষ্টা করিলে কি হইবে? যাহা ঘটিবার তাহা সংঘটিত হইয়াই যাইবে। আমার বক্তব্যটি এখনই বলিবার জন্য মা আমাকে এমনভাবে পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন যে আমি আর উপায়ান্তর না দেখিয়া অগত্যা বলিতেই হইল, "মা! আমার অবাঞ্ছনীয় এবং অপ্রীতিকর ব্যবহার ও আচরণে তোমাকে বারবার হাতজোড় করিতে হইতেছে। ইহা হইতে আমার পক্ষে লজ্জা ও দুঃখের বিষয় আর কি হইতে পারে? মা! আমার এই কলঙ্কিত মুখ তোমাকে আর ভবিষ্যতে দেখাইতে ইচ্ছা করি না। অতএব আজই, এখনই, আমি আশ্রম ছাড়িয়া চলিয়া যাইতেছি। যাহাতে তোমাকে আমার এই পোড়ামুখ

কখন আর দেখিতে না হয়। আমাকে তুমি দেখিবেও না এবং আমার কাছে তোমাকে হাত জোড়ও করিতে হইবে না, চির বিদায় হইয়া চলিলাম।" অতি দুঃখের সহিত মাকে এই কথা বলিয়া আমি আশ্রমে চলিয়া আসিলাম।

মা আমাকে আশ্রম ছাড়িয়া যাইতে বারংবার নিষেধ করিলেন। এই গোলমালের মধ্যে মায়ের গাড়ী ছাড়িয়া দিল। মা তাঁহার ভক্ত সন্তানদের লইয়া গন্তব্য স্থানে গমন করিলেন। গাড়ী ছাড়িবার মুখে মা পটলদাকে (শ্রীমান্ সতেন্দ্রকুমার বসু। মায়ের পুরাতন ভক্ত ও বিশেষ স্নেহ এবং কৃপার পাত্র।) বলিলেন, "যাহাতে নারায়ণ আশ্রম ত্যাগ করিয়া যাইতে না পারে তাহার ব্যবস্থা করিও।" মা চলিয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গে আমিও মায়ের কথায় কর্ণপাত না করিয়া আশ্রম পরিত্যাগকরতঃ বাহির হইয়া পড়িলাম। পটলদা, বঙ্কিমদা, অবনীদা প্রভৃতি অনেকেই এই ষষ্ঠীর দিন আশ্রম ছাড়িয়া যাইতে পুনঃ পুনঃ নিষেধ করিলেন। এমন কি সোলনের রাজা-সাহেব শ্রীদুর্গা সিংজী (যোগীভাই) পর্যন্ত কত রকমে বাধা দিতে চেষ্টা করিলেন। মর্মান্তিক দুঃখ হৃদয়ে লইয়া মায়ের আদেশ ও আশ্রমবাসীদের অনুরোধ অগ্রাহ্য করিয়া তখনই আশ্রম ছাড়িয়া চলিয়া গেলাম।

শ্রীভগবান্ মঙ্গলময়। তিনি কেন যে কি করেন তাহা বুঝিবার মত আমাদের শক্তি কোথায়? সেই দৃষ্টিভঙ্গি কোথায়? সেই বিশুদ্ধ বুদ্ধিই বা কোথায়? আপাতদৃষ্টিতে কোন কার্য অমঙ্গল বলিয়া মনে হইলেও, তাহার পশ্চাতে যে থাকিতে পারে মঙ্গল ও কল্যাণ তাহা দেখিবার মত অত দূরদৃষ্টি আমাদের মত জীবের নাই।

প্রায় পঞ্চাশ বৎসরের পুরাতন সম্বন্ধ আমার মায়ের সঙ্গে, তাহা এক কথায় ছিন্ন করিয়া চিরদিনের মত তাঁহার আশ্রয় পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলাম। একটা আদর্শকে রক্ষা ও সন্ন্যাসীর ধর্ম পালন করিতে গিয়া এই অতি গুরুতর পরিস্থিতির সৃষ্টি হইল। বর্তমান পরিস্থিতির মধ্যে কি করা আমার উচিত এই চিন্তা আমার মনকে তোলপাড় করিতে লাগিল।

বিপদে যিনি নিক্ষেপ করেন তিনিই আবার বিপদ্ হইতে

উদ্ধারেরও পথ নির্দেশ করিয়া দেন। মহাসাগরে পাতিত করিয়া তিনি সমুদ্র পার হইবার নিমিত্ত উপায় স্বরূপ তৃণ-খণ্ডটি সম্মুখে আনয়ন করিয়া থাকেন। এমনই দয়াল তিনি! তাঁহার করুণার সীমা নাই! আমরা অবোধ তাই তাঁহার অপার দয়ার পরিচয় জানি না। মায়ের এক হাতে করাল কৃপাণ দেখিয়া ভয়ে হৃদয় কম্পিত হয়, অপর হস্তে মায়ের বর ও অভয় মুদ্রা দর্শন করিয়া মাকে পরম স্নেহময়ী করুণাময়ী বলিয়া সন্তান তাঁহার বক্ষে আশ্রয় গ্রহণ করে। এই অবস্থার মধ্যে পড়িয়া সন্ন্যাসের যিনি গুরু যাঁহার মুখ-কমল হইতে সন্ন্যাসীর কর্তব্য সম্বন্ধে উপদেশ শ্রবণ করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলাম, তাঁহার আশ্রয় ব্যতীত অন্যত্র যাওয়া কদাপি উচিত নহে। এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া শ্রীগুরুদেবের কামরূপ মঠে যাইতে উদ্যত হইলে, পটলদা অনেক আগ্রহ করিয়া রিক্শায় আমাকে সেখানে লইয়া গেলেন। আমাকে দশাশ্বমেধ ঘাটে পৌঁছাইয়া দিয়া তিনি তাঁহার গন্তব্য স্থানে গমন করিলেন। পটলদা মায়ের নির্দেশমত আমাকে আশ্রমে রাখিতে না পারিয়া যে বিশেষ দুঃখিত হইয়াছিলেন তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে।

আমি আমার সন্ন্যাসাশ্রমের শ্রীগুরুদেবকে বন্দনা করিয়া সব ঘটনা সংক্ষেপে তাঁহার শ্রীচরণে নিবেদন করিলাম। তিনি কথা না বাড়াইয়া অতি অল্প কথায় বলিলেন, "গৃহস্থের কোন শুভকার্যে সন্ন্যাসীর যোগদান না করাই তো শাস্ত্রের নির্দেশ"। আমার মঠে থাকিবার সব ব্যবস্থা তিনি লোক দ্বারা করাইয়া দিলেন। মায়ের আশ্রম ছাড়িয়া গুরুজীর মঠে আসিয়া মনটাকে কিছুতেই স্থির করিতে পারিতেছিলাম না। যেমন নব পরিণীতা বালিকা বধূ পিতা-মাতার স্নেহের পক্ষপুট পরিত্যাগ করিয়া প্রথম প্রথম পতিগৃহে অপরিচিতের মধ্যে আসিয়া স্বস্তি পায় না, সেইরূপ অশান্তির মধ্যে আমার সারাটা দিন কাটিল।

অপরদিকে মহামহিমময়ী বিশ্বজননী শ্রীশ্রীমা হরিশবাবুর বাড়ীর সকলকে লইয়া শ্রীশ্রীদুর্গাষষ্ঠীর দিন প্রাতে শুভ মুহূর্তে সানাইয়ের সুমধুর আগমনী আলাপের মধ্যে গৃহপ্রবেশ করিয়া সেখানে আনন্দের হাট বসাইয়া আনন্দে বিরাজ করিতে লাগিলেন।

হর্ষ বিষাদ, ভাল মন্দ, সুখ দুঃখ, মান অপমান—এই সকল দ্বন্দ্ব বা বিরোধ আমাদের মত জীবের নিকট।

যিনি দ্বন্দ্বাতীত, স্বরূপে সদা স্থিত, সচ্চিদানন্দ সাগরে সর্বদা নিমগ্ন, তিনি এই সকলের বহু উর্ধ্বে অবস্থিত। তাঁহাকে এই সব বিরুদ্ধভাব স্পর্শও করিতে পারে না। মহাভাবকে উল্লঙ্ঘন বা অতিক্রম করিয়া ক্ষুদ্রভাবের উর্মি হৃদয়ে উত্থিতই হইতে পারে না। মহাশক্তিকে ক্ষুব্ধ করিবার সামর্থ্য কাহার আছে? তিনি হিমাদ্রির ন্যায় অচল, অটল, স্থির ও গম্ভীর। মহামায়ারূপিণী পরাশক্তির স্বরূপ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে—তেজে তিনি কোটি সূর্যের সমান দীপ্তিশালিনী এবং কোটি চন্দ্রের মধুরতার দ্বারা তাঁহার মুখমণ্ডল উদ্ভাসিত। গণনায়কের যে লাবণ্য তদপেক্ষা কোটিগুণ অধিক লাবণ্য মায়ের শরীরে বিদ্যমান। ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর শত্রুনাশের যত শক্তি তাহা হইতে কোটিগুণ অধিক শক্তি আমার মায়ের শত্রুক্ষয়ে। কোটি রুদ্রের সমান উগ্র পরাক্রমশালিনী মা এবং গণেশের সমৃদ্ধিদান করিবার যে সামর্থ্য তাহার কোটিগুণ অধিক শক্তি মায়ের ঐশ্বর্যদানে। কোটি সমুদ্রের ন্যায় মা গভীর এবং কোটি বায়ু অপেক্ষাও অধিক বলের অধিকারিণী আমার মা। এমন মাকে বিচলিত করিতে পারে বিশ্বে এমন শক্তি কাহার আছে? বিরুদ্ধ ভাব লইয়া খেলা করিতে পারেন, মা ব্যতীত এমন আর জগতে কে আছে?

শ্রীশ্রীদুর্গাদেবীর বোধন ও আমন্ত্রণাধিবাসের পর রাত্রিতে মা হরিশবাবুর বাড়ী হইতে আশ্রমে আসিয়া মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ মহাশয়কে (তিনি সেই সময় শ্রীশ্রীমায়ের নির্দেশে আশ্রমের কন্যাপীঠে বাস করিতেন) বলিলেন, "দেখ বাবা! আজ সকালে নারায়ণ আশ্রম ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে। অনেক করিয়াও তাহাকে আশ্রমে রাখা গেল না। বাবা! সে তো তোমাকে খুব মানে। দেখ, তুমি যদি কোন প্রকারে তাহাকে আশ্রমে আনিতে পার"। কবিরাজ মহাশয়কে এই কথা বলিতে বলিতে নাকি মায়ের কণ্ঠস্বর ভারি হইয়া আসিতেছিল। এই কথা বলার পর রাত্রিতে পুনরায় তিনি হরিশ

বাবুর বাড়ী ফিরিয়া যান। কবিরাজ মহাশয়কে এই কথা বলিবার জন্যই যেন মা তাঁহার নিকট আসিয়াছিলেন, নতুবা আজ সকালেই পূজার বাড়ী গিয়াছেন, পুনরায় রাত্রিতে আশ্রমে আসিবার কি প্রয়োজন থাকিতে পারে? শ্রীশ্রীমা আমার মহাভাবময়ী। তাঁহার ভাবের বিশ্লেষণ করিতে যাওয়া বাতুলতা। অতএব যথাশক্তি ঘটনাটিরই বর্ণন করিতে চেষ্টা করিব। ভাবের বা কারণের দিক দিয়া কিছু বলিব না, যেহেতু সে সবই হইবে আমার স্বকপোলকল্পিত অথবা অনুমান মাত্র।

পরের দিন দেবীর সপ্তমী পূজা। এদিকে যথা নিয়মে আমি রাত্রি শেষে শয্যা ত্যাগ করিয়া স্নানাদির পর আপন নিত্যকর্ম্ম জপাদিতে মনোনিবেশ করিতে প্রয়াস করিতেছি, কিন্তু কিছুতেই যথাযথরূপে অন্য দিনের ন্যায় কার্যে মনঃসংযোগ করিতে পারিতেছি না। কেবল যেন ভিতর হইতে গুমরিয়া গুমরিয়া কান্না আসিতে চাহে। আমি মালা লইয়া জপ করিতেছি, সঙ্গে সঙ্গে আমার দুই চক্ষু জলে ভরিয়া আসিতে লাগিল। মনে হইতেছিল এই দীর্ঘদিনের মায়ের সাথে সম্বন্ধ, তাহা এক কথায় চিরদিনের জন্য শেষ করিয়া ফেলিলাম। মায়ের সঙ্গে আমার আর এ জীবনে কখনও দেখা হইবে না। আমিও মায়ের কাছে যাইব না এবং তাঁহার তো আমার নিকট আসিবার কোন কথাই উঠে না। মা আর কখনও "নারায়ণ" বলিয়া সস্নেহে ডাকিবে না। পক্ষান্তরে আমিও তাঁহাকে প্রাণ খুলিয়া কখনও "মা" বলিয়া সম্বোধন করিব না। মা ও পুত্রের এই প্রায় অর্ধ শতাব্দীর মধুর সম্বন্ধ চিরতরে বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। এই রকম একটা পরিস্থিতির সৃষ্টি হইতে পারে ইহা কখনও আমি স্বপ্নেও কল্পনা করিতে পারি নাই।

বেলা অনুমান দশ ঘটিকার সময় পটল দা (শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু) আমার নিকট কামরূপ মঠে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং বলিলেন, "গতকাল রাত্রি দশটার সময় আমি আপনার কাছে আসিয়াছিলাম। অত রাত্রিতে মঠের দরজা বন্ধ হইয়া গিয়াছিল, তাই আর ডাকাডাকি না করিয়া চলিয়া গিয়াছিলাম। শ্রীযুক্ত গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয় আপনাকে তাঁহার সহিত দেখা

করিতে বলিয়াছেন। তাঁহার আপনার সঙ্গে বিশেষ কথা আছে। আমি কখন আপনাকে নিতে আসিব? আমি বলিলাম, "আপনাকে আর আসিতে হইবে না। তিনটার পর চারিটার মধ্যে আমি আশ্রমে গিয়া তাঁহার সঙ্গে দেখা করিয়া আসিব। ইহার পূর্বে তো তিনি বিশ্রাম হইতে উঠিবেন না"। এই কথার পর তিনি চলিয়া গেলেন।

সপ্তমী পূজার দিন প্রাতে আশ্রমের শ্রীসাধন ব্রহ্মচারী হরিশ বাবুর বাড়ী পূজা দেখিতে গিয়াছিলেন। তাহাকে দেখিয়া মা বলিলেন, "সাধন! তুমি নারায়ণের কাছে গিয়া জিজ্ঞাসা করিও আজ সকালে তাহার মনের অবস্থা কেমন ছিল? আর কিছু বলিও না।" ইহা পরে আমি তাহার মুখে শুনিয়াছিলাম।

বেলা অনুমান একটার সময় আহারাদির পর আশ্রমের দুইজন ব্রহ্মচারী সাধন দা ও বঙ্কিম দা আমার নিকট কামরূপ মঠে আসিলেন। সাধন দা আমাকে বলিলেন, "একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতে আসিয়াছি। আপনি কোন প্রশ্ন করিলে কিন্তু আমি তাহার উত্তর দিতে পারিব না। আজ সকালে আপনার মনের অবস্থা কেমন ছিল?"

শ্রীসাধন ব্রহ্মচারীর প্রশ্নের উত্তরে আমি বলিলাম, "আজ প্রাতে সন্ধ্যা করিতে বসিয়া কোন রকমেই জপে মনঃসংযোগ করিতে পারিতেছিলাম না। কেবলই ভিতর হইতে গুমরিয়া গুমরিয়া কান্না আসিতেছিল। চোখ দুইটা জলে ভরিয়া গিয়াছিল। মনে করিতেছিলাম, প্রায় অর্ধশতাব্দীর মায়ের সঙ্গে আমার সম্বন্ধ, তাহা এক কথায় চিরকালের জন্য ছিন্ন করিয়া আসিয়াছি। মায়ের সঙ্গে আর কোন দিন আমার দেখা হইবে না। মা ও পুত্রের এই অর্ধশতাব্দীর মধুর সম্বন্ধ চিরদিনের জন্য বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। এইরূপ একটা অতি বিষাদযুক্ত ও মর্মান্তিক দুঃখের ভাব আজ সকালে আমার মনকে তোলপাড় করিতেছিল।" আমার মুখ হইতে এই কথা শুনিয়া তাহারা দুইজনেই তাহাদের গন্তব্যস্থলে চলিয়া গেলেন। আমাকে আর কোন কথা বলিলেন না। আমার

নিকট হইতে ইহা শুনিবার জন্মই যেন তাহারা আমার কাছে আসিয়াছিলেন।

বৈকাল অনুমান তিনটার সময় পটলদা নিষেধ করা সত্ত্বেও আমাকে আশ্রমে লইয়া যাইবার জন্য পুনরায় মঠে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আমরা দুইজনে শ্রীযুক্ত গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আশ্রমে গিয়া হাজির হইলাম। আমি কবিরাজ মহাশয়ের সম্মুখে যাইতেই তিনি বলিলেন, "আমি কোন কথা শুনিতে চাহিনা। আপনি এখনই আশ্রমে চলিয়া আস্থন। যাও তো জগদীশ, (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন বিশিষ্ট উচ্চকর্মচারী এবং শ্রীকবিরাজ মহাশয়ের অনুরক্ত ভক্ত ও শিষ্যস্থানীয় শ্রীজগদীশ্বর পাল, এম, এ,) তুমি গিয়া স্বামীজীর জিনিসপত্র সব লইয়া আস।" তিনি এমন একটা আপনজনের দাবি বা অধিকার লইয়া স্নেহের সহিত আদেশ করিলেন যে আমি কিছুতেই তাহা অস্বীকার করিতে পারিলাম না। এমন কি তাঁহার কথার একটা উত্তর পর্যন্ত আমার মুখে আসিল না। শ্রীযুক্ত কবিরাজ মহাশয়ের সহিত আমার প্রায় ষাট বৎসরের পরিচয়। এই দীর্ঘকালের মধ্যে তিনি আমাকে কখনও এইভাবে নিজজনের মত আদেশ করেন নাই। আমিও কি জানি কেন আর কিছু চিন্তা না করিয়া মন্ত্র-মুগ্ধের ন্যায় বলিয়া ফেলিলাম, "জগদীশ্বরবাবুকে আমার সঙ্গে যাইতে হইবে না। আমার কোনই জিনিসপত্র সেখানে নাই। আমি আশ্রম হইতে যাইবার সময় কিছুই লইয়া যাই নাই। কেবল শ্রীগুরুজীকে বলিবার জন্য একবার মঠে যাইতে হইবে।" তথাপি কবিরাজ মহাশয় জগদীশ্বরবাবুকে আমার সঙ্গে পাঠাইয়া-দিলেন। আশ্রম হইতে মঠে যাইবার সময় পানুদা (শ্রীকনকাংশু বোস, আশ্রমের প্রধান কর্মসচিব বা সম্পাদক) আশ্রমের মোটর গাড়ী আমাদের ব্যবহারের জন্য দিলেন।

শ্রীগুরুদেবকে সব বৃত্তান্ত বিস্তারিতভাবে নিবেদন করিয়া আশ্রমে প্রত্যাবর্তন করিতেই দেখি শ্রীশ্রীমা হরিশবাবুর বাড়ী হইতে আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। আমি অনুমান করিলাম শ্রীযুক্ত কবিরাজ মহাশয়ের কথায় যে আমি আশ্রমে ফিরিয়া

আসিতেছি এই সংবাদ পাইয়াই তিনি এইভর সন্ধ্যায় পূজার বাড়ী ত্যাগ করিয়া আশ্রমে আসিয়াছেন। নতুবা এখন আশ্রমে পুনরায় আগমনের কোন কারণ অন্বেষণ করিয়া পাওয়া যায় না। পরম-স্নেহময়ী করুণাময়ী শ্রীশ্রীমা আমাকে দেখিয়া সহাস্যে বলিলেন, "চল নারায়ণ! মা দুর্গার আরতি দেখিয়া আসিবে, চল।" মা এমন সরলভাবে হাসিয়া কথাগুলি বলিলেন যে মনে হইল যেন ইহার পূর্বে মায়ের সহিত আমার কোন অপ্রীতিকর ব্যবহার সংঘটিত হয় নাই। পরম স্নেহময়ী মা অবোধ সন্তানের সকল অপরাধ ক্ষমা করিয়া মাতৃত্বের দাবিতে এমন ভাবে চরণে টানিয়া লইলেন যে এবার আমি কিছুতেই তাঁহার আদেশ অমান্য বা অগ্রাহ্য করিতে পারিলাম না। অতি শান্ত শিষ্ট ও আজ্ঞাবহ সুবোধ বালকটির মত মায়ের সঙ্গে হরিশবাবুর বাড়ী শ্রীশ্রীমা দুর্গার আরতি দেখিতে চলিলাম। মায়ের সঙ্গে আমি সর্বদাই ছায়ার মত থাকিতে চাহি, কিন্তু আমার প্রারব্ধই এমন ইচ্ছা পূর্ণ করিতে বাধা সৃষ্টি করে।

এই ঘটনার উপর নির্ভর করিয়া কেহ যেন মনে না করেন যে হরিশবাবুর সহিত আমার কোন বিরোধ বা মনোমালিন্য আছে। বরঞ্চ প্রকৃত তথ্য ইহার বিপরীত। তাঁহার সঙ্গে আমার খুবই হৃদ্যতা এবং ঐ পরিবারের সকলেরই সহিত অত্যন্ত সদ্ভাব ও সৌহার্দ্য বর্তমান। গৃহপ্রবেশের পূর্বে আমিই মাঝে পড়িয়া মাকে তাঁহার বাড়ী লইয়া গিয়াছিলাম। একটা আদর্শ বা শাস্ত্রমর্যাদা রক্ষা করিতে গিয়াই এই অপ্রীতিকর ব্যাপার উপস্থিত হইয়াছিল। কিসের জন্য যে কি সংঘটিত হয়, ইহার তত্ত্ব নির্ণয় করা বড়ই কঠিন! ইহার পশ্চাতে যে কত বড় মঙ্গল লুক্কায়িত রহিয়াছে উহা যথা সময়ে যবনিকা উৎঘাটিত হইলে প্রকাশ পাইবে এবং আমার হৃদয়-ফলকে এমন একটি রেখাপাত করিবে যাহা ভবিষ্যতে কখনও ম্লান হইবে না বরং উহা হইবে আমার জীবনের একটি চিরস্মরণীয় অমূল্য সম্পদ।

শ্রীশ্রীদুর্গাদেবীর আরতির পর মা আমাকে বলিলেন, "ইহাদের নিয়ম দেবীর ভোগ ইহারা নিজেরাই রান্না করে। অপর কাহাকেও দিয়া ভোগ রন্ধন করান হয় না। হরিশবাবুর স্ত্রী অসুস্থ, তিনি

রাঁধিতে পারিবেন না। আজ এক পুত্রবধূ ভোগ রান্না করিয়াছে। কাল হইতে সেও পারিবে না। এখন কি করা যায় বল তো?” মায়ের এই প্রশ্নের উত্তরে আমি বলিলাম, “এখানে উহাদের জ্ঞাতি যখন কেহ নাই, তখন অন্তত পক্ষে সগোত্রের দ্বারা ভোগ রাঁধাইয়া মা দুর্গার ভোগ দেওয়া যাইতে পারে। আশ্রমের আমাদের গীতা ও ছবি বন্দ্যোপাধ্যায় হরিশবাবুদের সগোত্র এবং দুইজনেই দীক্ষিতও বটে। আমার মনে হয় উহাদের দ্বারা ভোগের রান্না চলিতে পারে।” মা এই কথা শুনিয়া হাসিয়া বলিলেন, “নারায়ণ ছাড়া এই সব সমস্যার সমাধান কে আর করিবে?” পরে জানা গিয়াছিল শ্রীমতী ছবি বন্দ্যোপাধ্যায় উহাদের অর্থাৎ হরিশবাবুদের জ্ঞাতি।

শ্রীশ্রীদুর্গাপূজার পর স্নেহময়ী শ্রীশ্রীমায়ের সঙ্গে সংযম সপ্তাহ মহাব্রত উপলক্ষে বৃন্দাবন গিয়াছি। সংযম-সপ্তাহের মধ্যেই সংবাদ আসিল শ্রীহরিবাবাজী মহারাজ দিল্লীতে বড়ই অসুস্থ এবং তিনি মাকে দর্শন করিবার জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল। এই সংবাদ পাইয়া স্নেহময়ী মা কি আর বৃন্দাবনে স্থির থাকিতে পারেন? মা শ্রীহরিবাবাকে দেখিবার জন্য, হরিবাবার অপেক্ষাও অধিক উৎসুক হইয়া পড়িলেন। ভক্তের ভগবানকে দর্শন করিবার জন্য যতটা ব্যাকুলতা, তদপেক্ষা অধিক ব্যাকুলতা ভগবানের ভক্তকে দেখিবার জন্য। একটা প্রচলিত কিংবদন্তী আছে—ভক্ত যদি ভগবানকে দর্শন করিবার জন্য এক পা অগ্রসর হয়, ভগবান্ ভক্তকে দর্শন দিবার জন্য শত পা আগাইয়া আসেন।

মা বৈকাল তিন ঘটিকার ধ্যানের পরই মায়ের ভক্ত রায় বাহাদুর শ্রীগুলজারিমল মোদীর গাড়ীতে হরিবাবাকে দেখিবার নিমিত্ত বৃন্দাবন হইতে দিল্লী ছুটিলেন। রওয়ানা হইবার অব্যবহিত পূর্বে বলিয়া গেলেন রাত্রি নয়টার সৎসঙ্গের পূর্বে ফিরিতে চেষ্টা করিবেন। শ্রীশ্রীমায়ের সঙ্গে গিয়াছিলেন শ্রীকৃষ্ণানন্দ অবধূতজী। উদাস ও আমি মায়ের অপর সঙ্গী ছিলাম। দিল্লীতে শ্রীহরিবাবাকে দেখিয়া যেমন বলিয়া গিয়াছিলেন তেমন রাত্রি নয়টার সময় মা বৃন্দাবন প্রত্যাবর্তন করিলেন। এইভাবে মা নানা স্থান হইতে একমাসের মধ্যে পাঁচবার হরিবাবাকে দেখিতে দিল্লী গিয়াছিলেন। শেষের বার

দিল্লী গিয়া তাঁহাকে দেখিবার পর আর ফিরিলেন না। সেখানেই কিছুদিন মা আশ্রমে অবস্থান করিয়া হরিবাবাজীর সেবা ও চিকিৎসার যাহাতে কোন প্রকার ত্রুটি না হয় সেই সব ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। সেখান হইতে সংবাদ আসিল—মা দিদি গুরুপ্রিয়া দেবীকে দিল্লী রাখিয়া তুফান এক্সপ্রেসে কাশী যাত্রা করিতেছেন। আমি যেন দিদিমাকে (স্বামী মুক্তানন্দ গিরিজী) লইয়া মথুরা স্টেশন হইতে মায়ের গাড়ীতে উঠি। আমাদের টিকিট দিল্লী হইতে করা হইবে। মায়ের সঙ্গে উদাস এবং দিদিমার সঙ্গে বিমলাদি ও আমি কাশী যাইব। মায়ের নির্দেশমত আমরা তিনজন নির্দিষ্ট দিনে মথুরা স্টেশন হইতে তুফান এক্সপ্রেসে মায়ের গাড়ীতে যথাসময়ে উঠিয়া পড়িলাম।

এটাওয়া (Etawah) স্টেশনে শ্রীশ্রীমায়ের দর্শনাভিলাষে বহু ভক্ত আসিয়াছেন। শ্রীজয়নারায়ণ দাদা ও শ্রীবাজপেয়জী মায়ের জন্য এবং সঙ্গীয় অপর সকলের জন্য শুদ্ধমত প্রস্তুত করিয়া আনিয়াছেন দুধদিয়া তৈয়ারী লুচি, বিনা লবণের তরকারি, আচার, গোদুগ্ধ ইত্যাদি। সেই সকল বণ্টন করিবার নিমিত্ত এবং গোছ-গাছ করিয়া রাখিতে উদাস মায়ের কামরা ছাড়িয়া দিদিমার কামরায় আসিয়াছে। মা তাঁহার কামরায় একা আছেন দেখিয়া আমি সেখানে গিয়াছি। ইতোমধ্যে জ্যোতির্মঠের শঙ্করাচার্য শ্রীমৎস্বামী শান্তানন্দ সরস্বতী মহারাজ মায়ের সঙ্গে দেখা ও কথাবার্তা বলিয়া চলিয়া গেলেন। যাবার সময় মা তাঁহাকে প্রচুর ফল দিলেন। তিনি ঐ গাড়ীতেই এলাহাবাদ আসিতেছিলেন।

এটাওয়া হইতে কানপুর পর্যন্ত মায়ের কুপে (Coupe) অর্থাৎ কামরায় আমি ব্যতীত অপর কেহ ছিল না। আমি মায়ের সম্মুখে খবরের কাগজের উপর বসিয়া আধ্যাত্মিক বিষয় লইয়া আলোচনা করিতেছি। নানা কথার মধ্যে অবসরমত কথা প্রসঙ্গে আমি মাকে একলা পাইয়া নিবেদন করিলাম, "মা! এবার শ্রীশ্রীদুর্গাপূজার সময় হরিশবাবুর গৃহপ্রবেশকে উপলক্ষ্য করিয়া যে অপ্রীতিকর ও অভাবনীয় ঘটনাটা ঘটিয়াছিল তাহার জন্য মা, তোমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা হয় নাই। বড়ই ত্রুটি হইয়া গিয়াছে। ক্ষমা না

চাহিতেই অবশ্য তুমি তোমার এই অবাধ্য অধম সন্তানটাকে ক্ষমা করিয়া সব মিটাইয়া দিয়াছ। তবু বলি, "মা! তুমি দয়া করিয়া আমাকে ক্ষমা কর।" এই কথা বলিয়া মায়ের কোলের উপর মাথা রাখিয়া প্রণাম করিলাম। পরমস্নেহময়ী শ্রীশ্রীমা করুণা করিয়া তাঁহার বরদ হস্তখানি আমার মস্তকোপরি স্থাপন করিলেন এবং আমার কথার উত্তরে তিনি বলিলেন,

"সব কথা তো তুমি জান না নারায়ণ। বলার খেয়ালও হয় নাই। তোমার মনে আছে বোধ হয়, সপ্তমীপূজার দিন সকালবেলা তোমার মনের অবস্থা কেমন ছিল, তাহা জিজ্ঞাসা করিবার জন্য সাধনকে তোমার নিকট পাঠান হইয়াছিল। তখন সাধনকে আর কিছুই বলা হয় নাই। অপর কাহাকেও এ পর্যন্ত এই শরীর কিছুই বলে নাই। আজ তোমাকে বলা হইতেছে। তোমার গুরুজীর ওখানে যখন তুমি এই শরীরটাকে মনে করিতেছিলে তখন কেবলই খেয়াল হইতেছিল কতক্ষণে তোমার কাছে এই শরীরটা যাইবে। পূজার বাড়ী শরীরটাকে লইয়া গিয়াছে, দেবীর প্রাণপ্রতিষ্ঠা—হইতেছে, পূজা হইতেছে। এই শরীরটার কেবল খেয়াল হইতেছিল তোমাকে।"

করুণাময়ী সন্তানবৎসলা শ্রীশ্রীমায়ের শ্রীমুখে এই চিব অপরাধী অবাধ্য সন্তানটাকে স্মরণের কথা শ্রবণ করিয়া আমার চোখ দুইটা জলে ভরিয়া আসিল। কৃতজ্ঞতায ও আনন্দে আমার সর্ব শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল এবং বাক্‌শক্তি রুদ্ধ হইয়া আসিতেছিল। ভাবাবেশ একটু শান্ত হইলে আমি পুনরায় শ্রীশ্রীমাতৃক্রোড়ে মস্তক রাখিয়া প্রণাম করিলাম, ক্ষমা চাহিলাম এবং স্বকৃত অপরাধের জন্য যে অনুতপ্ত তাহাও নিবেদন করিলাম। সঙ্গে সঙ্গে স্নেহময়ী মা তাঁহার করকমল আবার আমার মাথায় রাখিয়া ক্ষমা করিলেন।

শ্রীশ্রীমায়ের এইরূপ স্নেহ, ক্ষমা ও করুণার তুলনা কি এই জগতে কাহারও সহিত হইতে পারে? গর্ভধারিণীও এই রকম অপরাধী সন্তানকে এত শীঘ্র ক্ষমা করেন না, যেমনটি আমাদের সন্তানবৎসলা শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী করিলেন তাঁহার এই অবাধ্য ও চির অপরাধী সন্তানটাকে। এই চিরস্মরণীয় ঘটনাটি আমাব কঠিন হৃদয়ের উপর এমন একটি গভীর রেখাপাত করিয়াছে যাহা জীবনে

কখনও ম্লান হইবে না ইহার পর আর কিছু লিখিবার প্রেরণা ভিতর হইতে আসিতেছে না। মরমিয়া কবির ভাষায় শ্রীশ্রীমায়ের শ্রীচরণে বার বার বিনীত প্রার্থনা—

"আমার কেশে ধরে লওগে টেনে,
তোমার চরণ ছাড়া ক'রো না।
আমি হইনা কেন যতই পাপী,
আমার দোষের পানে চে'য়ো না॥
আমি শুনেছি গো লোকের মুখে,
পতিত পেলে লও গো বুকে।
অধম পাষণ্ড ব'লে, জগৎ যারে ছোঁয় না॥"

———

গ্রন্থকারের অন্যান্য পুস্তক :—

১। মহর্ষি শ্রীবেদব্যাস বিরচিত—'অদ্ভুত রামায়ণ' ও অধ্যাত্ম-রামায়ণান্তর্গত—**শ্রীরাম গীতা**
(মূল সংস্কৃত শ্লোক, বঙ্গানুবাদ ও সরল ব্যাখ্যা সহ)

২। ভগবান্ শ্রীআদি শঙ্করাচার্য বিরচিত **বিবেক-চূড়ামণি**—
(মূল শ্লোক, বঙ্গানুবাদ ও সরল ব্যাখ্যা সহ)

৩। ভগবান্ শ্রীআদি শঙ্করাচার্য বিরচিত—**ব্রহ্মানুচিন্তনম্**
(মূল শ্লোক, অন্বয় ও বঙ্গানুবাদ সহ সরল ব্যাখ্যা)

৪। **অজ্ঞাত বনকুসুম**
(সাধু, সন্ন্যাসী, যোগী ও ভক্তদের জীবন-চরিত সংগ্রহ)

৫। মহামহোপাধ্যায় ডঃ গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয়ের পুণ্য জীবনের সংক্ষিপ্ত অনুধ্যান

৬। **দীক্ষিতের শ্রীশ্রীকৃষ্ণ পূজা**—বিস্তৃত-পূজা-পদ্ধতি

ডাক মাশুল স্বতন্ত্র

প্রাপ্তিস্থান :
শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী আশ্রম
ভাদৈনী, বারাণসী—২২১০০১